বং থেকে বাংলা

রিজিয়া রহমান

বং থেকে বাংলা

বং থেকে বাংলা

রিজিয়া রহমান

ঐতিহ্য

আমার শ্রদ্ধেয় অগ্রজ

ড. এ কে এম সিদ্দিককে

ভূমিকা

কোন দেশ বা জাতি তার স্বকীয়তা নিয়ে যেমন একদিনেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না তেমনি তার ভাষাও নানা আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী রূপ লাভ করে সময়ের বিস্তৃতির দ্বারা ।

আজকের বাংলাদেশ যা নদীমাতৃক পলিসমৃদ্ধ এক ভূমি তার জন্ম-লগ্নের সূচনা বহু হাজার বছর আগে ।

ভূতাত্ত্বিকরা মনে করেন হিমালয়ের উৎপত্তিকাল তিনটি যুগে পরিব্যাপ্ত, যথা—

১। ইয়োসিন যুগের শেষ দিক থেকে অলিগোসিন পর্যন্ত ।

২। মধ্য মাইওসিন যুগ ।

৩। মাইওসিনোত্তর যুগ হতে আরম্ভ করে মধ্য প্লাইস্টোসিন যুগ পর্যন্ত ।

প্লাইস্টোসিন যুগের পরিব্যাপ্তি কাল চলেছিল আনুমানিক প্রায় দশ লক্ষ বৎসর ধরে। তৃতীয় হিমবাহর সময়ে অর্থাৎ শেষ প্লাইস্টোসিন যুগ থেকে বর্তমান বাংলাদেশের উৎপত্তি। এর উৎপত্তি কালের সূচনা হয় আনুমনিক তিন লক্ষ বছর আগে। হিমালয়ের এই উৎক্ষেপণকালে এর সম্মুখে দক্ষিণ অংশে একটি নিম্নভাজের (ফোরডীপ) সৃষ্টি হয়। কালক্রমে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ও সম্ভবত মেঘনা বাহিত পলি দ্বারা বাংলার বদ্বীপ অঞ্চল গড়ে উঠতে থাকে। অবশ্য মনে করা হয় বাংলাদেশের মধুপুরগড়, লালমাই ও বরেন্দ্র (উত্তর বঙ্গ) অঞ্চল বদ্বীপের অন্যান্য অঞ্চল হতে প্রাচীন।

বাংলাদেশে মনুষ্য বসতি সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে এখন পর্যন্ত সকলেই ধারণা করেন যে দু'টি সময়ে এখানে মানব বসতি গড়ে ওঠে। প্রথমত সম্ভবত প্যালিওলেথিক তুষার যুগে। দ্বিতীয়ত আর্যরা ভারত উপমহাদেশের উত্তর অঞ্চলে প্রবেশ করলে। অর্থাৎ লৌহ যুগে। হিমবাহর যুগের ধারা হিমালয় অঞ্চল থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। বাংলার বদ্বীপ অঞ্চল সমুদ্র উপকূলবর্তী এবং ইকোয়েটরের নিকটবর্তী হওয়ায় এখানকার আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত কম শীত প্রবাহিত অঞ্চল বলে চিহ্নিত হয়। এ সময়ে উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। এই মানবগোষ্ঠীর বংশধররাই

বর্তমানের বাংলাদেশের উপজাতি খাসিয়া, গারো, হাজং, কোচ, চাকমা ইত্যাদি বলে মনে করা হয়। এদেশে এসে বসতি স্থাপন করে তারা নিজেদেরকে তিবেতো-বর্মন মনে করে থাকে। এরা প্রধানত উঁচু পার্বত্য এলাকাগুলোতো বসতি স্থাপন করে। এদের হস্তশিল্প, চাষাবাদ পদ্ধতি এখনও প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশের আদিম যে মানব সমাজের ইতিহাস পাওয়া যায় তারা সম্ভবত বহু পূর্ব থেকেই এই পলিঅঞ্চলে বাস করে আসছিল। এদেরকে নৃতত্ত্ববিদরা অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফরিদপুর অঞ্চলের কৈবর্ত, রাজশাহী বগুড়ায় ‘বুনো' ও সাঁওতালরা এই গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত। অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর মানবরা চাষ-আবাদ, মাছ ধরা এবং নৌকা চালনায় বিশেষ দক্ষ ছিল। জলপথ বাণিজ্যে এরা অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত একথা মনে করলে বোধ হয় ভুল করা হবে না ।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশের আরেকটি গোত্রকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। আমাদের বর্তমান বাংলাভাষায় যাদেরকে আমরা 'বেদে' বা বাইদ্যা বলি। এই গোত্র এখনও তাদের প্রাচীনতম রীতি অনুসারে জীবনযাপন করে। এরা জলচর-যাযাবর ও মোটামুটিভাবে স্ত্রী জাতি অনুগত গোত্র ।

প্রাচীন গ্রীক ভাষায় জীপসী বা যাযাবরদের 'স্লেষ্ট' বলে আখ্যায়িত করা হয়। পরবর্তী কালে বৈদিক যুগে প্রাচীন শাস্ত্রে দেখতে পাই বাংলাদেশের অধিবাসীদেরকে ম্লেচ্ছ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। গ্রীক শব্দের 'স্লেষ্ট' বা জীপসীদের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রাচীন অধিবাসীদের যোগসূত্র কতখানি তা নির্ণয় প্রমাণসাপেক্ষ। তবে এর থেকে একটা তথ্য উদঘাটন করা যায় যে এই জলচর বাইদ্যারা সব সময়েই যাযাবর এবং সম্ভবত বাংলাদেশের প্রাচীন একটি গোত্র। অবশ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশেই এখনও জলে বাসকারী গোত্র দেখা যায় ।

নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় বাংলাদেশের বাইদ্যাদের শরীরের গঠন, চুল, নাক এবং শরীরের রং থেকে এদেরকেও অস্ট্রো-এশিয়াটিক হিসেবে ধরা যায় ।

সম্ভবত বাংলাদেশের প্রাচীন অধিবাসীরা জলচরই ছিল। এদেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই ছিল নিম্ন জলাভূমি এবং স্থলে বন্য পশুর উপদ্রবের থেকে নিরাপদ থাকবার জন্যই বোধ হয় এবা নৌকায় বসবাস করত।

ড. আর. সি. মজুমদারের মতে অস্ট্রো-এশিয়াটিকরা ছিল স্থলের অধিবাসী এবং কৃষিজীবী ।

তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বাংলাদেশে অস্ট্রো-এশিয়াটিকের একটি শাখা ছিল স্থলের অধিবাসী এবং আরেকটি শাখা নৌকায় বসবাস করে আসছে। এরাই 'বেদে' বা বাইদ্যা ।

আর্যরা উত্তর ভারতে প্রবেশ করলে তাদের সঙ্গে সংঘাতে পরাজিত হতে হতে দ্রাবিড় জাতি ক্রমশ দক্ষিণ ভারতের পর্বতসংকুল অঞ্চলে সরে আসে। দ্রাবিড়দেরই একটি শাখা চলে আসে সমতটে। এই দ্রাবিড়-গোত্রটি বং গোত্র বলে অনুমান করা হয়। অনেকে মনে করেন দ্রাবিড় বং গোত্রের নাম থেকেই 'বংগ' বংগদেশ ও বংআল নামের উৎপত্তি ।

তিবেতো-বর্মন, অষ্ট্রো-এশিয়াটিক এবং দ্রাবিড় জাতির সমন্বয়ে সমতটের বঙ্গে যখন কৃষি এবং জলপথ ও স্থলপথে ব্যবসায়-বাণিজ্যভিত্তিক সমৃদ্ধশালী জনপদে গড়ে উঠেছে তখন এদেশে আগমন ঘটে আর্যদের। 'ঐতয়ের আরণ্যয়' গ্রন্থে বঙ্গদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এই সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে কৃষ্ণবর্ণ দাস্য জাতির আবাস। তারা মাছ ভাত খায় এবং তারা ম্লেচ্ছ।

সম্ভবত দ্রাবিড় জাতিকে পরাজিত করে তারা যুদ্ধবন্দীদের দাস বানিয়ে ছিল। সেই কারণেই হয়তো গৌরবর্ণ আর্যরা কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের 'দাস' 'অসুর' 'দস্যু' ইত্যাদি আখ্যা দিত ।

খুব সম্ভব বাংলাদেশের সম্পদের জনশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হয়ে আর্যরা এদিকে আকৃষ্ট হয়। কিংবদন্তী আছে যে মহাভারতের বীর নায়ক পাণ্ডব বংশীয় ভীম তার সেনাবাহিনী নিয়ে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত আসে। তাঁর সেনারা এখান থেকে ধন সম্পদ লুণ্ঠন করে আর্যাবর্তে ফিরে যায়। আর্যরা অশ্ব চালনায় পটু ছিল। কিন্তু নৌচালনায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেনি। সেই কারণেই নদীনালা এবং জংগলাকীর্ণ বঙ্গদেশ বহুদিন পর্যন্ত তাদের কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যায়।

তবু কিছু কিছু আর্য ক্ষত্রিয় এবং আর্য ব্যবসায়ী এদেশে স্থায়ী ভাবে থেকে যায়।

বঙ্গদেশ যা কিছুদিন আগে পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ নামে পরিচিত ছিল, নদীর ভাঙাগড়ায়

ও বারবার গতি পরিবর্তনের ফলে তার ভৌগোলক সীমানাও বহুবার পরিবর্তিত হয়। তবে তৎকালীন বঙ্গ বলতে বাংলার এই পলিনির্মিত বদ্বীপ অঞ্চল এবং কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ের সংলগ্ন অঞ্চল নিয়ে গঠিত অংশ বুঝাত। রাঢ় বা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ এবং বরেন্দ্রভূমি ছিল নদীর সীমানা দ্বারা বিভক্ত। রাঢ় এবং বরেন্দ্র পূন্ন-বর্ধনের নামানুসারে যে অংশকে পণ্ড্র মনে করা হত। এ অঞ্চলগুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও শুষ্কভূমি ছিল বলে এখানে সহজেই আর্যরা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় ।

সমুদ্রগুপ্তের সময়ে বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত করদ রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু এর বেশ কিছু আগে থেকেই এদেশে আর্যবসতি গড়ে উঠতে থাকে। পাল এবং সেন রাজাদের দীর্ঘ রাজত্ব কালে বাংলাদেশ অনার্য, দ্রাবিড় ও আর্য সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটে ।

ঐতিহাসিকদের মতে খ্রীষ্টের জন্মের আনুমানিক চার পাঁচ শতাব্দী পূর্ব হতে বাংলাদেশ অন্যান্য বিদেশী রাজ্যের সঙ্গে জলপথ-বাণিজ্যে খ্যাতি অর্জন করেছিল। বর্মা (মিয়ানমার), মালয় ও সুদূর প্রাচ্যের (ফার ইস্ট) সঙ্গে এ-দেশেল বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল বলে মনে করা হয়। এছাড়া সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। আসামের মনিপুরের মধ্যদিয়ে বর্মার পার্বত্য অঞ্চল হয়ে দক্ষিণ চীনদেশ পর্যন্ত স্থলপথে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য চলত বহু প্রাচীনকাল থেকে। অপরদিকে উত্তর ভারত হয়ে আফগানিস্থান পর্যন্ত স্থলপথে বাংলাদেশের পণ্য বিদেশের বাজারে পৌছত ।

বাঙালী জাতির জীবনে এই সুদূরপ্রসারী বাণিজ্য সম্পর্কে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে অনুমান করলে বোধ হয় ভুল হবে না।

এই ব্যবসা উপলক্ষেই আর্য, মোঙ্গলীয় অর্থাৎ চৈনিক ব্যবসায়ীও দ্রাবিড় এবং সেমেটিক রক্তের সংমিশ্রণ ঘটা এদেশে খুবই সম্ভব ছিল।

সপ্তম থেকে অষ্টম শতাব্দীতে আরব বণিকেরা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিয়মিতভাবে জাহাজ নিয়ে ব্যবসাকরতে আসত। সেই সময় সম্ভবত কিছু আরব এদেশে স্থায়ী বসবাস শুরু করে। প্রাচীন তামিল এবং তেলেগু সাহিত্যে পাওয়া যায় যে মুহাম্মদ- বিন-কাসেম সিন্ধু জয় করবার বহু পূর্বে দক্ষিণ ভারতে আরব বণিকদের আসা-যাওয়া ছিল । এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব নয় সে সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গেও তাদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।

মহাভারতের যুগ থেকে শুরু করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্ত এদেশে বহু বিদেশী বণিকের আগমন ঘটে। এই সব বিদেশী বণিকেরা একদিকে যেমন বাঙালী জাতির গঠনক্ষেত্রে সংমিশ্রণ ঘটায় তেমনি প্রভাব বিস্তার করে বাংলা ভাষার উপর।

বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এ দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সেই জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ-ছাড়া বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীর হস্ত সম্প্রসারণেও বাঙালীর জাতীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বহু আবর্তন বিবর্তন ঘটে ।

বাংলার আদিম অধিবাসীদের ধর্ম নিঃসন্দেহে আর্য ধর্ম এবং বর্তমান হিন্দু ধর্ম থেকে ভিন্ন ছিল ।

মাহঞ্জোদারো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে যে তথ্য উদঘাটন করা হয়েছে তাতে জানা যায় দ্রাবিড়রা শিবলিঙ্গ, গাভী এবং বৃক্ষের উপাসনা করত। বোধহয় এরাই বাংলাদেশের শিবলিঙ্গ পূজার প্রচলন করে। বর্তমানে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তুলসী গাছকে পূজা দেওয়াটা বোধ করি দ্রাবিড় ধর্মীয় আচারেরই অঙ্গ। মানুষের মধ্যে অচেনা বা অজানা অথবা মনুষ্য অপেক্ষা শক্তিশালী যে কোন শরীরী বা অশরীরী বস্তুকে বোধহয় আদিম কাল থেকেই পূজনীয় ধরা হয়েছে। সর্পপূজা যাকে বর্তমানে মনসা পূজা আখ্যা দেয়া হয়েছে এটা বোধ হয় বাংলাদেশে দ্রাবিড় জাতির আগে থেকে প্রচলিত ছিল। যদিও ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য সর্প পূজার উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মত প্রকাশ করেছেন যে দাক্ষিণাত্যে এই জাতীয় পূজার প্রচলন আছে এবং বিহার অঞ্চলেও মনসাপূজা করবার রীতি বর্তমান। সুপ্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় অর্থাৎ ক্রীট দ্বীপে খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্বে মিনায়ী জাতির মধ্যে সর্পপূজা প্রচলিত ছিল বলে পুরাতত্ত্ববিদ স্যার আর্থার ইভানস মনে করেন। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী মিনায়ী জাতির সঙ্গে সমুদ্র পথে বাংলাদেশের অধিবাসীদের যোগাযাগের মাধ্যমে এই সর্পপূজার উৎপত্তি হতে পারে। তবে এ কথা মনে করলেও বোধহয় অন্যায় হবে না যে এদেশের অধিবাসীদের বিষধর সর্প সংকুল এলাকায় বাস করতে হত বলে এই সর্প-ভীতি থেকেই বাংলার আদিম সমাজে সর্প পূজার প্রচলন হয় ।

আর্যরা এ দেশে সম্পূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করলে বাংলাদেশের শিব পূজা, সর্প পূজা, সূর্য পূজার সঙ্গে আর্য দেবদেবীর উপাসনার সংমিশ্রণ ঘটে।

উত্তর ভারতে আর্য ধর্মে বা ব্রাহ্মান্য ধর্মে অনাচার প্রবেশ করলে এবং ধর্মরক্ষক ব্রাহ্মণরা রাজকার্যে প্রধান্য বিস্তার করলে জনগণ ক্রমশ এ ধর্ম থেকে দূরে সরে পড়ে। মহাবীর পূর্ব ভারতে জৈন ধর্ম প্রচার করতে প্রবৃত্ত হন। সপ্তম শতকে বাংলাদেশে বিশেষত উত্তর বংগে জৈন তির্থংকর ও দিগম্বর সম্প্রদায় প্রভাব বিস্তার করে। পাল রাজাদের সময় বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের পূর্ণ জোয়ার বয়ে যায়। রাজপৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই বৌদ্ধ ধর্ম এদেশের মানুষের কাছে সাধারণভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর কারণও ছিল। যদিও আর্যরা বাংলাদেশের রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল এবং এদেশের অধিবাসীদেরকে আর্য ধর্ম ও জীবনযাত্রা দ্বারা প্রভাবান্বিত করেছিল কিন্তু সমাজে তারাই শ্রেণী বিভাগের প্রচলন করে । আর্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরা ছিল তথাকথিত উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অন্যরা ছিল নিম্নসম্প্রদায় ভুক্ত। সমাজে বিশেষ করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিম্নসম্প্রদায়ের লোকের শ্রমের অবদান বেশী থাকা সত্ত্বেও উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকেদের দ্বারা তারা নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হত । এই জন্যই ভেদবিহীন বৌদ্ধ ধর্মকে সাধারণ মানুষ সাগ্রহে গ্রহণ করে নিল। সেন রাজত্বকালে বাংলাদেশের হিন্দু ধর্ম পুনরুজ্জীবন লাভ করে এবং বৌদ্ধ ধর্ম সম্পূর্ণরূপে রাজপৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে আশ্রয় লাভ করে জনগণের মধ্যে। এর বেশ কিছু আগে থেকেই বাংলায় ইসলাম প্রচার শুরু করে। ইসলাম ধর্ম প্রচার উপলক্ষ্যে বহু সংখ্যক আউলিয়া দরবেশ ধর্ম প্রচারক বাংলাদেশে আসেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কীরা বাংলাদেশ আক্রমণ করে এবং তুর্কী অভিযানের ফলে সর্বপ্রথম উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব বঙ্গ এক শাসকের শাসনাধীনে আসে। বাংলাদেশে সেন রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একদিকে সেন রাজাদের আর্যশাস্ত্র প্রীতি নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি উপেক্ষা, অপরদিকে বৌদ্ধ ধর্ম বিরাগই জনসাধারণকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছিল বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে। এইদিক নিয়ে বাংলাদেশ সর্বজনের মধ্যে একাত্মতার বীজ রোপিত করেছিল বৌদ্ধ-ধর্ম-ই। বলতে গেলে এটাকে যে কোন "ইজম" আখ্যায়িত করা যায় ।

তুর্কী শাসন বাঙ্গালী জীবনে নতুন 'সংস্কৃতি' আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি নিয়ে প্রবেশ করল। যদিও তুর্কীরা এদেশে ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে তত উৎসাহী ছিল না, তবু বাংলার জীবন ধারায় তুর্কী প্রবাহ এসে মিলিত হল স্বাভাবিকভাবেই।

ইলিয়াস শাহী বংশের নাসিরুদ্দিনের পুত্র রুকন উদ্দীন বারবাকশাহ অভিজাত্যের নিদর্শন স্বরূপ আবিসিনিয়া থেকে বিরাট এক হাবসী ক্রীতদাস বাহিনী নিয়ে আসেন। আবিসিনীয় হাবসী ক্রীতদাসরা ছিল নিগ্রো। এদেরকে বলা হত 'সিদি' অর্থাৎ কৃষ্ণকায়। এই হাবসীরা ক্রমে বাংলার সিংহাসন আরোহণ করে। এই সিদিদের রাজত্বকাল বাংলাদেশের ইতিহাসে কলংকিত অধ্যায়। এদের অত্যাচারে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। 'সিদি'রা ছিল মানুষের কাছে আতংক স্বরূপ। অনেকে মনে করেন ঢাকার অদূরবর্তী "সিদ্ধিরগঞ্জ" (সিদিরগঞ্জ) হাবশীদের নাম থেকেই উৎপন্ন ।

হাবসী রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে আরব সন্তান সৈয়দ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ বাংলার শানকর্তা হন। হুসেন শাহের সময় বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য অগ্রগতির পথে চালিত হয়। বলা যেতে পারে যে সাধারণ মানুষের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম যে একাত্মতা এনেছিল হুসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলাভাষা ও সাহত্যের উন্নতির মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদের সেই বীজ অংকুরিত হবার সুযোগ লাভ করে। হুসেন শাহের পূর্বে কোন রাজা বাদশাহ বাংলা ভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করেননি।

দিল্লীতে পাঠান যুগের অবসান ঘটিয়ে মোগলরা আধিপত্য বিস্তার করলে বহু-সংখ্যক পাঠান এসে বাংলাদেশে বসবাস শুরু করে। মোগল বা মোঙ্গলরা খুব একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করেনি। মোগল বাদশাহরা বাংলাকে বলত 'জান্নাত উলবেলাত' অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের আরেকটি নামকরণ তারা করছিল—বুলাখখানা । যার অর্থ হল বিদ্রোহীদের আড্ডা ।

এইসব বিদ্রোহী বলতে বোধকরি বাংলাদেশের তৎকালীন আপামর জনসাধারণ বুঝাত না। বাংলাদেশকে করায়ত্ব করে দিল্লীর শাসকের অধীনে আনতে মোগলদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। এই বিদ্রোহীরা সাধারণত ছিল মোগল শক্তি দ্বারা বিতাড়িত পাঠান সম্প্রদায়।

বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে বিদ্রোহীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় ছিল। কারণ মোগলবাহিনী যদিও স্থলপথ যুদ্ধে দুর্ধর্ষ ছিল, কিন্তু জল পথে প্রাচীন আর্যদের মত ছিল অপারদর্শী । ইতিপূর্বে বাংলাদেশে আর এক জাতির আগমন ঘটেছে। বাংলার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ব্রহ্মদেশের রাজশক্তি বাংলাদেশের উপকূলীয়

জেলাগুলিতে অধিকার বিস্তারে মনোনিবেশ করে। নবম দশম শতাব্দী থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরাকানীরা বার বার উপকূল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অধিকার বিস্তারে তৎপর হয়ে উঠে। এতে বাঙালী রক্তধারায় আরকানী রক্তের মিশ্রণ ঘটে। এছাড়া মোগল সাম্রাজ্য কাল পর্যন্ত মগ বা আরাকানী জলদস্যুদের হানায় নোয়াখালী, বরিশাল, চট্টগ্রাম এমনকি, ঢাকা জেলায় পর্যন্ত অরাজকতা দেখা দেয় । আরাকানী প্রভাবে উপকূলীয় জেলাগুলি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। বহু মগ এইসব অঞ্চলে স্থায়ী বসবাস শুরু করে।

ইউরোপে আরব শক্তির প্রসার ঘটলে ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতির সূচনা হয়। ইউরোপের পর্তুগাল দীর্ঘদিন যাবৎ আরব অধীনতায় থাকায় জাহাজ নির্মাণ এবং জলপথ সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করবার সুযোগ লাভ করে। সে সময়ে ভারত উপমহাদেশের তথা বাংলাদেশের পণ্য ইউরোপের বাজারে ব্যবসা করবার অধিকার একচেটিয়াভাবে আরব বণিকদের হাতেই ছিল। ইউরোপীয় বণিকদের কাছে এ দেশ ছিল কল্পতরু সদৃশ্য সম্পদের দেশ। এদেশের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যপথ আবিষ্কারের জন্য তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৪৯৮ খৃ. ভাস্কোডাগামা সমুদ্রপথে দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপনীত হন। এরপর পর্তুগীজেরা প্রথমত ব্যবসা উপলক্ষে বাংলাদেশে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু পর্তুগীজের মূল লক্ষ্য ব্যবসা ছেড়ে ক্রমে অন্যদিকে সরে আসে। যদিও অনেক পর্তুগীজ এদেশের সুলতানের অধীনে চাকরি করত। তবু শেষ পর্যন্ত বাঙালী জীবনের ইতিহাসে পর্তুগীজ চরিত্র বিকৃত রূপ নেয়। সুযোগ অনুযায়ী এরা কখনও আরাকানীদের পক্ষ গ্রহণ করত, কখনও বা মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে স্থানীয় বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে মিলে ভাড়াটে সৈনিক হিসাবে কাজ করত। পর্তুগাল থেকে যে সব দুষ্কৃতকারী পর্তুগীজদের বহিষ্কার করা হত সে সব জঘন্যতম ফেরারী আসামীরা জাহাজ নিয়ে এসে ঘাঁটি পাতত বঙ্গোপসাগরে। এদের প্রধান কাজ ছিল উপকূলের নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার করা। লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন ও নরহত্যা ছিল এতের নিত্যনৈমত্তিক কর্ম। বাংলাদেশ থেকে লোকজন ধরে নিয়ে তারা দাসদাসী হিসেবে অন্যত্র বিক্রয় করত। সেই সঙ্গে এ দেশের পণ্যেরও কেনা-বেচা করত। দস্যুবৃত্তির সঙ্গে তারা খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করত। মগদের মত পর্তুগীজ রক্তের ধারাও এভাবে বাঙালী রক্তে এসে মিলিত হয়। পর্তুগীজ আবিষ্কৃত জল পথে ডাচ-ওলন্দাজ ফরাসীরাও এদেশে বাণিজ্য করতে আসে। তবে পর্তুগীজদের মত বাঙালী জীবনে এতখানি স্থায়ী ছাপ

ফেলতে সম্ভবত তারা সক্ষম হয়নি। এরপর আসে বণিক ইংরেজ।

এর মধ্যে মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে মধ্য ভারতের মারাঠা সর্দার ভাস্কর পণ্ডিত কিছু লোকজন নিয়ে প্রতিবছর বাংলায় এসে হানা দিতে থাকে। বাংলার লোকের কাছে এরা বর্গী নামে কুখ্যাত। বর্গীরা সাধারণত ভগীরথী নদীর পশ্চিম অংশে এবং রাজশাহী মুর্শিদাবাদ এলাকাতেই অত্যাচার বেশী করেছিল। এদেরও মূল উদ্দেশ্য ছিল দস্যুবৃত্তি। মগ পর্তুগীজদের পর বর্গীরা বাঙালী ললনাকুলকে নির্যাতন করে ইতিহাসে কলংকিত চরিত্র হয়ে আছে। এর ফলেও বর্ণশংকর সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু মগ মিশ্রিত বাঙালীকে যেমন এখনও সনাক্ত করা সহজ, পর্তুগীজরা বর্ণশংকর ফিরিঙ্গী বলেই মোটামুটি পরিচিত। এবং দুশ বছর ইংরেজের সঙ্গে অবস্থানের ফলে যেমন এ্যাংলো শ্রেণীর উদ্ভব। বর্গী রক্ত মিশ্রণকে ঠিক ততখানি সূক্ষ্মভাবে চিহ্নিত করা যায় না। সুদীর্ঘকাল ধরে অষ্ট্রিক জাতির মধ্যে যেমন বিভিন্ন জাতির ধারা এসে একাত্ম হয়েছে তেমনিভাবেই মিশে গেছে মারাঠা রক্তস্রোত ।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যুগ যুগ ধরে নানা জাতি নানা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এসে বাংলার আদিম রক্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে কি একটি শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে ?

উত্তরে বলা যায়, সংস্কৃতি ও ভাষার ক্ষেত্রে এই বিভিন্ন ধারা একই খাতে প্রবাহিত হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে শ্রেণী বিভেদটা বোধহয় এখনও পরলক্ষিত হয়।

দ্রাবিড় ও আষ্ট্রিক জাতির মিশ্রণটা স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিল ! আর্য সংমিশ্রণ প্রাকৃতিক নিয়মে কিছুটা হলেও আর্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশীয় লোকের সংমিশ্রণে প্রথম থেকেই সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাস অনুসারে বৈদিক ব্রাহ্মণরা খুব সম্ভবত বাংলাদেশে আসেনি। রাঢ়ি এবং বরেন্দ্রী ব্রাহ্মণ বলতে আমরা যাদের বুঝি এরা ছিল জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণ । বৈদিক বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিটি শ্রেণী ধারণাকে কেন্দ্র করে বল্লালসেন বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে কৌলিণ্য বিতরণ করেন। তবে ধারণা করলেও বোধহয় ভুল হবে না যে বল্লাল সেনের কৌলিণ্য বিতরণ ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক । সমাজে শ্রেণীর সৃষ্টি করে কিছু শ্রেণীকে অতিরিক্ত সম্মান বা প্রাধান্য দিয়ে সেন শক্তির অনুগত রাখাই বোধহয় তার উদ্দেশ্য ছিল। এর ফলে বাঙালী হিন্দু সমাজের দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়, একটি সম্প্রদায় অভিজাত।

অপরটি অনভিজাত। এই অনভিজাতের মধ্যে বাংলার আদিম অধিবাসীর বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট।

এদেশে বহিরাগত মুসলমান প্রথম পর্যায়ে হয়তো কিছুটা আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এরা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে নিজেদের অস্তিত্ব স্বতন্ত্র রাখার চেষ্টা করে। মুসলমান ধর্মীয় কানুন অনুসারে এই বংশে বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার বোধহয় সম্ভবপর হয়েছিল।

মুসলমান আরব, তুর্কী, তাতার, মোঙ্গল অপেক্ষা পাঠান এবং তুর্কী সম্প্রদায়ই অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যায় এদেশে বসতি স্থাপন করে। খুব সম্ভব এদের থেকেই বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের প্রাথমিক উদ্ভব। এছাড়া মুসলমান শাসকরা অধিকাংশই পারস্যদেশীয় অভিজাতকথিত আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ ছিলেন। এই রইসীয়ানা থেকেই আশরাফ আতরাফ বা ভদ্র অভদ্র শ্রেণীর সৃষ্টি। এক্ষেত্রে বংশ আভিজাত্য ছাড়াও অর্থনৈতিক কারণও বর্তমান ছিল। যেসব সাধারণ মুসলমান মুসলিম শাসকদের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ চাকরিতে রত ছিলেন তারাও এই রইসীয়ানা রপ্ত করে আশরাফ বা অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত হন। এক্ষেত্রে শ্রেণীবিভক্ত অনভিজাত মুসলমান তারাই যারা অধিকাংশই ছিল বৌদ্ধ এবং হিন্দু শাসনামলে উপেক্ষিত ধর্মান্তরিত নিম্নবর্ণ সম্প্রদায়। ধর্মের বিভেদমূলক আচরণে এবং বৌদ্ধদের প্রতি বিরাগের ফলেই এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। সেই কারণেই বোধহয় একজন মুসলমান চাষী এবং হিন্দু চাষীর শারীরিক গঠনসৌষ্ঠবে খুব একটা পার্থক্য অনেক সময় দৃষ্টিগোচর হয় না। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। তার কারণ হচ্ছে মুসলমান বাদশাহ সুলতান, সুবেদারদের বহু সৈন্যসামন্ত শেষ পর্যন্ত চাষাবাদে আত্মনিয়োগ করে চাষীতে পরিণত হয় ।

পরবর্তীকালে সামাজিক মর্যাদা লাভের মাধ্যম শিক্ষা-দীক্ষাকে অবলম্বন করে বা এর দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে এই নিম্নশ্রেণীর সম্প্রদায়ের কিছু অংশ আদিম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। সমগ্র ভারত উপমহাদেশে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব একমাত্র বাংলাদেশেই বর্তমান। এর কারণ উত্তর পশ্চিম অংশে এমনকি এককালের বিখ্যাত বৌদ্ধ ধর্ম চর্চা কেন্দ্র পাটলীপুত্র হতে নির্যাতিত হয়ে বৌদ্ধদের সরে আসতে হয় পূর্বাঞ্চলের দিকে। শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বিরাগই বৌদ্ধধর্ম পতনের একমাত্র কারণ নয়। যেমন করে আর্যধর্মে ব্রাহ্মণদের দ্বারা

ধর্মরক্ষার নামে অনাচার প্রবেশ করায় আর্যধর্ম দুর্বল হয়ে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়, বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা ঘটে।

সংঘারামে নানা প্রকার অনাচার প্রশ্রয় পেতে থাকে এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ও সংসার লোভী হয়ে ওঠে। ক্রমে বৌদ্ধ ধর্মের হীনযান মহাযান বিভাগ দুটি আরো কতগুলি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই বিভাগ আর কিছুই নয় নীতির মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেওয়া। মহাযানীদের মধ্যে একদল সহযান মতবাদ দ্বারা বিভক্ত হয়ে যায়। সহযান বা সহজিয়ারা পরে তন্ত্রবাদ বা তান্ত্রিক অথবা নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলে যায়। মনে করা হয় বৌদ্ধ মতাবলম্বী চান্দ্র বংশীয় রাজাদের সময়েই এই বিভক্তি শুরু হয়। সহজিয়া সম্প্রদায়ের সময়কাল থেকেই বাংলা প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন উদ্ধার করা হয়। ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তিব্বত থেকে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় নামক টীকা সম্বলিত একটি পুঁথি উদ্ধার করেন। এবং বলা হয় এতে সংকলিত ৪৭টি গান সিদ্ধ যোগীদের দ্বারা রচিত। আদিম বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গরূপ সম্ভবত এই গুলিতেই পাওয়া যায় ।

পলি নির্মিত সমতট বঙ্গ পরে বঙ্গাল, মোগল আমলে সুবা-ই-বঙ্গাল থেকে ইংরেজ আমলে বেঙ্গল অবশেষে বাংলাদেশ নামে ভাস্বর হয়ে ওঠে। এদেশের অধিবাসীরা পরিচিত হয় বাঙালী নামে। মনে করলে বোধ হয় ভুল হবে না 'বংগাল' বা 'বাঙাল' শব্দই হচ্ছে বাঙালী নামের প্রাথমিক উচ্চারণ।

যেমন করে ধীরে ধীরে এদেশ গড়ে উঠেছিল তেমনি যুগে যুগে বিভিন্ন মানবধারার আগমনে সংমিশ্রিত বাঙালী জাতির সৃষ্টি। আর সদাপ্রবাহিত নদীর মতই সকলের অজ্ঞাতসারে এদেশের ভাষা এক বেগমতী নদী হয়ে ওঠে। নানা স্থান থেকে এসেছে নানা জাতি। সঙ্গে নিয়ে এসেছে তাদের ভাষা। এইসব বিভিন্ন শাখা-প্রশাখারূপী ভাষার স্রোত মূল স্রোতধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে শক্তিশালী এক ভাষা, যার নাম বাংলাভাষা।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত বহু পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করতেন বাংলা ভাষা সংস্কৃতেরই একটি শাখা বা সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন। আবার অনেকের ধারণা বাংলা প্রাচীন মাগধী থেকে জাত । কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাভাষা সংস্কৃতের বা মাগধী ভাষার দুহিতা নয়। এটি একটি মৌলিক ভাষা ।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৪৯ সনে একবার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পূর্ববঙ্গে আসেন। এবং এখান থেকে ফিরে গিয়ে পূর্ববঙ্গ বা আদি বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি যে বক্তৃতা করেন তার মূল কথা হল বাংলাদেশ ভারতের অংশ নয়। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে এটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা দেশ। এর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু গাছপালা প্রমাণ করে দেয় যে সে ভারত নয় ।

যে দেশের প্রাকৃতিক গঠন প্রমাণ করে যে সে দেশ কোন উপমহাদেশের অংশ নয়, আলাদা একটা দেশ, সে দেশের ভাষাও সেখানে সৃষ্টি হবে এটাই তো স্বাভাবিক ।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা সাহিত্য লিখন সৃষ্টির একশ বছর আগে বাংলা ভাষার জন্ম। তিনি মনে করেন আনুমানিক ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলাভাষার আদিযুগ শুরু হয়। নানা আবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষা তার বর্তমান যুগে এসে উপনীত হয়েছে।

আর্যদের বাংলাদেশে আগমনের পূর্বে অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর লোকের মধ্যে কোন লিখন পদ্ধতি ছিল কিনা সে সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে দ্রাবিড়দের আসার পরে এদেশে কোন লিখন পদ্ধতি চালু হওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ থেকে জানা যায় যে তাদের মধ্যে লিখন পদ্ধতি চালু ছিল। অতএব, একথা অনুমান করলে বোধহয় ভুল হবে না যে বাংলাদেশে আগত দ্রাবিড়রা লিখন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারত।

দ্রাবিড় আগমনের পূর্ব থেকে এ পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে শব্দগতভাবে ভাষাতত্ত্ববিদরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা তদ্ভব, তৎসম, অর্ধতৎসম, দেশী ও বিদেশী। এই বিভক্তিকরণের মধ্য দিয়েই বাংলাভাষার বিবর্তন সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

দেশী বা অবিমিশ্র বলে যতগুলি খাঁটি বাংলা শব্দ আমরা পাই যেমন পাড়া, ঘোমটা, ঘুড়ি, ঝোপ, ছাল, বুড়ি, গণ্ডা, ডিঙি, ঢেঁকি, কাড়া ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যে দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের ভাষায় কিছু অবদান আছে ধরে নেয়া যায় ।

পরবর্তীকালে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি এদেশে প্রসার লাভ করলে তদ্ভব, তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দ রূপে আর্যভাষা বাংলা প্রাচীন ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে।

এরপর অপরাপর বিদেশী শব্দের মধ্যে যেসব বিদেশী শব্দ বাংলাভাষায় সংখ্যাগরিষ্ঠ তা হচ্ছে তুর্কী ও ফারসী এবং ইংরেজী। তুর্কী বিজয়ের পর থেকে মোগল আমলের অন্তিমকাল পর্যন্ত ফারসী ছিল এদেশের রাজভাষা বা রাষ্ট্রভাষা। যার ফলে ফারসী শব্দসমূহ বহুল পরিমাণে বাংলাভাষায় নিজস্ব স্থান করে নেয়। অনুরূপভাবে প্রচুর পরিমাণে ইংরেজী শব্দ দুশ বৎসর বৃটিশ শাসনাধীন বাংলার কথ্য ভাষায় প্রবেশ করে ।

ইসলাম প্রসারের ফলে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে আরবী ভাষা বিদেশী শব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করে ।

পর্তুগীজ এবং আরাকানী বর্মী শব্দও বাংলা ভাষায় প্রভাব বিস্তার করবার কারণ ঘটেছে। তবে পর্তুগীজ শব্দ যে পরিমাণে বাংলা ভাষায় দেখা যায় বর্মী শব্দ সে তুলনায় কম। বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলি বহুদিন ধরে আরাকানী শাসনের অধীনে ছিল। এমনকি আরাকান রাজসভায় বা রোসাঙ্গ রাজ্যে রীতিমত বাংলা সাহিত্যের চর্চা হত, এতে বাংলা ভাষার ওপর আরও উল্লেখযোগ্যভাবে বর্মীয় শব্দের প্রভাব বিস্তার করা উচিত ছিল। ভবিষ্যৎ গবেষণায় বাংলা ভাষার মধ্যে বর্মী শব্দের সংখ্যা আরো অধিক পরিমাণে আবিষ্কৃত হবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করা যায় ।

এ ছাড়া বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারে ওলন্দাজ, ফরাসী, চীনা, জাপানী, মালয়, তিব্বতি প্রভৃতি আরো বিদেশী শব্দ স্বাভাবিকভাবে প্রবেশ করেছে।

ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব ঘটার পর বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমগ্র দেশগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় বাংলা ভাষায় জার্মান, রাশিয়ান, ইতালীয় প্রভৃতি বিভিন্ন বিদেশী শব্দ এসে মিলিত হয়েছে।

এছাড়া বিদেশী দ্রব্য আমদানীর সঙ্গে আমরা বহু বিদেশী শব্দ আমাদের ভাষায় নিয়ে আসছি।

এমনিভাবেই বাংলাভাষা ক্রমাগত অর্থাৎ যুগ যুগান্তর ধরে নানা বিদেশী শব্দ চয়ন করে তার শ্রী এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি করছে। ইদানীংকালে অর্থাৎ বিগত চব্বিশ বৎসরের পাকিস্তানী শাসনে বাংলা ভাষায় কিছু উর্দু শব্দও এসেছে।

বাংলা সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে সংক্ষেপে বলতে হয় সপ্তম শতকের চর্যাপদের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট আদি বাংলা সাহিত্য আজ এমন এক স্তরে এসে

পৌঁছেছে যা বিশ্বের যে কোন ভাষা ও সাহিত্য সম্পদের সমগোত্রীয়। শেষ প্লাইস্টোসিন যুগের পর হতে হাজার হাজার বছর ধরে নদীবাহিত পলির দ্বারা যে বাংলাদেশের সৃষ্টি, সে দেশের অধিবাসীও যুগে যুগে আসা বিভিন্ন জাতির রক্তর ফসল। তেমনি বিভিন্ন ভাষা হতে স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হয়ে আসা শব্দের অপভ্রংশ হতে শক্তিশালী বাংলা ভাষার সৃষ্টি ।

বাংলাদেশের জাতি গঠন ও ভাষার বিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে বং থেকে বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি। তবে এর মূল কথা অন্য। আড়াই হাজার বছর আগে বং গোত্র থেকে শুরু করে উনিশশ' একাত্তুরের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয় কাল পর্যন্ত দীর্ঘ পরিব্যাপ্তির মধ্যে এ উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস করা হয়েছে। দীর্ঘ সময়ের বিভিন্ন যুগ থেকে বিভিন্ন ঘটনা গ্রহণ করে বিধৃত করা হলেও একটি মূল কথায় এসে এর সমাপ্তি ঘটান হয়েছে। বাংলার সিংহাসন চিরকাল বিদেশী ক্ষমতালিপ্স ও সম্পদলোভীর দ্বারা শাসিত হয়েছে। কিন্তু জনগণ থেকে তারা ছিল বিচ্ছিন্ন। বাংলার সাধারণ মানুষ চিরকালই ছিল অবহেলিত উপেক্ষিত এবং উৎপীড়িত। জাতি হিসেবে সামাজিক অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিক মর্যাদা তারা কোনদিন পায়নি 'বং থেকে বাংলা' যেমন এক দিকে ইতিহাসের সঙ্গে সেই কথাটিই প্রকাশ করেছে তেমনি কি করে সুদীর্ঘ দিনে একটি জাতি স্বাধীনতার মর্যাদায় এসে দাঁড়িয়েছে তারই চিত্রণের চেষ্টা করেছে। উপন্যাসটিতে বিভিন্ন সময়ের ঘটনা গ্রহণ করা হলেও এর মূল সুর আগাগোড়া একটি বক্তব্য ব্যক্ত করেছে বলেই ঘটনার বিচ্ছিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এটিকে আমি উপন্যাসই আখ্যা দিয়েছি। অনিবার্য কারণবশত নবম অধ্যায়ের পর আমি আরো যে দুটি অধ্যায় যোগ করতে চেয়েছিলাম যেমন ইংরেজ রাজত্বের শেষযুগ ও ভারত পাকিস্তানের উৎপত্তি, সেটি করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া স্বাধীনতার যুদ্ধের অধ্যায়টিকেও আমাকে মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংক্ষিপ্ত এবং সংযত আকারে আনতে হয়েছে। এরজন্য আমি নিরুপায়ভাবে পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তবু বলছি বং থেকে বাংলা উপন্যাস মূলত একটি দেশ ও জাতি গঠনের ইতিহাস, সাধারণ মানুষের বঞ্চনার দুঃখের হাহাকারের ইতিহাস, এবং একটি জাতির জাগরণের ইতিহাস।

রিজিয়া রহমান

প্রথম অধ্যায়

এক

সমুদ্র মেখলা স্রোতস্বিনীর ধারা-স্পর্শী নীল বনাচ্ছন্ন এক ভূমি। কবে সেই সৃষ্টির আদিতে যখন তৃতীয় হিমবাহর যুগ অতীত হয়ে পৃথিবীর বুকে নেমেছে সোনালী বসন্ত। কিন্তু তখনও জন্মলগ্নের আলোড়ন হিমালয়ের দক্ষিণ-পুর্ব সীমানায়, সেই জন্মলগ্নের বেদনা-আনন্দের মধ্য দিয়ে নীল জলধির বুক চিরে দেবী ভেনাসের মত জেগে উঠেছিল এই ভূখণ্ড। পাষাণ পর্বতের অন্তঃস্থল থেকে যে পয়োধর সদৃশ্য স্নিগ্ধ ধারা কিশোরীর চঞ্চলতার নৃত্যছন্দে স্বচ্ছ শরীরে ঘর ছেড়েছিল সেই ক্ষীণাঙ্গী ধারাই পূর্ণ যৌবনা হয়ে জন্ম দিল এক সুবর্ণ পলিখণ্ড—সমতট ।

এই শ্যাম ভূখণ্ডের দিগন্ত বিস্তৃত তরুরাজির শাখায় দোয়েল শ্যামা ফিঙে শিস দিয়ে গান গায়। নদীতীরের ঘাসের বনে ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ায় হলুদ-সাদা ছিটের হরিণেরা।

শণ আর হিন্তাল বনের আবছায়ায় নরম আঠাল মাটিতে হিংস্র নখের ছাপ এঁকে ফেরে ডোরাকাটা শার্দুল।

দ্বিপ্রহরের স্নিগ্ধতাকে কম্পিত করে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষুধার্ত পশুরাজ। সমতটে উত্তর-পূর্বের ঢেউতোলা টিলার লাল মাটিতে পায়ের খুরের দাপটে ভূমিকম্পের অস্থিরতা জাগিয়ে লালধূলির ঝড় তুলে ছুটে বেড়ায় নীল গাই, বন্য মহিষ, গণ্ডারের দল। জলাভূমিতে নেমে শুঁড় দিয়ে পানি ছিটিয়ে কেলী করে হস্তীযূথ । আর গাছের শাখায় শরীর জড়িয়ে মুখ ব্যাদন করে শিকার আকর্ষণের মায়া নিঃশ্বাসে হরিণ-শিশুকে টেনে আনে অতিকায় অজগর। ঝোপে-ঝাড়ে জলার পারের ঘাস বনে তীব্রগতি বিষাক্ত সরীসৃপেরা নির্বিঘ্নে ঘোরে। নদীর ধারের বালিতে বৌদ্র পোহায় মাংসাশী কুমীর ।

এক বিচিত্র আরণ্যক আদিম ভূমির বুকে বিচিত্রতর শ্বাপদসংকুল জীবন ।

এখানে এলো একদিন দু'টি ছিন্নমূল মানুষ। উত্তরে সমৃদ্ধশালী দ্রাবিড়ভূমিতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র আর মণিমুক্তার লোভে হানা দিল স্বর্ণকেশী গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় অশ্বারোহী যাযাবর আর্যরা। তাদের বর্বর অস্ত্রের আঘাতে শান্তিপ্রিয় নিরীহ

দ্রাবিড়েরা হল ছিন্ন- বিচ্ছিন্ন। কিন্তু আর্যদের বিক্রম কেবল স্থল-ভূমিতে, জল বিচরণে তারা অপটু। তাই সেই স্থলে বারংবার হানা দিয়ে তারা এক সন্ত্রাসের রাজ্য তৈরী করল। অসংখ্য দ্রাবিড় পুরুষ নিহত হল। নারীদের লাঞ্ছিত করে করা হল দাসী। শিশুদের বর্শার ফলকে বিদ্ধ করে বল্লমধারী চর্ম-পরিহিত আর্যরা মহা উল্লাসে অগ্নিসংযোগ করল দ্রাবিড় জনপদে। দ্রাবিড় দুর্গগুলির পতন ঘটল একে একে। তীরন্দাজ দ্রাবিড় যোদ্ধারা তীর নিক্ষেপ করতে করতে পিছু হটে অবশেষে ঘাঁটি তৈরি করল পর্বত- বন্ধুর দক্ষিণ ভূমিতে। এদেরই একদল জাহাজ ভাসিয়ে সমুদ্রচারী হল। সমুদ্রে তাদের জলযানগুলো ভাসতে লাগল নতুন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। এই বহরের একটি জাহাজ প্রবল কুয়াশায় দিগভ্রষ্টহয়ে দলছাড়া হল। অনির্দষ্টভাবে নোনা জলের ঝাপ্টা খেয়ে ভাসতে লাগল দিবিহীন অসীম সাগরে ।

ভোরের কুয়াসা কেটে সাগরের নীল জলে রঙ ছড়িয়ে হেসে ওঠে দিনের সূর্য। প্রচণ্ড খরতাপ বিকিরণ করে দিনের শেষে সাগরের বুকে হয় অস্তমিত। আসে তারকাখচিত রাত। কিন্তু তবু মাটির দেখা নাই। বারবার হয় দিক ভুল। এদিকে জাহাজে খাদ্য ফুরিয়েছে। পানীয় জল শেষ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিরাশায় এক জাহাজ মানুষ হন্যে হয়ে উঠেছে। কোথায় এ যাত্রার শেষ ! কোথায় আছে মাটি! এমন তিল তিল করে মরার চেয়ে সেই গৌরবর্ণ অশ্বমানবদের দাস হয়ে থাকাও যে ভাল ছিল। কেন এমন হল ?

জাহাজের বয়োজ্যেষ্ঠ জানাল, সমুদ্র-দেবতা হয়েছেন অসন্তুষ্ট। দেবতাকে খুশী না করলে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে কারো রেহাই নেই। তা হলে এখন উপায়!

জাহাজের স্ত্রী-পুরুষ আশ্বাস চায় বয়োজ্যেষ্ঠের কাছে। আছে, উপায় আছে। দেবতার কোপ থেকে বাঁচতে হলে উৎসর্গ করতে হবে একজোড়া স্ত্রীপুরুষ। সবচেয়ে বলিষ্ঠ সুদেহী দু'টি তরুণ-তরুণীকে ফেলে দিতে হবে জলে। তবেই দেবতা হবেন সন্তুষ্ট। পাওয়া যাবে স্থল-ভূমির ঠিকানা। বয়োজ্যেষ্ঠর কথায় মৃত্যু- পথযাত্রী মানুষেরা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক জোড়া তরুণ- তরুণীকে খুঁজে বের করা হল। সত্যি এরা সুন্দর। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার ক্লান্তি, ক্ষুধা- তৃষ্ণার ক্লিষ্টতায় তাদের দেহবর্ণের শ্যামলিমার উজ্জ্বলতা ম্লান হয়নি। সুডৌল পেশী হয়নি শিথিল। চোখের কাজলকালো মনোহারিত্ব নিষ্প্রভায় হারায়নি। দেবতার জন্য এরাই হবে সর্বোৎকৃষ্ট নৈবেদ্য। পরদিন সূর্যোদয়ের সময়ে মহা উল্লাসধ্বনি করে তরুণ-তরুণীকে সাগরে ফেলে দেওয়া হল ।

সমুদ্র-দেবতা পরিতুষ্ট হলেন কি না কে জানে-তরুণ-তরুণী সাগরে ভাসমান একটি কাষ্ঠখণ্ড ধরে ভাসতে লাগল ।

অবশেষে একদিন অর্ধমৃত অবস্থায় তারা দেখল সমুদ্র তাদের গ্রহণ করেনি। ঠেলে দিয়েছে মাটির কোলে। অভুক্ত দুর্বল শরীর নিয়ে হাত ধরাধরি করে তারা উঠে দাঁড়াল। তারপর শুরু হল চলা। একদিকে সাগর। আর একদিকে স্থলভূমি ঘিরে গভীর অরণ্য। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তারা বুঝল সাগর পিছে ফেলে নদীর কিনারা ধরে তারা অরণ্যে প্রবেশ করেছে। অবসন্ন ষোড়শী বসে পড়ে। সে আর হাঁটতে পারছে না। গাছের ফলমূল খেয়ে আর নদীর পানিতে তৃষ্ণা নিবারণ করে তারা তো শুধু হেঁটেই চলেছে। কিন্তু মানব-বসতির চিহ্ন যে এখনও মিলল না। তরুণটি যেন অপরাজেয় সৈনিক। হার মানলেই যে মৃত্যু। জনবসতি না হোক অন্তত বাস করবার মত ভূমি যে খুঁজে বের করতেই হবে।

ভাঙা গাছের ডাল আর লতা বেঁধে ভেলা তৈরী করে ফেলল তারা। জঙ্গলের কাঠ দিয়ে বৈঠাও বানিয়ে নিল। তারপর শুরু হল আবার নদীপথে যাত্রা। গভীর বনানীর সীমা শেষ হল একদিন। নদীর দু'ধারে তৃণভূমি। তটের কিনারায় বুনো গাছ আর সবুজ তৃণক্ষেত্র। তার ছড়া হাওয়ায় দুলছে। এখানে গাছপালা কিছু কম । নানা রঙের পাখী আর হাঁস ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। ভেলা থামল। হাত ধরাধরি করে নেমে এল ওরা। নরম কাদায় ভরা মাটিতে দু'জোড়া পায়ের ছাপ এঁকে বুক সমান ঘাসের বন ঠেলে মাঠের ওপর উঠে এল দু'জন।

পাখীর ডাকে নদীর কূল মুখরিত। মাথার ওপর দীপ্ত সূর্য। স্নিগ্ধ হাওয়ার স্পর্শে শরীর জুড়িয়ে গেল ।

একটি ঘন শাখা পল্লবিত গাছের নিচে বসে পড়ল ওরা।

-এখানেই আমরা ঘর বাঁধি বং।

তরুণী মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল ।

শ্রান্ত তরুণের মুখেও হাসির ঝলক দিল ।

- হ্যাঁ এলা। এখানেই আমরা নতুন ঘর তৈরী করব। কি সুন্দর এই দেশটা । পথক্লান্তি ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা সব ভুল এই পাখী-ডাকা নতুন দেশের সুন্দর নীল আকাশ, ছোট ছোট ঢেউতোলা খরতোয়া নীল নদী, সবুজ মাঠের শোভায়

তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল বং আর এলা।

দুই

পূর্ব আকাশে আলোর আভাস। বং এলাকে ডাকল এলা চল নামি রাত কেটে গেছে।

দু'জনে নেমে এল গাছ থেকে নীচে। রাতটা গাছের ওপরেই কাটিয়েছে ওরা। নীচে নেমে বং বলল—কাল রাতে আমি মাঠের ও-পারে দূরে আগুন দেখেছি। বোধহয় ওখানে মানুষের বসতি আছে। চল ওদিকে খোঁজ নেই ।

এলার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সভয়ে বংয়ের একটা হাত আকর্ষণ করে বলল—সর্বনাশ বং। ও আগুন নিশ্চয়ই কোন দত্যি-দানো, ভূত-প্রেতের মায়ার আলো । চল এখুনি এখান থেকে আমরা পালাই ।

বংয়ের মুখেও এলার উদ্বিগ্নতার ছায়া পড়ল। তবু ইতস্তত করল সে-কিন্তু.....।

- না না। কিন্তু নয়। এ নিশ্চয়ই দানোর রাজ্য। এখানে কি মানুষের বসতি থাকতে পারে ? দেখনি সারা-রাত গাছের নীচে হরিণেরা ছুটে বেড়ায়। বাঘেরা জল খেয়ে যায় নদী থেকে ।

বংয়ের দৃষ্টি ততক্ষণে মাঠের প্রান্তে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রভাতের স্বচ্ছ আকাশের দিকে উত্থিত ধূম্র-কুণ্ডলীর দিকে আঙ্গুল তুলে বং বলল—ওই দেখ এলা। দেখেছ ? আমি ভুল বলিনি। আগুন তো একমাত্র মানুষের কাছেই থাকে ।

এলাও ধোঁয়া দেখল। তার মুখ থেকে শঙ্কার মেঘ কেটে গেল। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এলা বলল—চল ।

কিন্তু চলা বললেই চলা নয়। এলা তখন এক বিপত্তি বাধিয়ে বসেছে। কাল সারা দুপুর ভরে নদীর ধারের শণ ঘাস তুলে নিজের জন্য পোশাক বানিয়েছে সে। কিন্তু হাতে বোনা শণের পোশাকে বড় বড় ছিদ্র রয়ে গেছে, গাছতলার কাঁটাঝোপের একটা ডাল এলার বসনের ছিদ্রে আটকে এলাকে অচল করে ফেলেছে। কাঁটা থেকে বসন ছাড়াতে গিয়ে এলার হাতে কাঁটা ফুটল। কণ্ঠে বেদনা ঝরিয়ে এলা বলল—উঃ। থাম বং। আমি কাঁটায় আটকে গেছি ।

মুখ ফিরিয়ে কাঁটায় আটকান এলাকে দেখে বং থেমে পড়ল। বলল—দাঁড়াও ছাড়িয়ে দিচ্ছি আমি ।

এগিয়ে এসে কাঁটা গাছ থেকে এলার পোশাক ছাড়াতে যেতেই সহসা আর্তচিৎকার করে দু'হাতে বংকে জড়িয়ে ধরল এলা। তার ভয়ার্ত দৃষ্টি অনুসরণ করে বং যা দেখল তাতে সেও ভয় পেল ।

কাঁটা ঝোপের সামনেই বিরাট এক সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা উঁচিয়ে দুলছে। লিক্ লিক্ করছে কালো সূতার মত জিহ্বা। সাপটার সারা শরীরে হলুদ চক্কর। ফণার মাথায় পদ্ম ফুলের ছাপ। ঠিক এমনই ফুল মাঠের ধারে জলায় অসংখ্য ফুটে থাকতে দেখেছে বং আর এলা। ওদের দিকে ফিরে দুলছিল সাপের ফণা। ফোঁস ফোঁস শব্দে ফণাটা ফুলে উঠছে। এলার পোশাকের প্রান্ত টেনে ছিঁড়ে ফেলে পিছিয়ে এল দু'জন। এর মধ্যে হঠাৎ পাশের ঘাস ঝোপ হতে কোথা থেকে তাড়া খাওয়া পলায়নপর একটি হরিণ শাবক লাফিয়ে পড়ল ঠিক ওদের সামনে। ক্রুদ্ধ গর্জনরত সাপের ফণা সঙ্গে সঙ্গে আছড়ে পড়ে ছোবল দিল হরিণ শিশুর পায়। ছোবল দিয়ে ফণা নামিয়ে নিল সাপটা। তারপর একেবেঁকে এলা আর বংয়ের পায়ের সামনে দিয়ে চলে গেল । ভীত রুদ্ধবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে সাপটার চলে যাওয়া দেখল ওরা। ছোবল খাওয়া হরিণের বাচ্চা তখন মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। কয়েকবার পা আছড়ে ধীরে ধীরে নিস্পন্দ হয়ে গেল হরিণ শাবক। ভীত বংয়ের আলিংগনাবদ্ধ এলা সহসা দুই হাঁটু ভেঙ্গে মাটিতে বসে পড়ল। বংয়ের দিকে ফিরে কম্পিত কণ্ঠে বলল— সাপটা এ দেশের রক্ষক বং। এই ভূমির কর্তৃ। এ নিশ্চয়ই আমাদের দেবতা। এসো দেবীর বন্দনা করি। দেবী যেন আমাদের সব বিপদ থেকে রক্ষা করেন। আমাদের ওপর যেন অসন্তুষ্ট না হন ।

যেদিকে সাপটা চলে গিয়েছিল সেদিকে মুখ করে দু'হাত জোড় করল এলা । বং এসে হাঁটু মুড়ে বসল এলার পাশে। দু'হাত জোড় করে ভীত স্বরে দু'জনে প্রার্থনা উচ্চারণ করল।

হে মাথায় পদ্ম

দেহে চক্র আঁকা দেবী ।

তুমি এই বিজন ভূমিতে

রক্ষ কর আমাদের ।

দেওদানার অনিষ্ট থেকে

আমাদের বাঁচিও।

আমাদেরে ঘর দিও জন দিও

শস্যক্ষেত আর দুধের গাই

ছাগল ভেড়া দিও

তোমায় হরিণ মেরে দেব।

মাঠের পরে উলুখড়ের বন। সকালের হাওয়া শন্ শন্ শব্দে ঢেউ তুলছে উলুখড়ের বনে। মাথার ওপর কলরব করতে করতে উড়ে চলেছে পাখীর ঝাঁক। উলুখড়ের ওপারে খুব কাছেই কোথাও শোনা গেল কুকুরের ডাক। সেই সঙ্গে মানুষের কণ্ঠের হৈ হৈ চিৎকার। ধোঁয়ার কুণ্ডলী এখন খুব কাছে। ধোঁয়ার উৎসে আগুনের স্ফুলিংগ ছিটকে উঠেছে। বং আর এলা খড়ের বনের মধ্য থেকে উৎসুক সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগল। মানুষ্য কণ্ঠের অধিকারীদের এবার তারা সত্যি দেখতে পেল। জঙ্গলে আগুন ধরাচ্ছে কতগুলি মানুষ। দত্যি দানো নয়। সত্যিকার মানুষ। গায়ের রঙ তাদের বং আর এলার মত তামাটে ধূসর নয়। একেবারে কুচকুচে কালো। পরনে স্বল্প পরিসরে বাকলের কৌপিন। ঊর্ধ্বাংগ নিরাবরণ । পুরুষ ক'জন গাছের ডাল ঠেলে আগুন উস্কে দিচ্ছে। নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে। যেখানে তারা আগুন জ্বালাচ্ছে সেখান থেকে একটু দূরেই তর্ তর্ করে বয়ে চলেছে ছোট একটা খাল। খালের ধারে দু'তিনটে ডোঙা বাঁধা । খালের ধারে ছুটোছুটি করে ডাকছে দু'টি কুকুর। মনে হয় কুকুর দু'টি ওদের পোষা ।

সহসা নারীকণ্ঠের সুরেলা হাসির শব্দে বং এলা দু'জনেই সচকিত হয়ে দেখল যেখানে আগুন জ্বলছে তার পাশের ঝোপ থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল একটি তরুণী। পরনে তার হাঁটু পর্যন্ত ঝুলান বাকল। গাত্রবর্ণ নিকষ কালো। কিন্তু শরীরের নিখুঁত গঠনের সৌষ্ঠব তার কালো রঙে অপরূপ লাবণ্য ছড়িয়েছে। বুকে-পিঠে ছড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘ একরাশ চুল। নৃত্য-ছন্দে হন হন করে হেঁটে পুরুষগুলির কাছে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। হাসতে হাসতে কি বলল। তারপর তার বাম হাতে ধরা পাতার ঝুড়িতে হাত ঢুকিয়ে টেনে বের করল হলুদ

একটা জীবন্ত সাপ। বং আর এলা বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে দেখল। তৈল-পিচ্ছিল হলুদ বর্ণ সাপটি মেয়েটির কালো সুঠাম আঙুলের নিষ্পেষণে আটকা পড়েছে। লেজ দিয়ে বারবার মেয়েটির হাত বেষ্টন করতে চেষ্টা করছে। ঝাড়া দিয়ে হাত মুক্ত করে সাপের গলা ধরে উজ্জ্বল মুখে সবাইকে দেখাচ্ছে তরুণী।

এমন ভয়াবহ কাণ্ড দেখে নিজের অজানিতে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল এলা। এলার চিৎকারে চমকে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি। সন্ধানী সাবধানী চোখে তাকাল উলুখড়ের ঝোপে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে পুরুষগুলিও তাকাল। নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করল। দলের বলিষ্ঠ পুরুষটি ইশারায় কুকুর দু'টিকে ঘাস ঝোপের দিকে দেখিয়ে বলল "চুঃ চুঃ" । লাফাতে লাফাতে কুকুর দুটি ছুটে উলুঘাসের কাছে এসে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করল। দলের পুরুষেরা ততক্ষণে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। হাতে সাপ ধরা তরুণীটি বাতাসে আন্দোলিত উলুখড়ের মধ্যে এলার মুখের একাংশ দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে তার সচকির উদ্বিগ্ন চেহারা হয়ে উঠল ভয়ংকর। হাতের সাপটা ছুড়ে আগুনে ফেলে দিল সে। তারপর ক্রুদ্ধা মার্জারীর মত ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল এলার ওপর। এলাও প্রস্তুত হয়েছিল। আঁচড়ে কামড়ে চুল ছিঁড়ে দু'জনে দু'জনকে ক্ষত-বিক্ষত করল। শেষ পর্যন্ত বং প্রবল শক্তিতে দু'জনকে ছাড়িয়ে দু'হাতে আবদ্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এল ।

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষেরা ওদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল। বং যোদ্ধা দুই নারীর হাত ছেড়ে দুই হাতের তালু এক করে মাথায় স্পর্শ করল। অর্থাৎ তার হাতে কোন অস্ত্র নেই। সে এদের বন্ধু হতে চায়। অপরপক্ষ বং আর এলার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি ফেলে দেখল কিছুক্ষণ। বংয়ের অস্ত্রহীন হাতের ইংগিতে তাকিয়ে বলিষ্ঠ পুরুষটির মুখের কঠিনতা কোমল হয়ে এল। মুখে মৃদু হাসির সঞ্চার হল। হাতের অস্ত্র ফেলে সেও দু'হাত জোড় করল। তারপর বংয়ের দিকে এগিয়ে এসে দুর্বোধ্য ভাষায় কি বলল। তার কথা বং সম্পূর্ণ বুঝতে পারল না। তবু অনুমানে তার প্রশ্নের জবাব দিল। নিজের বুকে হাত রেখে বলল—বং ।

তারপর এলার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল—এলা ।

কয়েকবারই এক কথা উচ্চারণ করল বং। দলের প্রত্যেকের চোখে কৌতুহল উছলে উঠল। বলিষ্ঠ পুরুষটি এগিয়ে এসে বং আর এলাকে নির্দেশ করে অনভ্যস্ত উচ্চারণে বলল–বং এলা ।

হাসল বং—হ্যাঁ বং এলা । তোমার নাম ?

বংয়ের চোখের প্রশ্ন যেন বুঝতে পারল পুরুষটি। নিজের বুকে হাত রেখে বলল—কৈয়াবরও ।

তরুণী মেয়েটি এতক্ষণ সাপের মত ফুসছিল, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল ওদের। তার জ্বল্ জ্বলে হিংস্র চোখের তারায় হাসি ফুটল। মুখের ওপর এলোমেলো হয়ে পড়া চুল সরিয়ে সাদা ঝকঝকে দাঁতে হেসে উঠে নিজেকে ইংগিত করে বলল—পাইক্কী। ততক্ষণে পোড়া সাপের চর্বির গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। কৈয়ারত্ত পাইক্কীকে কি বলল। পাইক্কী কলরব করে ছুটে চলে গেল আগুনের দিকে। বড় একটা আঁকশি দিয়ে ঝলসানো সাপটা টেনে বের করে আনল। সকলে ভারী খুশি হল। একজন সাপের মাথাটা কেটে ফেলে দিল। আরেকজন লেগে গেল তার চামড়া ছাড়াতে। এদের ভাবভঙ্গী দেখে বংয়ের মনে হল সাপ এদের উপাদেয় খাদ্য।

পোড়া সাপটা নিয়ে এরা যখন ব্যস্ত তখন খালের পাড় দিয়ে আর একদল নারী-পুরুষ উঠে এল। আগে-পিছে এল দু'তিনটে কুকুর। দলের সম্মুখে রয়েছে বল্লম হাতে একটি নারী। পাইক্কী চেয়ে কিছু বয়সে বড়। শরীর গঠনে শক্তি আর স্বাস্থ্য ঝলমল করছে। পরনে পাইক্কী মতই হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বাকল। গলায় হাতে শামুকের মালা।তাকে দেখে সকলে আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠল। আনন্দের অবশ্য কারণ ছিল ।

বল্লমধারিনী নারীর পিছে দু'জন পুরুষ একটি মরা হরিণ গাছের ডালে বেঁধে ঝুলিয়ে কাঁধে করে বয়ে আনছে। দলের সকলের রয়েছে তীর ধনুক । মৃত হরিণটার বুকে বিঁধে রয়েছে একটা তীর। তীরের মুখ থেকে এখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বং বুঝল এরা শিকার করে ফিরল। কাছে আসতেই বলিষ্ঠা নারীকে ঘিরে সকলে প্রায় খুশীতে নৃত্য শুরু করল ।

নারীর দৃষ্টি প্রথমেই পড়ল বং আর এলার দিকে। তা লক্ষ্য করে কৈয়ারও এগিয়ে গেল । বলল – বাইদ্যা । এই বং এলা ।

নারীর নাম বাইদ্যা। সে বল্লম নামিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এসে দাঁড়াল বং এলার সামনে। তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ ওদের দেখল। বংয়ের হাতের দৃঢ়পেশী শক্তিশালী পায়ের গোছা লক্ষ্য করল। এলার হাতে বোনা শণের পোশাক নেড়েচেড়ে দেখল । তারপর বংয়ের হাত আকর্ষণ করে টেনে আনল মরা

হরিণটার কাছে। ইশারা করে হরিণটা কাটতে বলল। বং বুঝল বাইদ্যা এদের নেত্রী। যদিও বংয়ের গোত্রে মেয়েদের প্রাধান্য নাই। তবুও এই নারীর প্রাধান্য অগ্রাহ্য করতে পারল না সে। খুশী মনে হরিণের চামড়া ছাড়াবার কাজে লেগে গেল। একে একে প্রায় সবাই এসে যোগ দিল হরিণের মাংস কাটার কাজে।

ক্ষিপ্রহাতে হরিণের মাংস কাটতে কাটতে বং এক সময় দেখল এলা পাইক্কী শণ দিয়ে পোশাক বোনা শেখাচ্ছে। এলা পাইক্কী দু'জনেই হাসছে। কিন্তু পাইক্কীর হাসিতে যেন কেমন এক বন্য মাদকতা। এদেশের এই প্রান্তরের উদ্দাম হাওয়া, অচেনা অনেক পাখীর কাকলী, আর ঢেউতোলা নদীর কলধ্বনির সুর যেন মেয়েটির দেহের কানায় কানায়, হাসিতে, চোখের দৃষ্টিতে। কেমন যেন নেশা আনে বুনো মেয়েটি। আর সে নেশা বংয়ের মত পুরুষের বুকের রক্তে বুঝি ঝড়ের দোলা লাগায়। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বং। সহসা লক্ষ্য করল একজোড়া তীব্র দৃষ্টি তাকে পর্যবেক্ষণ করছে। সে দৃষ্টি বাইদ্যার। আজ সকালে সাপটার ক্রূর হিংস্র চোখে যে দৃষ্টি দেখছিল বং, সেই হিংস্রতাই চকচক করছে বাইদ্যার সরু চোখে । সচকিত হয়ে মাংস কাটায় মন দিল বং।

মাংস কাটা শেষ হলে আগুনের কুণ্ড আবার জোরাল করা হল। পট পট করে বুনো জঙ্গল পাতা কাঠ পুড়তে লাগল। কৈয়ারও আরো কয়েকজন মিলে আগুন পোড়াতে বসল হরিণের মাংস। পাইক্কী তখন অন্য কয়েকজনকে নিয়ে পোড়া সাপটার সদগতি করতে শুরু করেছে। হরিণের ঝলসানো মাংসের লোভনীয় গন্ধ আর উলুবনে বাতাসের শনশনানীর সঙ্গে মাঝে মাঝে পাইক্কীর উতলা হাসি মিলে উন্মনা করে তুলছিল বংকে। বংয়েরমনে হল এই বন্য মানুষগুলো ভাল । খুব ভাল । সেই স্বর্ণকেশ নীল-চোখ অশ্বমানবদের মত বর্বর নয়। তাদের নিজের গোত্রের লোকদের মত নিষ্ঠুর নয়। হয়তো এরা নগর গড়তে জানে না। পারে না জাহাজ তৈরি কতে। তবু এরা ভাল ।

তিন

দ্বিপ্রহরের বেলা খালের বুকে নীল প্রতিবিম্ব ফেলে ঝিমিয়ে এল। খালের জলে কুলকুল ধ্বনি। জল স্ফীত হয়েছে। খালের শুকনো আঠাল কাদা ভরা বুক টলটলে জলে ভরে উঠেছে। আকাশটা এখন ভারী সুন্দর নীল। মাংস ভোজন পর্ব শেষ হয়েছে। উচ্ছিষ্ট হাড়গুলো কুকুরকে খেতে দিয়ে কিছুটা মাংস আলাদা করে তুলে রাখল বাইদ্যা। তারপর তীরধনুক নিয়ে শিকারী কয়েকজনকে সঙ্গে

করে নেমে গেল খালের পাড়ের ঘাস ঝোপের মধ্যে পাখী শিকার করতে।

আকাশে তাকিয়ে বং ভাবছিল এদের সঙ্গেই থেকে যাবে। কিন্তু এরা তো ঘর-বাড়ীতে থাকে বলে মনে হচ্ছে না। খুব সম্ভব এরা এখনও জলচারী। নৌকায় এদের বাস ।

এলা এল হাসতে হাসতে—চল বং খালে সাঁতার কাটি আমি আর তুমি। পাইক্কীকেও সঙ্গে নেব ।

পাইকীও এলার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। মুখের ভাষা দুর্বোধ্য হলেও তার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছিল প্রস্তাবে সেও বেশ উৎসাহিত।

উৎসাহিত হল বংও। ওই কালো মেয়েটি যেন আনন্দ বয়ে আনে মনে পলকে।

খালে নেমে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটল ওরা। বেলা স্তিমিত হয়ে এল। খালের জলে ছায়া পড়ল। ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস কলরব করে উড়ে এসে নামল ঘাসের ঝোপে । ওরা সাঁতার কাটার খেলাশেষ করে উঠে এল। অনেকক্ষণ সাঁতার কেটে ক্লান্ত হয়েছে তিনজনেই। ঘাসের ঝোপের পাশে অনেকটা বালুকাময় তট। তার ওপর শুয়ে পড়ল এলা এবং বং। সেদিকে তাকিয়ে সহসা বাঁকা হাঁসি ফুটে উঠল পাইক্কীর ঠোঁটের কোণে। ঘাস ঝোপের পাশে এক থোকা নীল ফুল হাওয়ায় দুলছিল। সেদিকে তাকিয়ে এলা বলল—কি সুন্দর ফুল ! দেখেছ বং ? যাওনা তুলে এনে আমার চুলে পরিয়ে দাও ।

বান্ধবীর মন রাখতে বং উঠল। এক গোছা ফুল তুলে নিয়ে এল। পাইক্কী তখনও ঠোঁটের বাঁকা হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে। এলার চুলে ফুল পরিয়ে দিলে খুশী হয়ে দু'হাতে বংয়ের গলা ধরে সোহাগে এলিয়ে পড়ল এলা। আর সঙ্গে সঙ্গে পাইক্কীর বাঁকা হাসিতে যেন আগুন ধরল। ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বংয়ের উপর। তার কালো সুঠাম বাহু দুটির নিষ্পেষনে দম বন্ধ হয়ে এল বংয়ের। এলাও প্রতিরোধ দুর্বার করবার জন্য আবার অবতীর্ণ হল যুদ্ধে ।

দুই যুদ্ধবাদিনী নারীর মধ্যে পড়ে বং যখন পর্যুদস্ত তখন পাখী শিকারীরা ফিরে এল। যুদ্ধ বন্ধ করল বাইদ্যা। তার কঠিন হাতের চপেটাঘাতে পাইক্কীর কালো গালেও লাল আভা ফুটে উঠল। এলাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল বাইদ্যা। আর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল বংয়ের দিকে।

মার খেয়ে পাইক্কী কিন্তু বিদ্রোহ করল না। ফাঁদ পেতে ধরা জীবন্ত হাঁস আর তীর ধনুকে মারা বক পাখীগুলো দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পাখীর মতই কলকল উচ্ছলা হয়ে উঠল পাইক্কী ।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে প্রায়। সূর্য হেলে পড়েছে মাঠের ওপারে সবুজ বনানীর ওপর। এবার ফিরে যাবার পালা। পুরুষেরা শুকনো কাঠ এনে আগুনে ফেলে আরও জোরাল করে দিল আগুন। যেন কাল পর্যন্ত নিভে না যায়। কুকুরগুলো এসে খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে কুঁই কুঁই করছিল। বাইদ্যা আরও কিছু মাংস ছুঁড়ে দিল ওদের । তারপর শিকারের ভারা তুলে ডোঙায় উঠে পড়ল সবাই। একসঙ্গে ডোঙাগুলো চলল। কিছুদূর এগোবার পর খালটা এসে পড়েছে বড় নদীতে। খালের মুখে সারি দিয়ে কয়েকটা বাঁশ পোতা। তার সামনে কৈয়ারত ডোঙা থামাল। বাঁশে বাঁধা লতায় তৈরী জাল টেনে তুলতে লাগল। পুরো জলটা উঠে এল একটু পরেই। দেখা গেল তাতে মাছ পড়েছে প্রচুর। ছোট বড় নানা আকৃতির মাছ। আবার হর্ষধ্বনি উঠল । কৈয়াত্ত ক্ষিপ্র হাতে জাল ঝেড়ে সব মাছ এক জায়গায় করল। আবার চলতে লাগল ডোঙা নদীর কিনার ধরে। সন্ধ্যা লাগতেই ডোঙা এসে পৌছাল গন্তব্য স্থানে ।

নদীর কিনার থেকে অনতিদূরে বড় দুটি নৌকা থেমে আছে। বাঁশের ভেলা আর কাঠের খোলের উপর বাঁশ আর উলু খড়ের তৈরী ঘরের মত নৌকা। বং মনে মনে এদের প্রশংসা না করে পারল না। যত অসভ্য এদের ভেবেছিল এরা তত অসভ্য নয়। নৌকা তৈরীর মধ্যে রীতিমতো কুশলী পরদর্শিতার লক্ষণ রয়েছে। ডোঙাগুলি এসে ভিড়ল নৌকার গায়। মুখে হাত রেখে বিচিত্র চিৎকার করে বাইদ্যা ডাকল বাংলী—মলু-ওরান-মুকরীই-ই-ই ।

বাইদ্যার ডাকে একদল নানা বয়সের উলঙ্গ শিশু বেরিয়ে এল নৌকার খোলের থেকে। বাইদ্যা প্রথমেই শিকারগুলো ছুঁড়ে দিল নৌকার ওপর। কয়েকখণ্ড ঝলসানো হরিণের মাংস ফেলে দিল শিশুদের মধ্যে। কামড়া-কামড়ি করে খাওয়া শুরু করল ওরা। ঠিক এই সময় লোমচর্ম সর্বস্ব কুঁজো এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এল। তার শরীরের ঊর্ধ্বাংশ নিরাবরণ। পরণে ছোট এক খণ্ড হরিণের চামড়া। বুড়ি বাইদ্যাকে দেখে হাউ মাউ করে বুকে চাপড়ে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভোজনরত শিশুরা মুখ ভরা মাংস নিয়ে ভয়ার্ত চোখে চিৎকার করে উঠল-বাংলী । বাংলী ।

বাইদ্যা এক লাফে গিয়ে পড়ল ক্রন্দররতা বৃদ্ধার সামনে। উত্তেজিত হয়ে কি

কি প্রশ্ন করল। বৃদ্ধাও কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিল। বাইদ্যার উত্তেজিত মুখে ক্রমে শোকের ছায়া নেমে এল। হতাশ হয়ে বৃদ্ধার পাশে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল বাইদ্যা-বাংলী ।

কৈয়ারত্ত বংকে বুঝিয়ে দিল ইশারা দিয়ে যে বাইদ্যার ছেলে বাংলীকে নৌকার গুলুয়ের ওপর থেকে লেজের ঝাপটায় জলে ফেলে কুমির ধরে নিয়ে গেছে।

চার

নৌকায় কিন্তু বেশ ভালোই লাগল বংয়ের। যদিও বাংলীকে কুমীরে ধরে নিয়ে যাওয়ায় বাইদ্যা গোত্রের সকলেই অশুভ কিছুর আশংকায় উদ্বিগ্ন। বাইদ্যার মা বুড়ি ছোট একটা পাথর আগুনের সামনে ধরে বিড় বিড় করে অপদেবতা দূর করার মন্ত্র পড়ছে নৌকার ভিতর। দলের সকলে বসেছে তার পিছে হাতের দুই করতল যুক্ত করে। ওই পাথর দেবতার শক্তি না কি অসীম। বংয়ের গোত্রেও এই পাথর লিঙ্গ পূজার চল আছে। সবচেয়ে উঁচু গাছের তলা থেকে এই পাথর কুড়িয়ে আনা হয় । তারপর গোত্র পরম্পরায় এই পাথর বিগ্রহ হয়ে থাকে। অপদেবতা, সাপ, বাঘ, ভূতপ্রেত দত্যি দানোর কোপ থেকে মানব সন্তানকে রক্ষা করে।

এক সময় পূজা শেষ হল। পাথরের দেবতাকে কিছু কাঁচা মাছ, হরিণের মাংস আর একটা আস্ত হাঁস উৎসর্গ করা হল। তারপর সেই নৈবেদ্য জলে ফেলে দিল বাইদ্যা। বাংলীর নাম ধরে তিনবার করে ডেকে পাংশু ভীত মুখে একটা একটা করে নদীতে ছুঁড়ে দিল বাইদ্যা। বং আর এলা বুঝল বাংলীর আত্মা যেন ভূত হয়ে এসে নৌকাবাসীদের উপদ্রব না করে তার জন্য এই পূজা ।

বং আর এলার জন্য কিন্তু আরও বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। বাইদ্যার মা যখন পূজা করছিল তখন পাইক্কী সেখানে ছিল না। পাশের নৌকায় মাটির চুল্লীতে সে তখন রান্না চাপিয়েছে। বং আর এলাকে ইশারা করে পাশের নৌকায় ডেকে নিয়ে রান্না দেখাল পাইক্কী। তিন ঝিকওয়ালা একটা বাটির মত উনানে কাঠ জ্বালিয়ে চুলা করা হয়েছে। তাতে বিরাট বাঁশের চোঙ্গের মধ্যে চাল মাছ ভরে মুখ বন্ধ করে পোড়া দেওয়া হয়েছে।

পাইক্কী বং আর এলার বিস্ময়াবিষ্ট মুখে তাকিয়ে মুচকি হাসল ।

বলল—ভাত ।

ভাত ?

এলার মুখ থেকে প্রশ্ন নির্গত হল ।

চুলার পাশে পাথরের শিকে কোটা গমের খোসা, তুষ আর গমের মত শস্যকণা ডাই করে জমা করা রয়েছে। হাত দিয়ে সেগুলো নির্দেশ করে হাসতে হাসতে পাইকী আবার বলল–চাল। তারপর একমুঠো চাল আগুনে ছিটিয়ে দিয়ে বলল—ভাত ।

নদীর ধারে এই খোসাযুক্ত চালের ছড়া অর্থাৎ ধান গাছ দেখছে বং আর এলা। শস্য উৎপাদন পদ্ধতি তাহলে এরাও জানে। বিস্মিত বং ভাবল, শুধু শিকার করা, মাছ ধরা, নৌকা তৈরীর কৌশল নয়, শস্য ব্যবহারের পদ্ধতি সম্বন্ধেও এদের জ্ঞান আছে তাহলে। বং ও এলা খুব মনোযোগ দিয়ে ভাত রান্না দেখল। অনেকগুলো বাঁশের চোঙে চাল-মাছ ভরে মুখ বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ রান্না করা হল ।

রান্নার পর খেতে শুরু করল সবাই। মাছ দিয়ে ঝলসানো ভাপে সিদ্ধ গরম ভাত এই মুহূর্তে সুসভ্য গোত্রভুক্ত বং- এলার মুখে কিছুটা বিচিত্র স্বাদ আনলেও, খেতে মোটামুটি ভালোই লাগল। বাইদ্যা সবুজ বড় বড় কতগুলো ফল নিয়ে এল। পাথরের আঘাতে ভেঙে তার ভেতরের সুমিষ্ট পানীয় আর শুভ্র নরম শাঁস খেতে দিল বং আর এলাকে । বলল-নাও নারিকেল ।

এরপর একটা মরা কচ্ছপের পিঠের খোলে কিছু পানিমিশ্রিত গলা ভাত নিয়ে এল বাইদ্যা। পচা দুর্গন্ধে বং-এর বমি আসার যোগাড়। কিন্তু নৌকার সকলে হৈ চৈ করে ছোট ছোট কাছিমের খোলে ভরে পান করল। শুধু বং আর এলার জন্য এল মধু । পচা ভাতের রস খেয়ে সকলে তখন নেশা ঘনিয়েছে ।

পুরুষেরা হৈ হৈ করে উঠছে আর মেয়েরা খিল খিল হেসে গড়িয়ে পড়ছে পুরুষদের ওপর। এক সময় বাইদ্যা হাততালি বাজিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় গান ধরল । সঙ্গে ধুয়া করল সবাই। পাইক্কী কোথায় থেকে একটা হাঁসের পালক চুলে গুঁজে উঠে নাচ আরম্ভ করল। একে একে সবাই যোগ দিল নাচেগানে। শুধু বাইদ্যার মা বুড়ি বাচ্চাকাচ্চাগুলো নিয়ে পাশের নৌকায় ঘুমিয়ে পড়ল। নেশায় উচ্ছল একনৌকা জলচারী আদিম নারী-পুরুষ ভুলে গেল আজই সন্ধ্যায় তাদের পরিবারের একজন কুমিরের পেটে গেছে ।

বিশাল জলাভূমি, গভীর অরণ্য, নিবিড় শনের বনে আর ঢেউতোলা নদীর বুকে আলোর দাক্ষিণ্য ছড়িয়ে আকাশে ভেসে এল পূর্ণচন্দ্র। নৌকায় তখনও স্ফুর্তির হুল্লোড়। আবার কান্নার রোল উঠল পাশের নৌকা থেকে। নেশা ভাঙল সকলের। সচকিত হয়ে তারা অনুভব করল বিরাট ভারী কিছু নৌকা দুটোকে যেন দলিত মথিত করে ঝাঁপিয়ে পড়ল কূলে। বং-এর নেশা কম হয়েছিল। নৌকা থেকে মুখ বাড়িয়ে তাকাল সে। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখল বিরাট এক ডোরাকাটা বাঘ বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে জল পার হয়ে ডাঙায় পড়ল। বাঘের মুখে ঝুলে আছে কি একটা বস্তু। সেটা থেকে ক্ষীণ কান্নার শব্দ শোনা গেল। কিন্তু নৌকার দোলা কমবার আগেই কান্নার শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে। বুড়ি বাইদ্যার মা চাপাসুরে বিলাপ করছে-মুকরী- মুকরী-ই-ই ।

এবার তাহলে মুকরী নামে কোন শিশু গেল বাঘের পেটে ।

বাইদ্যা আর কাঁদল না। গম্ভীর থমথমে মুখে নৌকা ছাড়বার আদেশ দিল। অপদেবতা নিশ্চয়ই কাছাকাছি ঘুরছে। দুলে উঠল নৌকা। বৈঠা পড়ল জলে। তর তর করে নৌকা দু'টি মাঝগাঙে এসে পড়ল। তরপর চাঁদনী রাতে পথ অনুমান করে এগিয়ে চলল সম্মুখে। পুরুষেরা কেউ কাঁদল না। মুকরী বা বাংলীর বাবা এদের মধ্যে কেউ একজন। কিন্তু কে যে সঠিক তারা জানে না। শুধু পাইকী কপাল ঠুকে ফুলে ফুলে কাঁদল কিছুক্ষণ। মুকরী তার আট বছরের প্রথম সন্তান।

নৌকা এগিয়ে চলেছে। একঘেয়ে ছপছপ তালে বৈঠা পড়ছে জলে। চাঁদ নেমে এসেছে নদীর বুকে। নৌকার অধিবাসীরা সবাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। বংও ঘুমিয়ে পড়েছিল। সহসা কার উষ্ণ কঠিন আকর্ষণে ঘুম ভাঙল । অনুমানে বুঝল একটি নারী তার সান্নিধ্যে। এলার পরিচিত দেহাবয়ব নয়। তবে কি পাইক্কী ! বিদ্যুৎ শিহরিত হল বংয়ের শিরা-উপশিরায়। কিন্তু না, পাইক্কী নয়। বাইদ্যা। এ গোত্রের নেত্রী। সব পুরুষ যার স্বামী। সব পুরুষের ওপর যার অধিকার ।

নৌকা দুলে উঠেছে। নৌকার নীচে অস্থির জলের মাতন নিয়ে মিলিত হয়েছে দুটি নদীর ধারা। বং এলা বাইদ্যা পাইক্কী কৈয়াত্তদের নৌকা এসে পৌছল দুই নদীর সঙ্গমস্থলে।

[*বং গোত্র দ্রাবিড়দের একটি শাখা বলে আধুনিক গবেষণায় অনুমিত হয়েছে। কিন্তু বং গোত্র ছাড়াও এদেশে খৃষ্টপূর্ব আনুমানিক তিন হাজার বছর আগে থেকে অস্ট্রো- এশিয়াটিক ও

অন্যান্য বিভিন্ন অর্ধ-সভ্য মানুষের বসতি আদিম সমতল এবং তৎসংলগ্ন এলাকাগুলোতে ছিল বলে অনুমান করা হয় ।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক

বেলা শেষ। গোধূলির আবির রঙে নারিকেল বনের মাথার ওপরের আকাশ রক্তিম। বাঁশঝাড়ে থোকা থোকা অন্ধকার নেমেছে। সুপারি গাছের ডালে বাদুড় উড়ে বসছে । পাখীরা কিচিরমিচির করে গাছে গাছে আশ্রয় খুঁজতে ব্যস্ত। লাঙল কাঁধে বাড়ী ফিরছিল কালু বংগআল । তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে গরুগুলো আথালে ভরে যেতে হবে একবার কৈবর্ত আলে। বর্ষার মাঝামাঝি। গাঙ বিল নদী নালা ভরভরন্তি । বাইদ্যাদের আসবার সময় হয়ে এল। বাইদ্যা গোত্র বংগআলদের মত স্থলে বসবাসকারী কৃষিজীবী নয়। অসংখ্য নৌকায় পুরো বাইদ্যা গোত্র জলচারী যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত। প্রতি বছর বর্ষায় বাইদ্যারা আসে। বংদের আলের বাইরে খালে সারি সারি নৌকা বেঁধে দশ-বিশ দিন থাকে। বাইদ্যাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বংগআলরা। রঙিন কড়ি, ঝিনুকের মুক্তো, সাপের চামড়া, বালিয়াড়ি খুড়ে স্বর্ণকণা নিয়ে আসে বাইদ্যারা। ব্যবসা-বাণিজ্য কেনাবেচার জন্য কড়ির প্রচলন করেছে বঙ্গআলরা। সেই কড়ির যোগান বাইদ্যারাই দেয় ।

বংগআলদের কাছ থেকে চাল, কাপড়, লোহার হাতিয়ার, কাটারি সুতোর কাপড় কেনে বাইদ্যারা । কৈবর্তদের কাছ থেকে কেনে শুঁটকি মাছ। এ ছাড়া বংগআলে আসে কিরাত বণিকেরা। ভালুকের চামড়া, হাতীর দাঁত, রঙিন পাথর, মাদুর, গাছগাছড়ার ওষুধপত্র বিক্রি করে। দক্ষিণের মোল বুনারা লবণ আর মাটিতে পোড়ান মোলঙ্গা ফেরি করতে আসে শীতকালে। নদীর ধার দিয়ে আসছিল কালু। সহসা ঘাটে ভিড়ে থাকা বিচিত্র-দর্শন একটি নৌকা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নৌকার সম্মুখের গলুইতে তামার গোল চাকতি বসানো। গলুইয়ের মুখটা অনেকটা ময়ূরের মুখের মতো। হাল-মাস্তুলও বিশিষ্ট ধরনের। দাঁড়িয়ে পড়েছিল কালু বংগআল । নৌকা থেকে একটি পুরুষ বেরিয়ে এল। আগন্তুকের গাত্রবর্ণ গৌর। নাক-মুখ ইষৎ চাপা। চোখ অতি ক্ষুদ্র। শরীরের গঠনও কিছু খর্ব। আগন্তুক যুবক। কালুকে দেখে প্রশ্ন করল—সামনের ওই উঁচু আলঘেরা গ্রাম কাদের ? যুগপৎ বিস্মিত ও বিরক্ত হল কালু ।

এখানে এত বড় আল-ঘেরা বসতি দেখে কে না বলতে পার যে, ওটা বংদের আল। ইতিমধ্যে কৈবর্ত ডেরার হীরু কৈবর্ত এসে দাঁড়িয়েছিল জাল কাঁধে করে।

উত্তর দিল সে—ওটা তো বঙ্গআলদের আলের সীমানা। এত উঁচু আর বড় আল এখানে আর কারো নেই। বংগআলরা একশ' বলদ আর দুধের গাইর মালিক। নদীর পারে আল-ঘেরা জমিতে তারা ধান আর কাপাস চাষ করে। কাপাস তুলোয় মিহিন কাপড় বোনে। তারা নিজ হাতে বড় বড় জাহাজ তৈরী করে, জংগী হাতী ধরে পোষ মানায়। লোহার হাতিয়ার তৈরীর জন্য বিখ্যাত বংগআলরা। তা তুমি কি উত্তর দেশীয় কিরাতভূমি থেকে আসছ ?

আগন্তুক হাসল-ঠিক ধরেছ। কিরাতরা এদিকে আসছে বটে, তবে আমি কোনদিন আসিনি। এসেছি কিছু কেনাবেচা করতে ।

এবারে কথা বলল কালু–বিদেশী, কিরাতরা আমাদের চেনা লোক । তোমরা বোধহয় কোচ গোত্রভুক্ত। শুনেছি কোচ গোত্রীয় কিরাতরা বিখ্যাত শিকারী এবং পরিশ্রমী। গুণ তুক মায়া বিদ্যায় কোচ রমণীরা বিশেষ পটু।

বিদেশী বণিক হাসল - ওসব তো পুরনো গল্প বংগআল । আমরা পাখী মারি। পাহাড়ের গায়ে চাষ আবাদও কিছু করি। আমি কিছু পাথরের বাঁটযুক্ত তামার হাতিয়ার আর পশুর চামড়া এনেছি। তোমাদের কাছ থেকে লোহার কাটারি আর কিছু সোনার টুকরো কিনতে চাই ।

কালু বলল কিন্তু ভাই তোমায় ক'দিন অপেক্ষা করতে হবে। বাইদ্যারা এখনও এসে পৌছায়নি। তোমার নামটি কি ?

কিরাত বণিক ইষৎ হেসে জবাব দিল - নমসিন ।

কালু বলল - আমার নাম কালু বংগআল। তুমি নতুন এসেছ এদেশে, আমাদের অতিথি তুমি নমসিন। নৌকায় তোমরা রেঁধে খাবে, এ বড় ভাল কথা নয়। বংগআলদের অসম্মান হবে তাতে। বিকেলে এসো, আমাদের আলে নিমন্ত্রণ রইল তোমার ।

নমসিন আপত্তি করল। কিন্তু কালুর পীড়াপীড়িতে নমসিনের চাপা ঠোঁটে হাসি সুবিস্তৃত হল । মাথা ঝুঁকিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল সে।

কালু গরু তাড়িয়ে বাড়ীর দিকে চলল। হীরুও আর দাঁড়াল না। চতুর্দিকে অন্ধকার হয়ে গেছে ততক্ষণে, নমসিনের নৌকাখানা বিরাটকায় একটি হংসীর মত ভেসে রইল খালের ধারে ।

দুই

কালু বংগআলের বাবা ভুলু বুড়ো হয়েছে। ক্ষেতের কাজ করতে পারে না। বাড়ী বসে তুলো ধুনে সুতো তৈরী করে। ভুলুর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী বুইনী স্বামীকে কাজে সাহায্য করে। মাকু চালিয়ে কাপড়ও বোনে। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে কাজ করতে করতে বুইনীর মনটা যেন প্রায়ই উদাস হয়ে যায়। বং গোত্রের মেয়ে নয় সে। দু'পনি কড়ি দুজোড়া কাপড় আর চার কাঠা ধানের বদলে বুইনীকে বাইদ্যা গোত্রের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে গত বছর। প্রথম প্রথম স্থলচারিণী হয়ে বুইনীর ভালোই লাগত। মন দিয়ে সে গরু বাছুরের যত্ন করত। ধান কুটত। আল লেপত। কিন্তু এখন যেন এসব বুইনীর ভালো লাগে না। বর্ষায় যখন আলের চতুর্দিকে পানিতে ভরে ওঠে, রং- বেরঙের পালের জাহাজ পানিতে ভেসে যায় তখন অজানা জলের হাতছানিতে বুইনীর মনটা উতলা হয়ে ওঠে। মনে পড়ে যায় বাইদ্যার বহরের জলচারী জীবনের কথা। সেই ভেসে বেড়ান জীবনের উন্মাদনা এই বংদের আল-ঘেরা গ্রামে নেই। ভুলু দুপুরবেলা তুলো শুকোতে দিয়েছিল। তুলোর পাহারাদারিতে বসেছিল বুইনী। একটা কাঠি দিয়ে তুলোগুলো উল্টে দিচ্ছিল মাঝে মাঝে। এমন সময় ঘেউ ঘেউ করে কুকুর ডেকে উঠল। বংগআলের পোষা কুকুর দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায় আলের চতুর্দিকে। অচেনা লোক দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সচকিত ও কৌতূহলী হয়ে উঠে দাঁড়াল বুইনী । আলের দরজার সামনে একজন বিদেশীকে কুকুর দল ঘিরে ধরেছে। বুইনী ছুটে ছুটে এসে কুকুরগুলোকে তাড়া দিল - যাঃ যাঃ সর্ ।

তারপর বিদেশীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল-কে তুমি ? কি চাও এখানে ? বিদেশী কিরাত বণিক নমসিন, একটু ইতস্তত করে জবাব দিল আমার নাম নমসিন। কালুর সঙ্গে কাল রাতে এখানে এসেছিলাম। বুইনীর মনে পড়ল কাল রাতে একজন বিদেশী অতিথি এসেছিল বটে। কিন্তু বুইনী তাকে দেখেনি। সে তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। এখন অতিথিকে দেখে তার মনে পড়ল আজ দুপুরেও ভুলুর প্রথম স্ত্রী নানা সুস্বাদু ব্যঞ্জন অন্ন রান্না করেছে অতিথির জন্য। বুইনী সসম্ভ্রমে নমসিনকে ডাকল—আমি চিনতে পারিনি তোমাকে। এস এস ভেতরে এস।

নমসিন বাড়ির ভেতরে এল। বাড়ির পুরুষেরা সবাই শিকারে গেছে। বুইনীই সমাদর করে নমসিনকে খেতে দিল।

খেতে খেতে মাঝে মাঝে বুইনীকে দেখছিল নমসিন। সুঠাম গঠনের মেয়েটি। গায়ের রং মিশকালো। তবু তার শরীরে মাদকতার হিল্লোল। চোখের দৃষ্টি অতিমাত্রায় প্রখর। বুইনী প্রশ্ন করল – আমাদের এদেশ কেমন লাগছে তোমার, বিদেশী ?

নমসিন চাপা ঠোঁটে হাসল সুন্দর। এমন নীল আকাশ, এমন ঢেউ তোলা নদী কার না ভালো লাগে। বুইনীর চোখ হাসিতে উজ্জ্বল হল। বলল-তা শুনেছি তোমাদের দেশের মেয়েরা নাকি সংসারে কর্তা ? তারা নাকি পুরুষদের যাদু দিয়ে ভেড়া বানিয়ে রাখে ? কেমন মেয়ে গো তারা ? একবার বাইদ্যাদের একদল কিরাতদেশে গিয়েছিল আর ফেরেনি। শুনেছি তাদের নাকি তোমাদের দেশের মেয়েরা যাদু করে পাখী বানিয়ে রেখেছে। তবে এক কিরাত-কন্যাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল আমার ঠাকুরমার বাবা। তার কাছ থেকে আমার ঠাকুরমা সাপের বিষ-ঝাড়া মন্ত্র শিখেছিল। এখন আমরা সব বাইদ্যাই সেই তুক জানি। নমসিনের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বুইনীর চোখে চোখ রাখল সে, একটু চুপ করে থেকে বলল-তোমরাও তাহলে যাদু জানো ? তাইতো তোমায় কামরূপের কিরাতদের মত যাদুকরী বলে মনে হয়। মনকাড়া যাদু। মনসিনের কথায় হেসে নুয়ে পড়ল বুইনী। হাসতে হাসতে বলল – তুমি তো ভারী মজার কথা কইতে পারো ।

ভুলুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী ওদিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। - কে রে বুইনী । কার সঙ্গে কথা বলছিস ?

বুইনী গলা উঁচিয়ে জবাব দিল – অতিথ গো ।

এমন সময় ধান-কোটা ঘরের পাশ থেকে খুব একটা শোরগোল উঠল। কালু বংগআলের আট বছরের মেয়েটার আতচীৎকার উঠল গোলমাল ছাপিয়ে। কালুর স্ত্রী ছুটে এল ওদিক থেকে। বুইনীকে দেখে বলল-সর্বনাশ হয়েছে। টুকিকে সাপে কেটেছে। তড়িৎগতিতে উঠে দাঁড়াল বুইনী— কোথায় ? কালুর স্ত্রী ভীতকণ্ঠে বলল, ধানের আঁটির নীচে বিরাট এক গোখরা সাপ শুয়ে ছিল, টুকি তার উপর পা দিয়েছে না দেখে, আর অমনি সাপ ছোবল দিল। বুইনী আর দাঁড়াল না। ছুটে গেল ধান- কোটা ঘরের নীচে কালুর মেয়েটা মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। বাড়ির আর সব ছেলে-মেয়ে-বুড়ো ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। বুইনী প্রশ্ন করল-সাপ কোথায় ? কালুর স্ত্রী বলল ওই তো টুকিকে কেটে আবার ধানের আঁটির তলায় ঢুকেছে। বুইনী সবাইকে বলল-তোমরা

সরে যাও ।

তারপর সাবধানে সে ধানের আঁটি সরাতে লাগল। একটু পরেই সাপের লেজ দেখা গেল। বুইনী মুখে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল। আর এক হাতে ধান সরাতে সরাতে হঠাৎ হাতের ক্ষিপ্র ভঙ্গীমায় সাপটার মাথা চেপে ধরে টেনে বের করে আনল ।

সাপটা আক্রোশে লেজ দিয়ে ঝাপটা মারতে লাগল বুইনীর হাতে। সকলের সঙ্গে নমসিনও এসে দাঁড়িয়েছিল। ভয়ে বিস্ময়ে সে বুইনীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে তার। সাপের মত সেও ফুঁসছে। তার চোখ দুটি সাপের চোখের মতই চকচক করছে।

দু'হাতের কসরতে সাপটাকে ধরে বুইনী সরু ঠোঁটে ঝিলিক তুলে বলল- এতবড় সাহস তোর ! তুই কার ঘরে বিষ ঢালতে এসেছিস জানিস না ! বিষদাঁত তোর ভাঙব ।

মাথার খোলা চুলে ঢেউ তুলে নেচে নেচে ঘরের দিকে চলে গেল বুইনী। একটু পরেই মাটির পাত্রে সাপটাকে ভরে নিয়ে ফিরে এল। তারপর কালুর মেয়ের মাথার কাছে বসে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে বিষ ঝাড়তে লাগল । মন্ত্র পড়তে পড়তে বুইনীর চোখ ক্রমশ লাল হয়ে উঠল । নাকের দু'পাশ ফুলে উঠল 1

ভুলুর প্রথম স্ত্রী এসে বলল-সাপটা ছেড়ে দে বুইনী। দেবতাকে বন্দী করলে যে মা মনসা অসন্তুষ্ট হবেন। ক্ষতি হবে বংআলদের।

বুইনী লাল চোখ তুলে ঘুরে তাকাল—আমি বাইদ্যার মেয়ে, আমায় এসব শিখিও না। আবার সে বিষ ঝাড়তে লাগল ।

নমসিন মন্ত্রমুগ্ধের মত বুইনীকে দেখছিল। তার দিকে দৃষ্টি পড়ল ভুলুর প্রথমা স্ত্রীর। নিরুপায় হয়ে তাকেই ধরে পড়ল সে বাবা বিদেশী, তুমি একবার আলের বাইরে গিয়ে আমাদের বাড়ীর বুড়ো বংগআলকে খবর দিয়ে এসো। বুইনী যে কথা শুনছে না। দেবতাকে বন্দী করেছে। বংগআলদের সর্বনাশ হয়ে যাবে যে। দেবতার কোপ হলে বান-বন্যাতে আল যে ভেসে ধুয়ে যাবে।

নমসিন বেরিয়ে গেল ।

নমসিন বেরিয়ে যেতে বুইনীও উঠে দাঁড়াল। রক্তলাল চোখে সতীনের দিকে

তাকিয়ে বলল-তোমার দেবতাকে ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু টুকিকে বাঁচান যাবে না। আর ওই ঘা-খাওয়া সাপ আমাকেও রেহাই দেবে না। সামনে পেলে কাউকেই ছাড়বে না। দেখছ হাঁড়ির ভেতর কেমন ফুঁসছে।

ভুলুর প্রথমা স্ত্রী একটু বিমূঢ় হল। বুইনী বাইদ্যাদের মেয়ে, অনেক তুক-তাক জানে। তাকে চটিয়ে দিতেও ভয় হয়। এদিকে দেবতার কোপের ভয়। ফি বছর মা মনসাকে তো দু'চারটে প্রাণ দিতেই হয়। মায়ের ইচ্ছে। তাই বলে সাপকে বন্দী করতে হবে নাকি ?

কৈবর্ত বুনো গোত্রের লোকেরা তো সাপের পূজা করে না। কিন্তু এই বং গোত্রের কে না জানে তাদের পূর্বপুরুষকে নাগ-দেবতা বর দিয়েছিল। তার ফলেই তো আজ ধনে-জনে বংগআলরা সবার উপরে ।

বংগআলদের ক্ষেতে সোনা ফলে। গাঙের ধারের তৃণভূমিতে বংগআলদের নধর দেহ গাভী বলদ চরে বেড়ায়। পলিমাটির সীমানা ঘেঁষে যে লাল মাটির শুরু, সেখানেও বংগআলদের আবাদে দিগন্তবিস্তৃত হয়ে যাওয়ায় দোলে কাপাস গাছের সবুজ পাতা। এইসব তো নাগ-দেবতার বরে। ভুলুর স্ত্রী বুড়ো ভুলুর কাছে শুনেছে, ভুলুর পূর্বপুরুষ বং নাকি এ ভূমিতে এসেই নাকি নাগ দেবতার আশীর্বাদ পেয়েছিল। ভয়ে ভক্তিতে শিহরিত হল ভুলুর স্ত্রী। অনুনয়ের সুরে বলল – ছেড়ে দে বুইনী ছেড়ে দে। অধর্ম করিসনে ।

বুইনী উঠে দাঁড়াল। কালুর মেয়ের মুখ দিয়ে তখন ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। ঠোঁট নীল হয়ে গেছে।

কালুর স্ত্রী করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বুইনীর দিকে। সবই দেখল বুইনী । বন্য ঝাঁঝাল ক্রোধে তার সারা শরীর জ্বলে উঠল। অধর্ম ! ওই যে কচি মেয়েটা চোখের উপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। কালুর স্ত্রীর চোখের দৃষ্টিতে তো তার মেয়েরই প্রাণভিক্ষা। তবে ? তবে কি ওই বিষাক্ত সাপকেই দয়া দেখিয়ে ধর্ম মানতে হবে ? মাটির হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে সাপটাকে টেনে বের করল বুইনী। তারপর ছুড়ে দিল আলের বাইরে।

-যা দূর হ ।

কালুর স্ত্রী দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে ভীতস্বরে বিড় বিড় করল-হেই বাবা নাগ-দেব । অপরাধ নিও না। বংগআলদের ক্ষতি কোরো না ।

নমসিন ভুলুকে খুঁজতে মাঠের দিকে এসে দেখল মাঠে কার্যরত কিষাণরা সবাই উত্তেজিত। উত্তেজিত কয়েকজনের কাছ থেকে নমসিন শুনল ক্ষেতের আলের ওপারে জঙ্গলে হাতিতে চড়ে শিকারে গিয়েছিল কালু বংগআল ও আলের আরোও কয়েকজন জোয়ান বংগআল। গিয়েছিল হরিণ আর বুনো ছাগল ধরতে। কিন্তু জঙ্গলে নাকি একপাল বুনো মহিষ নেমেছে। বুনো মহিষ যে কি ভয়ংকর পাজী জন্তু তা এই সমতট এলাকার সব গোত্রেরই জানা আছে। এই ভীষণ রাগী জন্তুর সামনে মানুষ পড়লে আর উপায় নেই। তীক্ষ্ণ বাঁকানো শিংয়ে বিধিয়ে পলকে মানুষকে আছড়ে মেরে ফেলে এরা ।

জঙ্গলের ওধার থেকে শিকার তাড়ানো দলের হৈ হৈ চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। নমসিন ভুলু বংগআলের সামনে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু মুহূর্তে যেন একটা প্রলয় ঘটে গেল। প্রবল খুরে দাপটে মাটিতে ভূমিকম্পের আলোড়ন তুলে একদল বুনো মহিষ ছুটে বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে। ক্ষেতে যারা কাজ করছিল সবাই মাটিতে মাথা নীচু করে বসে পড়ল। নমসিন লাফিয়ে উঠে পড়ল পাশের একটা গাছে, মহিষের দল ক্ষেতের আলের পাশ দিয়ে খুরের ঘায়ে ধূলি উড়িয়ে ঢুকে পড়ল ঘাস-ঝোপের ভিতর। নমসিন তখনও গাছের ওপর। ভুলু বংগআল ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াল। আলের পাশেই সে লুকিয়েছিল। ভুলু দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই পলায়মান মহিষের দল থেকে একটা মহিষ ঘুরে দাঁড়াল। এক পলক দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঘষে ধুলো ওড়াল, তারপর তীর বেগে ছুটে এল সামনে । ক্ষেতের এক বুক উঁচু মাটির আল ভেঙে এসে ঢুকল ক্ষেতের মধ্যে। বুড়ো ভুলু চিৎকার করতে করতে আঁকা-বাকা গতিতে ছুটতে লাগল। শিং বাঁকিয়ে মহিষ তাড়া করছে তার পিছে। নমসিন গাছের ওপর থেকে দেখল অন্যান্য কিষাণও উঠে দাঁড়িয়ে হই হই করে মহিষটাকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু মহিষটা বারবার মাটিতে পা আছড়ে তেড়ে আসছিল সামনের মানুষকে লক্ষ্য করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মহিষটা ভুলুর কাছাকাছি এসে পড়ল। শিং বাঁকিয়ে মাথা নুইয়ে তীরবেগে ছুটে গেল ভুলুর দিকে। বৃদ্ধ ভুলু আর ছুটতে পারছিল না। পলকে এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে গেল। ক্ষ্যাপা মহিষ ভুলুকে শিংয়ে গেঁথে আছড়ে ফেলল। রক্তে জন্তুটার ধারাল শিং লাল হয়ে গেল। ততক্ষণে শিকারীরাও এসে পড়েছে। মানুষের সমবেত চিৎকারে মহিষটা মৃত ভুলুকে ফেলে ঢুকে পড়ল ঘাস-ঝোপের মধ্যে।

আধঘণ্টার মধ্যে সারা আলের মানুষ ভেঙে পড়ল মাঠে। ভুলু ছিল বং গোত্রের প্রধান। তার এমন শোচনীয় মৃত্যুতে সকলেই বিমর্ষ হল। সবাই বলাবলি করল দেবতা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এ বড় অশুভ লক্ষণ। কালুর মেয়েটা বিকেলের আগেই মারা গিয়েছিল। পরপর দুটো অপমৃত্যুতে বংগআলরা বিমর্ষ, আতংকিত হয়ে পড়ল । ভুলুর স্ত্রী কেঁদে কেঁদে বুইনীকে দোষারোপ করে অভিশাপ দিতে লাগল ।

ডান গো। ওটা ডান। দেবতাকে অসম্মান করল ও। বের করে দাও ওকে আল থেকে। দূর করে দাও বাইদ্যাদের মেয়েকে ।

ভুলুর মৃত দেহ আগুনে পোড়ান হল। কিন্তু টুকির মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হল গাঙে ।

টুকিকে তো দেবতা নিয়েছে ।

পরদিন মুরগী বলি দিয়ে, পাঁঠা কেটে ভুলুর আত্মার তুষ্টি দেওয়া হল। এবার কে হবে বংগআলের প্রধান তাই সমস্যা ! শক্তি-সামর্থ্য-সাহসের দিক দিয়ে কালু বংগআলই গোত্রের প্রধান হবার উপযুক্ত। কিন্তু বংগআলদের নিয়ম অনুসারে গোত্রের লোকের রায়েই আলের প্রধান নির্বাচিত হয়।

যদিও এখানে সকলেই আল ঘিরে জমি চাষবাস করছে, জঙ্গল কেটে আল বেঁধে আবাদ বাড়াচ্ছে তবু এখানে কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু নেই। ক্ষেতের ফলন যা হয় তা সবাইকে ভাগ করে নিতে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য করে যা রোজগার হয় তাতেও গোত্রের সমান অধিকার। গোত্রের প্রধান শুধু গোত্রের বিচার-আচার, আইন-শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধায়ক ।

সন্ধ্যার আগে বংগআলদের আলের ভেতর খামারে গোত্রের বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রী-পুরুষ জড় হল । আজ বংগআলদের দলপতি নির্বাচিত হবে। দু'দিন আগেই কালু তার বাপ ও মেয়েকে হারিয়েছে। আলের বাইরে দূরে আবাদের শেষে জঙ্গলের মাথায় বিকেলের রোদ ম্লান হয়ে এসেছে। সেদিকে তাকিয়ে কালু যেন একটা গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল। তার সেই চিন্তাধারা বড় বিচিত্র। কালু ভাবছিল শুধু দলপতি নয়, তারও বেশী কি কিছু হওয়া যায় না। ওই মাঠভরা কাপাস আর ধান, আথালভরা গরু, আলের সামনে বাঁধা হাতী, মাছধরা ছিপ সবকিছুর মালিক কি সে একা হতে পারে না ? সব তার একার দখলে কি আনা যায় না ? কালু নিবিষ্ট মনে তার হাতের বাঁশের তীক্ষ্ণ সড়কি আর ধারাল কাটারির

দিকে তাকিয়ে দেখল। একটা কুটিল চিন্তা হিস্ হিস্ করে উঠল তার মনে। কালুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এ গোত্রে এমন পুরুষ নেই । তবু কেউ যদি করে তবে কালুর হাতের শক্তি তাকে শেষ করার পক্ষে যথেষ্ট ।

সূর্য যখন বনভূমির মাথায় অস্তমিত হচ্ছে, বংগআলদের ঘরে প্রদীপ জ্বলে উঠছে, তখন উঠে দাঁড়াল কালু। উপস্থিত স্ত্রী-পুরুষকে লক্ষ্য করে বলল আজ দলপতি ঠিক করা চলবে না ।

সকলে বিস্মিত হল কেন কালু ! কেন ? কোন অশুভ লক্ষণ দেখা দিয়েছে নাকি?

কালু কঠিন গম্ভীর সুরে বলল – না। শোন, আমি এ বং গোত্রের মালিক আজ থেকে । বংগআলদের মাঠ আল হাতী গরু ছাগল সব আমার সম্পত্তি। তোমরা আজ থেকে আমার অধীন ।

গুঞ্জন উঠল সকলের মধ্যে। সে কি ! এমন অদ্ভুত কথা বংগআলরা কোনদিন শুনেছে নাকি ! এ কি কথা বলছে কালু। এতে যে বং গোত্রের অপমান হবে।

কালু উঠে দাঁড়াল – হ্যাঁ। আমি যা বলছি তাই হবে। আমার সঙ্গে কাটারি আর সড়কির যুদ্ধে, লাঠি খেলায় যদি কেউ পারে তো আসুক। আমি হেরে গেলে চলে যাব গোত্র ছেড়ে। তা নইলে সকলে মূক হয়ে রইল। কালুর শক্তির কথা জানতে তো কারো বাকি নেই। ও একা একবার বাঘের সঙ্গে লড়েছে। জংলী হাতীর মোকাবেলা করেছে। কে পারবে ওর পাল্লায় পাল্লায় !

সন্ধ্যারাতের আকাশের নীচে বং-গোত্রের সকলে কালু বংগআলের অধীনতা স্বীকার করল ।

তিন

কালুর অধীনতা স্বীকার করল না একজন। সে বুইনী। তার সরু চোখ দুটো সর্বদা বিষাক্ত দৃষ্টি ঝরায় কালুর ওপর। সে বং-গোত্রের মেয়ে নয়। বাইদ্যাদের মেয়ে সে। স্বাধীন জীবনের রক্ত তার শিরায় শিরায় ।

সন্ধ্যার সময় খালের সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে ছিল নমসিন। দু'একদিনের মধ্যে দেশে ফিরে যাবে সে। বেচা-কেনা শেষ হয়েছে তার। বেশ কিছুদিন কাটাতে হল তাকে এখানে। বংআলদের জীবনযাত্রা থেকে অনেক কিছু সে

শিখে ফেলেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু একটা জিনিস সে ভালো বুঝতে পেরেছে – বংগআলরা জলপথে যত দুর্ধর্ষ, স্থলপথে নয়। স্থলপথে বাণিজ্য এখনও এরা শেখেনি ।

কিরাতরা স্থলপথে যাতায়াতে অভ্যস্ত। পাহাড়ী পথে যাতায়াতে, শিকার করতে কিরাতরা অনেক বেশী পটু বংগআলদের চেয়ে। ধাতুর ব্যবহারেও কিরাতরা বংগআলদের চেয়ে উন্নত ।

নমসিনের অপ্রাসঙ্গিক ভাবনায় বাধা পড়ল । সন্ধ্যার আবছায়ায় নমসিনের পাশে এসে দাঁড়াল একটি নারীমূর্তি ।

ফিরে দাঁড়াল নমসিন - কে ?

নারীমূর্তি আর কেউ নয়, মৃত ভুলুর স্ত্রী বুইনী। বুইনী ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে দাঁড়াল নমসিনের পাশে – তুমি চলে যাবে নমসিন ?

নমসিন বলল- হ্যাঁ, কেন ?

বুইনী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল- তোমার যাওয়া হবে না, নমসিন। তোমায় থাকতে হবে।

নমসিন চমকিত হয়ে বুইনীর দিকে তাকাল- কেন বুইনী ?

অন্ধকারে বুইনীর চোখ হিংস্র আলোয় ঝকঝক করল। সাদা দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বুইনী একটু হাসল। তারপর নমসিনের হাত জড়িয়ে ধরে বলল- তোমায় নিয়ে আমি নতুন আল গড়ব নমসিন ।

নদীর ওপারে নতুন মাটি জেগেছে, সেখানে বাদার ধারে বুনোদের আল । ওরা মাছ ধরে, নৌকা বানায়, পানের বরজের চাষ করে। বন থেকে ফাঁদ পেতে মুরগী ধরে এনে পোষ মানায়। চল, ওখানে গিয়ে আমরাও নতুন আল বসাই! ওদের মত আমরাও পানের বরজ করব, মুরগী পালব, আলের ধারে হলদি আর আদার ক্ষেত করব, তারপর নারকেল সুপুরীর বাগান করে বংগআলদের চাইতেও বড় আল গড়ে তুলব।

বুইনীর সান্নিধ্যে নমসিনের বুকের রক্ত খালের জোয়ারের পানির মত উচ্ছল হয়ে উঠছিল । দুইহাত বুইনীকে বেষ্টন করে নমসিন বলল- তার কি দরকার, বুইনী । এর চাইতে তুমি আমার সঙ্গে কিরাত দেশে চল। আমরা পাহাড়ের

ধারে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে মাচার ঘর বাঁধব। বাঁশের তীর ধনুক দিয়ে পাখী শিকার করব। পাহাড়ের মাথায় উঁচু গাছের ডালে আমাদের দেবতা থাকেন। সেই দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখলে আমরাও ধনে-জনে ভরে উঠব। ভালুকের আর সাপের চামড়া ছাড়িয়ে, পাটি বুনে, পাহাড়ে রঙিন পাথর কুড়িয়ে আমরা বাণিজ্যে যাব ।

বুইনী প্রবল আপত্তিতে মাধা ঝাঁকাল- না না। ওই পাহাড়ের দেশে আমি থাকতে পারব না। আমি বাইদ্যা গোত্রের মেয়ে। নদী পানি নতুন চর বাদাবন এসব না দেখলে আমি বাঁচব না। আর তোমাকেও চাই ভিনদেশী কিরাত। কোল, কিরাত, বুনা কৈবর্ত বংগআলদের মত আমি নতুন গোত্র তৈরী করব। সহসা বন্য আবেগে দু'হাতে নমসিনকে জড়িয়ে ধরল বুইনী।

খালের পানিতে তখন একফালি চাঁদের বাঁকা হাসি চিকমিক করছে।

সেই ক্ষীণ বাঁকা চাঁদ একদিন আলোর ঝলকে, বনে ঘেরা জলে, ডোবা পলির দেশে, আলোর বন্যা বইয়ে হারিয়ে গেল । এল নতুন চাঁদ। বার বার ঘুরে এল সেই একই চন্দ্র ।

এই চন্দ্রাবর্তের দিন রাত্রি পেরিয়ে গিয়ে ক্রমে একদিন দেখা গেল নদীর ওপারের বাদাবন পুড়িয়ে নতুন আল গড়ে উঠছে। সমতটের আকাশের রঙ অনেক বদলাল। নদীতে অনেক স্রোত বয়ে গেল। সেই আলোর ঘাটে বাঁধা নৌকার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ল। আলোর ধারে বরজে সবুজ পাতা লতিয়ে উঠল। আলের আশপাশে ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ায় পোষা কুকুর আর চরে খায় পালা মুরগীর ঝাঁক। হাওয়ায় দোলে কচি ধানের চারা। আলোর ধরে বাঁধা থাকে হাতী। নতুন জনপদ, বুইনী কিরাতের নতুন আল। এপারে হিংসায় চোখ জ্বলে উঠল বংগআলদের। ধন-জনে বংগআলরাও কম নয়। তবু ওই নতুন গড়া আলের সম্পদ যে অসহনীয়। শুধু প্রাকৃতিক ভাঙা গড়ার দুর্যোগকে প্রতিরোধ করে হিংস্র ভয়াল শ্বপদসংকুল বনের বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকাটাই বোধ হয়ে যথেষ্ট নয়। শুধুমাত্র নিজ গোত্রের ক্ষমতা কব্জাধীন করেও সেই আদিম আকাঙ্ক্ষার শান্তি নেই। দরকার যে আরো, সে দরকার অন্যকে পরাজিত করে আরো ক্ষমতা লিপ্সার আকাঙ্ক্ষা ।

চার

বঙ্গোপসাগর থেকে উড়ে এসেছে বৃষ্টির ঝাপটা নিয়ে কালো মেঘ। ফুলে-ফেঁপে উঠেছে খাল বিল নদী হাওর। সেই সময়েই একদিন বংগআলদের সামন্তসেনার ছিপ নৌকার জলযুদ্ধ বাহিনী গাঙে ভাসল। ঘিরে ফেলল নতুন আলোর সীমানা। বৃষ্টির ফলার মত বর্ষিত হতে লাগল তীরের ঝাঁক ।

ওপারের আলের স্থলবাহিনীও কম নয়। তাদের তরফ থেকেও এল পালটা আক্রমণ। আকাশ কাল মেঘে ঢাকা। নদীতে হিংস্র ঢেউয়ের উত্তাল গর্জন। তারই মাঝে দুই আলের অধিবাসীর প্রচণ্ড যুদ্ধে নিহত মানুষের রক্তে লাল হয়ে গেল নরম মাটি আর নদীর ঘোলা জল। মরা মানুষের মাংস নিয়ে কামড়াকামড়ি করে লেজের ঝাপটায় নদীর বুক তোলপাড় করে তুলল মাংসলোভী কুমিরেরা। বংগআল জলবাহিনী যুদ্ধে অগ্রগামী। পিছু হটছে আলের যোদ্ধারা। ঠিক সেই সময় সহসা আলের মাথায় উঠে এল কৃষ্ণবর্ণা বর্ষিয়সী বন্য এক নারী। সে নারী বুইনী। তার হাতে ধরা প্রকাণ্ড এক কালকেউটে। কালু বংগআল ছিল জলবাহিনীর অধিনায়ক। বুইনীর হাতে ধরা বিরাট সাপটা দূর থেকে দেখে সে শিহরিত হল । কি ভয়ংকর ! ও যে দেবীকে ধরে নিয়ে এসেছে। বংগআলদের বাস্তুদেবী। দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে ভীত কালু চিৎকার করে উঠল – ছেড়ে দে বুইনী। দেবতাকে অসন্তুষ্ট করিস না। সাপটাকে হাত উঁচু করে তুলে বুইনী ভয়ংকর কণ্ঠে হাসল না। তোদের দেবীকে তোদের সামনেই মারব তোদের আল ধ্বংস করে দেব। তারপর সাপটার ক্রুদ্ধ ফণা আঙুলে টিপে চেঁচিয়ে বলল যা মনসার বাহন, বংগআলদের আল বান-বন্যায় ভাসিয়ে দে। বংগআলদের কার্পাস আর ধানের ক্ষেতে খরা এনে দে । দাঁতালে চিরে মারুক বংগআলদের জোয়ানগুলোকে, হাতী নেমে পায়ে পিষে ফেলুক। বংগআলদের ঘরবাড়ী ভাসিয়ে নিয়ে যা ভাটিতে। যা মনসার বাহন, আমি বাইদ্যার মেয়ে তুক করে ছেড়ে দিলাম। সাপটাকে ছুঁড়ে দিল বুইনী সামনের দিকে। ঠিক সেই সময় বুইনী কিরাত যোদ্ধার তীর এসে বিধল কালুর বুকে। লুটিয়ে পড়ল কালু । ছত্রভঙ্গ হল কালুর বাহিনী। একটু পরে কালু বংগআলের মৃতদেহ নদীর হাঙ্গর কুমিরের দাঁতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল ।

এদিকে ভয়ংকর কালো আকাশ প্রচণ্ড ঝড় নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন । হু হু করে ছুটে এল সামুদ্রিক বন্যা। কুটোর মত ভেসে গেল আলগুলো।

পরদিন দীপ্ত সূর্যের আলো নতুন জীবনের উত্তাপ নিয়ে দেখা দিল। আলগুলি

বিধ্বস্ত। ধান-পান মানুষ জন্তুর মৃতদেহ ঢেউয়ের মাথায় ভেসে চলছে। কালু বংগআলের ছেলে ভিখু বংগআল এবং আরো কিছু বংগআল পুরুষ আলের মানুষেরা যারা বেঁচেছিল ক্ষুত-তৃষ্ণা ক্লান্তি নিয়ে তারা আবার নতুন আল বাঁধায় এগিয়ে এল। সমতটের সোনার মাটিতে বার বার প্রকৃতির ভাঙা গড়া, দুর্যোগ ঝটিকায় হৃদয়হীন প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনের আল বাঁধে মানুষ।

তেমনি আবার আল গড়ে তুলতে হবে বংগআলদের। আবার হাওয়ায় দুলবে ধানের শীষ। দিগন্ত বিস্তৃত কার্পাস ক্ষেতে উড়ে বেড়াবে প্রজাপতি। চওড়া মজবুত আলের সামনে বাঁধা থাকতে হাতী। মোরগ মুরগী শস্য খুঁটে খাবে। নারিকেল সুপারী পাতায় দোলা দেবে দক্ষিণের হাওয়া। পানের বরজের আশপাশে ছুটে বেড়াবে খরগোশ আর কাঠবেড়ালী। বেগুন, হলুদ, আদা গাছের ডালে ডালে উড়ে বসবে টুনটুনি । ঘাটে ভিড়ে থাকবে বাণিজ্যের বহর।

পাহাড়ী পথে আসবে কিরাত বণিক। নদীর বালি খুঁড়ে সোনা আনবে বাইদ্যারা। মোলরা নৌকা ভরে আসবে লবণ আর মোলঙ্গার (মাটির হাঁড়ী কলসী) ভারা।

কৈবর্তরা মাছের ডিঙিতে রূপালী মাছ ভরে এনে সুটকী দেবে।

সমৃদ্ধির ঝলকে আবার গড়ে উঠবে নতুন আল । বংগআল ।

(খৃঃ পূর্ব আনুমানিক দেড় হাজার বৎসর পূর্বে সমতটে প্লাবন জলোচ্ছ্বাস এবং নিয়ত নদীর গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম করেও বংগোত্র মোটামুটি কৃষি এবং বাণিজ্যভিত্তিক জনপদ গড়ে তুলেছিল।)

তৃতীয় অধ্যায়

এক

সমতটের আকাশ নীল। বনানী নীল। উত্তর-পূর্বে বনাচ্ছন্ন শ্যামলিমা স্নিগ্ধ পাহাড়ের শ্রেণী নবজাত সদৃশ্য পলির প্রান্তে ফেনিল সাগর নিরন্তর মাথা কুটে মরে নতুন সৃষ্টির যন্ত্রণায়। ঊষালগ্নের নীলিমার আবেষ্টনীতে কনকপ্রভায় আলোক বিকিরণ করে সোনার ভূমি। বৈদিক সভ্যতার ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রাধান্য পুষ্ট উত্তরের আর্যরা জানতে পারে এই নদীবিধৌত আরণ্যক ভূখণ্ডে গড়ে উঠেছে দামিল নিষাদ কিরাত জাতি অধ্যুষিত সমৃদ্ধশালী জনপদ। গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রের পলিবাহিত ভূমিতে সুবর্ণচ্ছটা। নদীতটে শস্যক্ষেত্রে সোনার ফলন। বাণিজ্যে স্বর্ণের বসতি ।

এই সমুদ্রলগ্না স্বর্ণপ্রসবিনী প্রান্ত দেশের সম্পদ আর্যদের লোলুপ-দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবু তাদের ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রঝংকার এখানে বেজে উঠতে ভীত সংশয়াপন্ন হয়।

আর্যাবর্তের শিরোমণি ব্রাহ্মণকুল বিধান দিয়েছে 'পাণ্ডব বর্জিত' ম্লেচ্ছদেশে পক্ষীসদৃশ্য দাস্য জাতির আবাস । ভাত, মাছ ভক্ষণকারী নীচ কুলোদ্ভূত দাস্য জাতির ছায়া স্পর্শে আর্য ব্রাহ্মণকুলের ধর্ম নষ্ট হয়। এই দাস্য জাতিকে তাঁরা 'পাপী' আখ্যায়িত করে। কারণ ব্রহ্মার পুণ্য মুখবিবর হতে ব্রাহ্মণের জন্ম আর তাঁর পাদপ্রদেশ হতে সৃষ্ট দাস্য সম্প্রদায়। অতএব, কৃষ্ণবর্ণ সম্প্রদায় দস্যু বিশেষ । অথচ দক্ষিণাপথের (দক্ষিণাবর্তের) দস্যু কথিত কৃষ্ণকায় মানবদের সঙ্গে যুদ্ধে সুবিধা করতে পারে না। গৌরাঙ্গ ক্ষমতালোভী আর্য ক্ষত্রিয়রা যজ্ঞ করে দেবতাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে জলচর কৃষ্ণকায় মানবদের পরাস্ত করবার জন্য। এশিয়ায় তৃণপ্রান্তর হতে আগত আর্যরা ঘোড়ার খুরে ধূলির মেঘ ওড়াতে পারে কিন্তু জল বিচরণে তারা অপারদর্শী।

সমতটে জলবিস্তৃত জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি হারিকেল কামরূপের দুর্গমতা, ব্যাঘ্রতটী বাকলার দুর্ভেয়তা আর্যরা অতিক্রম করতে সাহসী হয় না। তবু লোভ মানুষকে চিরকাল উন্মাদ করে তোলে ।

অবশেষে একদিন আর্যযোদ্ধা মহাবীর ভীম তার অশ্বারোহী সেনাবাহিনী নিয়ে হানা দিল রাঢ় (পঃ বংগ), গৌড় (মধ্য পশ্চিমবঙ্গ) সম্পদশালী পুণ্ড্রনগরে

(উত্তর বঙ্গের মহাস্থানগড়) আর সমতটের (বাংলা) প্রান্ত সীমানায়। ক্ষত্রিয় অশ্বারোহী যুদ্ধবাজ দিগ্‌বিজয়ীর তরবারীর আঘাতে এদেশের নদীর ধারা রক্তাক্ত হল । বন্দী হল স্বাধীন সামন্ত সেনারা। তারপর স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা আর হরিণীনয়না কেশবতী কৃষ্ণাঙ্গিনী ললনাদের লুণ্ঠন করে জয়ের ধ্বজা উড়িয়ে প্রচণ্ড উল্লাসে মেদিনী কম্পিত করে ক্ষত্রিয়বাহিনী ফিরে গেল আর্যাবর্তে।

কিছু সংখ্যক আর্যসৈন্য ফিরে গেল না। নীলাক্ষ তাদের একজন। যুদ্ধ বিদ্ধস্ত পুণ্ড্রনগর। কিছুদিন পুণ্ড্রনগরে অতিবাহিত করার পর দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা পূরণের জন্য নীলাক্ষ একদিন নদীপথে নৌকাযোগে সমতটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল । নদী এখানে ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করেছে। বহু শাখানদী খাল এসে সংযোজিত হয়েছে এই নদীতে। আর্যভাষী নীলাক্ষ দামিলদের ভাষা সম্পূর্ণ বুঝতে পারে না। মাঝির সঙ্গে ভাঙা ভাঙা কথোপকথন থেকে উদ্ধার করেছে নদী তীরবর্তী জনপদগুলির পরিচয়। নদীর দুই প্রান্তে দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত। কোথায়ও কৃষ্ণকায় দামিল কৃষকেরা গরুর পিঠে লাঙল জুড়ে ভূমি কর্ষণে ব্যস্ত। কোথায়ও ক্ষেতে লোহনির্মিত কাটারী হাতে কাজ করছে কিষাণরা। মাঝে মাঝে আল ঘেরা সুবৃহৎ জনপদ। কখনও দৃষ্টিগোচর হয় ভয়াল বনভূমি। বিশাল উৎপাটিত বৃক্ষ টেনে নিয়ে চলেছে পোষা হাতী। বংশ আর লৌহ ফলকে নির্মিত ভল্ল আর তীর ধনুক কাঁধে পোষা কুকুরের পাল সঙ্গে নিয়ে আগে চলছে শিকারীরা। নদীর বাঁকে বাঁকে নৌকার সারি। জাল ফেলে মাছ ধরছে কেউ। কখনও দেখা যাচ্ছে গঞ্জ, কেনা-বেচা ব্যবসা-বাণিজ্যে সরগরম। অবাক বিস্ময়ে নতুন দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করছিল নীলাক্ষ। দামিল মাঝি নৌকায় পাল খাটিয়ে নদীর ঢেউয়ের মত ঢেউ তোলা সুরে গান ধরছে, ভাটির গান। শুনতে শুনতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল নীলাক্ষ। এক সময় কেমন একটু গুমোট অস্বস্তিতে তন্দ্রা ভঙ্গ হল তার। চোখ মেলে তাকিয়ে বিমূঢ় হয়ে গেল সে। মাঝি নৌকার পাল নামিয়ে ফেলছে। হাওয়া নেই। সূর্যালোকিত প্রসন্ন আকাশ ঘন নীল মেঘের আড়ালে অবলুপ্ত । ঈশান কোণে নীল মেঘপুঞ্জ ক্রমে মসীবর্ণ ধারণ করছে। সেই নিকষকালো মেঘের বুক চিরে থেকে থেকে ক্ষণপ্রভা বিদ্যুত-বহ্নি স্বর্ণসর্পের মত আলোক বিচ্ছুরণকরে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। নদীর ঘোলা জল কালিমালিপ্ত ।

ভীত নীলাক্ষ নৌকার খোল থেকে বেরিয়ে এসে মাঝিকে প্রশ্ন করল – কর্ণধার! একি ব্যাপার ? এযে প্রলয় তাণ্ডবের লক্ষণ। মাঝির প্রস্তর-কঠিন পেশী-বহুল

কৃষ্ণবর্ণ বাহু প্রবল শক্তিতে দাঁড় টানছে, তারও মুখ মেঘাচ্ছন্ন। নদীর তীরে জনপদের চিহ্ন নেই। নিশ্ছিদ্র ভয়াল বনের মাঝখানে খল খল করে বয়ে চলছে উতলা কালরূপিণী নদী । মাঝি যা বলল তাতে নীলাক্ষ ভয়ে হিম হয়ে গেল। ঝড় আসছে। অথচ নৌকা তীরে সংলগ্ন করা আরো বিপজ্জক। তীরবর্তী বনভূমি হিংস্র ব্যাঘ্র, সর্প, দাঁতাল বন্য হস্তী যূথ আর বন্য মহিষের আবাসস্থল। তাছাড়া অশরীরী প্রেতাত্মার ভয়। নৌকা তীরে সংলগ্ন করার অর্থ মৃত্যু-গহ্বরে অবতরণ করা ।

উপায় একমাত্র উদ্ধারকারী ব্রহ্মা সহায়। দামিল নিষাদ কিরাতদের দেবদেবী সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান নেই নীলাকষর। শুনেছে এরা সর্প, ব্যাঘ্র, প্রস্তর, বনজ বৃক্ষের উপাসক । কেউ কেউ এরা আবার মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তির উপাসনা করে ।

আর্য ক্ষত্রিয় নীলাক্ষ জলে ভেসে থাকার কৌশল সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। ক্ষত্রিয় সে। মৃত্যুকে তার ভয় পাওয়া সাজে না। কিন্তু এই বিজন নদীবক্ষে অসহায় ভয়ে ভীত কম্পিত নীলাক্ষ, প্রাণপণে ইন্দ্রনাম জপ করতে লাগল। প্রচণ্ড শব্দে বনভূমি কম্পিত করে মেঘগর্জন করে উঠল। সেই সঙ্গে প্রবলবায়ু তাড়নায় নদী উত্তাল হয়ে উথাল পাথাল ঢেউয়ে বিচূর্ণ করে দিল নীলাক্ষর নৌকা ।

মুহূর্তে কোথা দিয়ে কি যেন ঘটে গেল। প্রবল ঝড়-বৃষ্টি আর নদীর গর্জনে এক সময় মুমূর্ষু নীলাক্ষ বুঝল নৌকার ভাঙা এক টুকরা কাষ্ঠখণ্ড ধরে সে ভাসছে। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এই মুহূর্তে তাকে এই জ্ঞান দান করল যে আপাতত সাঁতার না জানা নীলাক্ষর প্রাণরক্ষাকবচ ভাঙা নৌকার কাষ্ঠখণ্ড ।

ঝড়ের তাণ্ডবে পর্বতপ্রমাণ ঢেউয়ে আছড়ে পড়তে পড়তে কাষ্ঠখণ্ডটি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকল নীলাক্ষ । আপ্রাণ শক্তিতে ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এক সময় চেতনা বিলুপ্ত হল তার। বিলুপ্তির মাঝে তলিয়ে যেতে যেতে নীলাক্ষর ক্ষীণভাবে মনে পড়ল সুদূর আর্যাবর্তের গৃহসুখের কথা। পরমুহূর্তে শক্তিশালী মৃত্যুরূপিণী জলের হিম স্পর্শে ক্রমশঃ হারিয়ে গেল সে।

তারপর এক সময় ঝড়ের ক্ষ্যাপা তাণ্ডব শান্ত হয়ে এল । আকাশ মেঘমুক্ত হল। শ্বাপদসংকুল বনভূমির মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী-বক্ষের উদ্বেলিত নৃত্য থেমে এল। কল কল ছল ছল গান গেয়ে উঠল সে। অন্ধকারাচ্ছন্ন বনভূমির

উপরে মেঘমুক্ত আকাশে ভেসে এল তারকা দীপালোকিত রাত্রি ।

দুই

নীলাক্ষর যখন জ্ঞান ফিরল তখন ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া তার দুর্বল শরীরের উপর সস্নেহ প্রলেপ বুলিয়ে দিল। আবছা ভোরের মত আধো চেতনার মধ্যে নীলাক্ষ অনুভব করল তার মাথার কাছে কারো উপস্থিতি। ধীরে দৃষ্টি উন্মোচন করে সামনে তাকাতে চেষ্টা করল সে। আকাশ ক্রমশ রক্তিম আভায় রক্তবর্ণ ধারণ করছে। নদীর বালুতটে শুয়ে নীলাক্ষ দেখতে পেল একটি নারীমূর্তি। অপূর্ব শ্রীময়ী তার মুখশ্রী। ভ্রমর-কালো ভুরুর নীচে হরিণীনয়নার দৃষ্টি উদ্বেগ কৌতূহল আর শংকায় বিচিত্র ভাবব্যাঞ্জক ।

নীলাক্ষ প্রশ্ন করল— এটা কোন জায়গা ?

তরুণী নীলাক্ষকে কথা বলতে দেখে স্বস্তিবোধ করল, মিষ্টি সুন্দর সুর টেনে বলল- এটা বংগআল। আমাদের এ জায়গার নাম কাটাআলপাড়। তুমি কে বিদেশী ?

নীলাক্ষ ক্রমশ সুস্থ বোধ করছিল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষুধা অনুভব করল জঠরে। ম্লান হেসে বলল- আমি বহু দূর দেশের মানুষ। আর্য ক্ষত্রিয়। আমার নাম নীলাক্ষ। তুমি কে ললনে ! এদেশই কি তবে সমতটের ভাটি অঞ্চল ?

শ্যামাঙ্গীর পরনে সিক্ত সুতিবস্ত্র। পৃষ্ঠদেশে মেঘের মত কালো ভিজা আলুলায়িত চুল, তার পাশেই একটি জল ভর্তি মাটির কলস। সম্ভবত নদীতে স্নান সম্ভবত করে জল নিয়ে বাড়ী ফিলছিল সে।

তরুণীর সরল বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে সহসা যেন শংকার ঝিলিক ফুটল।

ভীত কণ্ঠে বলল- আমার নাম বিনিকা। কাটাআলের প্রধানের মেয়ে আমি । কাটাআলপাড়ের নদী একটু দক্ষিণে গিয়েই ভাটিতে পড়েছে। তা তুমি... তুমি কি সেই দস্যু দেশ – উত্তরাপথের (পাঞ্জাব) লোক ?

ধীরে ধীরে উঠে বসল নীলাক্ষ । বলল- আমি হস্তিনাপুরের ক্ষত্রিয় ।

বিনিকা অজানিতে যেন শিহরিত হল উঃ। কি ভয়ানক। কিছুদিন আগে উত্তরের পাণ্ডুবংশের ভীম তার সেনাদল নিয়ে এদেশ আক্রমণ করেছিল।

এদিক থেকে বহু সোনা রূপা আর মেয়ে লুঠে নিয়ে গেছে তারা।

নীলাক্ষ যথেষ্ট দুর্বল বোধ করছিল তবু জবাব দিল- সবাই দস্যু নয়, ললনে বিনিকা। আর যুদ্ধ-বিজয়ীর এ তো প্রাপ্য। শুনেছি দামিল নিষাদ কিরতদের শক্তিশালী হস্তীবাহিনী আছে। তবু তারা হেরে গেলে কেন ?

নীলাক্ষর কথার ঘনিষ্ঠ সহজতায় বিনিকার কিছুটা সহাসের সঞ্চার হল। বলল- তোমাদের তো ঘোড়া আছে। আর যুদ্ধবিদ্যাও তোমরা ভালো জানো । এদেশের এই দামিল নিষাদ কিরাতরা তো কেবল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করে নিজেদের দুর্বল করে ফেলেছিল। তবে আমাদের আল পর্যন্ত এসে পৌছতে পারেনি পাণ্ডববাহিনী । বর্ষায় নদী পার হতে তারা ভয় পেয়েছিল নিশ্চয়ই ।

নীলাক্ষর কথা বলার শক্তি হ্রাস পাচ্ছিল। আবার বালির ওপর শুয়ে পড়ল সে। ক্লান্ত স্বরে বলল- ভদ্রে ! আমায় একটু জলপান করাও। আমি ক্ষুধার্ত, দুর্বল। কাল রাতে ঝড়ে আমার নৌকা ডুবি হয়েছে।

বিনিকা সহসা নীলাক্ষর অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে লজ্জিত হল। ছিঃ ছিঃ বিপদগ্রস্ত বিদেশীকে সেবা না করে সে কেবল কথাই শুনিয়ে চলেছে। দ্রুত হাতে কলস থেকে পানি ঢেলে আজলা ভরে নীলাক্ষকে জল খাওয়াল সে ।

আকাশে সূর্যরশ্মির রেখা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঘেমে উঠছিল নীলাক্ষ। ভেজা শাড়ীর প্রান্ত দিয়ে নীলাক্ষের কপাল মুছিয়ে দিল বিনিকা। বলল- একটু অপেক্ষা কর নীলাক্ষ । আমি এখনি বাড়ী থেকে আসছি। এইতো কাছেই আমাদের বাড়ী ।

ভেজা শাড়ীর সুন্দর শ্রুতিমধুর শব্দ তুলে দ্রুত বাড়ীর দিকে চলে গেল বিনিকা।

একটু পরেই একজন বৃদ্ধ লোক ও তরুণ যুবাকে সঙ্গে করে সে ফিরে এল। কয়েকটা কুকুর সঙ্গে ডাকতে ডাকতে এল। বৃদ্ধটির গায়ের রঙ তামাটে। দীর্ঘ কাঁচা- পাকা দাড়িতে মুখ ঢাকা। হাতে মোটা বাঁশের লাঠি। তরুণটির হাতে একটি কাটারী ।

রৌদ্রের তাপ প্রখর হয়ে উঠেছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে দুর্বল শরীরে হতচেতনের মত পড়েছিল নীলাক্ষ। বিনিকা এবং বৃদ্ধটি তরুণটি সঙ্গে টানা সুরে অনেকক্ষণ উত্তেজিত হয়ে কি বলাবলি করল।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ পরে আদেশের সুরে তরুণটিকে বলল- বগাই, বাড়ী থেকে হাতী নিয়ে আয় । ওকে তুলে নিয়ে সেবা যত্ন না করলে মারা পড়বে।

তারপর বিনিকার দিকে ফিরে বলল- বিনি, ওকে একটু দুধ ঢেলে দে মোলংগা থেকে । কিছুটা সুস্থ বোধ করবে। মোলংগায় দুধ এনেছিস তো, মা ?

বিনিকা বলল- হ্যাঁ বাবা। পাকা কলা আর খানিকটা ভেজা চিড়েও এনেছি। বৃদ্ধ খুশী হল— বেশ করেছিস। লোকটি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে বগাই চলে গিয়েছিল। বিনিকা ভেজা কাপড় বদলে মাটির ছোট মোলংগায় (ঘটী) দুধ আর কলাপাতায় চিড়ে ও কলা নিয়ে এসেছিল।

নীলাক্ষর পাশে হাঁটুমুড়ে বসে দুধে চিড়ে ভিজিয়ে পরম যত্নে তাকে খাওয়াতে লাগল বিনিকা। খাওয়ার পর ধীরে ধীরে কিছুটা সুস্থবোধ করল নীলাক্ষ ।

বৃদ্ধ নীলাক্ষর কাছে বসে বলল- কোথা হতে আসছ, বিদেশী ?

নীলাক্ষ জবাব দিল- পুন্ড্রনগর থেকে। পথে ঝড়ে নৌকা ডুবে গিয়েছে। ইন্দ্রের অশেষ করুণা, কোন হিংস্র জন্তুর কবলে না পড়ে আপনাদের মত অতিথিবৃৎসল সৎলোকের কাছে এসে পড়েছি। তাই জীবন ফিরে পেলাম। আপনিই বিনিকার বাবা ?

বৃদ্ধ হাসল – বিপদাপন্নকে সেবা করা তো মানুষের ধর্ম। আমি বিনির বাবা । আমি কাটাআল পাড়ের প্রধান বাঘন। তুমি কি দেশ ভ্রমণে এসেছিলে বিদেশী?

নীলাক্ষ উঠে বসল— এসেছিলাম পাণ্ডুবপুত্র মহাবীর ভীমের সৈন্যবাহিনী হয়ে। কিন্তু এদেশ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই ভেবেছিলাম এখানেই কোথাও থেকে যাবো ঘর বেঁধে ।

বাঘন মাতবর হাসল – শুনেছি তোমরা নাকি আমাদের ঘৃণা কর ! আমাদের দেশ থেকে ছেলে-মেয়ে ধরে নিয়ে দাস-দাসী বানিয়ে রাখ !

নীলাক্ষ বিব্রত বোধ করল। একটু চুপ করে থেকে হাসল – তাতঃ (চাচা) বাঘন ! মানুষের চিরকাল সম্পদ আর প্রভুত্বের লোভ। আমাদের বৈদিক যুগের মনীষীরা এই লোভকে সর্বদা সংযত করতে বলে আসছে। তবুও এই সম্পদ আর প্রভুত্বের লোভে উন্মুক্ত তরবারী হাতে আর্যরা দেশ দেশান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমি ক্ষত্রিয়। আবাল্য অস্ত্র চালনা শিখেছি। কিন্তু মনে হয় এ

শুধু অন্যায় রক্তপাতের শিক্ষা। আমি আমার ক্ষত্রিয় পরিচয় ভুলে যেতে চাই ।

বাঘন নীলাক্ষর কথায় চমৎকৃত হল। বলল- তুমি তো ভারী জ্ঞানী লোক । আমরা ভাবতাম উত্তরের আর্যজাতি কেবল পরের সম্পদ আত্মসাৎ করা আর মানুষের ওপর অত্যাচার করা ছাড়া আর কিছুই শিক্ষা করে না ।

নীলাক্ষ অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভরে বলল- তাতঃ ! আপনারা অত্যন্ত সরল ভালো মানুষ। আর্যদের আপনারা ঠিক তাই বুঝে ওঠেন না ।

হো হো করে নদীতীর কম্পিত করে হেসে উঠল বাঘন মাতবর – আর্য ক্ষত্রিয়! বংগআলদের তোমরা চেননা তাই একথা বলছ। মানুষ মারা যুদ্ধে তোমাদের মত আমরা হয়ত এখনও অতটা পটু হয়ে উঠিনি। কিন্তু সাপ বাঘের সঙ্গে আমরা বাস করি। তীর ধনুক দিয়ে গয়াল মারি। বুনো হাতী বশ করি। জংলী গরু পোষ মানিয়ে লাঙল চাষ করে ফসল ফলাই। এই নদীর ভাঙন আর বানের ঝাপটা বারবার আমাদের আল ভাসায় তার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা বার বার নতুন আল গড়ি। বংগআলরা বড় কম ভয়ংকর নয় ! তোমরা পরের সম্পদ লুঠ কর। আর আমরা নিজের হাতে জাহাজ তৈরী করে সাগরে ভেসে দূরদূরান্ত দেশ থেকে বাণিজ্য করে সোনা-রূপা মণি-মুক্তা আনি ।

বিনিকা এতক্ষণ চুপ করেছিল। বিব্রত নীলাক্ষর দিকে তাকিয়ে তার কেমন করুণা বোধ হল । বলল- বাবা ! নীলাক্ষ কি অন্য রকম নয় ? ভালো মানুষ তো সব দেশের সব জাতিতেই আছে ।

বাঘনের চুল-দাড়ি সমাচ্ছন্ন মুখ বাৎসল্যের হাসিতে উজ্জ্বল হল এই দেখ । শুনলে হে ! এদেশের নদীর ভাঙাগড়ায় বংগালরা যেমন ভয়ংকর তেমনি এর নরম মাটির মত বংগালদের মেয়েরা নরম। মায়ায় ভরা মন। নদীর ঢেউয়ের মত ছলছলে । বিনিকার শ্যামশ্রী মুখে রক্তিম আভা পড়ল। সলজ্জ কণ্ঠে বলল – তুমি বড় বাড়িয়ে বল, বাবা।

এবার নীলাক্ষর শ্রান্ত দৃষ্টিতেও মুগ্ধ হাসি ফুটল ললনে বিনিকা ! আমাদের আর্যাবর্তের পুরুশপুর (পেশোয়ার) থেকে পাঞ্চাল হস্তীনাপুর অবধি এদেশের কালো কেশ আর হরিণী নয়নের প্রবাদ প্রচলিত আছে। আর্য-সুন্দরীদের এক ঘেয়ে পিংগল চুল, নীল চোখের আকর্ষণ আর মুগ্ধ করে না আর্যপুরুষদের, তাইতো শ্যামাঙ্গিনীদের কাছে হেমাঙ্গিনীরা হেরে যাচ্ছে। স্বর্ণকেশী আর্যদের লোলুপদৃষ্টি এই কালো চোখের দিকেই ।

বিনিকা লাজনম্র মুখ নিষ্প্রভ হয়ে উঠল। ব্যথিত কণ্ঠে বলল- তাই বুঝি কালো মেয়েদের অসুর কন্যা নাম দিয়ে তারা দাসী বানিয়ে সেবা নেয় ?

ওদিকে গ্রামের দিক থেকে একটা কোলাহল সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। হাতী নিয়ে আসছিল বগাই। সঙ্গে আসছে একপাল কুকুর নিয়ে তীর ধনুকধারী বাঘনের রক্ষী সেনারা। গ্রামের কিছু কৌতূহলী বৃদ্ধ, শিশু, যুবক-যুবতীও আসছিল।

বাঘন উঠে দাঁড়িয়ে নীলাক্ষর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল- আমার হাতটা ঘরে উঠে দাঁড়াতে পারবে তো নীলাক্ষ ?

বিনিকার হাত থেকে কলা আর মোলংগা নিয়ে আরও একটু দুধ চিড়ে কলার মণ্ড খেল নীলাক্ষ। তারপর তার শালপ্রাংশু সুঠাম দীর্ঘ দেহ উন্নত করে বাঘনের সাহায্য ছাড়াই উঠে দাঁড়াল ।

বাঘন হাসল ।

- বাঃ ! এই তো বল ফিরে পেয়েছ।

ততক্ষণ বগাইর দল এসে পড়েছে। সবাই বাঘনকে অভিবাদন করে অবাক বিস্ময়ে এই স্বর্ণকেশ গৌরবর্ণ ভিনদেশী লোকটিকে দেখছিল।

বগাই অংকুশের আস্ফালন করে হাতীটাকে হাঁটু মুড়ে বসিয়ে দিল। বাঘন নীলাক্ষকে বলল – হাতীর পিঠে উঠে বস নীলাক্ষ । কোন ভয় নেই ।

নীলাক্ষ অশ্বারোহী এবং রীতিমত পারদর্শী অশ্বচালক। কিন্তু হাতীর পিঠে চড়া সম্পর্কে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। একটু ইতস্তত করল সে। কুকুরের দল ভীড়ের বাইরে থেকে অপরিচিত নীলাক্ষকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে বিরক্তি জানাতে লাগল । ইতিমধ্যে নীলাক্ষকে ঘিরে জটলা লক্ষ্য করে নদীর ঘাটে দু'চারটে নৌকা ভীড়ে পড়ছে। মাঝিমাল্লা জেলেরা নেমে এসে নীলাক্ষকে দেখে নানা মন্তব্য করতে শুরু করেছে। বগাই হাসল- কি হে ভয় পাচ্ছ কেন ?

নীলাক্ষ বগাইকে লক্ষ্য করে জবাব দিল- থাক ভাই। আমি হেঁটেই যেতে পারব।

সে কি ? সকলেই অবাক হল। হাতী চড়িয়ে অতিথিকে ঘরে নেওয়া তো সম্মান দেখান। লোকটা বলে কি !

ভীড়ের মধ্যের বিস্ময়াবিষ্টতা তরল হল। অনেকে হেসে উঠল। বগাইও হাসল বেশ জোরেই। এবারে বাঘনের চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল । যারা হাসছিল তাদের দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড হুংকার ছাড়ল বাঘন – এই ! চুপ সব। বাঘনের অতিথিকে ঠাট্টা করিস এই কাটাআল পাড়ের লোকের এত সাহস কবে থেকে হল ?

নীলাক্ষ উত্তেজিত বাঘনের হাত ধরল- তাত, ওদের দোষ নেই। আমি সত্যিই একটু ভীত হয়ে পড়েছি। যাক এখন আমি অনেকটা সুস্থ, হেঁটে যেতে কোন অসুবিধা হবে না আমার ।

বাঘন গম্ভীর স্বরে আদেশ করল- হাতী তোল বগাই। এগিয়ে যা তোরা । বগাই হাসি থামিয়ে ফেলেছিল। দলপতির নির্দেশে সে হাতী উঠিয়ে দিল ।

ক্রমশঃ কৌতূহলী জনতার ভীড় কিছুটা হালকা হল। তীরন্দাজ বাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে নীলাক্ষকে নিয়ে হেঁটে চলল বাঘন বিনিকা পাশাপাশি ।

নীলাক্ষ হেঁটে যেতে যেতে লক্ষ্য করল পথের দু'পাশের কৌতূহলী জনতার উৎসুক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তার দীর্ঘ দেহাবয়ব, খাড়া নাক, নীল চোখ, গৌরবর্ণ দেহ এবং নদীর হাওয়ায় উন্নত ললাটে উড়ে এসে পড়া তার সোনালী চুল কেমন একটা মুগ্ধতার ছায়া ফেলেছে। এই মুহূর্তে তার দেহের শিরায় প্রবহমান আর্য রক্তধারা নিজের আভিজাত্য ও গৌরববোধ এই দামিল নিষাদদের অপেক্ষা নিজেকে উন্নততর বলে মনে করতে দাম্ভিক প্ররোচনা দিল। নিজেকে যেন অসুরাবেষ্টিত দেবতা বলে মনে হল নীলাক্ষর !

যেতে যেতে বাঘন একজন অনুচরকে আদেশ করল- কড়ি, তুই আগে ছুটে যা। হরিণ মেরে ভোজের আয়োজন কর। সেই সঙ্গে কচি পাঁঠাও কাটবি । গোলা থেকে ধান নামিয়ে চিড়ে কুটতে বল মেয়েদের। আজ সন্ধ্যায় সারা পাড়ায় খবর পাঠিয়ে দে বাঘনের বাড়ীতে ভোজ হবে ।

বগাই এগিয়ে গিয়েছিল। নীলাক্ষকে প্রথম থেকে অকারণেই সে যেন কেন মিত্র বলে ভাবতে পারছিল না। কাটাআল পাড়ের বংগআলদের মধ্যে বাঘনের পরেই শক্তিশালী বগাই । গয়াল শিকারে তার জুড়ি নেই। দুধর্ষ শিকারী সে। জাহাজ তৈরির কাজেও তার নাম-ডাক আছে। তাছাড়া বাঘনের মেয়ে বিনিকার প্রেমে মুগ্ধ বগাই । নীলাক্ষর প্রতি বিনিকার অতিমাত্রায় মনোযোগ এবং অনুরাগভরা দৃষ্টি তার চোখ এড়ায়নি। হিংস্র আক্রোশে বগাইর মনটা

জ্বলছিল। পাশের কড়িকে ফিসফিস করে বগাই বলল- লোকটাকে সুবিধের মনে হচ্ছে না-রে ।

কড়ি সচকিত হল। ইতিউতি তাকিয়ে নীচুকণ্ঠে বলল- মাতবর বাঘন তো ওর রূপ দেখেই গলে গেল। কোথাকার কে, চেনা নেই, জানা নেই, অমনি হুকুম হল হাতী চড়িয়ে বাড়ি নাও। হরিণ-পাঁঠা কেটে ভোজ দাও। যত্তো সব ।

কড়ির সমর্থনে বগাই খুশী হল। মনের ভাব চেপে বলল- লোকটা নিশ্চয়ই কোন বিদেশী গুপ্তচর। আমি তো বহু দেশ ঘুরেছি, মানুষ চিনতে আমার কষ্ট হয় না, বুঝলি কড়ি ।

বগাইর মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে উক্তির সত্যতা কতটুকু না বুঝলেও বগাইকে কড়ি রীতিমত সমীহ করে। কারণ বেনের জাহাজ চড়ে বগাই অনকেবার সাগর পাড়ি দিয়ে দূরের দ্বীপ-দ্বীপান্তরের ঘুরে এসেছে। বহু অচেনা দেশের খবর ওর নখদর্পণে ।

কড়ি বলল- আরে বাঘন তো আর অত কাঁচা লোক নয়। বাঁশ পিটিয়ে দাঁতাল মেরেছে। খালি হাতে বাঘের সঙ্গে লড়েছে। হুঁ হুঁ বাবা। বংগআলে এসে চালে গোলমাল করলে বাছাধনকে বাঘের মুখে পড়তে হবে ।

বগাই বিরক্ত হল-বড়বাজে বকিস তুই কড়ি। বাঘনের তো বুড়ো হয়ে বুদ্ধি গাঙের জলের মত ঘুলিয়ে যাচ্ছে। বুড়োকে ঘোল খাইয়ে ওই তালগাছের মত লম্বা লোকটা শেষে না আমাদের আল কেড়ে নেয়। আমাদের দাসদাসী বানিয়ে রাখে ।

কড়ির মুখ রাগে উত্তেজনায় গনগনে হয়ে উঠল। হাতের ঝকঝকে কাটারী শূন্যে আস্ফালন করে সাদা ঝকঝকে দাঁতে বন্য হাসি হাসল সে। বংগআলের রোদে ভাসা আকাশের শানিত আভা আর নদীর রৌদ্রোজ্জ্বল স্রোতের ধারাল বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল তার ধারাল কাটারী আর সাদা দাঁতের হিংস্রতা— এই আলে হাত দেবে এত বড় সাহস কার ! বগাই তুই বলিস কি ? বংগআলরা কি পুঁটি মাছ হয়ে গেছে নাকি ?

পেছন থেকৈ বাঘন হাঁকল- কি হল রে কড়ি, থামলি কেন ? এগিয়ে পা চালা।

কড়ি দ্রুত পা চালাল । বগাই মুখ ভার করে হাতীর পিঠে অংকুশ মারল ।

নদীর বুকে উঠতি বেলার রোদ বংগআলদের হাতের শানিত কাটারীর মত ধারাল আভায় ঝকঝক করছে।

তিন

নীলাক্ষ বংগআলে আসবার পর প্রায় ছয় ঋতু অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। বাঘনের বাড়ীর কাছেই ঘর বেঁধেছে সে। মাটিলেপা ভিতের ওপর বাঁশের বেড়া খুঁটি আর শন গোলপাতার ছাউনির চাল দিয়ে নিজ হাতে ঘর তৈরি করেছে নীলাক্ষ। বংগআলদের মত ভাত মাছ শাক খাওয়ায় রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। যবের রুটি, গোমাংস আর সোম সুরার স্বাদের কথা সে প্রায় ভুলেই গেছে। বংগআলদের খাবার তার উদগার উদ্রেক করে না। বরং ভালোই লাগে। বাঘনের বিশেষ প্রিয়পাত্র নীলাক্ষ । আলের লোকদের সঙ্গে সে ক্ষেতে কাজ করে। বীজ বোনে, মটিতে সার দেয়, ধান কাটে। কার্পাস তুলোর ক্ষেতে ডোংগায় করে জলসেচ করে। তা'ছাড়া জাহাজ তৈরির কারিগরী বিদ্যাও ইতিমধ্যে বেশ পটু হয়ে উঠেছে নীলাক্ষ। মাছ ধরা বিদ্যাও রপ্ত করে ফেলেছে সে। আলের শিকারীদের দলেও অগ্রগামী নীলাক্ষ। হাতী চড়ে বন থেকে কাঠ আনে। হরিণ আর গয়াল শিকারেও তার নাম-ডাক হয়েছে।

এক বৎসরের মধ্যে বংগআলদের জীবনযাত্রা সম্পর্কেও যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করেছে সে। নীলাক্ষ বেশ ভালোভাবে উপলব্ধি করেছে, কৃষিকাজ ও জলপথে বৈদেশিক বাণিজ্যে আর্যদের চেয়ে এদেশের অধিবাসীরা যথেষ্ট উন্নত। অভ্যন্তরীণ লেন-দেন কড়ির মারফত হলেও বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্রে বিদেশীদের সঙ্গে স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, সীসার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বংগআলরা। নীল সাগর পেরিয়ে সুদূরের দেশ-দেশান্তর থেকে যে সব বিদেশী বণিক আর মাল্লা আসে, তারা এ দেশকে বলে সোনার দেশ। বংগআলরা গর্ব করে বলে - আমাদের বংগআল ।

নদীর পাড়গুলোতেই সাধারণতঃ এদের বসতিগুলো বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়ে গড়ে উঠেছে। নদীনালা, খাল-বিলের পাড়ে অনেকগুলো মনুষ্যবসতির পাশাপাশি অবস্থান। এই অনেক ঘর নিয়ে পাড়ের বসতিকে বংগআলরা পাড়া বলে। আর এই পাড়াগুলোর আশেপাশে আঁকাবাঁকা ক্ষীণ খরস্রোতা খাল পেরিয়ে এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় যাবার সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা হাতীর পিঠের মত উঁচু রঙধনু আকৃতির বাঁশের তৈরি সেতু। বংগআলরা সেই সেতুকে বলে

সাঁকো ।

বেলা দ্বিপ্রহর। খালের জলে জোয়ার এসেছে। কুলকুল নৃত্যছন্দ তুলে ক্রমশঃ জলে ভরে উঠেছে খালের বুক। সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে ছিল নীলাক্ষ। খালের ওই পাড়ের আলঘেরা জমিতে এখনও কিষাণরা কাজে ব্যস্ত। গাছপালার আড়াল দিয়ে নদীর কিছুটা দেখা যাচ্ছিল। দ্বিপ্রহরের সূর্যালোক রুপোর মত ঝলমল করছে নদীর বুক ।

রঙ-বেরঙের পাল উড়িয়ে ভেসে চলেছে নানা আকৃতির নৌকা, জাহাজ, ডিঙি। দুরে নদীর ধারে ঘাসের বনে চরে বেড়াচ্ছে গাভীর দল। উন্মনা হয়ে গেল নীলাক্ষ । স্বপ্নের স্মৃতির মত মনে পড়ল সুদূর আর্যবর্তের কথা, সেখানে নীল আকাশের নীচে সোনালী যবের শীষ হাওয়ায় দোলে। তার আশেপাশে কেশর ফুলিয়ে ফুটে বেড়ায় আর্যদের ঘোড়ার পাল। চরে বেড়ায় মেষের দল ! সন্ধ্যায় 'জনের' স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে বসে হোম অগ্নির লালচে আভায় সোমরস পান করে গীত-বাদ্যে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে। স্বপ্নভঙ্গ হল নীলাক্ষর। সাঁকোর ওপারের আলের পাশ দিয়ে দ্রুতগতি একটি নারীমূর্তি ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নীলাক্ষর দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিস্তৃত হল মুখের হাসি। ততক্ষণ নারীমূর্তিটি কাছে এসে পড়েছে। সাঁকোর এ প্রান্তে এসে কপালের ঘাম মুছল বিনিকা ।

– এই যে নীলাক্ষ ! কার চিন্তায় এমন মগ্ন ?

দুপুরের ভেজা বাতাসে নীলাক্ষর কপালে কয়েক গুচ্ছ সোনালী চুল এসে পড়েছিল। নীল চোখের তারায় মুগ্ধ হাসি ফুটিয়ে নীলাক্ষ বলল- আপাততঃ আমার চিন্তারাজ্য দখল করেছে এমন এক নারী, নদীর আঁকাবাঁকা শরীরের মত যার দেহ, যার চোখ দীঘির জলের মত কালো, যার চাঁপাফুল পরা চুল মেঘের মত গভীর। আর মন পলির মত কোমল । নাম তার .....

হাতের মাটির পাত্র দু'টি কাঁখে জড়িয়ে নীলাক্ষর পাশে এসে দাঁড়াল বিনিকা।

— থাক থাক। খুব হয়েছে। এতক্ষণ ক্ষেতে কাজ করে পেটে খিদে নিয়ে আর ভাবুকগিরি দেখাতে হবে না ।

নীলাক্ষ বিনিকার হাত থেকে পাত্র দু'টি নিয়ে বলল- বিনি, এই যাদুর দেশে এলে পাষাণ হৃদয়েও ভাবের নদী বয়ে যায়। সাধে কি আর তোমরা, বংগআলরা এমন উচ্ছ্বাসপ্রবণ ? এত গান বাঁধো, ছড়া কাটো। তাছাড়া যদি তোমার মত

নারী সহচরি হয় তাহলে তো কথাই নেই। যোদ্ধাও অস্ত্র ফেলে হাতে বংশী তুলে নেয়।

বিনিকা ছদ্মকোপে ভ্রূ উৎক্ষিপ্ত করল— হয়েছে আমরা তো কালো কুচ্ছি তোমাদের দেশের মেয়েদের মত যুদ্ধবিদ্যা, শাস্ত্রচর্চা, কাব্যপাঠের গুণ আমাদের তো নেই । তাই ঠাট্টা করছ।

নীলাক্ষ বিনিকার হাত ধরে সাঁকো পার হয়ে খালপাড়ের গাছের ছায়ায় বসল। তারপর কৌতুকভরা কণ্ঠে বলল- বিনি, আমার কাছে শোনা গল্প আমাকেই শোনাচ্ছ ! এর অর্থ কি জান ? মেয়ে মাত্রই হিংসুটে। অন্য মেয়ের গুণগান সহ্য করতে পারে না।

বিনিকা তাচ্ছিল্যে ঠোঁট বাঁকাল- ইস। বয়ে গেছে। তোমরা নিজেদের যতই বিদ্বান পণ্ডিত সুসভ্য মনে কর না কেন তা নিয়ে আমার একটু মাথাব্যথা নেই। তোমাদের আমরা মোটেই পছন্দ করি না ।

নীলাক্ষর কৌতুকভরা চোখের দৃষ্টি গভীর হল- সত্যি বিনিকা ! আমাকে তাহলে তোমার পছন্দ হয় না। সত্যিই কি এই তোমার মনের কথা ?

বিনিকা পাত্র দু'টি খুলে নীলাক্ষর খাবার বের করছিল। এক পলক নীলাক্ষর চোখে চোখ রেখে দৃষ্টি অবনত করল।

নীলাক্ষ ব্যাকুল আগ্রহে আবার প্রশ্ন করল- কই কিছু বলছ না যে, বিনিকা ?

এবার মুখ তুলল বিনিকা- আমার মনের কথা তো তোমার অজানা নয় নীলাক্ষ। সবাই জানে। এমনকি মা-বাবাও। তবু সেই মনের কথাটাকে আমি মাঝে মাঝে বড় ভয় পাই নীলাক্ষ ।

- কেন বিনিকা ?

বিনিকা মুখ ঘুরিয়ে খালের দিকে তাকাল। তরতর করে স্রোত বয়ে চলেছে খালের জলে। খালপাড়ের একটা মরা গাছের গুঁড়ির ওপর একটা মাছরাঙা পাখী শিকার ধরবার আশায় গভীর অভিনিবেশে তাকিয়ে আছে জলের দিকে। মাছরাঙার পালকের ধূপছায়া নীল রংটাই যেন আকাশের বুকে ছড়ান। তবু অত সুন্দর পাখীটা কি অসীম ধৈর্যে একটা রূপালী মাছ বধ করবার জন্য অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল বিনিকা। তারপর উন্মনা কণ্ঠে

বলল- তোমার রূপে আমি পাগোল নীলাক্ষ। তবু মনে হয় তুমি যেন আমাদের কেউ নও। অনেক দূরের অচেনা মানুষ । তাই ভয় পাই ।

নীলাক্ষ অসীম আবেগে দুই বাহু দিয়ে বিনিকার সুন্দর দেহটা আলিঙ্গনাবদ্ধ করল- বিনিকা ! তুমি কি সুন্দর নও ? এই সুন্দর দেশের মত তুমিও আশ্চর্য সুন্দর । আর আমি – আমি তো ইন্দ্র বরুণ অগ্নিকে ভুলেছি, আমি ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র ঘৃণাভরে ফেলে দিয়েছি। আমি তোমাদের মতই সর্প, বৃক্ষ, লিংগ আর পশুপতি গাভীর পূজা করি। গোমাংস ভক্ষণ পাপ মনে করি। আমি উন্মুক্ত তরবারী হাতে রাজ্যজয়ের নেশাগ্রস্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে ঘৃণা করি। আজ আমি আল বাঁধি, চাষ করি, তাঁত বুনি, জাহাজ নির্মাণ করি । তবুও কি আমায় বিশ্বাস হয় না বিনিকা ?

বিনিকা নীরব হয়ে রইল ।

নীলাক্ষ আঙুল তুলে নির্দেশ করল দূরে- তাকাও বিনিকা ! ওই যে দূরে দেখ নদীর বুকে নতুন চর জেগেছে। ওই চরে তোমরা বংগআলরা একদিন ফসল ফলাবে, নারকেল-সুপারীর বাগান বসাবে। আল দিয়ে নতুন পাড়া গড়বে..... ওই নতুন চরটাকে কি ভয় পাও ? ওটা কি একদিন তোমাদের আপন সীমানা হয়ে উঠবে না ?

বিনিকা উচ্ছ্বসিত আবেগে নীলাক্ষর বুকে মুখ ঢেকে দু'বাহু দিয়ে তার কণ্ঠ বেষ্টন করে বলল- নীলাক্ষ ! নীল ! বংগআলরা নদীর ভাঙা-গড়ায় বারবার নতুন আল গড়ে। কিন্তু তারা আজন্ম স্বাধীন। হাঙ্গর, কুমির, বাঘ, গয়াল, নদীর ভাঙ্গন তাদের রুখতে পারে না। কিন্তু সেই গৌরবর্ণ মানুষদের বংগআলরা ভালো চোখে দেখে না। শুনেছি তারা বারবার এসে হানা দিচ্ছে রাঢ়ে, গৌড়ে, পুণ্ড্রনগরে । কেবল নদীর এপারে সমতট বঙ্গে আর কামরূপ হরিকেলে আসতে তার সাহস পায় না ।

নীলাক্ষর মুখ ম্লান হল। ব্যথিত কণ্ঠে বলল- বিনি ! সে সব খরবতো আমিও জানি। কিন্তু আমিও যে আজ বংগআল । তবুও যদি আমায় তোমরা বন্ধু না মনে কর তা'হলে আমি ফিরে যাই আর্যাবর্তে।

নীলাক্ষর কণ্ঠ থেকে বাহু আলগা করে বিস্মিত অভিমানে নীলাক্ষর চোখে চোখ রাখল বিনিকা ।

নীল । আমি তো তোমায় অবিশ্বাস করি না। তুমি এসেছ আজ কতদিন হয়ে গেল। কতবার নদীতে জোয়ার এল, চর জাগল; কত পাড় ভাঙল, কত কুড়ি দিন কেটে গেল তবুও তুমি কেন বাবাকে বলনা তুমি আমাকে চাও ? আর সত্যি যদি চলে যাও নীলাক্ষ, তার আগে আমায় নদীতে কুমিরের মুখে ফেলে দিয়ে যেও ।

নীলাক্ষ হেসে ফেলল । বিনিকার কপালে স্নেহ চুম্বন দিয়ে বলল- তোমায় ফেলে নীলাক্ষ স্বর্গের কিন্নরী-অপ্সরীদের নন্দনে যেতেও রাজী নয় বিনিকা ।

বিনিকাও হাসল। বলল- নাও, এবার খেয়ে নাও দেখি। আবার তো ক্ষেতে যাবে। আজ নলিতা শাক, পুঁটি মাছ বেগুন আর ভাতের সঙ্গে তোমার জন্য আখের রসের মিষ্টি রান্না করে এনেছি।

নীলাক্ষ হাত ধুয়ে খেতে বসল। খেতে খেতে বলল- বর্বর আত্মম্ভরী আর্যরা কেবল এদেশের মেয়েদের চোখ আর চুলের সৌন্দর্যেই পাগোল। কিন্তু এদেশের মেয়েদের বুকে যে মধুর প্রস্রবণের মত মমতার ধারা বয়ে চলেছে তার মর্ম সেই আর্যরা যদি বুঝত।

বিনিকার মুখে হাসির আভাস ফুটল। একটু চুপ করে থেকে বলল- আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ীতে উৎসব শুনেছ নীলাক্ষ ?

নীলাক্ষ তৃপ্তির সঙ্গে আহার করছিল। মুখে গ্রাস তুলে প্রশ্ন করল কই শুনিনি তো, কি ব্যাপার ?

- ভাটি থেকে বাবার এক কেমন ভাই যেন বংগআলে এসেছে। নৌকায় সঙ্গে এনেছে বহু উপহার। সন্ধ্যায় তার সম্মানের জন্য উৎসবের আয়োজন করেছে। ভাটির লোকেরা আমাদের বংগআল গোত্রের হলেও তাদেরকে আমরা ভাটিয়াল বলি। ওরা যা চমৎকার গান গায় শুনলে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে নীল ।

বটে। তা'হলে তো শুনতেই হবে। তাছাড়া আজ চাঁদের পূর্ণ তিথি । চাঁদনী রাতে উৎসব নিশ্চয়ই খুব ভালো জমবে। অবশ্য যদি জঙ্গল থেকে বুনো হাতীরা নেমে এসে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে না দিয়ে যায় ।

বিনিকা বলল- সে ভাবনার কারণ নেই। শীত না পড়লে হাতীরা এদিকে চলাফেরা করে না। বাবা বলছিল এবার শীতে জঙ্গলে হাতী ধরতে যাবার সময় তোমাকে সঙ্গে নেবে। বগাইকে এ কাজ আর দেবে না। বাগইটা বাবাকে

মানতে চায় না ।

নীলাক্ষর খাওয়া শেষ হল। খালের পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে জল পান করে এল সে। বিনিকা শূন্য পাত্রগুলো গুছিয়ে তুলে, আঁচলের খুঁট থেকে পান বের করল। একটা পানের পাতার ওপর কিছুটা ঝিনুক চূর্ণ আর গোটা কাঁচা সুপারী জড়িয়ে বলল- নাও নীলাক্ষ পান-গুয়া খাও। আমি চলি এবার। মার সঙ্গে গাঙে নাইতে যাব ।

নীলাক্ষ পানটা হাতে নিয়ে আরেকবার বিনিকাকে সস্নেহ আকর্ষণে কাছে নিয়ে এল, বিনিকার কালো চুলে চিবুক স্পর্শ করে বলল – বিনিকা, দিনে কতবার তোমার সঙ্গে দেখা হয় তবু প্রত্যেকবার বিদায়ের সময়টা তুমি যেন আমার বুকে শর বিঁধিয়ে দিয়ে যাও। আর অদর্শনের যন্ত্রণায় শরবিদ্ধ হরিণের মত ছটফট করে মরি আমি ।

বিনিকা সাদা দাঁতের সুগঠিত সারিতে হাসির ঝলক দিল- এ যন্ত্রণায় আমিও যে কষ্ট পাচ্ছি নীলাক্ষ !

ওদিকে খালের ওপারে ক্ষেতে কার্যরত কিষাণদের মধ্যে ভয়ার্ত একটা শোরগোল উঠল । বিনিকা নীলাক্ষ দু'জনেই চকিত হয়ে সেদিকে তাকাল ।

ভয়ংকর ব্যাপার। জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা দাঁতাল বুনোশূকর নেমে পড়েছে ক্ষেতে। একজন যুবকের ঊরু দাঁত দিয়ে চিরে রক্তাক্ত করে মাটিতে ফেলে আরেকজনকে তাড়া করেছে।

নীলাক্ষ মুহূর্তে অন্য মানুষ হয়ে গেল। বিনিকাকে বলল- তুমি আমার ঘর থেকে বর্ম আর তীর-ধনুকটা নিয়ে এস।

ভীত-ত্রস্ত বিনিকা ছুটে গেল বাড়ীর দিকে। কিষাণদের সাহায্য করবার জন্য ত্রস্ত ক্ষীপ্রতায় সাঁকো পেরিয়ে এপারে চলে এল নীলাক্ষ। আর এপারে এসেই বুঝল মস্ত ভুল করেছে সে। সকলে নানারকম বিচিত্র চীৎকার করে তাড়া দিচ্ছে বুনো শূকরটাকে। শূকর তাড়ানোর দলের পুরোভাগে রয়েছে কাটা আলপাড়া বংগআলের বিখ্যাত শিকারী বগাই । কিন্তু জন্তুটাকে জঙ্গলের দিকে না তাড়িয়ে যেদিকে নীলাক্ষ দাঁড়িয়ে আছে সেইদিকেই তাড়িয়ে আনছে। মুহূর্তে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে ফেলল নীলাক্ষ। এক পলকে সে বগাইর চেহারা দেখে নিয়েছে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির হিংস্র সংকল্পে বগাইর কালো চেহারা ভয়ংকর হয়ে

উঠেছে। চোখের দৃষ্টি তার হাতের ধারাল কাটারীর মত তীক্ষ্ণ। নীলাক্ষও আর দেরী করল না। পাশের একটা গাছের শাখা প্রবল শক্তিতে ভেঙে নামাল সে। তারপর ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে। বাধা পেয়ে বরাহ আরও হিংস্র হয়ে উঠল। সম্মুখে নীলাক্ষকে লক্ষ্য করে তীব্র গতিতে ছুটে আসতে লাগল। ইতিমধ্যে হৈ হৈ করতে করতে পাড়ার দিক থেকে লোক ছুটে এল । বাঘন এল তাদের আগে আগে ।

বাঘনের হাত থেকে বর্শা নিয়ে এক মুহূর্ত দেরী করল না নীলাক্ষ । এককালে বর্শা নিক্ষেপে তার বিশেষ নাম-ডাক ছিল। এতদিন পরেও লক্ষভ্রষ্ট হল না নীলাক্ষ । তার হাতে নিক্ষিপ্ত বর্শা গিয়ে বন্য বরাহর বুকে আমূল বিধে গেল। বিকট চীৎকার করে শূকরটা মাটিতে পড়ে গেল । আনন্দে-উল্লাসে হৈ চৈ করে উঠল সকলে। সবাই এসে খুশীতে ঘিরে ধরল নীলাক্ষকে।

কয়েকজন আহত যুবকটিকে আর মরা বন্য শূকরটাকে ধরাধরি করে পাড়ার দিকে নিয়ে চলল ।

বাঘন এসে নীলাক্ষর কাঁধে হাত রাখল- নীলাক্ষ, তোমার উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস আর শিকারের লক্ষ্যভেদ দেখে সত্যি আমি গর্ববোধ করছি।

নীলাক্ষ উত্তর না দিয়ে অল্প হাসল। তার চোখ দু'টি তখন আরেক দিকে স্থিরনিবদ্ধ। বিপদ কেটে যাওয়ার আনন্দ এবং শিকারের খুশীর ভাগ নেয়নি একজন। সে বগাই। সাঁকোর বাঁশের খুঁটি ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদৃষ্টিতে দেখছে নীলাক্ষকে। চোখেমুখে তার আগের মতই প্রতিহিংসার অবরুদ্ধ আগুন ধকধক করছে। নীলাক্ষও তাকিয়ে রইল বগাইর দিকে। দু'জনেই মনে মনে উপলব্ধি করল এই ভয়ংকর দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে রয়েছে একটি নারী। দু'জন পুরুষের কাছেই যে সমভাবে কাম্য ।

আজ দুপুরে নীলাক্ষ আর বিনিকার ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রেম বিনিময় দৃশ্য বগাইর দৃষ্টি এড়ায়নি। তখন থেকেই তার মাথায় যেন আগুন জ্বলছিল । তাছাড়া এই দীর্ঘদিনে সে খেয়াল করেছে বাঘন সব বিষয়ে নীলাক্ষকেই বেশী প্রাধান্য দিচ্ছে। এত বড় পরাজয় মেনে নেবে বগাই ! কেন, সে কি বংগআল নয় ? মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে যারা জীবনকে ছিনিয়ে আনে। বংগআলের শিরাধমনীর দুর্দান্ত রক্তস্রোত নিম্নমুখী হতে জানে না। কেন মাথা নোয়াবে বগাই !

নীলাক্ষও ঠিক এই ধরনের ভাবনাই ভাবছিল। বংগআলরা সংগ্রামী অথচ সরল নিরাড়ম্বর মনের সহজ মানুষ। তাই বংগআলদের ভালবেসে এখানেই স্থায়ী হতে চলেছে সে। কিন্তু তবু সে আর্য ক্ষত্রিয়। তাদের তরবারীর উন্মুক্ত ফলা শত্রুরক্তে রঞ্জিত না হলে ক্ষত্রিয় সম্মান ধুলায় লুণ্ঠিত হয়। বগাইর প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান উপেক্ষা করে মাথা নত করে ক্ষত্রিয় রক্তে কালিমা লেপন করবে নাকি ক্ষত্রিয় নীলাক্ষ। প্রাণ থাকতে নয়। দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে দু'জনে দু'জনার প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান গ্রহণ করল ।

সন্ধ্যায় কিন্তু উৎসব চমৎকার জমে উঠল। কাটাআল পাড়ার বাড়ীতে বাড়ীতে আজ ধুমধামের অন্ত নেই। মেয়েরা সারাদিন চিড়ে কুটেছে, মুড়ি ভেজেছে। আখের রস জ্বাল দিয়ে তাতে ভাজা চালের গুঁড়ো মাখিয়ে মণ্ড প্রস্তুত করা হয়েছে। ঘন আখের রসে পাকা নারকেলের শাঁস ডুবিয়ে রসাল মিষ্টান্ন ও চালের মিহি গুঁড়ি দিয়ে রান্না করা হয়েছে নানা পিঠা পুলি। সরিষা ভাঙা তেলে সুস্বাদু মাছের ব্যঞ্জন, কচ্ছপের আর হরিণের মাংস রান্নার ক্ষুধা উদ্রেককারী সুগন্ধে সারা পাড়া মৌতাত ।

গোময় লেপা পাড়ার বিরাট বারোয়ারী উঠানে মেয়েরা চালগুঁড়ি গুলিয়ে এঁকেছে শঙ্খ, পদ্ম, নৌকা, ধানের ছড়ার আলপনা। উঠোনের চারিদিকে পোঁতা হয়েছে কলাগাছ। ঘরের চালের বাতা থেকে কলাগাছগুলোর সঙ্গে সুতো বেঁধে আমপাতা ঝুলিয়ে আর কলাগাছের গোড়ার কাছে চিত্রিত মাটির মোলংগায় (ঘটের) মুখে কচি ডাব সাজিয়ে বংগআলদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মত সুন্দর উৎসব অঙ্গন তৈরী হয়েছে। রান্নাবান্না, ঘরবাড়ী সাজানোতে সারাদিন হাসি মুখ নিয়ে খেটেছে বংগআল বধূরা ।

সন্ধ্যায় কর্ম অন্তে বংগআল রমণীরা স্নান সেরে নতুন কাপড় পরে প্রত্যেকে গৃহ-প্রাংগণে বৃক্ষ দেবতার মণ্ডপে যখন প্রদীপ জ্বেলে দিচ্ছে ঠিক তখন পশ্চিম গগনের রক্তিম গোধূলি আভা মুছে রূপালী চাঁদের জোয়ারে ভেসে গেল আকাশ পৃথিবী। সঙ্গে সঙ্গে বংগআলদের বাড়ী বাড়ীতে শঙ্খধ্বনি সমস্বরে বেজে উঠল। শঙ্খধ্বনি করে বংগআল রমণীরা আনন্দ, মঙ্গল আর অতিথিকে আহ্বান করে। দূর করে অপদেবতা আর অমঙ্গলকে। শঙ্খে ফুৎকার দিয়ে দু'হাত জোড় করে মেয়েরা মনে মনে প্রার্থনা করল- হে বংগআল বাস্তুর দেবী, তুমি আমাদের এই সোনার বংগআলকে বান-বন্যা, শত্রুর আক্রমণ, খরা রৌদ্রের অমঙ্গল থেকে, ভূতপ্রেতের দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রেখ। আমাদের

গোলায় যেন সোনার ধান না ফুরোয় । আমাদের ক্ষেত ফসলে ভরে থাকে। বাণিজ্যে সোনার বেসাত হোক। ধনে-জনে সোনার বংগআলকে চিরদিন এমনি সুখের পাড়া করে রেখ। আমাদের বাস্তুকে (বসতি) রক্ষা কর।

ঘরের ঝাপে খিল লাগিয়ে বের হচ্ছিল নীলাক্ষ। সহসা পেছন থেকে কার দুটি কোমল করপল্লব মৃদু আকর্ষণে চোখ চেপে ধরল তার। নীলাক্ষ জানে এই কোমল হাত কার। চোখের ওপর থেকে হাত দু'টি নিজের মুঠিতে বন্ধ করে হাসিমুখে ঘুরে দাঁড়াল নীলাক্ষ ।

-এইবার ! পেছন থেকে আক্রমণকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছি। এখন তুমি আমার বন্দিনী বিনিকা ।

বিনিকা কপট ভয়ে ভ্রূ উৎক্ষিপ্ত করল-ওমা ! এখন তাহলে তোমার দাসী হতে হবে বোধহয় ।

নীলাক্ষ বিনিকার অপরূপ সাজসজ্জা দেখছিল। কানে স্বর্ণকুন্তল। গলায় মুক্তো গাঁথা হাঁসুলি। কোমরে রূপোর মেখলা। বাহুতে তাম্র বলয় আর সাপের মত পেঁচান অনন্ত। অনন্তের সর্প মুখে ঝিকমিক করছে দুটি লাল মণি। পায়ে রূপোর বাউটি। মেঘবরণ ঘন কুন্তর সুদৃঢ় খোঁপায় আবদ্ধ করে তাতে পেরেছে একটি লাল শাপলা ফুল ।

বিনিকা তার সাজসজ্জায় আলোর ঝিলিক তুলে অপরূপ ভঙ্গীতে হাসল-কি দেখছ এমন করে ? দাসী বুঝি মনের মত হয়নি ?

নীলাক্ষ গভীর প্রেমালিঙ্গন বিনিকাকে বক্ষলগ্ন করে বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলল-এই অধম তোমার সারা-জীবনের দাস হয়ে থাকতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে প্রিয়ে।

নদীর ঢেউয়ের মত সারা দেহে ঢেউয়ের কাঁপন তুলে হেসে উঠল বিনিকা-বল কি, এই কালো কুৎসিত বংগআল মেয়ের সারা জীবনের দাস হয়ে থাকবে স্বর্ণপুরুষ নীলাক্ষ ! সত্যি তোমার কথার যাদু কামরূপ-কামাখ্যার যাদুকরীদেরও হার মানায়।

নীলাক্ষ আহত কণ্ঠে বলল-বিনিকা। তোমাদের কথায় বংগআল টান যেমন সুমধুর, স্বভাবে যেমন তোমরা সরল,, তেমনি ধনুকের ছিলার মত তোমাদের বাক্যবাণ ।

বিনিকা দু'হাতে নীলাক্ষর কণ্ঠ বেষ্টন করে তরল উচ্ছলতায় বলল-বাঃ। অমনি রাগ । নাও চল । ওদিকে আবার দেরী হয়ে যাচ্ছে। বাবা তোমায় খুঁজছে।

পায়ের অলঙ্কারের সিঞ্জন তুলে নীলাক্ষর পাশাপাশি নৃত্যছন্দে হেঁটে চলল বিনিকা। বনানীর মাথার উপরে পূর্ণচন্দ্র তখন আলোর ঝরণা ঢেলে দিচ্ছে। ঝিকমিক করছে নদী-নালা খাল-বিলের জল। আলো-ছায়া নিয়ে লুকোচুরি খেলছে নারকেল-সুপারীর চিরল পাতা ।

হাঁটতে হাঁটতে পূর্ণচন্দ্রের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বিনিকা বলল-চাঁদের বুকে ওই কালো ছায়া দেখেছ নীলাক্ষ ? জানো ওটা কি ?

নীলাক্ষর সোনালী চুল জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছিল। ঝিকমিক করছিল নীল চোখের তারা। সেই ঝিকিমিকি আলো ঠোঁটে ফুটিয়ে নীলাক্ষ বলল-জানব না কেন ! ও যে রাহুর হিংস্র দাঁতের দাগ। রাহু তো চাঁদকে গ্রাস করতে করতে অবশেষে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলে। তখন আর আমরা চাঁদের আলো পাই না। কিন্তু দেবতার ভয়ে প্রতিবারই পূর্ণ গ্রাসের পর আবার রাহু চাঁদকে উদ্গার করে দেয় ধীরে ধীরে। তাই তো বারবার চাঁদ ফিরে আসে আকাশের দেবতার কাছে ।

খিল খিল করে হেসে উঠল বিনিকা— তোমরা বুঝি তাই ভাব। কিন্তু আমরা কি বলি জান ? ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি চাঁদ মাটির ভাই, তাই সে আমাদের মামা। আর তার বুকের ওই কালো ছায়া হল চাঁদের মা বুড়ি। আমাদের দিদিমা বলতে পার। আমরা যখন তুলো রোদে দেই, দুষ্ট হাওয়া সে তুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়। চাঁদমামার কাছে গিয়ে পৌঁছলেই চাঁদের মা বুড়ি হাওয়ার কাছ থেকে সে তুলো কেড়ে নেয় । পরের ধন চুরি করে নিয়ে যাওয়া চাঁদমামার মা চাঁদের বুড়ি একেবারেই পছন্দ করেন না। সেই তুলো নিয়ে চাঁদের মা বুড়ি সারা রাত চরকা কেটে তুলো পেঁজে আকাশে উড়িয়ে দিয়ে বলে, যা মেঘ হয়ে বংগআলদের বৃষ্টি দিয়ে যায়। ওই যে আকাশে সাদা মেঘ দেখছ, ও তো আমাদেরই তুলো। চাঁদের মা বুড়ি মেঘ করে আকাশে ছেড়ে দিয়েছেন। এই মেঘই বৃষ্টি আনবে। বংগআলদের শস্যক্ষেতের ফসল দ্বিগুণ হবে। নদী-নালা ভরবে। এই ভরানদীতে পাল তুলে বংগআল-বেনেরা বাণিজ্যে বেরোবে। বকদ্বীপ, চন্দ্রদীপ, সাগর দ্বীপ, সোনাদ্বীপ থেকে মুক্তো আনবে।

নীলাক্ষ এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল বিনিকার গল্প। এবার বলল- তা'হলে

চাঁদের হাওয়া আসার সঙ্গে সাগরকে কেন টেনে আনে ?

বিনিকা বিস্ময়ে থেমে পড়ে গালে হাত দিল-ওমা ! তুমি তাও জান না। চাঁদ মামার আদেশেই তো সাগর নদীতে জোয়ার আনে। আর নদীর ধারে পলি ফেলে যায়। সমতটে আমাদের বংগআলের সীমানা বাড়তে থাকে। সেই নতুন পলিতে গজিয়ে ওঠা সবুজ ঘাস আমাদের গাই বলদরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। বংগআল কিষাণেরা লাঙলে ফলা বসিয়ে নতুন মাটিতে চাষ বাড়ায়। পাড়া বসায় ।

নীলাক্ষ হাতজোড় করল—ক্ষমা চাচ্ছি হৃদয়েশ্বরী। কল্পনার পাল্লায় তোমাদের সঙ্গে আমার হার অনিবার্য বিনিকার বাহুর বলয়ের সাপের মাথায় বসান মণি হাতের সঞ্চালন আলো বিচ্ছুরিত করল। সেই আলোর ঝলক ঝিকিয়ে উঠল বিনিকার সুখী চোখের কাল মণিতে-এই যে দেখ সাপের ছবি আমাদের হাতের অলংকারে। কোমরে বিষাক্ত বিছের আকৃতির রূপালী বিছে। পায়ের রুপোর বাউটিতে মাছের আঁশের নকশা ।

আর আমার এই শাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখেছ ? মেঘরঙ শাড়ীতে ঝরনার ধারার মত রূপালী সুতোর নক্সা। আমরা বলি ঝরনা শাড়ী। নীলাক্ষ ! বংগআলের কালো মানুষদের তোমরা যাই ভাব না, বংগআলরা জাতশিল্পী। এই চাঁদ, নদী, সবুজ মাঠ, নীল আকাশ আর এর নীচে যত প্রাণী সবই বংগআলদের মুগ্ধ করে ।

গল্প করতে করতে ওরা উৎসব স্থলে এসে পড়েছিল। নিকানো আল্পনা আঁকা সুসজ্জিত উঠোনের একাধারে হোগলা পাতার চিকন পাটি পেতে ভাটির অতিথিদের বসানো হয়েছে। নীলাক্ষ বিনিকা ভীড়ের একধারে বসে পড়ল। খেলাধুলা স্ফূর্তি উৎসব শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে হাতীর খেলা হল। তারপর কড়ি খেলা। বাঘ আর ভালুকের চামড়া পরে মুখে রং মেখে একদল বংগআল যুবক বাঘ-ভালুকের লড়াইর খেলা দেখাল। উৎফুল্ল জনতার আনন্দিত উল্লাস-ধ্বনিতে বাতাস উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। এরপর নাচ। চামড়া দিয়ে বংগআলরা এরকম বাদ্যযন্ত্র তৈরী করে । নীলাক্ষ জানে বংগআলরা একে বলে ঢোল। একজন বংগআল যুবক ঢোল কাঁধে উঠে দাঁড়িয়ে ঢোল বাজাতে শুরু করল। বাজনার সঙ্গে তাল রেখে কোমর ধরাধরি করে সারিবদ্ধ বংগআল মেয়েরা সুঠাম পায়েল বাউটির বাজনা বাজিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। বিভিন্ন ছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীমায়। নর্তকীদের কালো চুলের খোঁপায় গোঁজা লাল শাপলা

জ্যোৎস্নায় অপরূপ বেগুনী বর্ণ ধারণ করে তাদের কালো গালে আগুনের আভা ছড়িয়ে দিচ্ছিল যেন। উদ্দাম নাচ-গানের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া চলতে লাগল মাঝে মাঝে ।

নাচিয়ের দল বসে পড়ল এক সময়। এবার ভাটির বংগাল ভাটিয়ালরা এসে বসল আসরের মধ্যে। তাদের সঙ্গে নানা ধরনের বাদ্যসরঞ্জাম। বাঁশের বাঁশী, ঢোল, চামড়ার ডুগি, করতাল, দোতারা। ভাটিয়ালদের মধ্যে বর্ষীয়ান ব্যক্তিটি উঠে দাঁড়াল। চুল-দাড়ি দুলিয়ে কোমরে এক হাত রেখে গান ধরল ভাটিয়াল-

আরে হাতী বান্ধে

পাতা ফান্দে,

বান্ধেরে জাংগাল ।

গাংগের পারে হাংগর মারে

বাঘাইয়া বংগআল ।

চারিদিকে গোল হয়ে বসে থাকা যন্ত্রীদের হাতের বিচিত্র বাজনা দ্রুত তালে এক সঙ্গে বেজে উঠল। বাজনার সঙ্গে বৃদ্ধ ভাটিয়ালের গানের শেষটুকু সকলে সমস্বরে ধুয়া ধরল ।

আহা বেশ রে বংগাল ।

আহা বেশ বেশ ।

বৃদ্ধ এক হাত তুলল। বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান আর ধুয়া থামল। আবার অঙ্গভঙ্গী করে সুর ধরল।

আ....রে...পদ্মা মেঘনার

ভাটির লগে সাইগরেতে যাই

বাকলা আলের বংগ আমরা

গুন টানি হাল বাই ।

আবার বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গীদের ঐক্যসুর উঠল-।

আহা....গুন টানি হাল বাই

বৃদ্ধ ইংগিতে বাজনা থামিয়ে মূল সুর ধরল-

ক্ষ্যাতের ধানে

মন না টানে ।

বাইন্যা হইবার চাই ।

আরে সেই না বুইঝা

নাও ভাসাইয়া

উজান ও ভাইটাই।

আহা.....উজানো ভাইটাই ।

জাহাজ বানাই

ভাটিতে যাই

ক্ষ্যাতে বান্ধি আল ।

বাদা কাইটা বসত করি

মারি রে গয়াল ।

আহা.......গাংগের পারে

ঝলক পাড়ে

সোনার বংগাল

মুইরা বংগ ভাটিয়াল ।

সম্মিলিত বাজনা আরও উদ্দাম হয়ে উঠল। চাঁদনী ঝরা আকাশের নীচে নদীর মত ঢেউ ঢেউ কাঁপা সুর যেন আবেগের বন্যা বইয়ে দিল সকলের মনে। সবার সঙ্গে একাত্ম হয়ে নীলাক্ষ অজানিতে সেই বন্য ঢেউ তোলা সুরের সঙ্গে মনে মনে ধুয়া ধরল-

আহা বাঘাইয়া বংগাল । ।

আহা মুইরা ভাটিয়াল

আহা বেশ বেশ বেশ ।

মনে মনে গুন গুন করতে করতে আকাশের দিকে তাকাল নীলাক্ষ। সাদা সাদা ছেঁড়া তুলোর মত মেঘ ছাড়িয়ে চাঁদটা প্রায় মধ্য আকাশে এসে বুঝি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে সহোদরা পৃথিবীর সন্তানদের সুখী সোনার বংগালের পানে । সত্যি সোনার বংগআলই বটে। চারিদিকে দুর্ভেদ্য সীমানা দিয়ে ঘিরে রেখেছে নদী এই সুবর্ণ ভূমিকে। তার মাঝে আনন্দে প্রাচুর্যে স্বচ্ছলতায় সুখী বংগআলরা সমতটের স্বর্ণপ্রদীপ ।

সহসা নীলাক্ষর খেয়াল হল এই উৎসবের আনন্দের মধ্যে বগাইকে দেখা যাচ্ছে না কেন ! কোথায় সে ? কাকে প্রশ্ন করবে নীলাক্ষ ! বিনিকা উঠে গেছে খাবার বন্দোবস্ত করতে। নীলাক্ষ সকলের অলক্ষ্যে বাঘনের কাছে এসে দাঁড়াল। নীলাক্ষর দিকে প্রশ্ন-সূচক দৃষ্টিতে তাকাল বাঘন ।

নীলাক্ষ নীম্ন কণ্ঠে বলল-বগাইকে যে দেখছি না। সে কোন কাজে কোথায়ও গেছে ?

বগাইর প্রসঙ্গে বাঘনের কপালে রেখা পড়ল। চোখের দৃষ্টি চিন্তাকুল হল । নিচু স্বরে বাঘন বলল-এখানে নয়। একটু ওদিকে চল নীলাক্ষ । তোমার সঙ্গে একটু বুদ্ধি করা দরকার ।

বাঘনের সঙ্গে নীলাক্ষ প্রাংগন ছেড়ে বাঘনের ঘরের পিছনে আড়ালে এসে দাঁড়াল। বাঘন চিন্তিত ও মেঘাচ্ছন্ন মুখে বলল-নীলাক্ষ তুমি ভিনদেশী। তবু তোমাকে আমি যথেষ্ট বিশ্বাস করি। বগাইর ভাব-গতিক অনেকদিন থেকেই আমি লক্ষ্য করছি। ও যে কি ফন্দি করছে তাও বুঝতে আমার বাকী নেই। ওর মত একটাকে কাটারী দিয়ে দু'খান করে কেটে গাঙে ভাসিয়ে দিতে বাঘন কিছুমাত্র ভয় পায় না। বাঘনকে সরিয়ে বগাই হতে চায় কাটাআল পাড়ার প্রধান। আমিও বাঘন । শক্তি পরীক্ষায় আমাকে পরাজিত না করতে পারলে কারো পক্ষে প্রধান হওয়া সম্ভব নয়। দু'চারটে গয়াল মেরে বগাই নিজেকে মস্ত শক্তিশালী মনে করেছে। নদীর ওপারে বাইদ্যার দল নৌকা বেঁধেছে। আর ওদিকের বাগড়ীর কিছু লোক নিয়ে বাইদ্যাদের সঙ্গে দল করে ও আমার আল

দখল করবে ঠিক করেছে ।

নীলাক্ষ সত্যি চিন্তিত বোধ করল-তাতঃ (চাচা) বাঘন, আপনারও তো প্রস্তুতির দরকার ।

বাঘনের চেহারা ভয়াল হয়ে উঠল।

বংগআলের লোক হয়ে যদি বংগআলদের সঙ্গেই লড়তে চায় তাহলে আসুক। বাঘনের হাতের কব্জির জোর এখনও যথেষ্ট আছে।

ওদিক থেকে গান বাজনা ফুর্তির উল্লাসধ্বনি ভেসে আসছিল।

নীলাক্ষ একটু চুপ করে বলল-আপনাদের সমাজ ব্যবস্থার কিছুটা ত্রুটি অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ।

বাঘন ভুরু কুচকে বিরক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল-কি বলতে চাও নীলাক্ষ ?

নীলাক্ষ দমল না। বলল-যুদ্ধ বিদ্যাটা রীতিমত অনুশীলনের ব্যাপার । আপনারা বংগআলরা একাধারে সব রকম কাজ করে থাকেন যেমন-ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত খামার করা, শিকার করা, জাহাজ তেরী, নৌকা চালনা, আবার দরকারের সময় যুদ্ধ করাও। আমার কি মনে হয় জানেন ? এক এক ধরনের কাজ সমাজের এক এক শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত। কেউ কেউ তাঁত বুনবে, কেউ কৃষিকাজ করবে, কেউ ধাতুর কাজ করবে। যুদ্ধবিদ্যা অনুশীলন করে শিক্ষিত পটু যুদ্ধবিদ হবে কেউ। এতে করে যার যার নিজের কাজ সম্বন্ধে সে যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে উঠবে। আপনারা শক্তিশালী হয়ে উঠবেন।

বাঘনের গম্ভীর ভয়াল চেহারা কিছুটা কোমল হল। সস্নেহে বলল-নীলাক্ষ আজ থেকে তোমাকে আমি বংগাল সেনাদল সুগঠিত করবার ভার দিলাম। কি পারবে তো ?

নীলাক্ষ হেসে মাথা নোয়াল-আপনার আদেশ শিরোধার্য ।

গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে দু'জনে উৎসবস্থলে ফিরে এল।

ভোজনপর্ব শুরু হয়েছে। খাওয়ার সঙ্গে এল পচা ভাতের নেশাল পানীয় আর তাল গাছের রস ।

সারা রাত পান, ভোজন নাচ গানের পর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। ঘুম আসে না বাঘনের। ঘরের দাওয়ায় খুঁটিতে হেলান দিয়ে বৃদ্ধ বাঘন বংগআল কল্পনায় দেখতে পায় এক সুসংগঠিত শক্তিশালী বংগাল জাতিকে। সেখানে তাঁতীরা মহার্ঘ্য সুতী বস্ত্র বয়ন করে, কুম্ভর মোলাংগীরা মৃৎপাত্র গড়ে, ছুতোর কাঠের কারগরী নৌকা-জাহাজ তৈরী করে, কর্মকারার স্বর্ণ-রৌপ্য-শংখের কাজে ব্যস্ত। হালিয়ারা আলে চাষাবাদ করে। ঘরামীরা পাড়ার পত্তন বসায়। যোদ্ধারা যুদ্ধবিদ্যা শিখে স্থলপথ জলপথের রক্ষী হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে থাকে হস্তীবাহিনী আর নৌকাবাহিনী নিয়ে। বিশাল নদী পদ্মা, যমুনা পলি ঢেলে সুবিস্তৃত করে চলে বংগআলের সীমানা ।

ঘুম ছিল না নীলাক্ষরের চোখেও। বেড়ার ছিদ্র দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। সেই আঁকা বাঁকা আলোর টুকরাগুলো জোড়া দিয়ে নীলাক্ষ নীলাভ স্নিগ্ধ আলোর স্বপ্নে ভাসে। সে স্বপ্ন বিনিকা নামের সেই আশ্চর্য নারীকে ঘিরে ।

সহসা বাইরে থেকে কেমন শব্দ শুনে বিদ্যুৎ বেগে উঠে বসল নীলাক্ষ। বেড়ায় গোজা বর্শা আর তীরধনুক হাতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে ত্বরিতে।

বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় নীলাক্ষ দেখতে পেল বাঘন বংগালের হাতীগুলো আর গরু গাভীর দলকে কয়েকজন কৃষ্ণকায় লোক তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কারা এরা ? সহসা বিদ্যুৎ চমকের মত মনে হল বগাই আর তার দলবল নয় তো ? মুহূর্ত দেরী করল না নীলাক্ষ। ঘরের পেছন দিকে বাঘনের উঠানে এসে পড়ল। হাত-মুখ বাঁধা বিনিকাকে উঠানের একধারে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে একটি লোক। বাঘনের সঙ্গে রীতিমত মল্লযুদ্ধে রত একটি যুবক। যুবকটি আর কেউ নয় বগাই। বাঘনকে বেকায়দায় ফেলে তার বুকের ওপর চড়ে বসেছে বগাই। নীলাক্ষ ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার বর্শার ফলায় প্রথমে বিনিকাকে অপহরণকারীর বুক এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল । তারপর, বগাইর হাতের কাটারী প্রবল শক্তিতে ছিনিয়ে নিয়ে বগাইকে ধরাশায়ী করে ফেলল নীলাক্ষ।

নীলাক্ষর চেহারা হয়েছে ভয়ংকর। নীল চোখে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে যেন। বগাই বশ্যতা স্বীকার করে উঠে দাঁড়াবার আগেই নীলাক্ষর কাটারীর আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল তার দেহ। পাড়ার অনেকেই উঠে পড়েছে তখন । পশু নিয়ে যারা পালাচ্ছিল প্রাণ ভয়ে নদীর দিকে ছুটল তারা।

বাঘনের দলবল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অনুসরণ করল তাদের। কিন্তু শত্রুরা ডিঙি নৌকায় উঠে প্রবল ক্ষীপ্রতায় দাঁড় বেয়ে দূরে মিলিয়ে গেছে ততক্ষণে ।

রাত শেষ হল। কাটাআল পাড়ার লোকজন ভেঙে পড়ল বাঘনের উঠানে। এদিকে একদল লোক গিয়ে গরু আর হাতীগুলোকে জঙ্গলের দিক থেকে খুঁজে তাড়িয়ে নিয়ে এল ।

বিনিকার বাঁধন খুলে দিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করে কিছুটা সুস্থ করে তোলা হয়েছে। বাঘন স্তব্ধ হয়ে বসেছিল উঠানের একধারে। নীলাক্ষ এল। বলল-তাতঃ বাঘন, আপনি এত ভেঙে পড়েছেন কেন ?

বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে বাঘন বলল - এই আলের প্রধান থাকার যোগ্যতা আমার আর নেই। বগাইকে তুমি মারলে কেন ? হাতের শক্তিতে ও আমাকে সত্যিই পরাজিত করেছে। ওই হত প্রধান ।

নীলাক্ষ দমল না। সান্ত্বনার স্বরে বলল - পেছন থেকে চোরের মত আক্রমণ করাটা বীরত্বের পরিচয় নয়। বংগালরা কি তাকে বীরত্ব বলে ?

বাঘনের চোখে নতুন আলোর সঞ্চার হল। ধীরে ধীরে মুখ তুলে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে নীলাক্ষর দিকে। একটা হাত দিয়ে নীলাক্ষর কাঁধ স্পর্শ করে বলল-তোমাকে তো এতদিন থেকে দেখছি। শৌর্য-জ্ঞানে বুদ্ধিতে তোমার জুড়ি নেই। আজ থেকে এই কাটাআলপাড়ের নিরাপত্তা রক্ষার ভার তোমার ।

নীলাক্ষ হাসল – আমি তো বংগাল নই। সুদূর আর্যাবর্তের। আপনাদের শত্রু বংশের লোক। এত বিশ্বাস কেন করবেন আমাকে ? নীলাক্ষর হাত দুটি নিজের হাতে তুলে নিল বাঘন ।

–তুমি শত্রু নও নীলাক্ষ ! তুমি আমাদের বন্ধু ।

নীলাক্ষ বাঘনের হাত চুম্বন করে বলল - তাতঃ বাঘন, আমার একটি মাত্র প্রার্থনা আছে আপনার কাছে ।

বাঘন ব্যগ্র কণ্ঠে বলল – বল কি তোমার প্রার্থনা, কি চাও তুমি ?

নীলাক্ষ সুন্দর হাসল – আমার সেই মহামূল্যবান প্রার্থনা হচ্ছে বিনিকা । বাঘনের মুখে আলোছায়ার সংশয় সুস্পষ্ট হল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে। তারপর বলল নীলাক্ষ, আমি জানি আমার মেয়েও তোমাকেই চায়। কিন্তু তুমি

ওকে নিয়ে বংগআল ছেড়ে চলে যাবে না তো ?

নীলাক্ষর কণ্ঠে প্রত্যয়ের সুর সুস্পষ্ট হল – আপনি আমায় যখন বিশ্বাস করেন তখন বলছি আজ থেকে আমি আর্য নই। ক্ষত্রিয় নই। আমার দেশাচার নেই। আমি আপনাদের মতই বংগআল। এই মাটির সন্তান। আমার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এই নদীর ধারে এই পলির আলে এই নীল আকাশেল নীচে বংগআল পরিচয়ে বেঁচে থাকবে বংগআলদের মত সহজ হয়ে ।

বাঘন পরম বিজয়ের আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে বলল বিনিকা আজ থেকে তোমারই নীলাক্ষ ।

চতুর্থ অধ্যায়

এক

উত্তর ভারতের বিভিন্ন গোত্র বিভক্ত বৈদান্তিক আর্য সমাজে রাজন্য প্রথা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিরপ্রধান ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় আর্য সমাজব্যবস্থা যখন জটিল, তখন উত্তরাপথে বার বার বিদেশী ক্ষমতাশালী পশুদের কোলাহল ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠল। বারংবার অস্ত্রের ঝনঝনা, আর্তের চীৎকার, রক্তের নদী অতিক্রম করে গঠিত হল মৌর্য সাম্রাজ্য। মৌর্যের তরবারী রুদ্ধ করল বিদেশী শত্রুর আক্রমণ। আর বিকৃত বেদান্ত ব্রাহ্মণ্যের প্রতিবাদে এল সামাজিক ধর্মীয় বিপ্লব। এল জৈন আর বৌদ্ধ মতবাদ ।

মৌর্য সম্রাট অশোক কলিঙ্গের যুদ্ধে অসংখ্য মৃত্যুপথযাত্রীর হাহাকারে যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করলেন। জীবনের ভোগ-আসক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে আশ্রয় নিলেন গৌতমবুদ্ধের আলোকিত বেদীতলে । জৈন তীর্থংকরদের পিছে ফেলে গৌতমবুদ্ধের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে অশোকের ছত্রবাহী বৌদ্ধ মতবাদীরা মগধ গৌড়, পুণ্ড্র সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। অহিংসা আর ভেদহীন মানবধর্মের ঢেউ বয়ে গেল চারিদিকে। আর সমতট ! সেখানকার ইতিহাস কি? ইতিহাস নীরব। কোথায় সেই নদীর সন্তানরা ? বৈদিক যুগের প্রারম্ভ থেকে যারা আর্য - সভ্য পৃথিবীর কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে অভিহিত হয়ে আসছে। সেখানে বার বার গতি পরিবর্তন করে নদী। বার বার গড়ে ওঠে নতুন লোকালয়। ঝঞ্ঝা, বন্যা ভাঙনের সঙ্গে সংগ্রাম করে এক সংগ্রামী সম্পদশালী জনপদের অস্তিত্ব ভাস্বর হয়ে আছে। আপন ধর্ম কৃষ্টি জীবন-যাত্রায় তারা বিশিষ্ট, তারা ভারতীয় নয়, বংগআল। আবার কোলাহল উত্তরে। এবারে শাসনদণ্ড হাতে তুলে নিয়েছে গুপ্ত বংশ। দিগ্বিজয়ী হবার নেশায় সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত ছুটে এলেন সমতট পর্যন্ত ।

***

পুন্ড্রনগরের রাজপথ দিয়ে দুটি যুবক পাশাপাশি হাঁটছিল। একজনের গাত্র-বর্ণ কালো। কেশ কুঞ্চিত কিন্তু চক্ষু-তারকা নীল। দ্বিতীয় যুবকটি গাত্র-বর্ণ হরিদ্রাভ তামার রং। চক্ষু ক্ষুদ্র। নাসিকা চাপা। প্রথম যুবকটির তুলনায়

তার শরীরের দৈর্ঘ্য কম। দু'জনেই স্বাস্থ্যবান যুবা। দুপুরের রৌদ্রে তপ্ত ধূলি গুঁড়া হাওয়ায় দুজনেই অস্বস্তিবোধ করছিল। কিন্তু নগরীর সুরম্য অট্টালিকা, পথের দু'ধারে মনোলোভন পণ্যশোভিত বিপণী, বিভিন্ন দেশের বিচিত্র পথচারী দেখতে দেখতে অবাক বিস্ময়ে হেঁটে চলছিল দু'জন। রাস্তার মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে মহিষটানা গাড়ী চলেছে। ধুলা উড়িয়ে চলেছে ঘোড়ার টানা রথ ।

একটি সরাইখানার সামনে প্রথম যুবকটি দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল ওয়াইমতাং চল এখানে কিছু খেয়ে নেয়া যাক। বিশ্রাম করে পরে আবার বেরোব। এমন গরম ধুলোয় ভরা বাতাসের ঝাপটা খেয়ে আর হাঁটতে ইচ্ছে হচ্ছে না ।

দ্বিতীয় যুবকটির নাম ওয়াইমতাং বর্মণ। প্রথম যুবকের প্রস্তাব তার মনঃপূত হল। তবু হেসে বলল – নীলেন্দ্র, তুমি এ নগরীতে প্রথম এসেছ তাই এখানকার আবহাওয়া ভালো লাগছে না। আমি আরো কয়েকবার এসেছি। আমার খারাপ লাগে না ।

নীলেন্দ্র কিন্তু সত্যি ক্লান্তিবোধ করছিল। সে আর হাঁটতে প্রস্তুত নয়। তা'ছাড়া বেলা বেড়েছে। সেই কোন সকালে খাওয়া হয়েছে। ক্ষিধেও পেয়েছে প্রচণ্ড।

দু'জনে ঢুকে পড়ল সরাইখানায়। সরাইখানা খরিদ্দারে পরিপূর্ণ। সকলে খাওয়ায় ব্যস্ত। অধিকাংশ লোকই এখানকার বিদেশী বণিক। সরাইখানার পরিচারক এসে দু'জনকে দু'খানা আসন, দুটি মাটির ঘটি ও দুটি কলাপাতা দিয়ে গেল । স্বল্প পরেই ভাত, মাছের ঝোল আর মহিষের দুধের দধি নিয়ে এল। নীলেন্দ্র আর অপেক্ষা না করেই খেতে শুরু করল। অন্য কোনদিকে তাকিয়ে দেখবার যেন তার অবসর নেই। ওয়াইমতাং কিন্তু খেতে খেতে সরাইখানার একপ্রান্তে ভোজনরত কয়েকজন লোকের দিকে বার কয়েক লক্ষ্য করল। তারপর কণ্ঠস্বর নীম্ন করে নীলেন্দ্রকে বলল – ওই লোকগুলোকে লক্ষ্য করেছ ?

নীলেন্দ্র খেতে খেতে অবাক হয়ে ওয়াইমতাংয়ের দিকে তাকাল - কেন ? কে লোকগুলো ?

ওমাইমাতাং চাপা ঠোঁটে হাসল বংগাল ব্যবসা করতে এসেছ। হাতী বিক্রী করে ঘোড়া কিনবে অথচ খরিদ্দার চিনতে পার না। লোকগুলো হয় মগধী নয়তো অযোধ্যাবাসী বৈশ্য। প্রতি বছর এ সময় ওরা এখানে ঘোড়া বেচতে আসে। ওদের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা বলে আমরা ভালো দরে হাতী বেচে ভালো

জাতের ঘোড়া কিনতে পারব। তা নইলে হাটে দালালগুলো বড় পয়সা মারে। তাছাড়া বিক্রী করের (Sale Tex) বোঝা তো রয়েছেই ।

নীলেন্দ্র দ্রুত খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল। বলল – ওয়াইমাতাং তুমি না হয় ওদের সঙ্গে কথা বল আমি বাইরের দোকান থেকে দু'খিলি পান কিনে আনি ।

নীলেন্দ্র আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেল। দিনকয়েক হল নীলেন্দ্র পুন্ড্র নগরে এসেছে। বংআল রাজ্যের (ডবাক) অঞ্চলের অধিবাসী সে। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে কিছু মূল্যবান পণ্য আর তিনটে হাতী । এখান থেকে ভালো জাতের কয়েকটি ঘোড়া কিনবার ইচ্ছা তার। জলপথ দিয়ে আসেনি সে। হরিকেলের দুর্গম পার্বত্য পথে হেঁটে এসেছে। পথে ওয়াইমতাংয়ের সঙ্গে নীলেন্দ্রর বন্ধুত্ব হয়েছে। ওয়াইমতা ঘোড়া কিনতে এসেছে। অগুরু, চন্দন কাঠ, আর কাপাশী উত্তরীয় বিক্রীর বিনিময়ে ঘোড়া কিনবে সে। সমতটে ঘোড়ার প্রচলন নেই তেমন। তবে কামরূপে হরিকেল (আসাম সিলেট) পার্বত্যপথে আজকাল যানবাহন কার্যে ঘোড়ার ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিরাত যোদ্ধারা অশ্বারোহী হিসেবে যথেষ্ট নাম করেছে।

পান কিনে ফিরে এসে নীলেন্দ্র দেখল ওয়াইমতাং বিদেশী বণিকদের সঙ্গে আলাপ করছে। নীলেন্দ্র এসে ওদের পাশে বসল। ওয়াইমতাং আলাপ করিয়ে দিল এই যে আমার বন্ধু নীলেন্দ্র ভদ্র। বংআলের লোক, ওর হাতী দুটো কিনলে মোটেই ঠকবেন না। বিদেশী বণিকদের একজন নীলেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলল একটা হাতী তো আপনার বিক্রী হয়ে গেছে। কত নিস্কে (স্বর্ণমুদ্রা) বিক্রী হল ?

নীলেন্দ্র একটু ইতস্তত করল। কারণ ওয়াইমতাং তাকে এ বিষয়ে আগেই সাবধান করে দিয়েছিল। পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির (উত্তর বঙ্গ) প্রধান শহর পুণ্ড্রনগর যদিও ব্যবসা-বাণিজ্যের নগর বলে খ্যাতি লাভ করেছে কিন্তু এ নগরের গুপ্ত বংশীয় অমাত্য ও তার অধীনস্ত কর্মচারীরা কর আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত ধূর্ত। বিশেষ করে অনার্য দেশীয় ব্যবসায়ীদের ওপর করের বোঝা তুলনামূলক ভাবে অন্য বণিকদের চেয়ে অত্যন্ত বেশী ।

নীলেন্দ্রকে চুপ করে থাকতে দেখে ওয়াইমতাং কথাবার্তায় অগ্রণী হল — দেখুন মহাশয়, নীলেন্দ্রর হাতীটা আমরা ঠিক নিস্কের বিনিময়ে বিক্রী করি নি। কয়েকটি ঘোড়ার বদলে হাতীটা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ঘোড়াগুলি ছাড়া

কয়েক নিস্ক আমরা পেয়েছি বটে তবে বাকি হাতী দু'টির একটি অবশ্য সম্পূর্ণরূপে নিস্কের বিনিময়ে বিক্রী করব বলে আমরা ঠিক করেছি। তবে যদি আপনাদের ঘোড়াগুলি ভালো জাতের হয় তাহলে ।

বিদেশী বণিকেরাও দরাদরিতে কম পটু নয়। নীলেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে একদল বলল দেখুন, আমরা হাতী কিনতে চাই বটে। একটি হাতী আমরা কিনব। তবে তার বদলে একটি ঘোড়া ও দশ নিস্ক দিতে আমরা রাজী আছি ।

নীলেন্দ্র অবাক হয়ে গেল। বলে কি ! একটি হাতীর বদলে একটা ঘোড়া আর মাত্র দশ নিস্ক ।

নীলেন্দ্র প্রবল আপত্তিতে মাথা নাড়ল না না এ অসম্ভব। আমার বড় ভাই কালকভদ্র একজন বিখ্যাত বণিক। মাত্র কয়েকদিন আগেই সে রাঢ়ের তাম্রলিপিতে গিয়ে শ্রাবস্তীর এক বণিকের কাছে তিরিশ নিস্কে একটা হাতী বেচে এসেছে । ভাটিবংগের দু'বাকবাসীরা জাত বণিক। যবদ্বীপ মালয়ে আমাদের পণ্যের জাহাজ যায়। কিন্তু এমনি জলের দরতো শুনিনি কখনও। দরকার নেই আমার হাতী বেচে !

বাধা দিল ওয়াইমতা এমন গরম মাথা করে ফেলছ কেন। এ না হলে কি আর - বংগাল । একটু ধৈর্য ধর না ।

বিদেশী বণিকেরা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে ইশারায় কোন সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল। ওয়াইমতাং তাদের বলল শুনুন। আগে দরাদরি না করে আপনারা আমাদের হাতী দেখুন। আমরাও ঘোড়াগুলি দেখি তারপর না হয় দরাদরি করা যাবে। চলুন ওগুলো আমদের পান্থশালার গো-রক্ষকের কাছে রেখে এসেছি।

ওয়াইমতাংয়ের কথায় অপরপক্ষ সম্মত হল। তাদের একজন প্রস্তাব দিল আসুন আমাদের বাণিজ্য সম্বন্ধকে স্বাগত জানিয়ে সুরাপান করা যাক ।

সরাইখানার পরিচারককে ডেকে সুরা আনতে বলা হল ।

ইতিমধ্যে সরাইখানার দ্বারপ্রান্তে উপবীতধারী দু'জন ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়াল। সরাইখানার তত্ত্বাবধায়ক ত্বরিতগতিতে উঠে গিয়ে জোড় হস্তে বিনীত কণ্ঠে বলল – আসুন। আসুন আচার্য। আপনাদের পদধূলিতে আমাদের সরাইখানা ধন্য হোক । আপনাদের জন্য গঙ্গা জলে ধোয়া আসন আর পাথরের পাত্র রেখেছি। আসন গ্রহণ করে আদেশ করুন কি খাবেন।

সরাইখানার ভোজনরত ব্যক্তিরাও উঠে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণদের সম্মান করে সাষ্টাংগে প্রণতি জানাল ।

ব্রাহ্মণদ্বয় চারিদিকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিপাত করতে করতে অগ্রসর হল। সরাইখানার পরিচারকরা জোড় হাতে ব্রাহ্মণদের পিছে পিছে এগিয়ে চলল ।

সরাইখানার তত্ত্বাবধায়ক নিজে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ব্রাহ্মণদের বসবার আসন পেতে দিল ।

পরিচারক পাত্র ভরে ভাজা মেষ মাংস, মাংসের ঝোল, শাক-তরকারীর ঘণ্ট, দধি, মিষ্টান্ন, ফলমূল নিয়ে এল। খাদ্যের তালিকা দর্শনে ব্রাহ্মণরা খুশী হল।

একজন বলল দেখ হে, উপারিক মহারাজার অতিথি হয়ে আমরা এসেছি। তবু রাজকীয় খাদ্যের চেয়ে এই সরাইখানাটার খাওয়া দাওয়াই আমরা বেশী পছন্দ করি। শুনেছি মহারাজের রসুই ঘরে না কি শূদ্রাণী দাসীরা পরিচারিকার কাজ করে। কি কেলেংকারী বল তো। শেষে বিদেশে এসে শূদ্রের ছোঁয়া খেয়ে জাত হারাব না কি । তা তোমাদের এখানে শূদ্রদের ঢুকতে দেও না তো ?

তত্ত্বাবধায়ক ভক্তি করে বলল – ছি ছি। তা কি সম্ভব, ব্রাহ্মণের অসম্মান করে বলল শেষে নরক প্রাপ্ত হব না ?

ব্রাহ্মণরা খাওয়া শুরু করল। ওদিকে সুরাপানকারী বণিক দলের মধ্যে বসে নীলেন্দ্র এই ব্রাহ্মণদের দেখছিল। ব্রাহ্মণদের আচার সম্বন্ধে সে কিছু শুনেছে। ব্রাহ্মণ সমাজ শুধু ধর্মযাজক নয় বরং আভিজাত্যে ক্ষত্রিয়ের ঊর্ধ্বে। এ সম্বন্ধেও নীলেন্দ্রর কিছু শোনা আছে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে এগিয়ে তাকিয়ে ছিল নীলেন্দ্র । সহসা একজনের দৃষ্টি পড়ল নীলেন্দ্রর দিকে। খাওয়া বন্ধ করে তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ চোখে দেখল কিছুক্ষণ সে নীলেন্দ্রকে। তারপর পরিচারককে আদেশ করল ।- ‘ওই লোকটিকে ডাক তো।’ পরিচারক নীলেন্দ্রকে ডেকে আনল। ওয়াইমতাং এদিকে পেছন দিয়ে বসেছিল তাই ব্রাহ্মণরা তাকে দেখতে পায়নি। তাছাড়া সুরাপানে সে একটু নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল বলে নীলেন্দ্রর উঠে যাওয়া তার দৃষ্টিগোচর হল না। নীলেন্দ্র ব্রাহ্মণদের সামনে এসে কিছুটা দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে দু’হাত যুক্ত করে অভিবাদন করল। নত হয়ে ভূমি স্পর্শ করে সাষ্টাংগে প্রণতি না করায় ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল। বিরক্ত কণ্ঠে একজন বলল এ যে দেখছি বর্বর বাচাল। আচার ব্যবহার জ্ঞানহীন মূর্খ। অপরজন প্রশ্ন করল - কে হে তুমি ? কোথা হতে আসছ ? কি গোত্রের লোক?

ব্রাহ্মণদের কটুবাক্য নীলেন্দ্রর কান এড়ায়নি। উদ্ধত কণ্ঠেই সে উত্তর দিল – আমার নাম নীলেন্দ্র ভদ্র। সমতটের বংগআল বণিক আমি ।

চমকে উঠল ব্রাহ্মণরা। কি সর্বনাশ ! সমতটের বংগআল। খাওয়া থেকে হাত গুটিয়ে নিল তারা। রাগে তাদের মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠল। একজন উপবীত স্পর্শ করে চীৎকার করে ডেকে উঠল – তত্ত্বাবধায়ক ।

তত্ত্বাবধায়ক ছুটে এল – আজ্ঞা করুন আচার্য। রাগে উত্তেজনায় ব্রাহ্মণদের দৃষ্টি হতে যে অগ্নি বর্ষিত হল এ সবের অর্থ কি ! এই বংগআল ম্লেচ্ছকে এ সরাইখানায় ঢুকতে দিয়েছ কেন ? জাননা তোমরা সরাইখানায় ব্রাহ্মণদের পদধূলি পড়ে ! তোমাকে শূলে চড়ান উচিত।

তত্ত্বাবধায়ক আভূমি গড় হতে জোড়হাতে বলল ক্ষমা করুন আচার্য। রোষ বর্ষণ করবেন না, আমি বুঝি নি লোকটা শূদ্র ।

নীলেন্দ্র কঠিন অনড় কণ্ঠে বলল – আমি শূদ্র নই । বংগাল বণিক ।

ব্রাহ্মণদ্বয়ের রোষ প্রশমিত হল না। হাত ধুয়ে গংগাজল স্পর্শ করে মন্ত্র জপ করতে করতে বলল – বাচাল বংগআল। তুই তো মূর্খ ! জাতের মর্ম তুই জানিস না বুঝিস ? ব্রাহ্মণদের অভিশাপে ভস্ম হয়ে যাবি যে। জানিস বিশ্বমিত্র মুনির দৃষ্টির অগ্নিবাণে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র ভস্ম হয়ে গিয়েছিল পুড়ে। তারপর ভাগীরথ তপস্যা করে স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে নামিয়ে এসেছিল সগর রাজার পুত্রদের জীবিত করবার জন্য। জহ্নু-মুনির জানু থেকে গঙ্গা পূর্বে প্রবাহিত হয়ে সাগরে নেমেছে সমস্ত পাপ ধৌত করে। সেই ভগীরথী গঙ্গার ওপারেই তো অস্পৃশ্যদের বাস। ব্রাহ্মণরা সেই অপবিত্র ভূমির ম্লেচ্ছের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না ।

এই হট্টগোলের মধ্যে রাজকীয় সৈন্যদের বেশধারী দু'জন সৈনিক সরাইখানায় প্রবেশ করল। ব্রাহ্মণদের প্রণতি করে তাদের একজন প্রশ্ন করল কি ব্যাপার আচার্য। আপনারা এত উত্তেজিত কেন ?

ব্রাহ্মণরা রাগত কণ্ঠে বলল – দেখ তোমাদের এই সরাইখানায় আর জাতের বাছ বিচার নেই। এখন থেকে এখানে বংগাল ম্লেচ্ছরাও পাত পাড়তে শুরু করেছে। এমনি করেই পবিত্র ব্রাহ্মণ ধর্ম ধ্বংস হতে চলেছে। ওদিকে রাস্তায় বেরোলেই দেখ নেংটিপরা দিগম্বর আর চাদরমোড়া তীর্থঙ্কর (জৈন ধর্মাবলম্বী

সাধু) নির্বিঘ্নে পথে ঘাটে ঘুরে যাগ-যজ্ঞের নিন্দে করে বেড়াচ্ছে। ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ তো মনে হয় নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। বৌদ্ধরা শোভাযাত্রা বের করছে খেয়াল খুশীতে। কাণ্ড বটে !

সৈনিক দুজনের ঠোঁটের কোণে গোপনহাসির ঝিলিক দিল। তবু তাদের একজন তত্ত্বাবধায়কের দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলল ম্লেচ্ছ স্পর্শ করা জল আচার্যকে দিয়েছ ? সরাইখানার তত্ত্বাবধায়ক কাঁদো কাঁদো হয়ে জবাব দিল – আজ্ঞে না। আচার্যদের ওপর ওর ছায়া পর্যন্ত ফেলতে দেই নি। প্রথম সৈনিক কণ্ঠস্বর কোমল করে বলে – যাও এখনি গঙ্গাজলে সরাইখানা পবিত্র করে তোল। তারপর ব্রাহ্মণদের বলল – আচার্য ম্লেচ্ছদের ছায়া পর্যন্ত আপনাদের কাছে আসেনি। ক্রোধ সম্বরণ করে ক্ষমা করে দিন !

তত্ত্বাবধায়ক ব্রাহ্মণদের দুই পা জড়িয়ে কেঁদে ফেলল – ক্ষমা করে দিন আচার্য। এ ভুল আর হবে না। দয়া করে অভিশাপ দেবেন না। উপারিক মহারাজকে অভিযোগ করবেন না ।

তত্ত্বাবধায়কের কান্নায় ব্রাহ্মণ্যরোষ কিছুটা প্রশমিত হল। একজন বলল – যাও গঙ্গাজলে ধোয়া পাত্রে একটা গোটা মেষের ঠ্যাং ভাজা এক কলস ঘৃত আর এক কলসি দধি নিয়ে এস । ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর ।

তত্ত্বাবধায়ক ছুটে চলে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্রাহ্মণের দক্ষিণা এসে গেল। পরিচারকের মাথায় দক্ষিণার পাত্র দিয়ে সদম্ভে বেরিয়ে গেল ব্রাহ্মণ দুইজন ।

ব্রাহ্মণরা বেরিয়ে যেতেই অট্ট-হাসিতে ফেটে পড়ল সৈনিকদ্বয় । একজন হাসতে হাসতে বলল – ভারী তো মগধী ব্রাহ্মণ ! তার আবার তেজ কত। হত কনৌজ কৌশল অযোধ্যার ব্রাহ্মণ তাহলে বোঝা যেত ।

আরেকজন বলল - দান-দক্ষিণার লোভে ঘুরে মরে। লুকিয়ে শূদ্রানী পতিতাদের গৃহে রাত্রি যাপন করে । আবার এদিকে জাত গেল বলে চেঁচিয়ে অস্থির ।

সৈন্য দুইজনের খাবার আসন পাতা হয়ে গিয়েছিল। খাবার এসে পড়ল। কোমর বন্ধনী সংলগ্ন কোষমুক্ত তরবারী খুলে রেখে খেতে বসল তারা। খেতে খেতে গল্প করতে লাগল দু'জন। তাদের খাদ্য পরিবেশনায় ছুটোছুটিতে ব্যস্ত সরাইখানার তত্ত্বাবধায়ক এবং সৈনিক দু'জনও একটু আগে নীলেন্দ্রকে উপলক্ষ্য করে গোলমালের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেল যেন। একজন সৈনিক

বলল ব্রাহ্মণরা অতি মাত্রায় বেড়ে গেছে। বৈদিক ব্রাহ্মণরা ছিল ধর্মরক্ষক। আর এখনকার ব্রাহ্মণরা রাজ্যরক্ষণের ব্যাপারেও নাক গলাতে চেষ্টা করছে। সোনাদানা জাঁকজমকে তারা ক্ষত্রিয় রাজাদের সঙ্গে সমান পাল্লায় চলেছে। দ্বিতীয় সৈনিক বলল আর বেদান্ত শাস্ত্রের মন গড়া ব্যাখ্যা দিয়ে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। যাগ-যজ্ঞের ব্যাপারেও অদ্ভুত সব আচার এনে জোড়া দিচ্ছে। আগে কোন কোন যজ্ঞে নরবলি পর্যন্ত ব্রাহ্মণ বিধান দিত বলে শুনেছি।

আর ওদিকে দাসদাসী সোন-রূপা নিষ্কর ভূমি আদায় করে চলেছে রাজাদের স্তোক বাক্যে ভুলিয়ে ! এই জন্যই সারাদেশে লোকে আর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পছন্দ করছে না। জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এমনকি আমি নিজেও বৌদ্ধ মতবাদ অবলম্বী । গুপ্ত সম্রাটদের অধিকাংশ কর্মচারীই তো বৌদ্ধ ।

-থাক ওসব কথা। আসল কাজের কথা শুনেছ ?

- কি ব্যাপার ?

সম্রাট কুমার গুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। যজ্ঞের খরচ বাবদ ধন-সম্পদ পাঠাতে হবে এখান থেকে !

– কিন্তু কি করে সম্ভব। এই তো কিছুদিন আগে যুবরাজের অভিষেক হল । এই অভিষেকে যাবতীয় খরচ খরচাতো পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি রাঢ় গৌড়ভুক্তি থেকেই পাঠান হয়েছে। দাসদাসী গো-মহিষও কম পাঠান হয়নি। খাজনা তোলা যে কি কঠিন ব্যাপার ওপরে বসে ধান-ধানাকরা তা অনুমান করতে পারে না। দুত্তোর ভাল লাগে না আর ।

-আহা চটছ কেন। উপঢৌকন পাঠাতে না পারলে সম্রাটের অমত্যরা অগ্নিশর্মা হয়ে ভুক্তির শাসনকর্তাদের শূলে চড়াবে। রাঢ় পুণ্ড্র থেকে যা হোক কিছু পাঠাচ্ছি বলেই না রাজকীয় সম্মানটা এখনও আছে।

-তা হোক। এ বড় অমানুষিক ব্যাপার। এবার এদিকে ফসলের ফলন নেই। রাঢ় পৌড় পুণ্ড্র সব ভুক্তিতেই হাহাকার। এদের কাছ থেকে আর কত আদায় করব ।

- তা বটে এক কাজ করলে হয় না ? সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সমতট জয় করে করদ রাজ্য করে দিয়ে গেছে। কিন্তু ওখান থেকে তো কোনই কর আসছে না। শুনেছি ওদিকের লোকের অবস্থা খুবই ভালো। মহাসামন্তকে বুদ্ধি দেওয়া যাক

সমতটের দিকে আবার কিছু সৈন্য বাহিনী' পাঠান হোক ।

বৌদ্ধমতাবলম্বী দ্বিতীয় সৈনিকটির খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। প্রথম সৈনিকের দিকে তাকিয়ে সে হাসল হু যত আজগুবী প্রস্তাব। সমতটে সৈন্যবাহিনী পাঠান বললেই অমনি পাঠান যায় কি না। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত তো নামে মাত্র সমতট জয় করেছেন। সাপ, বাঘ, হাতীর আড্ডা জঙ্গল আর নদী-নালা জলায় ভরা দেশ। না ছোটান যায় ঘোড়া না রথ। তা সমুদ্রগুপ্ত তো ওখানকার প্রবল বর্ষায় টিকতে না পেরে হটে এলেন। তার সঙ্গের সৈন্যরা অধিকাংশ মরল উদরাময় আর জ্বরে। কিছু বংগআল সেনাদের সাথে যুদ্ধে অক্কা পেল। এরপরও কি সমতটের দিকে নজর দেওয়া যায় ?

প্রথম সৈনিক এবার সত্যি বিরক্ত হল – আঃ, বাজে বোক না তো। ক্ষত্রিয়রা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে একেবারে নিরামিষী হয়ে গেছে। তাই যুদ্ধের নামে আঁতকে উঠে। বংগআল থেকে কিছু সোনাদানা আর দাসদাসী পাঠাতে পারলে আমাদের নাম ফেটে পড়বে । ব্রাহ্মণরা যতই জাতের দোহাই দিয়ে চেঁচামেচি করুক না বংগআলের মেয়েদের দেখে লোভ সামলাতে পারবে এমন লোক কোথায় দেখাও দেখি আমায় ?

প্রথম সৈনিক আর কথা বাড়াল না। তাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। পরিচারক সৌখিন রৌপ্যের পাত্রে পান সুপারী নিয়ে এল ।

ঠিক এই সময়ে নীলেন্দ্রের দিকে নজর পড়ল সৈনিক দুজনের। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তাদের। একজন অত্যন্ত বিরক্ত কণ্ঠে বলল – আরে এ সেই ছোকরা না, দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা এতক্ষণ শুনছে। মতলবটা কি ওর ?

একজন ডাকল – ওহে বংগআল পুঙ্গব। এদিকে এস ।

নীলেন্দ্র কোন কথা বলল না। যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি স্থির অনড় হয়ে রইল। শুধু তার দুই চক্ষু থেকে আগুনের ফুলকির মত দৃষ্টি ঝরতে লাগল ।

সৈনিকদ্বয় কোমরবন্ধনীযুক্ত তরবারী হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে এল। কঠোর কণ্ঠে একজন প্রশ্ন করল,

কথা বলছ না কেন ? কে তুমি ? তুমি কি কোন গুপ্তচর ? জানো গুপ্তচরের কি কঠিন সাজা দেই আমরা ?

সরাইখানার সকলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। সকলের শঙ্কিত দৃষ্টি নীলেন্দ্রর দিকে। ওদিকে ওয়াইমতাং ও তার সঙ্গীদের নেশা ছুটে গিয়েছিল। ওয়াইমতাং ছুটে এসে নীলেন্দ্রর সামনে দাঁড়াল। বলল বিনীতভাবে বলল ভুল বুঝবেন না মহামান্য। এ এক বংগআল বণিক। এখানে ঘোড়া কিনতে এসেছে। কোনদিন শহরে আসেনি। তাই বুঝতে পারে না কার সঙ্গে কি ব্যবহার করতে হয়।

ওয়াইমতাংকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল নীলেন্দ্র। দুর্বিনীত ঔদ্ধত্যে তার চোখের তারা ঝকঝক করছে। ঠোঁটের কোণে বিদ্যুৎ চমকের মত বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটিয়ে সমতটের বংগাল আমি। তোমাদের সভ্য আচার ব্যবহার অর্থাৎ অন্যকে ঘৃণা করা আর তরবারীর জোরে দস্যু তস্করের মত পরের সম্পদ লুট করাকে বংগআলরা মানুষের ব্যবহার মনে করে না। আমিও করি না।

সরাইখানায় যেন বজ্রপাত হল। রাজকীয় সৈন্যদের গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল রাগে অপমানে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। বটে। এত বড় সাহস এই চণ্ডাল শূদ্রজাতীয় নীচু বর্ণের বংগআলের। তাও আবার গুপ্তদের করদ রাজ্যে যারা বাস করে।

সৈনিকেরা বোধ হয় অতি উত্তেজনায় ভাষা খুঁজে পেল না রোষ প্রকাশের। ভীড়ের মধ্য থেকে একজন টিপ্পনি কাটল – আরে খুব যে জাঁক দেখাচ্ছ ব্যাটা পান্তা- খাওয়া বংগআল। তা বাবা চোখ দু'টি ওমন পিংগল বর্ণের কেন ? কোন ক্ষত্রিয় সৈন্যের জারজ সন্তান না কি হে ?

নীলেন্দ্রর ভেতরটা উত্তপ্ত তৈলের মত টগবগ করছিল। বহু কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে রেখেছিল সে। কিন্তু এমন সরাসরি অপমানকর মন্তব্যে যেন আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণ হল। বন্য ঝাঁঝাল রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নীলেন্দ্র। নীলেন্দ্রর কবল থেকে সৈনিক দু'জন যখন লোকটিকে উদ্ধার করল, তখন তার শোচনীয় অবস্থা। সরাইখানার সম্মুখে পথচারীদের ভীড় জমে গেছে। নগররক্ষী কয়েকজন সেনা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হল । সৈন্যরা নগররক্ষীদের আদেশ করল এই উদ্ধত বর্বর বংগআলকে কারাগারে নিক্ষেপ কর। অংকুশের আঘাতে ওর পিঠের ছাল তুলে দাও। তারপর রথের চাকায় বেঁধে সারা নগরীর পথে ঘুরিয়ে ওকে থেলে দাও ।

নগররক্ষীরা নীলেন্দ্রকে বন্দী করল। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল ওয়াইমতাং

এতক্ষণ। ধীর পদে সে এসে দাঁড়াল নীলেন্দ্রর কাছে। তার কানের কাছে মুখ নীচু স্বরে বলল বন্ধু নীলেন্দ্র। এর প্রতিশোধ না নিয়ে আমি ছাড়ব না। কালই ফিরে যাবো। কিরাত বংগআলদেরকে এরা এখনও চেনেনি ।

রক্ষীরা নীলেন্দ্রকে বেঁধে নিয়ে গেল।

যাঁদের সঙ্গে ওয়াইমতাং আর নীলেন্দ্র বাণিজ্যচুক্তি করেছিল তাদের একজন বলে উঠল বলল বাপরে। কি সাংঘাতিক লোক। এদের কাছ থেকে আবার হাতী কিনতে চেয়েছিলাম ।

প্রথম সৈনিকটি ঘুরে দাঁড়াল। নগররক্ষীকে ডেকে আদেশ করল - ভালো কথা ওই বংগআল আর কিরাত বণিকের সব পণ্য বাজেয়াপ্ত করা হল। ওগুলো রাজ ভাণ্ডারে যাবে।

কিরাত ওয়াইমতাং বর্মণের চাপা মুখে তার মনোভাবের কোন প্রকাশ ঘটল না। শুধু তার চোখ দুটি জ্বলতে লাগল নিরুদ্ধ আক্রোশে ।

দুই

পুণ্ড্রনগরের ওপর দিয়ে অনেক দিন-মাস ঋতু অতিবাহিত হয়ে গেছে। বন্দী নীলেন্দ্র ভদ্র কারাগারের আবদ্ধ কুঠুরীতে বসে তার কোনই খবর জানেনি। বন্দীশালার শাস্তি চত্বরে অনেক দৈহিক নির্যাতন সহ্য করেছে সে। প্রথম দিকে শরীরের রক্ত টগবগ করে উঠত তার। কিন্তু ক্রমশঃ সে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। এবং তার চরিত্রে কোথায় যেন পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। অবশ্য এই পরিবর্তনের মূলে আছে আর একজন বন্দীর সাহচার্য। তিনি একজন নিগ্রন্থ তীর্থংকর (জৈন সাধু)। একজন রাজপুরুষের কবল থেকে একটি শূদ্র কুমারী কন্যাকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছেন।

কারাগারের কুঠুরীর মধ্যে দু'হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসেছিল নীলেন্দ্র। বন্দীশালার এই প্রকোষ্ঠটিকে মনে হয় যেন ভূগর্ভস্থিত। বাইরে এখন দিন না রাত তা এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে বসে অনুমান করা যায় না। হঠাৎ শব্দ করে বন্দীশালার কক্ষের দ্বারা খুলে গেল। দ্বাররক্ষী একটি পাত্রে কিছু ছাতু আর এক খণ্ড আখের গুড় রেখে গেল । বলে গেল – খেয়ে নাও বংগআল ।

মুখ তুলল না নীলেন্দ্র ।

তীর্থংকর এসে নীলেন্দ্রর মাথায় হাত রাখলেন – নীলেন্দ্র !

নীলেন্দ্র এবার মুখ তুলল – বলুন তীর্থংকর।

তীর্থংকর কোমল কণ্ঠে বললেন শরীরে কি খুব বেশী বেদনাবোধ করছ নীলেন্দ্র?

নীলেন্দ্র বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল — বংগআলরা এইটুকু কষ্টে ভেঙে যায় না। কিন্তু এ অপমান যে অসহ্য। আমি কি মানুষ নই ?

তীর্থংকর বসে পড়লেন নীলেন্দ্রর পাশে নীলেন্দ্র তোমার মাতামহী যে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ কন্যা এ কথা মনে করে তুমি এখনও গৌরবান্বিত হও ?

নীলেন্দ্রর পিঙ্গল চোখের তারা জ্বলে উঠল – না। কক্ষনও না ।

তীর্থংকর আবার হাসলেন - আর তোমার পিতার মাতামহীর পিতৃব্য যে গৌতমবুদ্ধের কাছে জ্ঞান লাভ করেছিল সে কথা তো তুমিই বলেছ।

নীলেন্দ্র মাথা নাড়ল – হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। আমার বাবার কাছে শুনেছি যে মহামানব গৌতমবুদ্ধ সমতটে দু'বাক অঞ্চলে সাতদিন ছিলেন। তিনিই বলেছিলেন সব মানুষ সমান । মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই ।

তীর্থংকর ম্লান কণ্ঠে বললেন আজ এই গুপ্ত অধিকৃত পুণ্ড্রবর্ধনে এত অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার রয়েছে। রাজ কর্মচারীরা অধিকাংশই বৌদ্ধ মতাবলম্বী। তবু এখানে জীবহত্যা কি হয় না ? মানুষের উপর উৎপীড়ন কি বন্ধ হয়েছে ? কোথায় তোমার গৌতমবুদ্ধের শিক্ষা ?

নীলেন্দ্র বলল তীর্থংকর। আবার বাবা তিলক ভদ্র গোঁড়া শৈব মতাবলম্বী। বহু অর্থ ব্যয় করে তিনি শিব-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন আমাদের গাঁয়ে। সমতটে এত জাঁকজমকপূর্ণ মন্দির আর কোথাও নেই কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন ?

–কি ?

তীর্থংকর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন নীলেন্দ্রর দিকে ।

নীলেন্দ্র একটু চুপ করে থেকে বলল আমার মনে হয় কোন কিছুতেই মানুষের মুক্তি নেই। যতদিন মানুষের ক্ষমতা আর সম্পদের নেশা না কাটবে ততদিন

কোন মতবাদই মুক্তি আনতে পারবে না ।

তীর্থংকর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন – নীলেন্দ্র ভদ্র তুমি যে দেখছি মহাজ্ঞানী । এই বয়সে এত ভাবতে শিখলে কি করে ?

নীলেন্দ্রও হাসল এবারে – তীর্থংকর, আমরা সমতটের বংগআল। যাদেরকে সমতটের পশ্চিম থেকে সুদূর উত্তর-পশ্চিম পর্যন্ত সব স্থানের লোকেরা অসভ্য বর্বর মনে করে। কিন্তু কি আশ্চর্য এই যে, সমতটের মোহ তো এদের কম নয়। সেই কতযুগ থেকে আর্য ক্ষত্রিয়রা সমতট বংগআলের নেশায় পাগল হয়েছে। বৈশ্যরা সমতটে ব্যবসা করতে ছুটেছে। আর তাদেরই সঙ্গে গেছে কিছু বৈদিক ব্রাহ্মণ । কিন্তু আমাদের জাতে তুলতে গিয়ে তারা নিজেরাই জাত হারিয়েছেন। তাদের বংশধরেরা যাগ-যজ্ঞ মন্ত্রপাঠ সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাদের পরিচয় বংগআল বলেই। যেমন ধরুন আমি ।

তীর্থংকর মন দিয়ে শুনছিলেন নীলেন্দ্রর কথা। স্থির দৃষ্টিতে নীলেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন – নীলেন্দ্র তুমি কালে মহাপুরুষ হবে।

নীলেন্দ্র এবারে তরল কণ্ঠে বলল-এই বন্দীশালায় যদি বংগআল নীলেন্দ্র ভদ্রের জীবনান্ত ঘটে তাহলেই বোধহয় আপনার অনুমান ঠিক হবে।

তীর্থংকরও নীলেন্দ্রর ঠাট্টায় কৌতুক বোধ করে হাসলেন। তারপর বললেন এসো খেয়ে নাও ।

ছাতু গুড় পানিতে গুলিয়ে দু'জন খেতে বসল ।

খেতে খেতে তীর্থংকর বললেন গুপ্ত রাজারা যদিও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংস্কার ও পুনরুত্থানের চেষ্টা করছেন, তবু ব্যক্তিগতভাবে তারা বৌদ্ধধর্ম, নিগ্রন্থ ও শৈব বিষ্ণু ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত উদার। কিন্তু পাটলী পুত্রের সোনার সিংহাসনে বসে স্বর্ণরৌপ্য নির্মিত রাজপ্রাসাদে বাস করে তারা দেশের প্রকৃত ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ খবর রাখেন না। তাই রাজপুরুষ উপারিক আর ব্রাহ্মণদের প্রতাপে আমরা সবাই স্বাধীনতা হারিয়েছি। শুনছি সম্রাট কুমারগুপ্ত নাকি সমুদ্রগুপ্তের মতই মহাধুমধামে অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন।

নীলেন্দ্র খেতে খেতে সহসা হাত গুটিয়ে নিল। বলল তাই তো শুনছিলাম । আর এই অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য ধনসম্পদ আনতে তারা সমতট কামরূপে সৈন্যবাহিনী পাঠাবে বলেও শুনেছিলাম।

তীর্থংকর বললেন সমুদ্রগুপ্তও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তারও আগে এই যাগযজ্ঞের অতি বাড়াবাড়ি আর অজস্র বালিদানের ফলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিকৃত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশেষে ক্ষত্রিয় আর বাহ্মণের ক্ষমতার লড়াই সাধারণ মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল ধর্মের ওপর। বাড়াবাড়ি সব সময়েই খারাপ।

নীলেন্দ্র সহসা কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। তার মনে হল যুগ যুগ ধরে বুঝি এমনি করেই অস্ত্রের শক্তি আর ধর্মের শক্তির প্রতিযোগিতা চলছে। আর শেষ পর্যন্ত ধর্মশক্তি অস্ত্র শক্তির কাছে মাথা নত করছে। কিন্তু কেন ? কোথায় এর শেষ ? কোথায় শান্তি ?

তীর্থংকর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল – কি হল নীলেন্দ্র ?

তীর্থংকর লক্ষ্য করছেন দুর্ধর্ষ বন্য বংগআল নীলেন্দ্র ভদ্র যেন দীর্ঘ কয়েক মাসের নির্যাতিত কারারুদ্ধ জীবনে অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। নীলেন্দ্রর মধ্যে যেন কিসের এক অনুসন্ধিৎসা ! কিসের অস্থিরতা ! কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণা !

তীর্থংকর আবার প্রশ্ন করলেন – কি ভাবছ নীলেন্দ্র ?

এবারে সম্বিত ফিরে পেল নীলেন্দ্র। কিন্তু তেমনি চিন্তামগ্ন কণ্ঠে বলল- আমরা বংগআলরা প্রকৃতির সন্তান। কিন্তু বিদেশী সম্পদলোভীরা আমাদের ঘৃণ্য জীব মনে করে। শুনেছি আমরা কৃষ্ণবর্ণ মানুষরা নাকি জন্মগতভাবে দাস ।

জিন (জয়ী), ঋষভ, পাশ্বব, মহাবীরের দিব্যজ্ঞান গৌতম বুদ্ধের ‘বোধি' যদি মানুষের মুক্তির পথ এনে থাকে তাহলে আজও কেন সবলের অত্যাচারে দুর্বলরা মার খায় ?

তীর্থংকর বিষণ্ণ হাসলেন বৎস নীলেন্দ্র ! প্রকৃত ‘জিন' আর ‘শ্রমন’ কোথায় বল তো ? নিগ্রন্থরা দিগম্বর শ্বেতাম্বরের দলাদলিতে সত্যভ্রষ্ট, বৌদ্ধরা হীনযান ‘মহাযানের’ বিভাগে কলহলিপ্ত। তা' না হলে তুমি কি ভাবতে পার প্রকৃত নিগ্রন্থ্ অহিংসার ধ্বজাবাহী হয়েও দাস ক্রয় করে, শরীরে জোঁক লাগিয়ে দাসের রক্তপান করায়। একেই তারা বলে জীবে দয়া। বৌদ্ধ সংঘারামগুলিতে ভিক্ষুরা বৈরাগ্যের নামে আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের প্রতি লোলুপ হয়ে উঠছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বেদের মনগড়া প্রচার দ্বারা মানুষের মধ্যে জাতিভেদের কঠোরতায় ভয়াবহ।

সত্য যুগে যুগেই ঠিকই আসে।মানুষই তাকে বিকৃত জটিল করে তোলে, ফলে মানুষের মুক্তি শান্তি কিছুই লাভ হয় না। বরং এই বিকৃত মতবাদ রাজ-রাজড়াদের হাতের অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। আর হয় সাধারণ মানুষকে নিপীড়ন করবার সহজ পন্থা ।

নীলেন্দ্র অন্যমনস্কভাবে খেয়ে উঠল। অন্ধকার কুঠুরীর এক ধারে খড়ের বিছানায় তীর্থংকর চক্ষু মুদ্রিত করে ধ্যানে বসলেন। তার পাশে খড়ের বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগল নীলেন্দ্র। শান্তি চাই, মুক্তি চাই। কিন্তু কেমন করে? কোথায় সে পথ ?

ক্রমশঃ তার অস্থিরতা শান্ত হয়ে এল। ঘুমিয়ে পড়ল নীলেন্দ্র। পুণ্ড্রনগরের বন্দীশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে সর্ব শরীরে নিষ্ঠুর অঙ্কুশের দাগ নিয়ে নীলেন্দ্র স্বপ্ন দেখল এক দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ। নীল নদী। সবুজ মাঠ। নদীর দু'পারে হাওয়ায় দোলে শুভ্র কাশফুল। নদীর চরে ঝাঁক বেঁধে নামে বুনোহাঁস, দীর্ঘ চঞ্চু সারস। ক্ষেতের ধানের শীর্ষে আর কার্পাশ ফুলের ওপর রঙিন প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়। সেখানকার সুখী মানুষেরা জাহাজে পাল তুলে বাণিজ্যে যায়। ফিরে আসে সোনার বেসাত নিয়ে। ক্ষেতের সোনার ফসল কেটে তোলে ঘরে। ঘুমিয়েই হাসে নীলেন্দ্র । সুখের আর শান্তির হাসি। মুক্তির ইশারায় ভাস্বর ।

তিন

পুণ্ড্রনগরের রাজকীয় আবাসে উপারিকের মন্ত্রণা কক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসেছে। উপাসদরা সকলেই চিন্তিত উদ্বিগ্ন। সমতটের ভুক্তির শাসনকর্তার চর এসেছে দুঃসংবাদ বহন করে। সমতটের দু'বাঁক (ডবাক–বর্তমান বিক্রমপুর) অঞ্চলের বং গোত্রের অধিপতি তিলক ভদ্র ও উত্তর পূর্বের কিরাত গোত্রভুক্ত তিব্বত-বর্মন বংশীয় লাং বর্মনের যৌথ বাহিনী বাণিজ্য গুপ্তের বাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। এই যৌথ বাহিনীর আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে গুপ্ত সেনাবাহিনী। বন্দী হয়েছে বহু সৈন্য। এখন উপায় ? উপায় অস্ত্র নয়। উপায় কৌশল। জানা গেছে তিলক ভদ্র বৌদ্ধ নয়। তবে ওখানে যথেষ্ট বৌদ্ধ অধিবাসী আছে। এখান থেকে কিছু বৌদ্ধ শ্রমন সন্ধির বাণী বহন করে নিয়ে যাক। অন্ততঃ তাঁদেরকে তিলক ভদ্র অপমান করতে পারবে না।

কিন্তু এ যুক্তিও মনঃপূত হল না। তার চাইতে কিছু ব্রাহ্মণ পাঠান যাক ।

তিলক ভদ্র নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণদের সম্মান করবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণকে রাজদূত হিসেবে পাঠান হবে।

কিন্তু বিপদ হল ব্রাহ্মণরা যে ওসব দিকে একেবারেই যেতে চায় না। না যাবার কারণও তো যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণ যারা ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের পরে সমতটবংগে গিয়েছিল তারা বংগ রমণীদের রূপে মুগ্ধ হয়ে নীচ কুলের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে জাতিচ্যুত হয়েছে। মন্ত্র তন্ত্র ভুলে বংগআলদের সঙ্গে মিশে গেছে ।

উপারিক ক্ষত্রিয় বংশের শাখাভুক্ত হলেও তার পিতামহ জৈন মতাবলম্বী ছিলেন। এবং তার কর্মচারীরা অধিকাংশই বৌদ্ধ। তারা ব্রাহ্মণদের সম্মান করেন একমাত্র গুপ্ত রাজাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্যই। কিন্তু এই পরম সঙ্কটকালে ব্রাহ্মণ শুচিতার কথা তারা ভাবলেন না ।

উপারিক আদেশ করলেন মহাসামন্ত, কিছু ব্রাহ্মণকে নিষ্কর-ভূমি ও দান-দক্ষিণায় প্রলুব্ধ করে দু'বাঁকে পাঠান। সেই সঙ্গে বন্দী নীলেন্দ্র ভদ্রকে মুক্ত করে রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। তারপর যা করতে হয় আমরা এখানে বসে করব।

নীলেন্দ্রর কারারুদ্ধ জীবন যেন এক নতুন আলো জ্বেলে দিয়েছে তার মানস নয়নে। দুর্ধর্ষ বংগআল নীলেন্দ্র ভগ্ন সর্বদা গভীর চিন্তামগ্ন। গত কয়েক মাস ধরে কারা প্রকোষ্ঠের গবাক্ষ দিয়ে ভয়াবহ রোমহর্ষক দৃশ্য দেখেছে সে। সে দৃশ্যগুলি অপরাধীর শাস্তির দৃশ্য ।

চুরির অপরাধে এক চণ্ডাল অপরাধীকে 'হথুজ্জোতিক' শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এ সব শাস্তির ব্যবস্থা নাকি মৌর্যযুগ থেকেই চলে আসছে। চণ্ডাল অপরাধী একজন রাজ পুরুষের একটি গাভী চুরি করেছিল। নীলেন্দ্রর প্রকোষ্ঠের পাশেই শাস্তি চত্বর। চারিদিকে উঁচু দেওয়ালে ঘেরা। কারাগারের শাস্তিদানকারী কর্মচারীরা এখানে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অপরাধীকে শাস্তি দেয়।

হথুজ্জোতিক শাস্তিপ্রাপ্ত চণ্ডালটির দু'হাত তৈল সিক্ত কাপড় জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। ভয়াবহ আর্ত চীৎকার করতে করতে দুগ্ধ চণ্ডাল সংজ্ঞাহারা হল । একজন রক্ষী তার অচেতন দগ্ধ দেহ লৌহ শলাকায় বিদ্ধ করে টেনে নিয়ে গেল। তার আর্ত চীৎকারে নীলেন্দ্র অস্থির হয়ে দু'কান চেপে মাটিতে বসে পড়েছিল। বাকরুদ্ধ তীর্থকরের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। তবু

তিনি নীলেন্দ্রকে সান্ত্বনা দিলেন – নিজেকে সম্বরণ কর নীলেন্দ্র। তুমি না বংগআল !

নীলেন্দ্রের চোখ দপ করে জ্বলে উঠল।

-বংগআলরা সাহসী । কিন্তু তারা নিষ্ঠুর নয়। পশু নয় ।

তীর্থংকর বেদনা তিক্ত হাসলেন—কত তো দেখলে। আরো দেখবে নীরেন্দ্র। 'বলিস্মংসিক' 'বিলঙ্গথালিক' 'রাহুমুখ' 'কহাপন' কত শুনবে। জীবন্ত মানুষের মাংস ছাড়িয়ে নেওয়া, মুখের চামড়া ছাড়িয়ে লবণের মধ্যে দেওয়া, শরীরের চামড়া খুলে ফেলে চামড়াহীন মাংসকে অস্ত্রের খোঁচায় থেতলে চামড়ায় ভরে পুঁটুলী বানান, কানের ভিতর লৌহ শলাকা ঢুকিয়ে দু'পা ধরে ঘুরান, মাথার খুলি কেটে জ্বলন্ত লোহার গোলা মাথায় ঢুকিয়ে..............

নীলেন্দ্র দু'হাতে কান চেপে চীৎকার করে উঠল থামুন ! তীর্থংকর। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। ওঃ ! শাস্তির নামে কি ভয়াবহ হিংস্রতা ।

তীর্থংকর চুপ করলেন !

নীলেন্দ্র নতমস্তকে গভীর চিন্তামগ্ন কণ্ঠে আপন মনে বলল- মানুষ চিরদিন স্বাধীন । তার সে জন্মগত অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না ।

তীর্থংকর হাসলেন – তাহলে তুমি বন্দী কেন নীলেন্দ্র ? নীলেন্দ্র চমকে উঠল। কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল- বন্দী আমার দেহ। আমার আত্মা স্বাধীন। স্বাধীন নীল আকাশের মত। সাগরের মত ।

তীর্থংকর গভীর শ্রদ্ধাভরে নীলেন্দ্রর বাহু স্পর্শ করলেন। অলোকিত দৃষ্টিতে নীলেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন – তুমি সত্যের সন্ধান পেয়েছ নীলেন্দ্র। এই সত্যই তোমাকে মুক্তির পথ এনে দেবে ।

এই সময় সহসা কারা প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলে দ্বাররক্ষী সসম্ভ্রমে একধারে সরে দাঁড়াল । প্রবেশ করলেন প্রধান কারা অধ্যক্ষ। সঙ্গে উপারিকের প্রতিনিধি ।

তীর্থংকর ও নীলেন্দ্রের বিস্মিত দৃষ্টি সামনে এসে দাঁড়িয়ে কারাধ্যক্ষ সম্ভ্রম ভরে জোড় করে অভিবাদন জানিয়ে বলল কুমার নীলেন্দ্র ভদ্র। বাইরে আপনার জন্য রথ অপেক্ষা করছে। ভুক্তি প্রধানের রাজ অতিথিশালায় আপনার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে । অনুগ্রহ করে গাত্রোত্থান করুন ।

বিস্ময়ে হতবাক নীলেন্দ্র কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর বলল বর্বর বংগআলদের জন্য সহসা এমন রাজকীয় অভ্যর্থনা কেন ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না ।

উপারিকের প্রতিনিধি এগিয়ে এসে বলল - অপরাধ নেবেন না নীলেন্দ্র ভদ্র। আমরা শুনেছি আপনি বৈদিক ব্রাহ্মণের বংশভুক্ত রাজপরিবারের লোক।

নীলেন্দ্র হেসে ফেলল মহাশয়। আপনি ভুল করছেন। আমি বংগআল । আমার বাবা তিলক ভদ্র শৈব। আমরা কোন রাজপরিবার নই। বংগআলের বণিক আমি ।

রাজপ্রতিনিধি গোঁফের আড়ালে ধূর্ত হেসে তোষামোদ তরল কণ্ঠে বলল নীলেন্দ্র ভদ্র । আপনি বোধহয় জানেন না যে আপনার পিতা বিক্রমপুর ভুক্তির প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন।

নীলেন্দ্র চমকে উঠল। সরল বিস্ময়ে প্রশ্ন করল – বিক্রমপুর ভুক্তি ! কি বলছেন আপনি ?

রাজপ্রতিনিধি বিনীত কণ্ঠে জবাব দিল হ্যাঁ। কুমারগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করে সেই নামে সমতটবংগের দুবাকের নামকরণ করেছেন বিক্রমপুর।

নীলেন্দ্র দৃপ্ত কণ্ঠে বলল – না কক্ষণও নয়। এ আমি বিশ্বাস করি না । নীলেন্দ্রর একগুঁয়েমীতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রতিনিধি কথা খুঁজে পেল না। তবু শেষ চেষ্টা করে বলল আপনি বাইরে চলুন। আপনার জন্য রথ অপেক্ষা করছে। গেলেই আপনি সব জানতে পারবেন ।

ঘটনার আকস্মিকতায় নীলেন্দ্রর বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সব কিছুই দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল তার। কারণ এইসব রাজ কর্মচারীদের সে মনে মনে মোটেই বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি বলে ভাবতে পারছিল না। তার মতে এরা ভণ্ড, কপট, পরস্ব অপহারী দুবৃত্ত বিশেষ। নীলেন্দ্র ভদ্রের বংগআল রক্তস্রোত উত্তপ্ত হয়ে উঠল। প্রচণ্ড ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটল তার কণ্ঠে – ভণিতা রেখে বলুন কি আপনাদের উদ্দেশ্য ?

রাজপুরুষের মুখাবয়ব কঠিন হল। তথাপি সংযত কণ্ঠে বলল উদ্দেশ্য শুভ। আর দেরী করবার সময় নেই ।

নীলেন্দ্রর উত্তেজনা কমল না-না আমি যাব না। আপনারা হীন কোন চক্রান্তের বশবর্তী হয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন ।

কারাধ্যক্ষ এতক্ষণে কথা বলল বংগআল নীলেন্দ্র ভদ্র জানেন তো এটা গুপ্ত রাজাদের রাজ্যভুক্ত এলাকা। আর গুপ্তরা নিগ্রন্থ অথবা বৌদ্ধ নয়। রাজদ্রোহীতার শাস্তি দিতে তারা জানেন ! কিন্তু আপনার ঔদ্ধত্য তারা ক্ষমা করেছেন ।

নীলেন্দ্র তীব্র বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসল-রাজদ্রোহী। বংগআলরা কারো অধীন নয়। শাস্তির ভয় দেখাবেন ? এই দীর্ঘ কারাবাসে আপনাদের শাস্তি দানের সব অমানুষিক প্রক্রিয়া আমি দেখেছি । তাতে বিচারের মূল্য যতটুকুই থাক অন্ততঃ মনুষ্যত্ব নই ।

তীর্থংকর এগিয়ে এলেন। নীলেন্দ্রর পিঠে হাত রেখে বললেন— নীলেন্দ্র তুমি না সত্যের অনুসন্ধানকারী। তবে কেন দ্বিধান্বিত হও। নির্ভীক বীরের মত এগিয়ে যাও । মনে রেখ, সত্য সূর্যের মত। কূটচক্র, মিথ্যা অন্যায়ের কালো মেঘ তাকে ঢেকে ফেলতে পারে না ।

মুহূর্তে নীলেন্দ্র যেন অন্য মানুষে রূপান্তরিত হল। তার মুখের রেখা কোমল হয়ে এল। চোখের দৃষ্টিতে স্নিগ্ধ আভা ঝিকমিক্ করে উঠল। হাসল সে – আপনার কথাই সত্য। আমি নিজেকে এখনও চিনিনি তীর্থংকর।

রাজ প্রতিনিধির দিকে তাকিয়ে নীলেন্দ্র স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল-চলুন।

নীলেন্দ্র কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল পিছন ফিরে। এক পলক, তীর্থংকর চোখে চোখ রাখল । জ্যোতির্ময় হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে তীর্থংকর ধীরে মাথা নাড়লেন। নীলেন্দ্র দৃষ্টি দিয়ে সে হাসি স্পর্শ করলে যেন। তারপর অস্ফুটে বলল-বিদায় ।

চার

রাজ উপারিকের অতিথিশালায় বিলাসবহুল এক কক্ষের জানালায় উন্মনা দৃষ্টিতে দাঁড়িয়েছিল নীলেন্দ্র। জানালায় শুক্লপক্ষের পূর্ণচন্দ্র আকাশে ভেসে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ড্রনগরের বৌদ্ধবিহারের স্তূপগুলিতে মালার মত অর্ঘ্যদীপ জ্বলে উঠেছে। কয়েকটি ভবনে আলোকসজ্জাও করা হয়েছে। জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছিল নীলেন্দ্র । সহসা রাস্তায় সোরগোল শুনে সচকিত হল সে। তাকিয়ে

দেখল রাজপথ দিয়ে মিছিল চলেছে। রথের ওপর দীপালোকবেষ্টিত বুদ্ধের মূর্তি বসিয়ে শোভাযাত্রা চলেছে। রথের অগ্রপশ্চাতে রয়েছে গৈরিক বেশধারী ভিক্ষুরা। অসংখ্য নরনারীর ভীড়। বুদ্ধের নাম গান করতে করতে শোযাত্রা এগিয়ে চলেছে ।

তাকিয়ে দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল নীলেন্দ্র । হঠাৎ শোভাযাত্রা থেমে পড়ল। হৈ হৈ রৈ রৈ বিশৃংখলার মধ্যে লোকজনের ছুটোছুটি এবং আর্ত চীৎকার উঠল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অশ্বারোহী নগররক্ষী সেনারা জনতার বিশৃংখলার মধ্যে এসে পড়ল। রথ থেমে গিয়েছিল। ভীড়ের ঠেলাঠেলিতে রথ কাত হয়ে পড়ে বুদ্ধমূর্তির চতুর্দিকের সাজান প্রদীপগুলো নির্বাপিত প্রায়। অতিথিশালার পরিচারক জানালার সামনে বারান্দার স্তম্ভের ওপর থেকে ঝুঁকে নীচে তাকিয়ে দেখছিল। নীলেন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল – কি ব্যাপার, হঠাৎ এমন গোলমাল শুরু হল কেন ? দু'জন অতিথি বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। নীলেন্দ্র শুনল তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে।

কি আর হবে । হীনযান মহাযান রেষারেষির ব্যাপার হয়তো।

পরিচারক বিনীত কণ্ঠে বলল আজ্ঞে না মহাশয়। আপনারা শ্রাবস্তী থেকে এসেছেন তাই বোধহয় জানেন না এখানে হীনযান মহাযানের মধ্যে বিরোধ নেই ।

অতিথিদ্বয় দাঁড়াল না। চলে গেল নিজেদের কক্ষের দিকে ।

ইতিমধ্যে আর একজন পরিচারক উঠে এল বারান্দায়। সে ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ দিল। শোভাযাত্রা দেখতে গিয়ে এক চণ্ডাল বুদ্ধমূর্তি স্পর্শ করে ফেলেছে। তাই যত গণ্ডগোল। লোকে উত্তেজিত হয়ে তাকে বাধা দেবার সময় রথের চাকায় চাপা পড়েছে সে।

নীলেন্দ্র পরিচারককে ডেকে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল- চণ্ডাল বদ্ধের মূর্তি স্পর্শ করায় কি অপরাধ হয়েছে?

পরিচারক অবাক হয়ে নীলেন্দ্র ভদ্রকে দেখল কিছুক্ষণ তার পর বলল— আপনি জানেন না যে শূদ্র চণ্ডাল জাতীয়রা পশু বধ করে মাংস খায়, পেঁয়াজ রসুন খায় ? ভগবান বুদ্ধের বাণীতে তো তা নিষিদ্ধ ।

নীলেন্দ্রর পাশে আর একজন অতিথি এসে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল বুদ্ধের পবিত্র

বাণীর বিকৃত রূপ হয়তো তাই। যাক, আমি শুনলাম শোভাযাত্রা দেখবার সময় লোকের ভীড়ের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে চণ্ডালটি চাপা পড়েছে।

অতিথির দিকে তাকিয়ে পরিচারক দু'জন সসম্ভ্রমে সরে গেল। অতিথি নীলেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলল-আসলে কি জানেন, চিরদিন আলোর নীচে থাকে অন্ধকার। মহাপুরুষরা সব সময় আলোর পথ দেখায় কিন্তু সেই আলোর নীচের অন্ধকারেই অন্যায় ঘৃণা বিভেদ কুসংস্কার লুকিয়ে থাকে ।

নীলেন্দ্র নির্নিমেষে বক্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। নীলেন্দ্রর এই দৃষ্টিতেই বক্তা বোধ হয় সচেতন হল। হেসে বলল- আপনি কোথা থেকে আসছেন ভাই ? কি নাম আপনার ?

নীলেন্দ্র উত্তর দিল - আমার নাম নীলেন্দ্র ভদ্র। সমতট বঙ্গের দু'বাকের অধিবাসী আমি।

অতিথি নির্বাক হয়ে নীলেন্দ্রর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল- আসুন আমার ঘরে আপনার সঙ্গে আলাপ করি।

নীলেন্দ্রর হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে এল অতিথি। নীলেন্দ্রর কক্ষের কাছাকাছি ঘরটি, অত্যন্ত আড়ম্বর ও জাঁকজমকে সজ্জিত। উপবেশন করে নীলেন্দ্র প্রশ্ন করল - আপনার পরিচয় তো পেলাম না ।

— আগন্তুক অতিথি হাসল– আমার নাম অনঙ্গভট্ট। উজ্জয়িনীর ব্রাহ্মণ আমি নীলেন্দ্রর কণ্ঠে বিতৃষ্ণা ঝরে পড়ল—

— আপনি ব্রাহ্মণ ।

অনঙ্গভট্ট নীলেন্দ্রর কণ্ঠস্বরে চমকিত হল - কেন ভদ্র ? ব্রাহ্মণ শুনে আপনি বীতশ্রদ্ধ হলেন কেন ?

নীলেন্দ্র অনেকক্ষণ জবাব দিল না। অনঙ্গভট্টও বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নীলেন্দ্রর দিকে।

এক সময় নীলেন্দ্র দৃষ্টি উন্নত করল- মহাশয়, আমি সমতটের বংগআল। আমার বাবা সমৃদ্ধশালী লোক। কিন্তু এই পুণ্ড্রনগরে আসার আগে আমি জানতাম না আপনারা আমাদের এত বেশী ঘৃণা করেন। এখানে এসে আমি দীর্ঘকাল কারাবাস করেছি। আজকে অবশ্য জানিনা কি অজ্ঞাত করণে রাজ-

অতিথি হয়েছি। তবে বোধহয় এ নগরীতে না এলে আমি সেই নদীর পারের নীল আকাশের নীচের সবুজ শস্য-ভরা মাঠের মানুষ স্বাধীন সরল অনভিজ্ঞ বংগআলই থেকে যেতাম। এখানে এসে আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে। মানুষে মানুষে এত ভেদাভেদ, এত ঘৃণা, দুর্বলের উপর সবলের অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে কিছুই জানবার সুযোগ পেতাম না । এ পৃথিবী কত বড় তা আমি জানি না। তবু আমার মনে হয় পৃথিবীতে বুঝি দু'জাতির মানুষেরই বাস—সাদা আর কালো। আপনাদের ভাষায় দেবতা আর দাস। ব্রাহ্মণ সমাজ সেই মতধারী দাম্ভিক মানুষের দ্বারা গঠিত ।

অনঙ্গভট্ট বিস্ময়াবিষ্ট মুগ্ধতায় এতক্ষণ নীলেন্দ্র ভদ্রর কথা শুনছিল, নীলেন্দ্রর কথা শেষ হলে বলল-নীলেন্দ্র ভদ্র আপনি মহাবিদ্বান ব্যক্তি, মনে হয় আপনি বহু শাস্ত্র পাঠ করেছেন ।

নীলেন্দ্র সলজ্জ হাসল-আমি লেখাপড়া বিশেষ জানি না। অনঙ্গভট্ট আরো অবাক হল – বলেন কি ?

- হ্যাঁ, মিথ্যা বলিনি। তবে তীর্থংকরের কাছে শুনেছি উজ্জয়িনীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ চর্চা হয়। এসব শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যদি প্রকৃত সত্য লাভ করা যায় তাহলে শাস্ত্র অধ্যয়নে আমার যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে।

অনঙ্গভট্ট ম্লান হল। বিষণ্ন বলল-নীলেন্দ্র ভদ্র ! আমিও একজন শাস্ত্রকার । 'বেদের' নবতর সংস্কারণ কার্যে লিপ্ত আছি। গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিশেষ ভাতা দিয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শাস্ত্রকারদের নিযুক্ত করেছিলেন বেদের বিকৃত প্রচার বন্ধ করে প্রকৃত মতবাদকে পুনর্লিখনের জন্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজের যে গতি দেখছি, জানি না কতটা সফল হব। যাক, আপনি যদি উজ্জয়িনীতে যেতে চান আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু প্রকৃত সন্ধান সেখানকার জ্ঞানী-গুণী সমাজ থেকে আপনি কতটুকু পাবেন জানি না। সেখানকার রাজপক্ষপুটের ছায়াতলে জ্ঞানী-গুণীরা যে জ্ঞানের চর্চা করেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। 'ধার' নিবাসী মহাকবি কালিদাসের নাম শুনেছেন ?

নীলেন্দ্র নাথা নাড়ল-না, শুনিনি। কে তিনি ?

অনঙ্গভট্ট বলল-কালিদাস তো এযুগের একজন বিখ্যাত কবি। অনেকে বলেন তিনি গৌড়ের অধিবাসী। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত গৌড় বিজয়কালে কালিদাসকে যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে পাটলীপুত্রে নিয়ে এসেছিলেন। পরে সরস্বতীর কূলে নিবাসী

এক ব্রাহ্মণ তাঁকে সম্রাটের কাছ থেকে অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় দাসরূপে যৌতুক লাভ করেন। আজ তিনি গুপ্তদের সভা অলংকৃত করেছেন। তাঁর কথা বলছি এই কারণে যে যখন পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সমতট গুপ্তদের করদরাজ্য হয়ে পরাধীন ঘৃণ জীবন-যাপন করছে তখন তিনি 'মেঘদূত, 'কুমার সম্ভব', 'রঘুবংশ' লিখেছেন। তাঁর কাব্যে কোথায়ও মানুষের পরাধীনতার যন্ত্রণা নেই! দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষের হাহাকার নেই। নীলেন্দ্র ভদ্র আপনি একজন অর্ধশিক্ষিত বংগআল হয়ে মানুষের বৈষম্যে ব্যথাবোধ করে নতুন মানুষে রূপান্তরেত হয়ে মুক্তির পথ জানতে ব্যাকুল। অসংখ্য মানুষ দাস হয়ে নিরুপায় জীবন কাটাচ্ছে। সমাজে ব্রাহ্মণসৃষ্ট বিভেদের ফলে দলে দলে লোক সম্মান লাভের আশায় নির্গ্রন্থ আর গৌতম বুদ্ধের পথে আশ্রয় ভিক্ষা করে ফিরছে। তখন এই মুহূর্তে উজ্জয়িনীর জ্ঞানীরা আপনাকে কি জ্ঞান দান করবে সে বিষয়ে আমি সন্দিহান।

রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। পূর্ণিমার চাঁদ স্বচ্ছ নীল আকাশ সাঁতরে চলেছে। স্নিগ্ধ নীলাভ চন্দ্রালোক কক্ষের কারুকার্যখচিত গবাক্ষ পথে এসে বিচিত্র আলোছায়ার নক্শা এঁকেছে ঘরের মেঝেতে। সেদিকে তাকিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে ছিল নীলেন্দ্র ।

সহসা অনঙ্গভট্ট ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল-এই দেখুন এতক্ষণ কেবল আবার সঙ্গে রসকষহীন দীর্ঘ আলোচনা করলাম। আপনাকে তো কিছু আপ্যায়ন করা প্রয়োজন। কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক। সুরা পান করায় আপত্তি আছে ? আপনি তো বৌদ্ধ নন ।

নীলেন্দ্র সচকিত হল সে কি ! আমি যে ম্লেচ্ছ বংগআল ! আপনি ব্রাহ্মণ ! জাত যাবে যে আপনার ।

অনঙ্গভট্ট হাসল-তা ঠিক ! আপনার সঙ্গে আমাকে একত্রে সুরা পান করতে দেখলে মগধী ব্রাহ্মণরা আমায় জাতিচ্যুত করবে। তবে আমার নিজের জাত হয়তো যাবে না ।

নীলেন্দ্র অভিভূত কণ্ঠে বলল-আপনি ব্রাহ্মণ অথচ মানুষকে ঘৃণা করেন না ? অনঙ্গভট্টর হাসি আর বিস্তৃত হল-না করি না। কি বিশ্বাস হয় না ?

এখানে আমার একজন চীনা বৌদ্ধ বন্ধু আছে। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময় ফাহিয়েন নামে একজন চীনদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত এসেছিলেন পাটলীপুত্রে।

তাঁরই সঙ্গে আমার এই বন্ধুটি আসেন। কিছুকাল আগে ফাহিয়েন তাম্রলিপি (বর্তমানে পঃ বঙ্গের মেদিনীপুরের তমলুক) হয়ে চীন দেশে ফিরে গেছেন কিন্তু আমার চীনা বৌদ্ধ বন্ধু লাও তুং এদেশে রয়ে গেছেন। তিনি পাটলীপুত্রের বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছেন। আমরা দু'বন্ধু অবসর পেলেই এক সঙ্গে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াই। যদিও তিনি মদ মাংস পান আহার করেন না তবু কতবার আমরা এক সাথে খাওয়া দাওয়া করেছি তার হিসেব নেই ।

নীলেন্দ্র নিজের ক্ষণপূর্বের উক্তি সম্বন্ধে লজ্জিত হল। প্রসঙ্গ বদলে তাড়াতাড়ি বলল-আপনার বন্ধু চীনদেশ থেকে পাটলীপুত্রে পড়তে এসেছেন আশ্চর্য বটে! —হ্যাঁ। তাকে আমি অবশ্য সংস্কৃত পড়াই। অনঙ্গভট্ট সহজ উত্তর দিল । নীলেন্দ্র ব্যাকুলভাবে বলল – তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন ? অনঙ্গভট্ট মৃদু হাসল দেব। কিন্তু তার আগে পরিচারককে ডেকে আপনার জন্য সুরা আনতে আদেশ করি।

নীলেন্দ্র ক্ষমা প্রার্থনা ভঙ্গীতে হাত জোড় করল-আজ নয়। আমি বংগআল বণিক। ভাত মাছই আমার বিশেষ প্রিয় খাদ্য ।

উঠে দাঁড়াল নীলেন্দ্র-রাত হল, যাই এবার। নীলেন্দ্র বরান্দায় এসে দাঁড়াতেই পরিচারক মহা ব্যস্ত হয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এল-এই যে আপনি এখানে ! আর আমরা আপনাকে খুঁজে সারা। উপারিক মহারাজের দূত এসেছিল। আপনাকে কাল মহারাজের প্রাসাদে যেতে হবে।

- নীলেন্দ্র অবাক হল কেন ? কি ব্যাপার ? পরিচারক বলল - আজ্ঞে তা আমার জানা নেই।

অনঙ্গভট্টও বিস্মিত হল। পরিচারককে প্রশ্ন করল-কি ঘটনা। বলতো আমায় খুলে ।

বৌদ্ধ পরিচারক পুণ্ড্রনগরের আদি অধিবাসী। মাথা চুলকে বিপন্নভাবে নীম্নস্বরে বলল-কি যেন ঠিক জানি না। আমাদের ওপর আদেশ হয়েছে এই বংগআল অতিথিকে সর্বদা চোখে চোখে রাখি। তবে শুনেছি যে - বলতে বলতে থেমে গেল পরিচারক ।

অনঙ্গভট্ট গম্ভীর আদেশের স্বরে প্রশ্ন করল-কি শুনেছ বল । চাপা দিও না। অমঙ্গলজনক কোন ইংগিত থাকলে আমার কাছে গোপন কোর না। আমি

নীলেন্দ্র ভদ্রর শুভাকাঙ্ক্ষী ।

পরিচারক ভীতভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে চাপা স্বরে বলল-আমার অপরাধ নেবেন না। শুনেছি সমতট বঙ্গে খুব গোলযোগ। কামরূপের লাং বর্মন আর বংগালের ভদ্রদের কাছে গুপ্ত বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়েছে। তারপর কি ঘটেছে আমি ঠিক জানি না। তবে এ মাসের শেষে এক নৌকা ব্রাহ্মণ পাঠান হবে দু'বাকে। আর এক পক্ষকাল পরে আরো দু'টি নৌকা যাবে ব্রাহ্মণদের নিয়ে। সঙ্গে এই বংগআল অতিথিকেও পাঠান হবে।

নীলেন্দ্রর সব শরীর এক মুহূর্তে যেন প্রস্তরীভূত হয়ে গেল। পরক্ষণেই প্রচণ্ড ক্রোধে তার শরীরের শিরা উপশিরায় রক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠল। কঠিন চাপা কণ্ঠে সে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল এখন সব চক্রান্ত আমি বুঝেছি। কিন্তু না এ অসম্ভব ।

বারান্দার ওদিক দিয়ে কয়েকজন অতিথি হেঁটে আসছিল। সেদিকে তাকিয়ে পরিচারক দ্রুত সরে গেল। অনঙ্গভট্ট ক্ষীপ্রগতিতে নীলেন্দ্রর হাত আকর্ষণ করে ঘরে টেনে আনল। ঘরে কপাট রুদ্ধ করে দিয়ে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে নীলেন্দ্রকে বলল-উত্তেজান সম্বরণ করুন নীলেন্দ্র ভদ্র । তা নহলে যে বিপদে পড়ে যাবেন ।

নীলেন্দ্রর কণ্ঠে তখনও ঔদ্ধত্য।

বলল-বিপদকে বংগআল নীলেন্দ্র ভদ্র ভয় পায় না।

অনঙ্গভট্ট স্থির দৃষ্টিতে নীলেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে চিন্তাচ্ছন্ন স্বরে বলল-হয়তো পায় না। কিন্তু বিপদের চেয়ে ষড়যন্ত্র আরও ভয়াবহ। আমি এতক্ষণে বুঝেছি আপনি কে ? আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হচ্ছি নীলেন্দ্র ভদ্র। আমি আপনাকে রাজদূত উপারিক মহারাজের কূটচালের ঘুঁটি হতে দেব না। আমাকে কি বন্ধু বলে স্বীকার করেন ?

উত্তেজিত নীলেন্দ্র আবার বিভ্রান্ত হল-একথা কেন বলছেন অনঙ্গভট্ট ?

-বলছি। কারণ আপনার মধ্যে আমি যেন এক যুগমানবকে দেখতে পাচ্ছি। আপনি কি বন্ধুরূপে আমার পরামর্শ গ্রহণ করবেন ?

বিভ্রান্ত নীলেন্দ্র ধাতস্থ হতে পারল না। দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল-বলুন কি করতে

হবে ?

অনঙ্গভট্ট নীলেন্দ্রর কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বলল-আপনি আজ ভোর রাতেই এ নগর ছেড়ে চলে যান ।

-কোথায় ?

–কেন, সমতটে ? তবে রাজকীয় দলের সঙ্গে নয়। তারা আপনাকে শর্ত রেখে দু'বাক বিক্রমপুর ভুক্তির পুনঃদখলে তৎপর হয়েছে।

নীলেন্দ্র মাথা নাড়ল-না, ফিরে যাবে না, সমতটে। কারো সঙ্গে নয়। একাও নয়।

অনঙ্গভট্ট বিস্ময়বিমূঢ় স্বরে বলল-সে কি কথা ! কোথায় যাবেন তাহলে ? উত্তেজনাবিহীন স্থিরপ্রত্যয় দৃঢ়তায় কঠিন হল নীলেন্দ্র-আমাকে জ্ঞান লাভ করতে হবে। মানুষের অপমান অসম্মান দূর করবার পথ খুঁজে বের করতে হবে । তবে উজ্জয়িনী বৈশালী মগধের প্রাচুর্যের মধ্যে নয়। মানুষের দুঃখের মধ্যে থেকে ।

অনঙ্গভট্টও অধৈর্য হল-কিন্তু এ রাজ-অতিথিশালা থেকে তা কেমন করে সম্ভব ? নীলেন্দ্র উন্মনা দৃষ্টি মেলে তাকাল জ্যোৎস্না-ধোয়া তারকালোকিত আকাশে। -আজ রাতেই আমি চলে যাব ।

অনঙ্গভট্ট চিন্তান্বিত ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল-সেটা বোধহয় খুব সহজ কাজ নয় । তবে আমি একটি উপায় স্থির করেছি।

-বলুন, কি সে উপায় ?

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল নীলেন্দ্র ।

অনঙ্গভট্ট দরোজা ভালোভাবে বন্ধ করে নীলেন্দ্রর কাছে এসে বসল। বলল-এর জন্য একটু ছদ্মবেশ দরকার হবে। আপনাকে চুল-দাড়ি মুণ্ডিত করে গৈরিক বেশধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ নিতে হবে। তারপর যা ব্যবস্থা করতে হয় আমি করব। কি সম্মত হবেন তো এতে ?

নীলেন্দ্র এতক্ষণে মৃদু হাসল-হ্যাঁ, আমি সম্মত আছি ।

-তাহলে আজ রাতের মধ্যেই প্রস্তুত হতে হবে। আমার বৌদ্ধবন্ধু লাও তুং আজ শেষ রাত্রে কপিলাবস্তুর দিকে যাত্রা করবে। আপনি তার সঙ্গে এ নগর ছেড়ে চলে যাবেন। কেউ সন্দেহ করতে পারবে না ।

নীলেন্দ্র গভীর কৃতজ্ঞতা ভরা নয়নে অনঙ্গভট্টর দিকে তাকাল আপনি মহৎ লোক ।

অনঙ্গভট্ট প্রত্যুত্তরে হাসল-এর মধ্যে মহত্ত্বের কিছু নেই নীলেন্দ্র ভদ্র । আপনি আপাতত এ ঘরে বসুন। আমি লাও তুংয়ের সঙ্গে আলাপ করে আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাগুলো করে আসি ।

অনঙ্গভট্ট বেরিয়ে গেল। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশে উন্মনা দৃষ্টিতে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে নীলেন্দ্র ভাবল হয়তো এবার তার এমনি উজ্জ্বল আলোর পথে যাত্রা শুরু হল ।

পাঁচ

পুণ্ড্রনগরের সিংহদ্বার দিয়ে মুণ্ডিত কেশ গৈরিক বসনাবৃত দু'জন বৌদ্ধ ভিক্ষু বেরিয়ে গেল। সারা নগরী তখন নিদ্রাসুপ্ত । রাতের প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছিল। ভিক্ষু দু'জনকে দেখে তারা পথ খুলে দিল। আকাশের পশ্চিম প্রান্তে যখন চাঁদ অস্তমিত হচ্ছে, ততক্ষণ দূর হতে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে দু'টি সম্মিলিত সুর

‘বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'।

এই সুরের রেশ ধরে বংগআল নীলেন্দ্র ভদ্র এক জ্যোতির্ময় মানবে রূপান্তরিত হল। গৈরিকধারী নীলেন্দ্র ভদ্র কপিলাবস্তু, মিথিলা, কুশীনগর প্রভৃতি নানা নগর গ্রাম জনপদ অতিক্রম করে দেখল দুঃখ, ব্যাধি, জরা, বার্ধক্য মৃত্যুর প্রতীকরূপী এক অবহেলিত নিষ্পেষিত মানবগোষ্ঠীকে। এই দুঃখী সম্ভমবিহীন দরিদ্র মানুষের কাছেই ভিক্ষু নীলেন্দ্র ভদ্র জীবন দেখল, সত্যকে চিনল। সুদীর্ঘকাল পাটলীপুত্রের বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্ত্র চর্চা করে অবশেষে বুদ্ধগয়ায় নৈরঞ্জনা নদীর তীরে পবিত্র বোধিবৃক্ষ তীর্থে বহুদিন অতিবাহিত করল ভিক্ষু নীলেন্দ্র ভদ্র ।

দীর্ঘ তিরিশ বছর বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও গৌতম বুদ্ধের ধ্যানের অনুশীলনের

পর একদিন সমতট বংগে যাত্রা করল নীলেন্দ্র ভদ্র ।

সমতটের নদীর বহুবার পাড় ভেঙেছে। আল ভাসিয়ে লোকালয় গ্রাস করেছে। আবার জন্ম দিয়েছে পলিসমৃদ্ধ ভূখণ্ড। কিন্তু এখানকার প্রকৃতির সন্তান বংগআলরা গুপ্তসমর্থনপুষ্ট উপনিবেশ স্থাপনকারী ব্রাহ্মণদের প্রতাপে নিষ্প্রভ। বিক্রমপুর, কোটালপাড়া, নিধানপুরে (সিলেটে) ব্রাহ্মণ্য প্রভাব যদিও উপেক্ষা করতে পারেনি, তথাপি বার বার তাদের স্বাধীন সত্তা বিদ্রোহে দুর্বার হয়ে উঠেছে। গুপ্ত অধিকৃত হলেও বলা যায় বিক্রমপুরের ভদ্ররা মোটামুটি স্বাধীন তখনও। বিক্রমপুরের ভদ্র পরিবারে তিলক ভদ্র গত হয়েছেন। বৃদ্ধ কালক ভদ্রের পুত্র হল ভদ্র এখন বিক্রমপুর বংশের অধিপতি । হল ভদ্রের ছোটবোন উরীর বিয়ে হয়েছে এক ব্রাহ্মণপুত্রের সঙ্গে। ভদ্ররা বহিরাগত ব্রাহ্মণদের রীতিনীতি যথাসম্ভব গ্রহণ করে মিশ্র বংগআল গোত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। বিক্রমপুরের বৌদ্ধ বিহারগুলি এখন অযত্ন অবহেলায় পরিণত হয়েছে জঙ্গলাকীর্ণ ধ্বংসস্তূপে। সেখানে সাপ-খোপ বাঘের আড্ডা। এমনি এক সময়ে একটি নৌকা এসে ভিড়ল বিক্রমপুরের বক-যান পাড়ার ঘাটে। বর্ষণক্ষান্ত সমতটের আকাশ তখন আশ্চর্য নীল। গাঙের পানিতে টান ধরেছে। গাঙের দু'ধারে আকাশের বৃষ্টিহীন শুভ্র মেঘের মত অজস্র সাদা কাশফুল ফুটে উঠেছে। এখানে বিলের কালো পানিতে লাল শাপলার দল হাওয়ায় দোলে। পানকৌড়িরা বিলের পানিতে ডুব সাঁতার কাটে। নলখাগড়া হোগলার বনে ঢেউয়ের উদ্দামতা জাগিয়ে ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায় বেলে হাঁস। ঘাসের ঝোপে ঘেরা ডোবার ধারে নির্বিঘ্নে বিচরণ করে ডাহুক পরিবার। গ্রাম্য বধূরা গাঙের ঘাটে এসে পানিতে কলস ভাসিয়ে গাত্রমার্জন করে স্নান করতে করতে সাংসারিক সুখ-দুঃখের গল্পে মুখর হয়ে উঠে। শিশুরা ঝাঁপাঝাঁপি করে সাঁতারের পাল্লা দেয়। কিষাণরা ডোঙায় করে ক্ষেতে জল সেচ করে। নারিকেল সুপারীর ছায়ায় খড়ের চালায় দাওয়ায় বসে তাঁত বোনে তাঁতী বউ। বেনে বউ হলুদ কোটে। নদীতে পালের নায়ের মাঝি নৌকার পাটাতনে বসে ভাত রাঁধে ভাটিয়ালী গায়। উজানে গুন টানে। শাশ্বত চিরন্তন সুন্দর বঙ্গ। নৌকা থেকে নেমে প্রৌঢ় ভিক্ষু নীলেন্দ্র ভদ্র অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। উতলা আবেগে ভাবল কত জনপদ, গ্রাম নগর নগরীতে ঘুরেছি কিন্তু এমন দেশ কোথায় আছে ? নেই, কোথাও নেই। আবার নীল নদী, নীল আকাশ, শ্যামল ছায়াঘেরা গ্রাম, সবুজ মাঠের শোভা দুচোখ ভরে দেখে অস্ফুটে নিজেকে প্রশ্ন করল- এখানেও কি সেই জরা, ব্যাধি, রোগ-শোক দুঃখ যন্ত্রণার জীবন আছে?

মন উত্তর দিল—আছে। সারা পৃথিবী জুড়ে আছে সেই কালো ছায়া ।

ভিক্ষু নীলেন্দ্র ভদ্র পা বাড়াল সম্মুখে। যেন এগিয়ে গেল অন্ধকারের দিকে আলোর প্রদীপ হাতে নিয়ে ।

ডবাক-বিক্রমপুর ভুক্তির গ্রামে গ্রামে সে আলো জ্বলে উঠল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল সমতট। ব্রাহ্মণ্য উন্নাসিকতাকে ঝেড়ে ফেলে বংগআলরা আবার যেন নূতন জীবন পেল। আবার বৌদ্ধ স্তূপে অর্ঘ্যের প্রদীপ জ্বলল। সে প্রদীপ হাতে তুলে নিয়ে উরীর পুত্র শংখভদ্র ভিক্ষু হল । শংখভদ্রেরই উত্তরপুরুষ পরবর্তীকালে সেই আলোবর্তিকাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলল। সেই বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতের নাম শীলভদ্র। বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ পরিবারের রক্তধারা শিরা-উপশিরায় প্রবাহমান থাকা সত্ত্বেও একজন বিদগ্ধ বংগআল ভিক্ষুরূপে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে জ্ঞান বিতরণের নিজেকে বিলীন করে দিল ।

সারা সমতট বঙ্গ গৌরবোজ্জ্বল আলোকে গেয়ে উঠল-

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামিঃ

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ।

(আজ হতে প্রায় ১৬৫০ বৎসর পূর্বে সমতট বঙ্গ গুপ্তদের শাসনাধীন হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বঙ্গভদ্রদের মত কতকগুলি স্বাধীন বংগআল অধিপতি গুপ্ত-অধীনতা অস্বীকার করে এবং এই সময় থেকেই সমতট বংগে বৌদ্ধ ধর্ম জনগণের ধর্মরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।)

পঞ্চম অধ্যায়

এক

লালমাটি আকাশে এখন সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘ ভাসছে। সেই সাদা মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি ক্রমশ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম। উজ্জ্বল নীল আকাশের বুকে ভাসমান শুভ্র মেঘগুলিকে মনে হচ্ছিল যেন নীল সাগরের বুকে পালতোলা জাহাজের বহর। ধীরে ধীরে আমার মানস দৃষ্টির সামনে থেকে একটি বিস্মৃতির আবরণ সরে যাচ্ছিল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি এক বংগআল নৌ- অধিকানয়ক। বংগপতি মহারাজাধিরাজ সমচর দেবের নৌ-সেনানায়ক হয়ে এগিয়ে চলেছি। বিদেশী শত্রু সেনাবাহিনীর বঙ্গ আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্য !

সহসা সে দৃশ্য কেমন অস্পষ্ট হয়ে গেল। আমি হারিয়ে গেলাম। আসলে এই যুদ্ধে আমার পরাজয় ঘটে। আমি মৃত্যুবরণ করি ।

এখানেই কি আমার শেষ ? না শেষ নয়। আমি যে বহুকালের বহু ঘটনার সাক্ষী। আমি ছিলাম বংগের হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ। তাই এই মৃত্যুতে আমার নির্বাণ হল না।

আসলে আমি জাতিস্মর। পূর্বজন্মের স্মৃতি আমার মনে আছে । শশাঙ্কের রাজত্বকালে আমি ছিলাম রাঢ়ের বৌদ্ধ শ্রমন। চন্দ্রদ্বীপের (বাকেরগঞ্জ) ভাটিয়াল নৃপতিদের সময়ও আমি ছিলাম। আমি ছিলাম স্বাধীন সামন্তরাজ চন্দ্রদ্বীপ অধিপতির টাকশালের প্রধান কর্মকার ।

থাক সে সব কথা ।

এখন আমার নাম পঞ্চ গোপাল চাঁদ। আমার বাবা তিন কড়ি। ক্ষেতখামার করেন। পাহাড়ের ঢালে বাবার কার্পাস ক্ষেত আর রেশম চাষে বাবাকে সাহায্য করি আমি। মা চরকা কাটে, রেশমের গুটির যত্ন নেয়। চাঁদনী রাতে নিকানো উঠোনে বসে মাকু চালিয়ে দু'কূলা কার্পাসিকা কুসমী শাড়ী বুনতে বুনতে গুন গুন করে সহজিয়া যোগীদের গান গায়। মায়ের হাতের বোনা সে শাড়ীতে ফাগের গুঁড়োর মতো ঝিকমিক করে রংয়ের ঝলক। শেষ রাতের কুয়াশার মত মিহি কুসমী শাড়ীতে হরিণ, হংস, পদ্ম, করিন্তাফুলের সূক্ষ্ম নকশা আঁকতে

মায়ের জুড়ি নেই। চন্দ্রদ্বীপের মেয়ে আমার মা। এই লালমাটির (লালমাই ময়নামতী অঞ্চল) সবুজ টিলা ঘেরা লাল কাঁকরের দেশের খরস্রোতা তটিনী আর রূপালী ঝরনার নকশা আঁকার চাইতে মা তার দুকূলা শাড়ীতে চন্দ্রদ্বীপের নকশা তুলতে পছন্দ করে। দুকূলা শাড়ীর দুই পাড়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে নীলাম্বরী। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র যেখানে সাগরে মিশেছে সেখানে কত নতুন পলির অঞ্চল জন্ম নিচ্ছে। মায়ের দুকূলার আঁচলে তেমনি কারু- কার্যের ফোঁটায় প্রাণ পায় নতুন নতুন অঞ্চল ।

আমাদের পাটল রঙের দুগ্ধবতী গাভীটির শরীরে মা যখন সস্নেহে হাত বুলিয়ে দেয় তখন আমি লক্ষ্য করেছি মায়ের দৃষ্টিটা যেন কোন্ সুদূরে হারিয়ে যায়। আমি বুঝতে পারি মায়ের কপোতাক্ষী দৃষ্টিতে সবুজ টিপের মত এক শ্যামল ধান শরীর দ্বীপমালার ছায়া দুলে ওঠে। কখনও পাতা ঝরা ঘুঘু ডাকা উদাস দুপুরে মা যখন আমাদের কুটিরের নিকোনো দাওয়ায় বসে চরকায় সুতো কাটে তখন হালকা সাদা তুলোর দিকে তাকিয়ে মা যেন এক নীল সাগরের ফেনিল ঊর্মিমালার উচ্ছ্বাসের স্মৃতিতে মগ্ন হয়ে যায়। সেই শুভ্র ফেনিল সাগরবালারা যেন শ্যামল দ্বীপের প্রান্তে এসে দিবারাত্রি জোয়ার ভাটার গান গায়। সাগরের ভেজা লবণাক্ত হওয়া উতলা দোলায় মর্মরিত হয় নারিকেল গুবাকের চিরল পাতায়। বৃষ্টি ঝরায় সবুজ ধানের ক্ষেতে, ঢেউ তোলা মাঠে, খালে, বিলে, সাঁকো, বনানীতে গ্রামে গঞ্জে। সেই চন্দ্রদ্বীপে ।

মা তখন আনমনে গান গায়, সে গানে আমি দাঁড়ের ছপছপ হাওয়া লাগা পালের ধ্বনি শুনতে পাই। সে গানে আমি সাম্পানের দোলা, গুনটানার ধুঁয়া, জলের ছলছল অনুভব করি । মাকে আমি কতদিন প্রশ্ন করেছি –মা গো তুমি কুসুম, রেশম, কার্পাসিকা বোনার চাইতে দু'কূলা (প্রাচীন বাংলার শাড়ী) শাড়ী বুনতে বেশি পছন্দ কর কেন ?

মা হাসে—দুকূলা যে নদী। দুপাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে সাগরে পড়েছে। দুকূলার শেষে আঁচল। নদী যেখানে শেষ হয়ে সাগরে পড়েছে সেখানেও আছে অঞ্চল। সে অঞ্চল আমার জন্মভূমি ভাটির টিপ। হোগলা বন, হিন্তাল লতা সুন্দরী গাছের শ্যামলিমা ঘেরা চন্দ্রদ্বীপ ।

আমি অবাক হয়ে ভাবি এই সবুজ টিলায় ঘেরা লালমাটি (সংস্কৃত লহিত গিরি) কেন মায়ের ভালো লাগে না। এখানে টিলার মাথায় জালিপ্যগর্জা, শাল, শিরিষের বন কত রঙ-বেরঙের পাখীরা কাকলীমুখর করে তোলে। পাহাড়ের

গায়ে চাষের আলে যখন সোনালী ধানের শীষ ঝরে পড়ে হলুদ ডানা মেলে বন থেকে ঝাঁক বেঁধে বনমোরগেরা নেমে এসে শস্য খুটে খায়। পাহাড়ের বনানীর ভেতর দিয়ে রূপালী উত্তরিকার মত ঝরে পড়া ঝরনার জল খেতে নামে কাজলনয়না হরিণীরা । 'কমলঙ্ক' (কুমিল্লা) বসতির পর থেকে যে মেঘনীল পাহাড়ের সারি, সেই পাহাড়ের পথ বেয়ে নেমে আসে বুনো হাতীর দল, পড়ন্ত সূর্যের রক্তিম বেলায় লালমাটির টিলা পেরিয়ে বৃংহতি রবে বনভূমি উতলা করে তারা সারিবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যায়।

ক্ষরস্রোতা নদী পেরিয়ে বাঁশের ঝাড়ে ঝড়ের দোলা জাগিয়ে চলে যায় চম্পানগরীর দুর্গম পার্বত্য পথ ধরে প্রাগ জ্যোতিষপুরের অরণ্য পথে। টিলার পাদদেশে সবুজ কার্পাসের বনে ছুটে বেড়ায় শশককুল ।

এসব কেন মায়ের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে না ! মা কেন এখনো সমুদ্রের গান শোনে! নদীর স্বপ্ন দেখে, মায়ের দুচোখে কেন দিবানিশি সাগরের দক্ষিণা বাতাসে আন্দোলিত নারকেল সারির উদাস মর্মরধ্বনির বেদনা !

মা এখনো প্রভাতে ঘুম ভেঙে গৃহকর্ম করতে করতে প্রভাতী সূর্যের আলোয় তাকিয়ে আনমনে ভাটির টানা সুরে সূর্য পূজার সুর গায়। আমার মায়ের পরিবার মৈনানাথের (মীন নাথ) শিষ্য। নির্জন দ্বিপ্রহরে তাঁত বুনতে বুনতে মা মৈনার সহজিয়া গান গায়। বংগাল রাগ, ধনসী রাগের সে গান যেন কুসমী শাড়ির মত হাওয়ায় ভাসে। আমার মায়ের নাম কমলিনী। মায়ের বাবা চন্দ্রদীপের বেনে। একদিন কুয়াশা অস্পষ্ট শীতের প্রভাতে মা যখন পাড়ার কুমারী মেয়েদের সঙ্গে গাঙে স্নান করে সূর্যি ঠাকুরের কাছে বর প্রার্থনা করে সূর্যি পূজার ব্রত শেষ করে উঠেছে ঠিক সেই সময় আমার বাবার নৌকা ভিড়লা গাঙের ঘাটে।

লালমাটি থেকে চন্দ্রদ্বীপে বেড়াতে গিয়েছিলেন বাবা। চন্দ্র রাজারা তো এই লালমাটির বাসিন্দা। চন্দ্ররাজারা নিজেদেরকে চাঁদের বংশধর বলে দাবি করে। চন্দ্রের বরে চাঁদের ষোলো কলার প্রাচুর্যের মত দিন দিন বেড়ে চলেছে চন্দ্ররাজাদের রাজত্বের সীমানা। সমগ্র বংগের একচ্ছত্র অধিপতি চন্দ্র রাজারা, যাক সে কথা। সাগরের নীল ছোয়া শ্যামল সবুজ সমতল চন্দ্রদ্বীপ থেকে বাবা যখন দেশে ফিরলেন তখন বাবার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এল শ্যামলী মেয়ে কমলিনী, আমার মা ।

ভাটির দেশের মেয়ে আমার মা আজও কি চন্দ্রদ্বীপের কথা ভুলতে পেরেছে? সুখের শৈশব যেমন ভোলা যায় না। তেমনি অতীত জীবনের পাপের বোঝা টেনে বেড়ান আমার বন্দী আত্মার তো মুক্তি নেই। এক নির্বাণহীন জীবনের বোঝা বয়ে চলেছি আমি । কিন্তু জীবনের আসক্তিতে তো আমি বীতশ্রদ্ধ নই।

টিলার ধারে সবুজ কোমল চাদরের মত দুর্বাঘাসের উপর মাথার নীচে হাত রেখে শুয়ে আছি আমি। আমি ঊনিশ বছরের তরুণ যুবা। আমার দৃষ্টি উন্মুক্ত নীল আকাশে নিবদ্ধ। কার্পাস ক্ষেতে হু হু করে হাওয়া বইছে। উতলা হাওয়ার মাতনে জালিপ্যাগর্জার পাতা ঝরে পড়ছে অনবরত। পানের বরজের ছায়ায় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে কাঠবেড়ালীরা। সহসা নূপুরের রুনুঝুনু শব্দে আমি উৎকর্ণ হলাম। টিলার ওধারে ঝরঝর শব্দে যে ঝরনাটা ঝরে পড়ছে ওদিক থেকে নূপুরের ধ্বনি ভেসে আসছে। আমি জানি এ ধ্বনি কার নুপুরের। সুপুষ্ট দু'টি পায়ের গোড়ালী ছাড়িয়ে কিছুটা উঁচু করে পরা ডোরা কাটা দু'কূলা আঁটসাট করে কোমরে জড়ান। কোমরে একটি শংখের মেখলা। কানে হস্তীদন্তের কুণ্ডল। খোঁপায় লাল ফুল। ঝুমুর ঝুমুর নৃত্যছন্দে সারা শরীরে ঢেউয়ের দোলা জাগিয়ে কলসিতে ঝরনার জল ভরে ঘরের দিকে চলেছে সে। এই সোনার মত রোদেভরা আকাশ। উতলা হাওয়ার উদ্দামতার মত আমার শরীর মন সজীব হয়ে উঠল। আমি বুঝলাম চম্পা আসছে। মুহূর্তে অভিমানে আমার মন ভরে উঠল। সেই কোন্ সকাল থেকে কার্পাস ক্ষেতে হরিণের পাল তাড়াবার ছুতো করে এখানে চম্পার অপেক্ষায় বসে আছি। অথচ আমার কথা এতক্ষণ তার মনেই পড়েনি ।

চম্পার পরিচিত নূপুরধ্বনি আমার পাশে এসে থামল। আমি ইচ্ছে করেই মুখ ফিরিয়ে রইলাম । চম্পা বোধহয় আমার অভিমান বুঝল । একটু চুপ করে থেকে মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে ডাকল – পঞ্চ ।

আমি নীরব ।

বুঝতে পারছি চম্পার হলুদবরণ মুখে রং ধরেছে। তবু প্রাণপণে সে রঙের অপরূপ শোভা দেখবার লোভ সম্বরণ করে দূরে টিলার ওপর সবুজ বনের শোভায় দৃষ্টি মেলে রাখলাম আমি ।

চম্পা জলের কলস নামিয়ে রেখে আমার পাশে বসে পড়ল দু'বাহু দিয়ে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে মিষ্টি সুরে হেসে উঠল।

আমি কপট রাগে মুখে ফেরালাম – হাসছিস যে ?

আরো হিল্লোলিত হয়ে হাসল চম্পা।

— হাসব না তো কি। তুই যে অমন রাগ করে মুখ ফিরিয়ে আছিস ! আমি এবার সত্যি রাগ করলাম ।

- তুই হাসছিস চম্পা। সে কোন্ বেলা থেকে তোর অপেক্ষায় বসে আছি। অথচ আমার কথা তোর এতক্ষণ মনেও পড়ল না ।

আমার কণ্ঠ থেকে শিথিল হল চম্পার বাহু । ম্লান মুখে গলার গুঞ্জার মালা আঙ্গুল দিয়ে পিষ্ট করতে লাগল সে।

চম্পার মলিন মুখে তাকিয়ে আমি এবার উদ্বিগ্ন হলাম তাহলে তুইও সত্যি রাগ করছিস চম্পা ! রাগ করিস না চম্পা। কাল কমলঙ্কার (কুমিল্লা) হাট থেকে তোর জন্য কর্পূর সুগন্ধি পান পদ্মমধু আর হাতীর দাঁতের কংকন এনে দেব।

চম্পা মুখ তুলল। চম্পার সুন্দর চোখ দু'টি জলে ভরে উঠল। সজল চোখে বলল – তুই আমায় অনেক ভালবাসিস পঞ্চ

চম্পার দু'কপোল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল ।

আমি ব্যাকুল হয়ে চম্পাকে বাহু বেষ্টন করে ওর মসৃণ কপালে ঠোঁটের স্পর্শ রেখে বললাম - কেন কাঁদছিস চম্পা ! কে দুঃখ দিয়েয়ে তোকে ?

চোখ মুছে ম্লান হাসল চম্পা – দুঃখ আমাদের কপালের। একটু চুপ করে মুখ নত করে চম্পা ধীরে ধীরে বলল – কাল থেকে আমাদের কিছুই খাওয়া হয়নি বলতে গেলে। ঘরে একমুঠো চালও নেই। বাবা শিকারে গেছে সকালে, এখনও ফেরেনি। টিলার ওপর আমাদের ঘর। পাড়া-প্রতিবেশীও নেই যে একেমুঠো ক্ষুদ ধার চাইব ।

আমি লজ্জিত ও মর্মাহত হলাম। আমারই প্রেয়সী কাল থেকে অভুক্ত রয়েছে। তার হাঁড়িতে ভাত নেই। অথচ আমি তার মান ভাঙাবার ছুতোয় কমলঙ্কার হাটের বিলাস সামগ্রীর প্রলোভন দেখাচ্ছি। ছিঃ ছিঃ ! নিজেকে ধিক্কার দিলাম আমি। বললাম- আমাদের বাড়ী চল চম্পা। আমিও এতক্ষণ কিছু খাইনি। দু'জন এক সঙ্গে খাব ।

চম্পা হেসে উঠল – তোর মাথা খারাপ হয়েছে পঞ্চ। আমি শবরী। আমাদের সবাই ঘৃণা করে। দুর ছাই করে। গৃহস্থের বাড়ী ভাত খেতে যাব কোন্ সাহসে?

আমি উত্তর খুঁজে পেলাম না। চম্পার বাবা তিপুর অহির (শিকারী) জঙ্গলে শিকার করে সংসার চালায়। ওর মা বন থেকে বাঁশ কেটে চাঙারী (টুকরী), ডালা, কুলো তৈরি করে হাটে বিক্রি করে। আমি চম্পাকে বললাম- এক কাজ করি চম্পা। চল সংঘারামে (ময়নামতী বৌদ্ধ বিহার) যাই, ওখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের রসুইঘরে বহু রান্না হয় । আমার বন্ধু তিপপু সংঘারামে ভর্তি হয়েছে। চল ওখানেই যাব আজ।

চম্পা ম্লান চোখে জালিপ্যাগর্জা গাছের আড়াল দিয়ে টিলার ওপর সংঘারামের মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বিষাদভরা কণ্ঠে বলল- নারে পঞ্চ থাক। আমাদের সবাই ঘৃণা করে। সংঘারামের পাশের দীঘিতে একদিন নাইতে গিয়েছিলাম, রাজার প্রহরী আমাকে যা তা গালাগালি করে তাড়িয়ে দিল। সংঘারামের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছাত্ররা দেখছিল, ওরাও বাধা দিল না ।

আমি ব্যথিত হলাম। কি বলে সান্ত্বনা দেব চম্পাকে। রাজকীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান লালমাটি বৌদ্ধ সংঘারাম। চাটিল (চট্টগ্রাম), কামরূপ, প্রাগজ্যোতিষপুর, বিক্রমপুর থেকে ছাত্ররা এখানে বৌদ্ধ শাস্ত্র পড়ে বিদ্বান হতে আসে। কত দেশ-বিদেশের ভিক্ষুরা এই সংঘারামের সম্মেলনে যোগ দিতে আসে। তখন আলোক সজ্জায় কমলঙ্কা লালমাটি উৎসব মুখর হয়ে উঠে। সাতদিন ধরে উৎসব চলে। মেলা হয় । কেনাবেচায় গম গম করে লালমাটির হাট। সেই উৎসবে ডোম-ডোমনী শবর- শবরীরা নাচ-গান করে বাড়তি রোজগার করে। অথচ সংঘারামের দীঘিতে কোন ডোমনী শবরীদের জলস্পর্শ করবার অনুমতি নেই ।

চন্দ্ররাজারা বৌদ্ধ । এ রাজ্যের সাধারণ মানুষও বৌদ্ধ। কমলঙ্কার আর্য ব্রাহ্মণ- ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরা প্রতিপত্তিশালী হলেও এ ব্যাপারে তারা উদাসীন নয়। সংঘারামের মেলায় তারা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এসে কেনা-বেচা করে আনন্দ উৎসবে যোগ দেয় । সংঘারামের দীঘিতে তারা স্নান করে। তখন তো রাজপ্রহরীরা বাধা দেয় না। অথচ এই ডোম আর শবররা জলস্পর্শ করলে সংঘারামের অসম্মান হয় ।

শবররা বৃক্ষপূজা করে। ডোমদের ধর্ম নেই। ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ সবার কাছেই তারা

উপেক্ষিত। কিন্তু বুদ্ধের বন্দনা গানের সময় দূর থেকে তারাও তো প্রার্থনায় যোগ দেয়।

চম্পা বলল – কি ভাবছিস পঞ্চ ?

- ভাবছি এই অন্যায় অবিচারের কথা। চন্দ্ররাজার কি চোখ বন্ধ করে আছে। তারাও তো বুদ্ধের বন্দনা গায়।

চম্পা মৃদু হাসল – একজনের দুঃখ আরেকজন কি সহজে বোঝে রে পঞ্চ? আমি না খেয়ে আছি, আমার ক্ষুধার জ্বালা তো আমিই বুঝতে পারছি। তুইতো আমার মত করে বুঝবি না ।

আমি মাথা নাড়লাম ঠিকই বলেছিস চম্পা। রাজারা দলান-কোঠায় বাস করে। সোনার সিংহাসনে বসে রাজ্য চালায়। গজমতী হাতীর পিঠে চড়ে প্রজার সংবাদ নেয়। কিন্তু অত উঁচু থেকে তো প্রজার অবস্থা জানা যায় না ।

চম্পা ঘাসের ডগা আঙুলে টুকরো করতে করতে বলল চাঁদ রাজাদের দোষ দিসনা পঞ্চু। রাজাদের দয়ার শরীর। রাণী মা কিছুদিন আগে সংঘারামে এসেছিলেন। বুদ্ধের বন্দনা করে সংঘারামের তোরণের পাশে গরীব কাঙালকে দু'হাতে দান করে গেছে। শেষ পর্যন্ত নিজের গলার চন্দ্রহারটাও খুলে এক ডেম্বিনীকে দান করেছে ।

আমি হাসলাম - তাহলে আর কি। তাতেই খুশী থাক। চল আমাদের বাড়ীতে খাবি ।

চম্পা আবার বাধা দিল – না, না, তোর মা রাগ করবে। তার চাইতে আমি যাই। বাবা হয়তো এখন ফিরেছে। নয়তো মা নিশ্চয়ই বন থেকে বুনো আলু তুলে আর শাক সিদ্ধ করে আমার জন্য বসে আছে।

চম্পা উঠে দাঁড়াল – যাই আমি ।

আমিও উঠলাম – চল তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি ।

চম্পা হেসে উঠতে গিয়ে থামল। ব্যস্ত কণ্ঠে বলল ওই দেখ পঞ্চ তোদের কার্পাস ক্ষেতে হরিণ নেমে কচিপাতা খেতে শুরু করেছে। চল তাড়িয়ে দিয়ে আসি ।

চম্পা হরিণীর মতই ছুটে গেল কার্পাস ক্ষেতের দিকে। আমি কাঠের তক্তার ওপল লাঠি দিয়ে শব্দ করতে করতে হরিণের পালকে তাড়া দিলাম ।

আমাদের দু'জনের তাড়া খেয়ে হরিণের দল ক্ষেতের ওপর দিয়ে লাফিয়ে তীর বেগে ছুটেতে লাগল পাহাড়ের দিকে চম্পাও হালকা পা ফেলে হরিণের পিছু ছুটতে ছুটতে টিলার পিছে বনের দিকে অদৃশ্য হল ।

শংকিত হলাম। শবর বালিকারা জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। বনের পশুকে ওরা ভয় পায় না। কিন্তু তা হলেই কি ! জঙ্গলে বুনো মহিষ, বন্য শূকররা ঘুরে বেড়ায়। গাছের ওপর শরীর জড়িয়ে দুলতে থাকে ময়াল সাপ ।

এইতো ক'দিন আগে পাহাড়ের দিক থেকে একপাল জংলী হাতী নেমে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করেছে। ক্ষেতের ধারের ডোমপাড়া দু'পায়ে দলে তছনছ করে দিয়ে গেছে।

সে ভয়াবহ দৃশ্য মনে করে শিহরিত হলাম। মুহূর্তে দু'হাতে কার্পাসের ডাল সরিয়ে ছুটতে ছুটতে ডাকতে লাগলাম – চম্পা ! চম্পা !

কিন্তু চম্পার সাড়া নেই। আমি আরও ভীত হয়ে ছুটতে লাগলাম। জঙ্গলের ভেতর ঢুকে টিলার উপর উঠতে হঠাৎ উৎকর্ণ হলাম। ছায়াচ্ছন্ন বনভূমির গাছের পাতায় পাতায় চম্পার হাসি ছড়িয়ে পড়েছে।

দু'হাত দিয়ে জঙ্গলের ডালপালা, লতা, বুনো বাঁশঝাড় ঠেলে চম্পার হাসি লক্ষ্য করে ওপরে উঠতে লাগলাম। এবার চম্পার হাসি আরও স্পষ্ট। মুখের পাশে হাত রেখে চীৎকার করে আবার ডাকলাম – চম্পা.... ! তুই কোন্ দিকে ?

ওপর থেকে চম্পার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল – এই তো এদিকে জলছড়ির (ঝরনা) মুখে। শিঘ্রি আয় পঞ্চ, হরিণ ধরেছি।

জঙ্গল ঠেলে চম্পার কাছে এসে পৌছলাম। চম্পার কাছে এসে অপূর্ব এক দৃশ্য দেখে আমি রীতিমত হতবাক হয়ে গেলাম। হৃষ্টপুষ্ট একটি হরিণ জংলী লতায় শিং জড়িয়ে আটকে পড়েছে। পেছনের পায়ের খুরের দাপটে টিলার লালমাটি ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে। হরিণকে দু'হাতে জাপটে ধরে লতা দিয়ে তার পা বাঁধবা চেষ্টা করছে চম্পা ।

পরিশ্রমে উল্লাসে ওর সারা মুখ রক্তিম।

আমার দিকে তাকিয়ে হাফাতে হাফাতে চম্পা বলল – হা করে দাঁড়িয়ে আছিস পঞ্চু ! দেখছিস না কেমন শিং দিয়ে ঘাই মারছে আর লাথি ছুড়ছে। শিঘ্রি ওর পা দুটো বাঁধ । আমি একা পারছি না ।

আমি ঘোর কাটিয়ে ক্ষীপ্র হাত লাগালাম। দু'জনে হরিণটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করবার পর বুনো লতা দিয়ে ওর সম্মুখের পেছনের দুজোড়া পা-ই বেঁধে ফেললাম। তারপর হাত দিয়ে সাবধানে হরিণের ধারাল শিং থেকে লতার জাল টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগলাম। শক্ত বুনো লতা প্রাণপণে ছিঁড়তে ছিঁড়তে চম্পার কোমল হাতের তালু কেটে রক্ত পড়তে লাগল। অভুক্ত শরীর ঘামে ভিজে উঠল। কিন্তু চম্পার উৎসাহের অন্ত নেই। পা বাঁধা হরিণাটার দাপাদাপিতে বার বার হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল সে।

অবশেষে অনেক কষ্টে হরিণটার শিং মুক্ত করলাম আমরা। চম্পা দু'হাতে চেপে হরিণটাকে ধরে রাখল। আমি একটা মরাগাছের মোটা ডাল ভেঙে এনে হরিণের দু'পা বেঁধে ঝুলিয়ে দিলাম। তারপর দু'জনে কাঁধে ঝুলিয়ে নামতে শুরু করলাম ।

চম্পা খুশীতে ঝলমল, নামতে নামতে বলল— উঃ কি চমৎকার শিকার হল পঞ্চু। আমি ভাবতেই পারিনি ।

সাবধানে নামতে নামতেই উত্তর দিলাম- তোর সাহসেই কিন্তু হরিণটার ধরা পড়ল ।

চম্পা হাসতে হাসতে গর্বিত কণ্ঠে বলল- ভুলে যাস না, চম্পা শবর অহেরীর মেয়ে।

আমরা নিচে নেমে এলাম, বেলা প্রায় শেষ। গাছ-গাছালীর মাথায় পাখীরা কলরব করে উড়ে বসছে। দূরে ঢেউতোলা সবুজ টিলার মাথায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করে সূর্য অস্তমিত হচ্ছে। ক্ষেতের কাজ সেরে কিষাণরা ঘরে ফিরছে। সংঘারামের পবিত্র গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে পাহাড়-অরণ্য-প্রান্তরে। আমরা এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ঘণ্টা ধ্বনি শুনলাম। চম্পা ধীরে ধীরে বলল- ভগবন্ বুদ্ধ আমার প্রার্থনা শুনেছে রে। কারো কাছে হাত পাততে হল না। তিনিই আহারের ব্যবস্থা করে দিলেন ।

আমি চমকিত হয়ে ফিরে তাকালাম। গভীর অভিনিবেশে চম্পার মুখে তাকিয়ে

বললাম – চম্পা পূর্ব জন্মে নিশ্চয়ই তুই সংঘারামে ভিক্ষুণী ছিলি। জানিনা কোন্ কর্মফলে এ জন্মে শবরের ঘরে এসেছিস।

চম্পার মুখ ম্লান হল ।

মৌন সন্ধ্যায় সংঘারামের গম্ভীর ঘণ্টা ধ্বনি শুনতে শুনতে আমি আবার উন্মনা হলাম । লালমাটির সন্ধ্যা, ধূসর পাহাড়ের সারি, এই জনপদ সব যেন হারিয়ে যেতে লাগল। হরিণ কাঁধে চম্পাদের টিলার দিকে যেতে যেতে ওই ঘণ্টাধ্বনির প্রতিটি তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে আমি ক্রমশ বিস্মৃতির অন্ধকার সরিয়ে ফিরে যেতে লাগলাম অতীতের জীবনে ।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পর গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক স্বাধীন নৃপতি থেকে ‘মহারাজাধিরাজ' উপাধী গ্রহণ করলেন। তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হল উত্তর-পশ্চিমে। মহারাজাধিরাজের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ) স্বাধীন সত্তার গরবে ঝলমল করে উঠল।

এই কর্ণসুবর্ণ নগরীর বৌদ্ধ সংঘারামের শ্রমন আমি। আমার নাম ভিক্ষু উত্তমার্ন। আমি বহুদিন পাটলীপুত্রের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার পর আরো অধিকতর জ্ঞান আহরণের জন্য কম্বোজ (নেপাল), স্বর্ণদ্বীপ (শ্রীলংকা) সুমাত্রায় ঘুরে অবশেষে একদিন তাম্রলিপ্তি বন্দরে (তমলুক-মেদেনীপুর) নেমে ফিরে এলাম কর্ণসুবর্ণে। জন্মগতভাবে আমি কর্ণসুবর্ণের অধিবাসী। নদীর ধারের এই তরুরাজি নীল শহরটিকে আমি বিদেশে গিয়েও ভুলতে পারিনি। এখানকার নদী, ধু-ধু দিগন্ত ব্যাপী বালুচর, পদ্মবনাকীর্ণ কালো বিল আর তার তীরে তীরে বৌদ্ধ বিহারের সারি এ শহরের শোভা ও জ্ঞানের মহিমা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু যখন ফিরে এলাম ! এসে আমি এ কি দেখছি !

দিগ্বিজয়ী সম্রাট শশাঙ্কের শোর্য বীর্য দাপটে থর থর করছে কর্ণসুবর্ণ।

যে পথে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বুদ্ধের নাম গান করতে করতে নগর পরিভ্রমণ করত সে পথে এখন ধূলির মেঘ উড়িয়ে ছুটে চলেছে সম্রাট শশাঙ্কের অশ্বারোহী সেনাবাহিনী ।

গোঁড়া শৈব শশাঙ্কর আদেশে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নগর পরিভ্রমণ নিষিদ্ধ। স্তূপে অর্ঘ্যদানের শাস্তি চক্ষু উৎপাটন, বুদ্ধের নাম গান করলে জিহ্বা কর্তন করার আদেশ। কর্ণসুবর্ণের বৌদ্ধরা রাজরোষ হতে আত্মরক্ষার জন্য দলে দলে প্রায়শ্চিত্ত করে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করেছে । অন্যরা নৌকায় উঠে পালিয়ে গেছে

সমতটের দিকে ।

গঙ্গার তীরে বৌদ্ধ বিহারগুলি এখন ধূসর পাটল বর্ণ ধারণ করেছে। আগাছায় ছেয়ে গেছে সংঘারামের চত্বর। ভিক্ষুদের আবাসগৃহ শৃগাল শূকরের আবাসস্থল।

রাজাদেশে কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দিরের বুদ্ধমূর্তি উত্তোলন করে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করা হয়েছে। সেখানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মহা সমারোহে ।

তাম্রলিপি থেকে কর্ণসুবর্ণে ফিরে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম। আমার সংঘারাম অর্থাৎ যেখানে এসে প্রথম আমি শ্রমন হয়েছিলাম, সেটি অন্ধকার আবর্জনাস্তূপে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধের পবিত্র মূর্তিটি ভগ্ন হয়ে পড়ে আছে। ধূলির আস্তরণে তথাগতের মূর্তি আচ্ছন্ন। প্রবল বেদনার আবেগে আমার সারা অন্তর মথিত হল ।

দীর্ঘ পথ ভ্রমণের পর ধূসর সন্ধ্যায় এই বিবর্ণ ধ্বংস মণ্ডপে যখন বজ্রহতের মত আমি দাঁড়িয়ে তখন শুনলাম পিছু থেকে একটি শিশু কণ্ঠ-শুনছ ! তুমি কে ?

ফিরে তাকালাম। আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে একটি ছোট বালক। আমার দিকে অবাক বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে ।

আমি বিবর্ণ হাসলাম-আমি বৌদ্ধ ভিক্ষু। আমি আগে এখানেই ছিলাম । বালকটি সচকিত হয়ে উঠল।

বলল-কি সর্বনাশ। তুমি পালাও। একটু পরেই এ দিকে রাস্তা দিয়ে মহারাজা গঙ্গার দিকে বেড়াতে যাবেন। তোমাকে দেখলে আর উপায় নেই ।

বালকের ভীত সন্ত্রস্ত মুখে তাকিয়ে আমি বিহ্বল হলাম-কেন কি করবেন মহারাজ আমায় ?

-কি করবেন ? কেন তুমি জান না বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধরে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়া হয় ! রাজার কারাগার থেকে রোজই দু'একজন বন্দী বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হাত-পা বেঁধে বুকে পাথর ঝুলিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয় গঙ্গায়। তাই তো মা কাঁদে আর বলে..

আমি চমকিত হলাম- তোমার মা কাঁদে ? কেন কাঁদে ? কে তোমরা ?

আমার ব্যাকুল প্রশ্নে ছেলেটা কেমন বিচলিত হল। একটু চুপ করে থেকে বলল-বলব না। তুমি যদি রাজার কাছে আমার মাকে ধরিয়ে দাও। আমি বাড়ী যাই । মা আবার খুঁজতে বেরোবে'খন।

ভগ্নস্তূপের পেছন থেকে একটা গাভীর দড়ি তুলে নিয়ে বালক ডাকল-চল বুধি বাড়ী যাই। মা আবার ভাববে ।

গাভীটাকে তাড়িয়ে নিয়ে বালক তেঁতুল আর বাবলা গাছের আড়াল দিয়ে ফিরে চলল ।

বেলা অবশিষ্ট নেই । ঝোপ-ঝাড়ের মাঝ দিয়ে দেখা যাচ্ছে গঙ্গার বুকে ভাসমান নৌকাগুলিতে টিমটিমে আলো জ্বলে উঠছে ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সহসা শুকনো পাতার ওপর পদধ্বনি শুনে ফিরে তাকালাম। একটু দূরেই তেঁতুল গাছের গোড়ায় পিঠ রেখে অপলকে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই বালকটি ।

আমার সঙ্গে দৃষ্টি মিলিত হতে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল-তোমার নাম কি ? আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম-আমার নাম উত্তমার্ণ ! তোমার কি নাম ? ছেলেটি উত্তর দিল – আমার নাম ভিখু ।

আমি হাসলাম-বাঃ, সুন্দর নাম ! তা ভিখু তুমি ফিরে এলে কেন ?

ভিখু কিছুক্ষণ নতমুখে ঝরা-পাতার স্তূপে তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলল-তোমার জন্য আমার মন খারাপ করল তাই। আমার মনে হয় তুমি খুব ভালো লোক! ভালো লোকদের দুঃখ দেখলে আমারও দুঃখ হয়। আমরাও খুব দুঃখী কি না।

বালকের দীর্ঘপক্ষ কালো চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠল।

আমার অন্তর আবেগে উচ্ছলিত হল। দু'হাতে ভিখুকে কোলে তুলে প্রশ্ন করলাম-কিসের দুঃখ তোমার ভিখু ? কেন তুমি দুঃখী ? ভিখুর দুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল ।

অভিমানী কণ্ঠে বলল-দুঃখী নয় তো কি । মা যে বলে আমরা দীন দুঃখী ।
-ওঃ, মা বলে বুঝি !

বলবে না কেন ! আমরা চণ্ডাল। শহর থেকে দূরে গাঁ ছাড়িয়ে বনের ধারে

থাকি। আমাদের সবাই ঘৃণা করে। জানো গাঙের ধারের পথটা দিয়ে একদিন একজন ব্রাহ্মণ গঙ্গা স্নানে যাচ্ছিল। আমি পথের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম ব্রাহ্মণ দেখবার জন্য। তাই কি কাণ্ডটা হল ।

-কি হল ?

–কি আবার । আমি কি জানতাম যে আমার ছায়াটা খুব দুষ্টু ।

- তার মানে !

—তুমি দেখছি কিছুই জানো না। আমার ছায়াটা ব্রাহ্মণের পায়ে পড়েছিল। তাই রাজার রক্ষীরা মারতে মারতে আমার পা ভেঙে দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ তো বলছিল আমার ছায়াটা না কি পাপ ।

—ছিঃ ছিঃ, সে কি কথা। তুমি তো নিষ্পাপ অবোধ শিশু। এমন কথা কে বলে। আমার সান্ত্বনা বাণীতে ভিখু চোখ মুছে হেসে ফেলল ।

-সত্যি তুমি খুব ভালো। আমি ঠিক বুঝেছিলাম তুমি ভালো লোক। চল আমাদের বাড়ীতে। মা খুব খুশী হবে। জানো আমি আর মা লুকিয়ে এই স্তূপে অর্ঘ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে যাই ।

কোন কোনদিন খুব ভোরে কাক-পক্ষী জাগবার আগে মা আর আমি ভগবন বুদ্ধের মুর্তি ধুয়ে মুছে দিয়ে যাই ।

সংসার ত্যাগী মায়ার বন্ধনহীন বৌদ্ধ ভিক্ষু আমি। কিন্তু এই আশ্চর্য বিষণ্ণ সন্ধ্যায় কোমল প্রাণ এই সমাজ অনাদৃত চণ্ডাল শিশুটির মুখে তাকিয়ে প্রচণ্ড গৃহের আকর্ষণ অনুভব করলাম ।

ভিখুর মুখে স্নেহ চুম্বন এঁকে বললাম-আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু ভিখু। চল, আমায় তোমাদের বাড়ী নিয়ে চল ।

ভিখুর সঙ্গে ভিখুদের বাড়ীতে অতিথি হলাম আমি ।

ভিখুর মা-বাবা সত্যিই খুব গরীব। ভিখুর বাবার একটি গাধা আছে। গাধায় চড়ে দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে মৃত পশুর চামড়া সংগ্রহ করে আনে সে। নদীর ধারের মাঠে সে সব চামড়াকে লবণ মাখিয়ে ধুয়ে শুকাতে দেয়। তারপর বিক্রি করে হাটে । যখন চামড়ার বাজার মন্দা হয় তখন ডিঙি চড়ে জাল দিয়ে মাছ

ধরতে যায় বিলে ।

ভিখুর মা ঘর-কন্নার কাজের ফাঁকে বাঁশের ফালা আর সর ঘাস দিয়ে ঝুড়ি তৈরী করে, পাটি বোনে ।

শহরের এক প্রান্তে এক দীন দরিদ্রের ভাঙাকুটিরে আত্মগোপন করে আমার দিন কাটতে লাগল । ভিখু সারদিন মাঠে গরু-ছাগল চরায়। সন্ধ্যার পর যখন গঙ্গার বুকে হু হু করে হাওয়া বয়ে যায়, সেই উদাস হাওয়ায় দূরে বৌদ্ধ সংঘারামের ভগ্নস্ত পের চারিধারে গাছপালা হাহাকার করে ওঠে। কান্নার মত শব্দ করে বাতাস মাথা কুটে মরে পিপল আর সাঁই বাংলার ডালপালায়। তখন ঘরের দাওয়ায় বসে ভিখু আমার কাছে দেশবিদেশের গল্প শোনে ।

গল্প শুনতে শুনতে বলে ওঠে কোনদিন-আচ্ছা বন্ধু। সিদ্ধার্থ ছেলেবেলায় এত ভালো ছেলে ছিল । মানুষের দুঃখে এত দুঃখ পেত অথচ তার ভাই দেবদত্ত এত দুষ্টু ছিল কেন ? আমি হাসি-সিদ্ধার্থ যে মহাপুরুষ আর দেবদত্ত ক্ষত্রিয় রাজ-পরিবারের ছেলে। শিকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে যুদ্ধ বিদ্যা শিখতে হচ্ছিল। উড়ন্ত হাঁসকে তীর বিদ্ধ করে সে তো হাতের লক্ষ্য পাকা করছিল। অথচ সেই তীর বিদ্ধ আহত হাঁসটাকে বুকে করে সিদ্ধার্থ ব্যাকুল হল দুঃখে। দেবদত্তের কি দোষ বল !

ভিখু তাচ্ছিল্যে ঠোঁট বাঁকাল-ছিঃ ! রাজার ছেলে হলেই বুঝি ওসব দুষ্টুমি শিখতে হয়। সেই জন্যই তো রাজারা বড় হয়ে মানুষ মারে ।

আমি আবার হাসলাম-সব রাজারা মানুষ মারে না বন্ধু ভিখু ।

ভিখু কিন্তু অটল-না, না। সব রাজাই দুষ্টু। আমি কোনদিন রাজা হব না । ভিখুকে আদর করে বললাম-আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি কোনদিন দুষ্টু রাজা হয়ো না, এসো তোমাকে স্বর্ণদ্বীপের বণিকের গল্প বলি.....সেই যে দারুচিনি লবঙ্গ বনে খরগোশরা ছুটে বেড়ায়। বণিকের মেয়ে সেখানে ঝিনুকের মুক্তো জমায়, সেই দেশে...

ভিখু আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে ।

আমি সারা রাত অতন্দ্র প্রহরীর মত বুক ভরা অক্ষমতার জ্বালা আর অসহায়তা নিয়ে জেগে থাকি। রাত কাটে। দিন আসে। মাস ফুরায়। বৎসর অতিবাহিত হয়। চণ্ডালের কুঁড়ে ঘরে বালক বন্ধুর সঙ্গ নিয়ে আমার দিন যায়।

সংসার বৈরাগী ভিক্ষু উত্তমার্ণ একটি নিষ্পাপ বালকের সাহচর্যে ক্রমশঃ গৃহী হয়ে ওঠে যেন। দীর্ঘ সাধনার জীবনে যে আলো এত সুন্দর হয়ে ধরা দেয়নি সেই আলো বুঝি ভাস্বর হয়ে জ্বলে একটি ছোট মুখের হাসিতে, ছোট বাহু যুগলের আকর্ষণে। নিজেকে ভর্ৎসনা করি আমি। ভিক্ষু উত্তমার্ণ এ কোন্ দিকে আমার মনের গতি ! সংসারের আসক্তিতে তো মুক্তি নেই। মুক্তি নেই ব্যাধি, জরা, বার্ধক্য রোগ- শোকের ভয়াবহতা থেকে। তাহলে ? নিজেকে প্রশ্ন করতে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি আমার মনের দর্পণে একটি আকর্ষণীয় মুখের মায়া। সে মুখ ভিখুর ।

একদিন ভিখুর বাবা তিনকড়ি এসে খবর দিল রাজপ্রাসাদে মহাসমারোহের আয়োজন। মহারাজাধিরাজ শশাংক নূতন বিজয় শেষ করে গৌরবান্বিত হয়ে রাজধানীতে ফিরেছেন। আজ গঙ্গায় প্রমোদতরী ভাসবে। সারা নগরী আলোক সজ্জায় সজ্জিত হবে। রাজা গরীব-দুঃখীকে অকাতরে দান করবেন ।

ভিখুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল- সত্যি বাবা ? আমি যাব আলো সাজান দেখতে । কাঙালী ভোজ খাবো আমি। কতদিন পাঁঠার মাংস আর ডালনা খাইনি। দইও কোনদিন খাইনি আমি বাবা। কেবল হাটে গিয়ে চোখেই দেখেছি ।

ভিখুর মা হাসি-খুশী আশান্বিত চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে সস্নেহ কণ্ঠে বলল-যাস বাবা। যত খুশী পাঁঠার মাংস খেয়ে আসিস। আমি তো আর কোনদিন তোকে ভালমন্দ খাওয়াতে পারলাম না ।

তিনকড়ি দীর্ঘশ্বাস ফেলল-আর ভালো-মন্দ। আমাদের আর মন্দই বা কি ভালোই বা কি। দুটো শাকান্ন জোটাতেই আমরা দিন রাত খেটে মরি। সারা জীবন লোকের দুরছাই ঝাঁটা লাথি সহ্য করি ।

ভিখুর মার মুখ কিন্তু ম্লান হল না-আহা, তাই তো এত খুশী হচ্ছি। এ উৎসবে ছেলেটা দুটো মিষ্টান্ন খেতে পাবে ! আমি হয়তো একখানা কাপড় পাব। দেখ না পরার কাপড়টার কি অবস্থা হয়েছে। ছিঁড়ে কুটিকুটি একেবারে। আহ্ বুদ্ধের কৃপায় মহারাজার এমন নিত্য নূতন বিজয় হোক...... ।

ভিখু চেঁচিয়ে উঠল-চুপ কর মা, চুপ কর। বুদ্ধের নাম করছ মহারাজার কানে যদি যায়। তবে আর আমরা কাপড় খাবার কিচ্ছু পাব না ।

ভিখুর মা হেসে উঠল-বাবাঃ, তোর তো খুব বুদ্ধি হয়েছে ।

আমি ঘরের এক প্রান্তে বসে দরিদ্র পরিবারের আলাপ-আলোচনা শুনছিলাম। বললাম-মা ! ভিখুকে আপনি যেই সেই লোক ভাববেন না। ও মহাজ্ঞানী লোক।

ভিখু ছুটে এসে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আদুরে কণ্ঠে বলল- বন্ধু ! তুমি কেবল ঠাট্টা কর।

ভিখুর চুলে হাত বুলিয়ে আদর করলাম-ঠাট্টা নয় হে আমার ক্ষুদে বন্ধু। তুমি যে সত্যি ভালো।

-ইস ! তোমার মত ভালো ?

উন্মনা হলাম। আমার দৃষ্টি দূরের আকাশের নক্ষত্রলোকে হারিয়ে গেল। ভিখু কি জানে আমার মনে গৃহ-আসক্তি বাসা বেঁধেছে। আমি কি সত্যি ভালো আছি! না না এবার আমার বেরিয়ে পড়া উচিত। আর নয়। আর নয় ।

তিনকড়ি স্তব্ধতা ভাঙল-আচার্য আজ হাটে শুনলাম গৌড়পতি শশাঙ্কের হাতে মৌখরীরাজ গ্রহবর্মন মারা গেছেন । তাঁর স্ত্রী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হয়েছেন ।

চমকে উঠলাম-সে কি ! রাজ্যশ্রী যে থানেশ্বরের রাজা প্রভাকর বর্ধনের কন্যা। কোথায় শুনলে তুমি এসব ?

তিনকড়ি মাথা দোলাল-হাটে একজন বৌদ্ধ দোকানদার চুপি চুপি গল্প করছিল আর একজনের সঙ্গে। আমি পেছন থেকে সব শুনে ফেলেছি। শুনলাম আমাদের মহারাজ কূট-কৌশলে রাজ্যশ্রীর বড় ভাই রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেছেন । রাজা আজ তাই উল্লাসিত আনন্দে । তবে ওরা আরেকটা কথাও বলছিল ।

-কি বলছিল ?

-বলছিল শিগ্রি নাকি আরেকটা বড় যুদ্ধ হবে। রাজ্যশ্রীর আরেক ভাই থানেশ্বরের যুবরাজ শিলাদিত্য প্রতিজ্ঞা করেছেন এ অপমানের প্রতিশোধ তিনি নেবেন। থানেশ্বরে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। ওদিকে কামরূপে না কোথায় এক রাজা আছেন নাম ভাস্কর বর্মন। তিনিও শিলাদিত্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আমার কিন্তু একটা সন্দেহ হয় আচার্য !

–কি সন্দেহ ?

-লোক দুটো বোধ হয় আমাদের মহারাজার বিরুদ্ধে। ওরা সম্ভবত চায় গৌড়রাজ্য শিলাদিত্য দখল করে নিক।

—ওদের কি খুব একটা দোষ দেওয়া যায় তিনকড়ি। দেশের প্রজা সাধারণ যখন রাজার দ্বারা নিগৃহীত হয় তখনই তারা বহিঃআক্রমণে সহায়তা করে। শোনা যায় শিলাদিত্য বৌদ্ধ মতবাদ পছন্দ করে। সম্ভবত তাই গোঁড়া শৈব শশাঙ্কের অবহেলা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি পেয়ে লুপ্ত বৌদ্ধ গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্য এখানকার বৌদ্ধরা শিলাদিত্য সম্পর্কে উৎসাহী। হয়তো তারা গুপ্তচরবৃত্তিও করে থাকে। সে তো মহারাজ শশাঙ্কেরই গোঁড়ামীর ভুলের ফল।

তিনকড়ি চিন্তিত কণ্ঠে বলল-কিন্তু তার ফলে যে অকারণ সন্দেহে নিরীহ বৌদ্ধদের মহারাজের রোষাণলে পড়তে হচ্ছে।

-তাতো হবেই । উভয় পক্ষই ভুলপথে চলেছে ।

-যাক গিয়ে আমাদেরই বা কি। যুদ্ধ তো রাজায় রাজায়। সিংহাসনে যেই বসুক, আমাদের তো তাতে কিছু এসে যায় না ।

তিনকড়ি উঠে গিয়ে ওর মাছ ধরার জাল তালি দিতে বসল ।

পরদিন সন্ধ্যায় যখন গঙ্গা বক্ষে পূর্ণচন্দ্রের ছায়া ভেসে উঠল তখন অসংখ্য সুসজ্জিত ময়ূরপঙ্ক্ষী আলোকমালায় উজ্জ্বল হয়ে নদীতে ভাসল। গীত-বাদ্য রঙ্গ- রসে আনন্দে সারা রাজধানী উচ্ছল হয়ে উঠল। ভিখু আর ওর মা সারাদিন ওদের জামা কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করেছে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ধোয়া কাপড় পরে ভিখু এসে দাঁড়াল আমার সামনে-বন্ধু তুমি যাবে না আলো দেখতে ভোজ খেতে ?

আমি হাসলাম-আমার তো ছাড়পত্র নেই বন্ধু। তুমি খেয়ে এসো। আর জানো তো আমি মাছ-মাংস খাই না ।

ভিখু অবাক হল—ও তুমি যাবে না তাহলে ?

-কি করে যাব ! রাজার সৈন্যরা আমায় ধরে আগুনে ফেলে দেবে যে !

-ওমা ! আজ উৎসবের দিনেও ফেলবে ?

-ফেলতে পারে তো ।

–থাক, তাহলে তোমার আর গিয়ে কাজ নেই। আমি বরং আমার ভাগের একটু মিষ্টান্ন তোমার জন্য পাতায় মুড়ে নিয়ে আসব, কেমন ?

তাই ভালো, যাও বন্ধু ।

ভিখু মা-বাবার সঙ্গে চলে গেল। মাঠের পাশে জনহীন এই বাড়ীটায় আমি চুপচাপ একাকী বসে রইলাম ।

এখানে এখন নিঃসঙ্গ হু হু একটানা হাওয়া। দূরে চন্দ্রালোকিত গঙ্গাবক্ষে উৎসব উচ্ছলিত প্রমোদ তরণী ভেসে চলছে। নানা রঙের ফানুস বাজী আলোর প্রস্রবণের মত আকাশে ঝলসে উঠেছে। আমার ঘরের পেছনে হঠাৎ কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। দীর্ঘ ছায়া পড়ল জ্যোৎস্নালোকিত আঙিনায়। আমি চকিতে উঠে দাঁড়ালাম-কে ? কে ওখানে ?

ছায়া মূর্তি সামনে এসে দাঁড়াল-উত্তমার্ণ !

আমি আরও বিস্মিত হলাম-কে আপনি, কি চান ?

ছায়া মূর্তি আমার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল ।

–আমি, আমি বহুদূর থেকে আসছি। আমার নাম অপলেন্দ্র। ভিক্ষু অপলেন্দ্র । এক সময় নালন্দায় তোমার সহপাঠি ছিলাম ।

আমার যেন সুপ্তি ভঙ্গ হল। দু'হাতে বন্ধু অপলেন্দ্রকে আলিঙ্গনে করে আবেগাতুর কণ্ঠে বললাম-অপলেন্দ্র কেমন করে এলে তুমি ! এ শত্রুপুরীতে কেনই বা এলে ? তুমি কি কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধদের খবর কিছুই শোননি ? জান না তারা কি ভয়াবহ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে ।

অপলেন্দ্র গম্ভীর কণ্ঠে বলল-তার চাইতেও ভয়াবহ খবর নিয়ে এসেছি উত্তমার্ন! শশাঙ্কের বর্বর সেনাবাহিনী বৌদ্ধ গয়ার ‘বোধিদ্রুম' কেটে ফেলেছে।

–বোধি বৃক্ষ কেটে ফেলেছে ! বলছ কি ?

হ্যাঁ, উত্তমার্ণ। আমি নিজে দেখে এসেছি। সব দেশের বৌদ্ধরা হাহাকার করছে। কিন্তু শোন, আমি এর প্রতিশোধ নিতে এসেছি।

-সে কি ! বৌদ্ধ ভিক্ষু কেন প্রতিহিংসাপরায়ণ হবে ?

-না হয়ে উপায় নেই উত্তমার্ণ। এ নগরীতে আমাদের বহু গুপ্তচর রয়েছে। আমি এক কম্বোজদেশীয় ডাকিনীর (তিব্বতী যাদুকরী) কাছ থেকে এক ধরনের বিষ এনেছি। এ বিষ কারো শরীরের ছিটিয়ে দিলে তার সর্ব শরীর বিষাক্ত ঘায়ে খসে পড়বে। এই বিষ নিক্ষেপ করতে হবে শশাঙ্কের শরীরে। তোমাকেই করতে হবে সে কাজ ।

আমি শিহরিত হলাম-এ কি সাংঘাতিক কথা বলছ অপলেন্দ্র। না, না, আমি পারব না। এ নিষ্ঠুর কাজ আমার দ্বারা অসম্ভব ।

অপলেন্দ্র কঠিন হল-অসম্ভব ! কেন ? তুমি কি দেশের শত শত নিরীহ বৌদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ-শিশুর নিরাপত্তার কথা ভাববে না। তাছাড়া যদি বোধিবৃক্ষ উৎপাটনের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ বিরোধী শশাঙ্ক এমন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে তবে সবাই একে অলৌকিক অভিশাপ বলে ভাববে। এবং তাতে বৌদ্ধদের মর্যাদা জন- সমাজে বৃদ্ধি পাবে।

অভিভূতের মত উচ্চারণ করলাম-মর্যাদা। কিন্তু এমন গুপ্ত চক্রান্তে...

আমার কথা শেষ হল না ! একটু দূরে মাঠের দিক থেকে কান্নার রোল শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম আমি । এ কি, এ যে তিনকড়ি আর ভিখুর মায়ের কণ্ঠ।

দ্রুত ছুটে গেলাম মাঠের দিকে। শুভ্র জ্যোৎস্নায় মাঠের মাঝে তিনকড়ি আর তার স্ত্রীর কাছে এলে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার সারা দেহ থর থর করে কেঁপে উঠল। ভিখুর মায়ের কাপড়ে জড়ান ভিখুর দলিত মথিত বিকৃত মৃত দেহ। রক্ত- মাংসের একটি ছিন্ন ভিন্ন দলা বলা যায় ।

তিনকড়ি এসে গড়িয়ে পড়ল আমার পায়ে-আচার্য দেখুন আমার ভিখুকে দেখুন। এর বিচার করুন। এর বিচার করুন ।

আমি যেন বোবা হয়েগেছি। আমার দেহ চলৎশক্তি রহিত। আমার ওষ্ঠ বাক্যহীন ।

অপলেন্দ্র এসেছিল আমার সঙ্গে। সেই প্রশ্ন করে জানল ভিখুর অপমৃত্যুর কথা।

ভিখু রাজার কাঙালী ভোজ খেয়ে লঘুচিত্তে উৎসব মেলায় ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে। খেলাধুলা আলোকসজ্জা দেখেছে। ফেরার সময় সে ভোজ

পরিবেশনকারীর কাছে সামান্য মিষ্টান্ন প্রার্থনা করেছিল। তারা তাকে দুর দুর করে তাড়িয়ে দেয়। ভিখুর মা-বাবা একটু দূরে ছিল বলে এসব কিছুই জানতে পারে নি। ভিখু বার বার প্রার্থনা করেছে—একটু মিষ্টান্ন দাও আমার বন্ধুকে খাওয়াব। একজন পাচক বিরক্ত হয়ে গরম খুন্তি দিয়ে ভিখুর হাতে দাগ দিয়ে দিল। যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে ভিখু ছুটে পালাল। কিন্তু বন্ধুকে মিষ্টান্ন খাওয়ার সংকল্প ভিখুর দমল না। এক সময় সে বাবা-মায়ের চোখ এড়িয়ে যেখানে রাজকীয় অতিথিদের খাওয়ার স্থান করা হয়েছিল তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সামনেই বিরাট স্বর্ণপাত্রে মিষ্টান সাজান থরে থরে। এমন খাদ্য ভিখু জীবনে চোখে দেখেনি। পরিচারকদের অগোচরে টপাটপ দুটি মিষ্টি তুলে পাতায় মুড়ে ভিখু যখন চলে আসছে তখনই একজন পরিচারকের সামনে পড়ে গেল। মিষ্টিচোর ভিখুকে ধরে নিয়ে এল সবাই তত্ত্বাবধায়কের সম্মুখে ।

মহা সোরগোল চীৎকার শুনে ভিখুর মা-বাবা ছুটে গেল সেদিকে। দূর থেকে তারা শুনল হুংকার গর্জন। প্রহারের শব্দ ছাপিয়ে ভিখুর কান্না -----আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। আমি নিজে খাবার জন্য চুরি করিনি। আমার বন্ধুকে খাওয়াব। সে মাছ-মাংস খায় না। সে যে ভিক্ষু ।

আর কিছু শুনতে পায়নি ভিখুর মা-বাবা ! রাজার কাছে খবর গিয়েছল। চণ্ডাল বালক খাদ্য স্পর্শ করে ভোজ সভা অস্পৃশ্য করেছে। ছেলেটি কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর চর । রাজাদেশ মৃত্যুদণ্ড। পাথরের ওপরে আছড়ে আছড়ে ভিখুর ছোট্ট দেহ চূর্ণ করে দেওয়া হল। তারপর নিক্ষেপ করা হল বনের দিকে। সেখান থেকে চুপি চুপি ভিখুর মা-বাবা একমাত্র প্রিয় পুত্রের বিচূর্ণ শব কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

আমি স্তব্ধ হয়েছিলাম। ভিখুর মা তার কাপড় বিছিয়ে দিল মাটিতে। বিকারগ্রস্ত কণ্ঠে বলল-এই নিন আচার্য, আপনার বন্ধুকে। সে আপনার জন্য মিষ্টান্ন এনেছে ।

আমি তাকিয়ে দেখলাম ভিখুর একটি বিচ্ছিন্ন হাতের মুঠিতে ধরা তখনও মিষ্টির গুঁড়ো জড়ান পাতা, রক্তে লাল ।

আমার দৃষ্টির সামনে থেকে এই চন্দ্রালোকিত রাত, আলোক বিকীর্ণ নদীর জল, উৎসব মুখর দূরের নগরী ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে গেল। ভয়ংকর এক প্রতিহিংসা যেন ঘুম ভাঙা সিংহের মত কেশর ফুলিয়ে গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল আমার

মধ্যে। আমি ফিরে তাকালাম অপলেন্দ্রের দিকে। হাত বাড়িয়ে বললাম-কোথায় সেই ডাকিনীর বিষ, দাও। আমার আর কোন বাধা নেই।

আজও আমি মনে করতে পারি শশাঙ্কের সারা শরীরের মাংস সেই বিষে পচে গলে পড়েছিল ।

সে বিষ আমি ছিটিয়েছিলাম শশাঙ্কের রাজপুরীর এক দাসীর সহায়তা নিয়ে।

আর সত্য ভ্রষ্ট হিংস্র উত্তমার্ণ অপমৃত্যু বরণ করেছিল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে। গলায় কলস বেঁধে ডুবে মরবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ভুলতে পারিনি একটি মৃত বালকের খণ্ডিত হাতের মুঠিতে ধরা পাতায় মোড়া একটি মিষ্টির কথা।

শশাঙ্কের বিষ নিক্ষেপকারী উত্তমার্ণ গৃহ বাঁধনের বিরহ জ্বালা দূর করে নির্বাণ লাভ করতে পারল না। সৎকর্মের অভাব আর সংসারের আসক্তিতে পুনঃজন্ম হল তার।

দুই

জালিপ্যাগর্জার পাতায় পাতায় সোনালী রোদ ঝিকমিক করছে। কার্পাস ক্ষেতে উড়ে বেড়াচ্ছে টুনটুনি ! দূরে টিলার বনানীর গাছগাছালী লাল ফুলে ছেয়ে গেছে। আমি দু'পণ কড়ির থলে কোমরে বেঁধে বাড়ী থেকে বের হচ্ছিলাম। আজ চম্পাকে নিয়ে কমলঙ্কার হাটে যাব ।

পিছন থেকে মা ডাকল-কোথায় যাচ্ছিস রে পঞ্চ ?

নিকানো দাওয়ায় বসে চরকা কাটছিল মা। ফিরে এসে মায়ের কাছে দাঁড়ালাম-একটু বাইরে যাচ্ছি মা।

মা মিষ্টি করে হাসল-তা তো দেখতেই পাচ্ছি। চম্পাকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিস বুঝি ?

মায়ের পাশে বসে পড়ে দু'হাত দিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলাম-ইস্ মা । তুমি যে কি করে সব বুঝতে পারো। তোমার চোখকে একটুও ফাঁকি দেবার উপায় নেই ।

মা আবার হাসল-ফাঁকি দেবার কি আছে রে বাবা। তবে তোর বাবা বলেছিলেন যে, তুই আজকাল শবর পাড়ায় দিনরাত পড়ে থাকিস। কাজকামে মন নেই।

তাছাড়া তার ইচ্ছা সাংঘারমে গিয়ে তুই লেখাপড়া শিখিস। জ্ঞানী বলে পরিচিত হোস ।

আমার মুখের হাসি তিক্ত হয়ে উঠল—তুমিও অমন কথা বোলো না মা । সংঘারামের প্রধান ভিক্ষুরা তো এখন চন্দ্ররাজাদের চাটুকার। ধন সম্পদ সম্মান মর্যাদার লোভেই এখন সবাই সংঘারামের ছাত্র হতে চায়। ধর্ম রক্ষক না বলে তাদের রাজ্য রক্ষক বলাই ভাল ।

-ছিঃ ! বাবা এমন কথা বলতে নেই ।

-কেন বলতে নেই। জানো মা আমি অনেক পুরনো কথা মনে করতে পারি । জানো শশাঙ্কের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল পুণ্ড্র গৌড় রাঢ় আর সমতটে এক কঠিন সময়ে কেটেছে। সবলের অত্যাচারে দুর্বলেরা দিশেহারা হয়ে থেকেছে। বড় মাছ যেমন ছোট মাছ গিলে খায়তেমনি সবলেরা দুর্বলকে সংহার করেছে। ঠিক সেই সময় অসহ্য হয়ে পুণ্ড্রনগরের মানুষ একদিন বৌদ্ধ মঠের সামনে সাদা হাতী ছেড়ে দিয়ে ছিল । হাতী যাকে শুঁড়ে তুলে পিঠে বসাবে সেই হবে রাজ্যের রাজা।

মায়ের হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল ।

আমি হাসলাম-তুমি বিশ্বাস করছ না মা ?

—হ্যাঁ করছি। তুই বল ।

–সেই সাদা হাতী মাঠের সামনে থেকে গোপাল নামে এক ভিক্ষুকে পিঠে তুলে নিল। জনতা হর্ষধ্বনী করে উঠল। কারণ সদাশয় জ্ঞানী বিচক্ষণ বলে গোপালের বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। সেই গোপালের বংশই আজ দীর্ঘদিন ধরে পুণ্ড্র শাসন করে আসছে। এই বিখ্যাত বৌদ্ধ পাল রাজবংশের রাজ্য সীমা বহু দূরদুরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। অসংখ্য বিহার সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত করেছে তারা। শিল্পকলার চর্চা, শাস্ত্র অধ্যয়ন, জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণায় পাল রাজ সভা বিখ্যাত। কিন্তু মা একদিন যে দুঃখী মানুষের দুর্দশা দূর করবার জন্য গোপালকে রাজা নির্বাচিত করা হয়েছিল তারই বংশধররা জাতিভেদের কঠোরতা দূর করতে পারে নি। দেশে একদিকে যেমন ঐশ্বর্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রাচুর্যের ঝলক, আরেক দিকে রয়েছে ক্ষুধা দারিদ্র্য অনাচার। দুঃখী ডোম

শবররা চণ্ডালরা ঘৃণিত, অর্ধভুক্ত, অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে এক কোণে । কে ভাবে তাদের কথা ! তারাও যে মানুষ মা ।

মায়ের চক্ষু সজল হয়ে উঠল। আবেগপ্লুত কণ্ঠে বলল-পঞ্চ তুই এসব বলিস না আমি সহ্য করতে পারি না বাবা ।

আমি হাসলাম-তাহলে মা তুমি কেন আমাকে সংঘারামের ছাত্র হতে বল ? সংঘারামের ভিক্ষুভিক্ষুনীদের অনাচারের কথা তুমি কি জান না ! ভগবন বুদ্ধের মহৎ বাণী যে লুপ্ত হতে চলেছে। বৌদ্ধ আচার্যরা জ্ঞান দান থেকে বহু দূরে সরে পড়েছে।

আজ তারা সমাজের হর্তাকর্তা। বৌদ্ধ রাজারা বিরাট বৌদ্ধ সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সোনা-রূপা-হীরা-মুক্তা-মানিক্যে চোখ ধাঁধান যে সৌধ নির্মাণ করছে তা ধর্ম রক্ষার জন্য নয়, নিজেদের কীর্তিকে অমর করবার জন্য। ওই ধনীর সৃষ্ট ধর্মালয় সহজ মানুষের জন্য নয়। ওতে আসক্তি, মুক্তি নয় ।

মায়ের দুচোখ দিয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ল। আঁচলে চোখ মুছে মা বলল—পঞ্চু তুই যে জাতিস্মর। তুই তো আমাদের মত সাধারণ নস ! দুঃখী মানুষের কথা তুই সবাইকে শুনিয়ে দে। এই লালমাটি, প্রাগ জ্যোতিষপুর, চন্দ্রদ্বীপ বংগাল, সবাইকে জাগিয়ে দে ।

আমি মায়ের কোলে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করলাম। মা, আমার মমতাময়ী মা। কত বড় আমার মা। মুখে বললাম-মা, দুঃখী যে আমরাও। শবর, চণ্ডাল, ডোম, কৈর্বত সবাই দুঃখী। এদের ঘরে ভাত নেই । এরা সকলের ঘৃণার পাত্রা। ডোম হাড়ী সবর বালিকাদের সামাজিক সম্মান নেই। দেহ বেচে এদের পেটের ভাত জোগাড় করতে হয়। এদের বাড়ীর বউ-ঝিদের উঁচু শ্রেণীর লোকেরা সম্ভ্রম হানি করে। কিন্তু এরা তো মুখ খুলতে পারে না ।

মা আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দূরের ঢেউ তোলা সবুজ পাহাড়ের সারিতে।

বেলা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে রৌদ্র ম্লান হয়ে এসেছে। আমাদের বাড়ীর পাশের রাস্তা দিয়া ঢং ঢং করে গলায় ঘণ্টা বাজিয়ে কার হাতী চলেছে। মা সহসা উদাস উন্মনা কণ্ঠে বলল- পঞ্চ তুই সহজিয়াদের গান শুনেছিস ? আমাদের চন্দ্রদ্বীপের এক জেলের ছেলে মৈনার (মীননাথ) গান শুনিস নি ?

উঠে বসলাম— হ্যাঁ মা। শুনব না কেন ? সেই যে ছেলেবেলায় যখন বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলে নীল আকাশ সোনার মত রোদে ভরে যেত তখন তুমি তুলো রৌদ্রে দিতে। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতাম তখন তুমি যে মৈনার গান গাইতে। সে গান আমি এখনো ভুলিনি মা ।

মা ভারী সুন্দর হাসল – আর শবরপাদ সিদ্ধর গান শুনেছিস ?

আমি উঠে বসলাম শুনেছি মা। অনেক শুনেছি। কিন্তু তোমার মুখে শুনতে ভারী ইচ্ছে করে । গাও না মা একটা ।

দূরে বনানীর অন্তরালে সূর্য অস্তমিত হয়েছে। সংঘারামের ঘণ্টা বেজে উঠেছে। জালিপ্যাগর্জার পাতায় পাতায় গোধূলীর রং করুণ বেদনার মত ছড়িয়ে আছে। দূরের টিলার জঙ্গল থেকে বাতাসে পাকা কুচংগিনার মাতাল গন্ধ ভেসে আসছে। গুন গুন করে গান ধরল মা ।

উচ্যা পর্বতে থাকে দুঃখী

শবর বালা,

ময়ূরের পুচ্ছ পরে, গলে

গুঞ্জর মালা ।

ফুলে ফুলে ছাইল রে বন শূন্যে

ছুইল ডালা

আহা ! বিজনে ঘুইরা মরে

শবরী কর্ণকুণ্ডলা ।

আহা শবরী একেলা ॥

মায়ের গানের সুমধুর সুরের মায়ায় যেন চম্পার করুণ বিষণ্ণ মুখচ্ছবি মূর্ত হয়ে উঠল। আমি চঞ্চল হলাম । মা তখন গাইছে :

“ওরে পাগোল শবর রে-

কিসের জঞ্জালা -

উঠে বসলাম আমি – মা ।

মা থামল – কি রে পঞ্চ ?

আমার কিছু ভালো লাগে না মা ।

মা সস্নেহে আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিল । কেন রে কি হয়েছে ?

আমি চম্পাকে নিয়ে যোগী হয়ে যাব।

সে কি রে পাগোল ছেলে !

হ্যা মা। ওই 'বজ্র, শঙ্খ, চক্র নদীর' মতধারায় আমি মুক্তি চাই না ! আমি সিদ্ধনাথ হব । নৈরাত্মা দেবীর সন্ধানে । কিন্তু সেই নৈরাত্মা দেবী কি তা কি জানো মা ?

- কি করে জানব বাবা ? আমি যে মুখ্য মেয়ে মানুষ। আমি তো জানি আমরা সহজযানী আমি কেবল সহজযান বজ্রযান বৌদ্ধদেরই বুঝি ।

- কে তোমায় মূর্খ বলে মা। তুমি যে মানুষ চেন ! জানো মা সহজিয়া সিদ্ধরা এই নৈরাত্মা দেবীর মধ্য দিয়ে যে মানুষের আত্মার সম্মানকে খুঁজে বেড়ায়। সাধারণ মানুষকে আজ বুদ্ধের বাণী থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সিদ্ধনাথরা আজ তাদের মতবাদ নিয়ে আমাদের মত মানুষের হয়ে গান গেয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যা বয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আকাশে ঝিকমিক করে জ্বলে উঠেছে তারার দীপ। মা উন্মনা কণ্ঠে বলল তোর যা ভালো লাগে তাই তুই কর বাবা। তোর শান্তিতেই আমার শান্তি ।

দু'হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলাম আমি – মা, আমার লক্ষ্মী মা তোমার মত আর কেউ নয় ।

মা উজ্জ্বল হাসল – আমি যে রত্নগর্ভা। তুই আমার পূর্ব জন্মের সৎকর্মের ফল। কমলঙ্কার হাট থেকে ফিরছিলাম আমি আর চম্পা। চম্পার বাহুতে রুপোর বাউটি । মুখে কর্পূর সুগন্ধি পান। আনন্দে ঝলমল চম্পা ।

চম্পার মুখের মিষ্টি সুগন্ধ আমায় পাগোল করে তুলছিল। ওর খোঁপার ফুলের

সুবাস আমার মনে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল। আমার হাতের বাঁশী মুখে লাগিয়ে মৈনার (মীন নাথের) গানের সুর বাজাতে বাজাতে আমি হাঁটছিলাম। দ্বিপ্রহরের সোনালী রোদ শ্যামল টিলার ঢেউয়ে অপরূপ রং ছড়িয়েছে। আমলকী বনে হরিণ ডাকছে । ময়ূরের ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে ডালে ডালে। পথের ধারে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল চম্পা।

বস পঞ্চ ! এখানে বসে তোর বাঁশী শুনি।

আমি ঠোঁট থেকে বাঁশী নামিয়ে দিলাম। চম্পার পাশে বসে পড়ে বললাম - আয় আমি তোকে দু'চোখ ভরে দেখি চম্পা। এত সুন্দর তুই চম্পা। মাঝে মাঝে মনে হয় তোর রূপে আমি বুঝি পাগোল হয়ে যাব ।

চম্পা ঝিকমিকিয়ে হাসল – তোর কেবল ঠাট্টা পঞ্চ ।

– ঠাট্টা ! কেন তোর জন্য আমি কি সত্যি পাগোল নই। তোর মত এ ত্রিভুবনে আর কে আছে ?

চম্পার দৃষ্টি বিষণ্ণ হল – তাই বুঝি তুই আমায় ফেলে যোগী হয়ে যেতে চাস। চম্পার সুপুষ্ট রক্তিম ঠোঁটে চুমু খেলাম আমি তোকে নিয়েই তো যোগী হব । তোকে ছেড়ে কোথায় যাব আমি ?

আমার বুকে মাথা রেখে সুখের আবেশে চম্পা এলিয়ে পড়ল । বলল আমার বড় ভয় হয় রে পঞ্চ ।

- কিসের ভয় ?

- দেখিস নি কমলঙ্কার হাটে ডোম আর শবর মেয়েরা খোঁপায় ফুল পরে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে । এক গণ্ডা কড়ির আশায় ওই সব নীল চোখ সোনালী চুল বণিক আর ব্রাহ্মণদের সেবার আশায় ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে থাকে। জানিস পঞ্চ, আজ যখন তুই আমার জন্য পান কিনতে গেছিস তখন হাতীর পিঠে চড়া একজন ধনী বণিক আমার সামনে এসে থেমে পড়েছিল। আমায় ডাকছিল। বলছিল সোনার বাউটি দেবে এক রাতের বদলে।

আমি সচকিত হলাম - তারপর ?

শংকিত উত্তর দিল চম্পা - তারপর আমি ছুটে পালিয়ে এলাম ভীড় ঠেলে লোকটা যদি আমায় ধরে নেয় ? ও কি আমায় নর্তকী ডোম্বিনী ভেবেছে না

কি? তুই আমায় ফেলে কোথাও যাস না পঞ্চু। আমি চালের কাড়ার জাউ খেয়ে থাকব তবু ওই সব লম্পট পয়সাওয়ালাদের হাতের পুতুল হব না। আমরা কি মানুষ নই পঞ্চু । ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল চম্পা ।

চম্পাকে আদর করলাম। ঠোঁটের স্পর্শের আবেগে ওর চোখ মুখ চুল ভরিয়ে দিলাম – চম্পা, আমার চম্পা। কাঁদিস না তুই। এর বিচার একদিন হবেই ।

চম্পা আরো কেঁদে উঠল কবে ? আর কবে হবে ? ব্যাধের তাড়া খাওয়া হরিণীর মত আর কত পালিয়ে ফিরব ? জানিস বাবা কি বলে ?

কি বলে ?

– বলে ডোম শবর চণ্ডাল এরা তো ধনীর মন যোগাবার জন্যই। যাদের পেটে ভাত নেই তাদের আবার সতীত্ব কি ।

আমার মুখের রেখা বোধ হয় কঠিন হয়ে উঠল তোর বাবা তিপুর আহেরী জঙ্গলের লোক। সে আর এর বেশী কি বলবে। তোর মা চরকা তৈরি করে হাটে বিক্রি করে। তোর বড় বোন কুচংগিনার মদ তৈরি করে কমলঙ্কার শুঁড়িখানায় ফেরী করে। সোনার কানট সোনার বাউটি কুসুম শাড়ী তার পরনে। তারা তো একেই সুখ মনে করে। কিন্তু তোদের ছায়াকে যখন সবাই থুথু দেয় তখন ?

চম্পা জবাব না দিয়ে নিরুপায় বিষণ্ন ভঙ্গীতে বসে রইল।

আমার মনে আবার উথাল পাথাল সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল । বিস্মৃতির উদ্দামতার মাঝ দিয়ে আমি হারিয়ে যেতে লাগলাম যেন কোথায় ।

চম্পা আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে অস্থির হয়ে উঠল। দু'হাত দিয়ে আমার কাঁধ ঝাঁকুনী দিল প্রবল শক্তিতে। ব্যাকুল হয়ে ডাকল পঞ্চ। পঞ্চু, কি হল তোর? এমন কেন করছিস ? কথা বলছিস না কেন ? আমার ভয় করছে পঞ্চ।

প্রাণপণে নিজের চেতনাকে জাগ্রত রাখতে সচেষ্ট হলাম। কিন্তু আমি এ কি দেখছি। দেখছি প্রচণ্ড কোলাহল । ভয়াবহ যুদ্ধ । অজস্র রক্তপাত। পুণ্ড্রে বিখ্যাত পাল বংশের রাজা অত্যাচারী মহীপালের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়েছে কৈবত বাহিনীর অস্ত্র । সে বাহিনীর অগ্রভাগে রয়েছে কৈবর্ত নেতা দিব্যক। জয়ের উল্লাসে এগিয়ে চলেছে কৈর্বত সেনারা । প্রাণ ভয়ে ভীত অত্যাচারী রাজপুরুষের হাতের অস্ত্র খসে পড়েছে।

যে কৈবর্তদের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়েছে পাল রাজারা, হাতীর পায়ের নীচে ফেলে যাদের পিষ্ট করছে, রাজকীয় শুল্ক আদায়কারী কর্মচারীদর অংকুশের আঘাতে যাদের পিঠের কালো চামড়া কেটে লাল রক্ত ফিন্‌ কি দিয়ে ছুটছে,

তাদের স্ত্রী কন্যাদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করেছে রাজ কর্মচারীরা, আজ কোন্‌ মন্ত্রের বলে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ! ক্ষমতাগর্বিত পাল-রাজার স্বর্ণ মুকুট ধুলায় লুণ্ঠিত ।

পুণ্ড্রের সিংহাসনে আসন নিয়েছে কৈবর্তনেতা দিব্যক। তাদেরই প্রতিনিধি হয়ে যারা এতদিন সকলের অত্যাচারে বোবা পশুর মত মার খেয়েছে। আমি নিজেকে দেখছি দিব্যকের প্রধান সেনাপতি আর পার্শ্বচর রূপে। আমার হাতেই মৃত্যু ঘটেছে মহীপালের ।

সহসা চম্পার আকুল কান্নায় আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। দৃষ্টি মেরে তাকালাম চম্পার দিকে। আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল চম্পা। কান্না উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল— তুই এমন কেন হয়ে গিয়েছিলি পঞ্চ ? আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। সত্যি মাঝে মাঝে তুই যে কেমন হয়ে যাস। আমি তখন যেন তোকে একেবারেই চিনতে পারি না ।

আমি ম্লান হাসলাম— চম্পা। আমাকে তুই চিনতে চাস না। যেটুকু চিনেছিস এই যথেষ্ট। ওঠ বিকেল হয়ে এল । চল ডোমপাড়ার ওদিকে আজ সহজিয়া সিদ্ধদের গান হবে, শুনবি চল ।

চম্পা উঠল না। বলল- থাক তার চাইতে আমি টালে ফিরে যাই। আমার কিছু ভালো লাগছে না ।

আমি আবার চম্পাকে আদর করলাম – তুই একটুকুতেই রাগ করিস। চল না গান শুনে আসি। আর জানিস পাহাড়ের কোলে ফাঁদ পেতেছি। তুই আর আমি বনমোরগ ধরব কাল ।

চম্পা তবু মুখ ভার করে রইল। আমি চম্পার হাত তুলে নিলাম আমার হাতের মুঠিতে – আমার কথা শুনবি না তো। বেশ কালই আমি এখান থেকে চলে যাব দেশান্তরে ।

চম্পা শংকিত হল - না। না তুই কোথায়ও যাবি না পঞ্চু। তুই যা বলবি তাই শুনব। একটুও রাগ করব না আর ।

– বেশ তাহলে ওঠ এবার।

চম্পা উঠে দাঁড়াল ।

টিলার মাথার ওপর এক ফালি বাঁকা চাঁদ স্বল্পালোক বিকিরণ করে ভেসে চলেছে তারোকালোকিত আকাশ বেয়ে। ডোমপাড়ার মাঠে পাতার চাটাই পেতে সিদ্ধ সহজিয়াদের আসন পাতা হয়েছে। চারদিকের স্ত্রী-পুরুষ আবাল বৃদ্ধ বনিতা এসে জড়ো হয়েছে গান শুনবার জন্য। বংগাল, উজানী নগর (উত্তর বঙ্গ) চাটিলের পণ্ডিত বিহার (বর্তমান চট্টগ্রাম) থেকে সিদ্ধ নাথরা এসেছে। অগুরু চন্দন ধূপ-ধুনার সুগন্ধে সন্ধ্যার বাতাস সুরভিত।

প্রথমে একজন সিদ্ধ সহজিয়া এসে নামল আসরে। পিছে তার সঙ্গতকারীরা নানা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসল । ঐকতানে বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠল, গান ধরল সহজিয়া:

আহ – রে – এ

কায়া ছোট নৌকারে

খাঁটি দাঁড় মন -- ও

হাইল হইল ভাইরে

সদ্ গুরুর বচন ———ও

আরে – খাঁটি মন দাঁড়

পারে যাইবার অন্য উপায়

নাই তো যে রে আর ॥

সংগতকারীরা ধুয়া ধরল

আরে – খাঁটি মন দাঁড় ।

পারে যাইবার অন্য উপায়

নাই তো যে রে আর ॥

একটার পর একটা গান চলল। রাত বাড়ল। হু হু উদাস বাতাসের মত উদাস

হয়ে গেল শ্রোতাদের মন। কেথায় সেই খাঁটি মন। কোথায় সদগুরুর বচনের আশ্রয় ? কি আশ্রয় করে এই দুঃখী সমাজ অবহেলিত মানুষেরা মুক্তি পাবে। উন্মানা হয়ে ছিলাম আমিও। সহসা এক করুণ গানের সুরে সম্বিত ফিরে পেলাম। একজন চুলদাড়ি সমাচ্ছন্ন সহজিয়া গাইছে ।

নগরের বাইরে ডোমনী

ভাঙা কুঁইড়া তোর –

করে .... তারই ধারে ঘুরাঘুরি

..... ন্যাড়া বামুন চোর.......

আশেপাশে তাকালাম। ডোমনী মেয়েরা যারা দেহ বেচে পেটের ভাত জোগায় তাদের দুচোখে জলের ধারা নেমেছে।

সহজিয়া তন্ময় হয় গাইছেঃ

আমি ডোমনী রে......

টালের উপর

ভাঙা ঘর মোর

পাড়া পড়শী নাই । শূন্য হাঁড়ি

ভাত জোটেনা

নিত্যি উপাস যাই ।

সহজিয়া গানে যখন সবাই আত্মবিস্মৃত ঠিক সেই সময় লালমাটির আকাশ মশালের আলোয় রক্তিম হয়ে উঠল। ঘোড়ার খুরের সম্মিলিত শব্দে উত্তাল হয়ে উঠল আকাশ বাতাস বনভূমি জনপদ ।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যেন প্রলয় ঘটে গেল। উন্মুক্ত তরবারী হাতে ছুটে এল বিদেশী দস্যু অভিযানকারীরা।

এপক্ষের প্রতিরোধের পূর্বেই ধ্বংসের আগুন জ্বলে উঠল নগর জনপদে ।

গ্রাম নগর জনপদ দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। মানুষের বিখণ্ডিত দেহের স্তূপ থেকে রক্তের ধারা নদীর স্রোতের মত বয়ে চলল লালমাটির বুক সিক্ত করে।

আগুন জ্বলল সংঘারামে। নির্যাতিতা নারী আর পুরুষের মৃতদেহের ওপর দিয়ে বর্শা ফলকে শিশু-দেহ বিদ্ধ করে বিজয়ধ্বজা উড়িয়ে এল শত্রুবাহিনী। সুবর্ণ গ্রাম (সোনার গাঁও, ঢাকা) চন্দ্ররাজাদের রাজধানী চন্দ্রদ্বীপ দলিত মথিত করে, সোনা দানা লুণ্ঠন করে, বৌদ্ধ বিহারে আগুন ধরিয়ে লহিতগিরিতে (লালমাই, কুমিল্লা) এসে থামল বিদেশী সম্পদলোভী দস্যু অভিযানকারীর দল ।

সুদূর উত্তরাপথের (পাঞ্জাবের) অধিবাসী ব্রাহ্মণ ভোজবর্মণ বৌদ্ধ চন্দ্র রাজ্যের গৌরব ধুলায় মিশিয়ে দিল। স্বাধীন সমতট বংগআল বিদেশীর পদানত হল ।

তিন

যখন জ্ঞান হল আমি তাকিয়ে দেখলাম আমি এক বালুকাময় চরে অচৈতন্য হয়ে পড়ি আছি। দুর্বল শরীর নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। না এবার আমার জন্মান্তর ঘটেনি। আমি লালমাটির অধিবাসী পঞ্চগোপাল চাঁদ। পূর্বজন্মের স্মৃতির মতই মনে পড়ল আমাদের সেই দিগন্তবিস্তৃত কাপাস ক্ষেত, সেই নিকানো দাওয়া, জালিপ্যাগর্জার পাতা ছায়ায় দুকুলা কার্পাশিকা বয়নরতা আমার মমতাময়ী মা, আমার বাবা, দুঃখী শবরীবালা আমার প্রেয়সী চম্পা। কোথায় তারা আজ ? তাদের দগ্ধ গলিত শব হয়ত গৃধিনীর নখরে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে !

আপাতত নিজের চতুর্দিকের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হলাম। মাথার ওপর উঠতি বেলার সূর্য প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে জ্বলছে। জনমানব শূন্য বালুকাময় এই চরের চতুর্দিকে নীল ফেনিল ঢেউ ক্রমাগত খলখল শব্দে মাথা কুটছে। এ কোথায় এলাম আমি ? আর কেমন করেই বা এলাম । হয়তো শত্রুসেনরা মৃতদেহ নদীতে ভাসাবার সময় সেই সঙ্গে আমাকেও ফেলে দিয়েছিল। হাঙ্গর কুমিরের পেটে না গিয়ে ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে কোথায় এই নদীর মোহনার চরে এসে ঠেকেছি।

বেলা ক্রমশঃ বাড়ছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে উঠলাম। লক্ষ্য করলাম বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জলও ক্রমশঃ স্ফীত হয়ে উঠেছে। ঢেউয়ের সারি উত্তাল

হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্থলভূমি গ্রাস করছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। কূলের কাছে এগিয়ে এক আজলা জল তুলে মুখে দিতে কটু লবণাক্ত স্বাদে আমার মুখ জ্বলে গেল । বুঝলাম আমি সাগর দ্বীপের মোহনায় ভাটির কাছাকাছি এসে পড়েছি। জ্বলন্ত তপ্ত বালির ওপর দাঁড়িয়ে চোখের ওপর হাত রেখে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চেষ্টা করলাম।

বহু দূরে অস্পষ্ট কূলের রেখা দেখতে পেলাম। নীল আকাশের বুকে সবুজ পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়ার সারি। কিন্তু অত দূর থেকে কে আমার অসহায় অবস্থার কথা জানতে পারবে। আর আদৌ ওখানে লোকালয় আছে কিনা সন্দেহ ।

সহসা এক ঝাঁক সামুদ্রিক পাখীর কাকলীতে আমি চমকিত হলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম এক ঝাঁক গাঙ-পায়রা উড়ে আসছে। আর সেই উড়ন্ত পাখীর ঝাঁকের পিছে দিকচক্রবালে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটি বহিত্রের (সমুদ্রগামী জাহাজের) পাল-মাস্তুল ।

আমি উৎফুল্ল হলাম। যেন নতুন আশার আলো দেখতে পেলাম। জাহাজের পাল সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সম্ভবত কোন বিদেশী বণিকের জাহাজ। এই চরের পাশ দিয়েই বোধ হয় জাহাজটা যাবে। মুহূর্তে আমি কর্তব্য ঠিক করে ফেললাম। আমার ঊর্ধ্বাঙ্গের জামা খুলে হাত তুলে দোলাতে লাগলাম। সেই সঙ্গে প্রাণপণ চীৎকার করতে লাগলাম সাহায্যের জন্য ।

আমার হস্ত আন্দোলনে কাজ হল। জাহাজটা ধীরে ধীরে চরের কাছাকাছি এগিয়ে এল। চরের থেকে একটু দূরে নোঙ্গর করে থেমে পড়ল। দু'জন নাবিক জাহাজের সঙ্গে বাঁধা ডিঙি খুলে চরের দিকে দাঁড় বেয়ে এল। লোক দু'জন যখন মাটিতে নেমে আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি অবসাদে উত্তপ্ত বালির ওপর পড়ে আবার আমি সংজ্ঞাহীন হলাম ।

যখন জ্ঞান হল তখন তাকিয়ে দেখলাম আমি জাহাজের একটি প্রকোষ্ঠে আরামপ্রদ বিছানায় শুয়ে। আমার পাশে উৎসুক দৃষ্টি মেলে কয়েকজন লোক বসে আছে। আমাকে তাকাতে দেখে তারা নিজেদের মধ্যে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলাবলি করল। দলের মধ্যে যে বয়স্ক সম্ভবত তারই আদেশে একজন উঠে বাইরে গেল।

বয়স্ক লোকটি আমার মুখের কাছে এগিয়ে এসে কি যেন বলল। তার ভাষার এক বর্ণও আমার বোধগম্য হল না ।

তাছাড়া এদের চেহারা পোশাক পরিচ্ছদও অদ্ভুত বিচিত্র ধরনের।

দীর্ঘ দেহ, গৌরবর্ণ, ঈগলের মত বাঁকা নাক। সবচেয়ে আশ্চর্য এদের পোশাক। পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত দীর্ঘ ঢাকা পোশাক। হাতের কব্জি অবধিও কাপড় ঢাকা। মাথায় কেমন অদ্ভুত ধরনের কাপড় বাঁধা। এদের সকলেরই দীর্ঘ দাড়ি।

বৃদ্ধের কথা বুঝতে না পারায় সে হাস। আমার সামনে ঝুঁকে পড়ে এবার আমাদের মত ভাষায় উচ্চারণে প্রশ্ন করল – তুমি কোন্ দেশের লোক ? কি নাম তোমার ? এই নির্জন দ্বীপে কেমন করে এলে ?

আমি সংক্ষেপে নিজের পরিচয় এবং দুর্ঘটনার বিবরণ শোনালাম ।

বৃদ্ধের চেহারা সহানুভূতিতে করুণ হল। হাত তুলে বলল – আল্লাহ্ করুণাময় তোমার সহায় হোন। তিনি বিপদ দেন। তিনিই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

আমি বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আপনি কে ? কারা আপনারা ? কোন্ দেশ থেকে আসছেন ? চলছেনই বা কোথায় ?

বৃদ্ধ স্নিগ্ধ হাসল আমার নাম সাইফউদ্দীন। আমি একজন আরব বণিক। এ জাহাজের সবাই আরব। চলেছি চাটিল (চট্টগ্রাম) বন্দরে ।

ইতিমধ্যে আর একজন লোক বিরাটাকার কাঠের পাত্রে রুটি, মাংস, খেজুর নিয়ে এল। আমার সামনে খাদ্যের পাত্র ধরে দিয়ে বৃদ্ধ সাইফউদ্দীন বলল খাও তুমি অসুস্থ ক্ষুধার্ত ।

আমি বৃদ্ধকে প্রশ্ন করলাম- আপনি কি এর আগেও এদিকে এসেছেন ?

সাইফউদ্দীনের হাসিতে কৌতুক ফুটল আমি যে এখন চাটিলের স্থায়ী অধিবাসী। সেখানে এ দেশীয় এক মেয়ে বিয়ে করে ঘর সংসার পেতেছি। সে আমাকে বিয়ে করে ইসলাম কবুল করেছে।

আমি সবিস্ময়ে উঠে বসলাম ।

- ইসলাম ! সে কেমন ?

- সাইফউদ্দীন আবার হাসল- ইসলাম অর্থাৎ শান্তি। আমাদের স্রষ্টা একক। আমরা তাঁরই কাছ থেকে এসেছি। তাঁরই কাছে আবার ফিরে যাব মৃত্যুর পর।

আচ্ছা ওসব কথা থাক এখন। তুমি খেয়ে নাও বন্ধু ।

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে খেতে শুরু করলাম। বিচিত্র স্বাদ ও সুগন্ধযুক্ত মাংস, রুটি এবং ফল অত্যন্ত উপাদেয় মনে হল আমার। খাবার পর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লাম। কারণ এই বিদেশী বণিকদের ব্যবহার আমার কাছে বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতাপূর্ণ বলে মনে হল।

যখন ঘুম ভাঙল তখন সন্ধ্যার গোধূলি আভায় সাগরের বুক আবিরের মত লাল। এক বিচিত্র সুললিত সুরধ্বনিতে আমি উৎকর্ণ হলাম। জাহাজ চলছে অথচ লোকজনের কোন সাড়া পাচ্ছি না। বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমার প্রকোষ্ঠের সম্মুখে জাহাজের উন্মুক্ত পাটতনের উপর সারিবদ্ধ ভাবে বুকে হাত বেঁধে সকল দাঁড়িয়েছে। সাইফউদ্দীন সকলের অগ্রভাগে। অত্যন্ত সুমধুর সুরে সে একা কি যে টেনে উচ্চারণ করছিল। তারই সঙ্গে সকলে কখন হাঁটু ভেঙে কখনও দু'হাত তুলে, কখনও ভূমিতে কপাল স্পর্শ করে একই সঙ্গে উঠছিল বসছিল।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। অবশেষে তাদের প্রার্থনা শেষ হল। সাইফউদ্দীন দীর্ঘপদক্ষেপে এগিয়ে এল আমার দিকে কি ব্যাপার পঞ্চ ? আমাদের নামাজ পড়া দেখছিলে না কি ? যাক এখন তাহলে তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা চাটিল বন্দরে পৌঁছে যাব। চাটিলে পৌঁছে কোথায় যেতে চাও তুমি ?

কোথায় যেতে চাই ! নিজের মনকে নিজেই প্রশ্ন করলাম। উত্তর পেলাম আজ সারা জগতের দ্বার আমার জন্য খোলা। কোথাও যেতে আমার আজ আর বাধা নেই । পিছু টান নেই ।

সাইফউদ্দীন আমার মুখে তাকিয়ে বোধ হয় কিছু অনুমান করল। তারপর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কণ্ঠে বলল— বেশ তো কোথায়ও যদি যেতে না চাও তবে আমার বাড়ীতেই থাকবে। আর তুমি তো বৌদ্ধ। চাটিলে বহু বৌদ্ধ বিহার গড়ে উঠেছে। তোমার কোন অসুবিধে হবে না ।

দূরে সাগর আর আকাশের মিলিত দিকচক্রবালে তাকিয়ে উদাস কণ্ঠে বললাম—বিদেশী বন্ধু, কোন বিহার, মন্দির, মঠে আমার আর আকর্ষণ নেই। জীবনের আসক্তি থেকে এবার প্রকৃত মুক্তি পেয়েছি আমি। আমায় তুমি চাটিল থেকে কামরূপের পথে এগিয়ে দিও। আমি চলে যাব উত্তরের পার্বত্য দেশে।

সেখানে গিয়ে যোগ সাধনা করব ।

সাইফউদ্দীন স্থির দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে বন্ধু পঞ্চু ! মানুষকে দূরে সরিয়ে গভীর জঙ্গলে নির্জন পর্বতে এসে সাধনা করলে কি সত্যি মুক্তি পাওয়া যায় ? মানুষের সেবাই তো মহৎ ধর্ম ।

আমি ম্লান বিষণ্ণ চোখে তাকলাম আরব বণিক ! আমাদের দেশের মানুষে মানুষে ভেদাভেদের কথা তোমাদের জানা নেই। এই সোনার দেশের সম্পদের লোভে যুগে যুগে বিদেশী আক্রমণকারীরা এ দেশে ছুটে এসে বসত গড়েছে।

এদেশের সম্পদ সাত সাগর দূরের দেশে বিকিকিনি করে সোনার দালান তুলেছে। আজ তাদেরই হাতে রাজদণ্ড, তারাই ধর্মরক্ষক, তারাই সমাজের শক্তিমান পুরুষ। আর এদেশের মানুষ যারা এই সোনার ফলন ফলায়, মুক্তোর বেসাত করে, কারুকলার চারুকার তারা ঘৃণা, অশ্রদ্ধা আর অবহেলার পাত্র। তারা নিরন্তর যন্ত্রণা, উপেক্ষা আর দারিদ্র্যে অর্ধমৃত।

সাউফউদ্দীনের কণ্ঠস্বর বিষণ্ন হয়ে উঠল – বন্ধু একদিন আমাদেরও এই ঘৃণ্য পশুর মত জীবন ছিল। কিন্তু আজ আমরা আলোর পথ পেয়েছি। আজ আমরা মানি মানুষে-মানুষে ধনী-দরিদ্রে উচ্চ-নীচে কোন প্রভেদ নেই। আল্লার সৃষ্ট মানুষ সবাই সমান ।

জাহাজ এসে ভিড়ল চাটিল বন্দরে। সবুজ পাহাড়ের পটভূমিতে নীল সাগরচুম্বিত এই বন্দরে নোঙ্গর করে আছে শত শত দূরদূরান্তের সাগর পেরিয়ে আসা বাণিজ্য জাহাজ। কত বিচিত্র ভাষী, বিচিত্র বেশধারী বণিকেরা কেনা-বেচায় ব্যস্ত। সাউফউদ্দীন আমাকে তার বাড়ী যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল। আম রাজী হইনি। গৃহের বন্ধন যখন একবার ছিন্ন হয়ে গেছে তখন আর নয়। এবার আমার মুক্তির পথে যাত্রা।

সন্ধ্যায় জাহাজের পাটাতনে বসেছিলাম। সহসা উন্মুক্ত আকাশের বুকে এক চেনা সুর ছড়িয়ে পড়ল। বন্দরের ধারে, জাহজের সারিগুলো থেকে একটু দূরে এক মাঝি সহজিয়া গাইছে,

বজ্র নাওয়ে পাড়ি দিয়া

বাইলাম পদ্মার খাল

আহা দস্যু হইয়া লুইটা নিলাম

অদ্বয় বংগআল ।

চঞ্চল হয়ে উঠলাম ।

সহজিয়া তান্ত্রিকরা আজ প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই জ্ঞানী যোগীদের মতবাদ জেলে, মাঝি তাঁতীদের মুখে দুঃখের গীত হয়ে ফিরছে অথচ আমি কোথায় ? মা যে আমায় বলেছিলেন সবাইকে জ্ঞান দান করতে।

সকলের অগোচরে ধীরে ধীরে জাহাজ থেকে নেমে পড়লাম আমি। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই একজন সিদ্ধ তান্ত্রিকের সাথে আলাপ হল। আমায় বলল এসো বংগাল। আমি সেই উত্তরের ডাকিনীর দেশে চলেছি। (তিব্বত দেশ। তিব্বতী ভাষায় ডাক অর্থ জ্ঞান, তিব্বতী যোগিনীদের ডাকিনী বলা হত) আমি মাথা নত করে সম্মতি দিলাম – চলুন আমিও সেই পথেই চলছি।

তান্ত্রিক বলল – আমি বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনীর অধিবাসী। অতীশ দীপংকরের নাম শুনেছ ?

মাথা নাড়লাম না। চন্দ্রবংশীয় মহারাজাধিরাজ সুবর্ণচন্দ্রের আত্মীয় তিনি। বজ্রযোগিনীর অধিবাসী এই মহাপণ্ডিত অতীশ দীপংকর উত্তরের কম্বোজে পদব্রজে প্রয়াণ করেছেন । আমি তার কাছে জ্ঞান লাভ করেছিলাম ছেলেবেলায়।

দূরে আরব বণিকের জাহাজ থেকে প্রার্থনা আহ্বানের বাণী ভেসে এল,

"আল্লাহ্ হু আকবর ...

আল্লাহ্ হু আকবর।"

ওদিকে টিলার ওপর বৌদ্ধ মন্দির থেকে গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে ।

বন্দরসংলগ্ন বাজারের পথের ধারে জৈন দিগম্বর ধূপধুনা জ্বেলে ধ্যানে বসেছে। তারই মাঝে চলেছে বেচাকেনা। মানুষের আবহমান জীবনের লেনদেনের হিসেব। আমি এগিয়ে চললাম। এবার আমার মুক্তি। এবার আমার নির্বাণ । এবার শূণ্যতা। নৈরাত্মায় বিলীন হয়ে মহাসুখ সংগমে একাকার হয়ে যাওয়া।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এক

নীলাভ কালো মেঘের দল ডানায় বৃষ্টির ঝাপটা নিয়ে ঘুরছে আকাশে। পদ্মার বুক ফুলে উঠেছে। দূরের নীলবনাচ্ছন্ন কূলের রেখা ধোঁয়াটে বৃষ্টির ঝাপটায় বিলীন বিলের কালো পানিতে আকাশের কালো ছায়া। চক বিল খাল ডোবা বর্ষার পানিতে থৈ থৈ ।

বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামের ধারের বিদ্যাপীঠে পণ্ডিত রামচরণ কাব্যরত্ন দুলে দুলে মেঘমন্দ্র সুরে ছাত্রদের পাঠ দিচ্ছেন

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

মেঘমাশ্লিষ্ট সানু

একজন বিদ্যার্থী সহসা উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল – পণ্ডিত মশাই ! সানু অর্থ তো পর্বত-শিখা, তা সেখানে আবার মেঘ আসে কেমন করে ?

বিরক্ত পণ্ডিত মহাশয় ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন ।

– কে হে বটে ! কতদিন না বলেছি এখানে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলবে। ওই ম্লেচ্ছ বংগাল ভাষা বললে এ টোল থেকে নাম কাটিয়ে গাঙে মালদের সঙ্গে মাছ ধরতে হবে বুঝেছ। তোমার পিতৃদেবের কড়ি ধ্বংস হবে না আর। আর শোন এই বংগাল দেশে বসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানু বুঝবে কি হে ! দেখছ তো কেবল নদী খাল বিল আর ডোবা । ছিঃ ছিঃ। এদেশে মানুষ বাস করতে পারে?

প্রশ্নকারী তরুণ ছাত্র হাসি গোপন করে আবার বলল তা পণ্ডিত মশাই রাঢ়ে গৌড়েওতো মেঘমাশ্লিষ্ট সানু দেখা যায় না বোধ হয় ।

পণ্ডিত মশাই আরও রুষ্ট হলেন – তোমার বাবার কুলজী অনুসারে তোমারা তো বংগজ ব্রাহ্মণ । কিন্তু তোমার ধৃষ্টতা দেখে মনে হয় তোমার পিতার বোধ করি অনুজ নীচ কুলে জন্ম ।

আরেকটি ছাত্র পেছন থেকে বলে উঠল – পণ্ডিত মশাই, কমল কি বলে জানেন ? ও বলে ওর কাছে নাকি 'মেঘদূত' বিক্রমউর্বশী পড়ার চাইতে 'রাম

চরিত' পড়তে বেশী ভালো লাগে। মহারাজ বল্লাল সেনের 'অদ্ভুত সাগর' 'দান সাগর' এগুলোর ভাষা নাকি বাজে । যা-ইচ্ছে-তাই খটমটে ।

পণ্ডিত মশাই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রচণ্ড আস্ফালন করে উঠলেন বটে। এতখানি অধঃপতন। ওহে কমলাকান্ত, রামচরিত পড়তে চাও, ভালো কথা। কিন্তু ওই ম্লেচ্ছ বংগাল ভাষা পড়লে কি হয় জানো ?

কমল নিরীহ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল- না পণ্ডিত মশাই !

পণ্ডিতমশাই ঝড়ের বেগে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করলেন,

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য

চরিতানি চ ।

ভাষায়াং মানব শ্রুত্বা রৌরবং

নরকং ব্রজেৎ

(লৌকিক ভাষায় অষ্টাদশ পুরাণ রামচরিত ইত্যাদি যে শুনবে তার ব্যবস্থা নরকে।)

ছাত্ররা সকলে কমলকে ব্যঙ্গ করে হেসে উঠল। অপমানিত কমল সহপাঠীদের দিকে তাকিয়ে পণ্ডিত মশাইয়ের দৃষ্টির অগোচরে চোখ পাকিয়ে শাসাল । ভাবখানা, পরে এর মজা টের পাওয়াবে। ইতিমধ্যে বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় রাঢ়িখালের খালের মুখে একটি নৌকা এসে ভিড়ল। কলার পাতায় মাথা মুড়ে কোন রকমে বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচিয়ে একজন আগন্তুক এসে উঠলেন টোলের বারান্দায়। মাথা থেকে পাতা নামিয়ে স্বগতোক্তি করলেন ইস্, আষাঢ় মাস না পড়তেই যা বর্ষা শুরু হয়েছে ...... বিচ্ছিরি ব্যাপার। তারপর সহসা রামচরণ কাব্যরত্নের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দুই কর জোড় করে অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন ।

রামচরণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্ন করলেন— মহাশয়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে ? কি নাম ? কি পদবী ?

আগন্তুক সংস্কৃত ভাষাতেই উত্তর দিরেন- আমার নাম পুরুষোত্তম গঙ্গ ? আসছি বজ্রযোগিনী থেকে। আপনি সম্ভবত রামচরণ কাব্যরত্ন মহাশয় ।

পণ্ডিত মশায়ের মুখ সুপ্রসন্ন হল। সমাদর করে অতিথিকে আহ্বান করলেন- আসুন। ওরে শ্রীধর, তাম্বাকু আন ।

অতিথি আসন গ্রহণ করে টোলের ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন আপনাদের এখানে সংস্কৃত চর্চাটা বেশ ভালোই চলছে। আর আমরা বজ্রযোগিনীর ব্রাহ্মণরা তো এখন 'নেড়ানেড়ীদের' (বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুনীর) আচার দূর করতে পারলাম না। ওটাতো আবার যোগীদের আস্তানা ছিল কি না ।

পণ্ডিত মশাই আক্ষেপে মুখ কুঞ্চিত কররেন আর বলেন কেন। সে রামও নেই আর সে অযোধ্যাও নেই। সেন রাজারা গৌড় ছেড়ে আসবার পর দেশে ব্রাহ্মণ্য শুচিতা লোপ পেতে বসেছে বললেই চলে। আমার প্রপিতামহ জাজনগরে (উড়িষ্যা) এসেছিলেন কান্যকুব্জ থেকে। আমার পিতামহ ছিলেন মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেনের সভাসদ। আমরা মশাই সাধারণ রাঢ়ি ব্রাহ্মণ নই। আমদের কুলজী অনুযায়ী নিকষ কুলীন। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে মরতে হল এই ম্লেচ্ছ দেশে এসে। আহ্, গৌড় নগরে আমার পিতার ভবন শিখরে স্বর্ণকলস শোভা পেত। আমরা ছিলাম গৌড়ে ধনী- দরিদ্রের দেবতুল্য পূজ্যস্থানীয় ।

অতিথি পুরুষেত্তম সায় দিয়ে মাথা দোলালেন – সে আর বলতে। বল্লাল সেন কুলীন প্রথা চালু করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আবার নতুন জীবন দান করেছিলেন। ছোট জাত ম্লেচ্ছ অস্পৃশ্য আর 'নেড়েদের' তো মূলোচ্ছেদ করে ছেড়েছিলেন। কিছুদিন রাজত্ব করতে পারলে তিনি দেশ থেকে বৌদ্ধদের নির্মূল করে ছাড়তেন ।

শ্রীধর তামাক নিয়ে এল। শ্রীধরের পিছেই এল কমলাকান্ত। কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে বলল পণ্ডিত মশাই, আজ বড় বাদলা। ছুটি দিন না। পাঠে মন বসছে না। বাড়ী চলে যাই ।

— পণ্ডিত মশাইয়ের মেজাজটা এখন কিছুটা প্রসন্ন থাকায় তিনি আর নিষেধ করলেন না। বললেন – আচ্ছা যা ।

কমলাকান্ত পণ্ডিত মশাইকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ল। অতিথি পুরুষোত্তম কমলের প্রস্থানপথের দিকে তাকিয়ে সপ্রশংস কণ্ঠে বলল বাঃ বড় সুন্দর ছেলে তো । ব্রাহ্মণ সন্তান নিশ্চয়ই ।

পণ্ডিত মশাই একটু ক্ষুব্ধ হয়ে উত্তর দিলেন – উপবীতধারী যখন তখন ব্রাহ্মণ

তো বটেই। তবে কথা কি জানেন, বৈদিক যুগে যে সব ব্রাহ্মণ এই বংগাল বিক্রমপুর মণ্ডল এসেছিল তারা এখন এক রকম আচারভ্রষ্ট বললেই চলে। যাকে বলে বংশজ বংগজ ব্রাহ্মণ ।

- সে কি কথা ?

- নয় তো কি ? এই ধরুন না যেমন আমরা যারা মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে বংগালে এসেছি আমরা, এখনও জানি যে আমরা সাধারণ মানুষের মত নই। ব্রহ্মার প্রেরিত অবতার। শাস্ত্র পাঠ যাগ-যজ্ঞ এই সবের শুদ্ধ শুচিতা বজায় রাখাই আমাদের কর্তব্য। দেব-সেবা করাই আমাদের কাজ। আর এরা? কি বলব মশাই । আদিশূরও মহা ধুমধামে ব্রাহ্মণ এনে বংগালকে জাতে তুলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মাঝখান থেকে অপবিত্র হয়েছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। এরা নামে ব্রাহ্মণ, না জানে মন্ত্র-তন্ত্র না জানে শাস্ত্র পাঠ। আচার-বিচারের বালাই নেই। চণ্ডালের ছায়া মাড়ায়। লজ্জায় আমাদের মুখ দেখাবার উপায় নেই ।

পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য মহাশয় তাম্বাকুর গড়াগড়া তুলতে ভুলে গেলেন যেন তিনি-কি বলছেন ? আমরা তো ভাবতাম আমদের ওদিককার বামুনরাই বুঝি এখন চড়কপূজা, নীলপূজা, চৈত্রসংক্রান্তি করে বেড়ায়। এ দুষ্টক্ষত রাঢ়িখালের পাড়াতেও ঢুকেছে। কি বলব মশায়। যেদিন যবন মুসলমানরা লক্ষাণাবতীকে অপবিত্র করল সেদিনই এদেশে পবিত্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম রাহুগ্রাস কবলিত হল। তা দোষ আমাদেরও আছে বৈ কি

রামচরণ ভ্রূকুঁচকে তাকাল-কি রকম ?

একটু ইতস্তত করে পুরুষোত্তম বললেন-সেন রাজাদের পূর্ব পুরুষ তো শুনেছি সুদূর কর্ণাট থেকে এসে রাঢ় গৌড় পুণ্ড্রের অধিপতি হয়েছিল। এই নীচ জাতির আবাস ভূমিকে তারা জাতে তুলতে চেয়েছিল বলেই প্রথমে এ দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করল ওইসব ন্যাড়া নেড়ী বৌদ্ধ ভিক্ষু আর যোগীদের।

রামচরণ পরম সন্তোষে উচ্চ হাস্য করে উঠলেন-তা যা বলেছেন বটে, আমি তো মশাই গৌড় নগরীর অধিবাসী। এই মূর্খ বংগালরা না হয় আমাদের বসতিকে বলে রাঢ়ি। একবার হল কি জানেন ! আমার বাবার আমলে মহারাজ বল্লাল সেন হুকুম দিলেন সব যোগীদের ধরে চুল-জটা-দাড়ি কেটে মাথায় ঘোল ঢেলে একটা একটা করে শূলে চড়াও। ব্যাস একেবারে যোগী শেষ। সব পালিয়ে গেল কালক বনে (সুন্দরবনে), কিছু পালাল মগধে। বাকিরা প্রাণভয়ে

একেবারে উত্তরে হিমালয়ে। বুঝুন ঠেলা। আর ব্রাহ্মণদের কি সম্মান। নিষ্কর ভূমি দান, দক্ষিণা, সে এক যুগ ছিল বটে।

বৃষ্টি কিছুটা ধরে এসেছিল। রামচরণের ছাত্র শ্রীধর এসে সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করল- গুরুদেব, গুরুমা জানতে চেয়েছেন অতিথি মহাশয়ের খাবার জোগাড় করবেন - কি না ।

রামচরণ সাগ্রহেব জবাব দিলেন—

-নিশ্চয়ই, গুরুমাকে বল পঞ্চ ব্যঞ্জনের আয়োজন করতে।

পুরুষোত্তম বাধা দিয়ে বললেন-

-না না। শুধু শুধু ঝামেলা করবেন না। আমি এসেছি বিশেষ এক কাজে। এই একটি পাত্রের খোঁজখবর করতে। আমার একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। শুনেছিলাম পাত্র আপনার এই টোলের ছাত্র, বাবার নাম ভজহরি চট্ট। পাত্রের নাম কমলকান্ত চট্ট ।

রামচরণ কাব্যরত্নের নাসিকা কুঞ্চিত হল-কমলকান্ত। আরে ও তো ওই অকালকুষ্মণ্ডটা। যাদের কথা আমি আগেই বলেছিলাম। ওর বাবা ভজহরি। ওদেরতো চুলোয় হাঁড়ি চড়ে না। তাছাড়া লজ্জার কথা কি আর বলব। বামুন হয়ে শাস্ত্র পুরাণ পড়ে না। দেবভাষা (সংস্কৃত) কিছুই জানে না। বসে বসে গেঁয়ো ভাষায় মনসা শিব আর সুয্যিব্রতের গান বাঁধে। চাষা পাড়ায় সুয্যিঠাকুরের পালা গায়। সবাই ওকে বলে ভজহরি গায়েন। ছোঁয়াছোঁয়ি আচার বিচার মানে না। এই ঘরে মেয়ে দিয়ে শেষে যে নরকপ্রাপ্ত হবেন, ছিঃ ছিঃ, কি ভয়ংকর !

পুরুষোত্তম বিচলিত হলেন—তবে যে শুনেছি ওরা কুলীন হিসেবে খাঁটি । তাছাড়া বংশপরম্পরায় প্রচুর জমিজমা নিষ্কর ভূমি হিসেবে ভোগ করে আসছে।

রামচরণ বাঁকা হাসলেন-হুঁ, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে মশাই। অনাচার করলে কি নিষ্কর ভূমি ভোগ করা যায় ? গাঙে ভেঙে নিয়ে গেছে কবে সব জমি । তা যাক, আপনি যখন বিবাহ সম্পর্কিত ব্যাপারে এসেছেন তখন নিরাশ কেন হবেন। এই রাঢ়িখালে আরও কুলীন ব্রাহ্মণপুত্র আছে ।

শ্রীধর এতক্ষণ পেছনে দাঁড়িয়ে দুজনের আলাপ শুনছিল। কমলকান্তর বিবাহ প্রস্তাব শুনে সে ভারী মজা পেল। খবরটা কমলকে দেবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে

উঠল। কিছুক্ষণ উসখুস করে বলল-গুরুমশাই, মাকে রান্নার কথা বলে আমি একটু গাঙের ঘাট থেকে ঘুরে আসি ।

গুরু মহাশয়ের আদেশের অপেক্ষা না করেই শ্রীধর ছুটল। ভজহরি গায়েনের ছেলে কমলকান্তর বিবাহ-প্রস্তাব এসেছে এমন চমকপ্রদ খবরটা সারা রাঢ়িখালের বন্ধুমহলে না জানালে যে আজ রাতে শ্রীধরের ঘুমই আসবে না ।

পুরুষোত্তম পণ্ডিত রামচরণকে অনুনয় করে বললেন-আপনার অনুগ্রহ যে এত বড় খবরটা আপনি আমায় জানালেন। অবশ্য আমার ব্রাহ্মণী আমায় বলে দিয়েছিল ঘটকের কথায় কান না দিয়ে নিজে এসে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে। তা যাক আপনি আর এ খবরটা কাউকে বলবেন না। বড় অপমানিত হব আমি ।

রামচরণ দরাজ কণ্ঠে হাসল-সে আর বলতে। আমি নিজে সদ্ বামুন হয়ে কি আর এক বামুনের জাত মারতে পারি ? তবে জানেন আমরা ভাবছি ওই ভজহরিকে এক ঘরে করব। অনেক আগেই করতাম এখন পারছি না মৌর্যপাড়ায় (মৌরাপাড়া বিক্রমপুর) ওই নেড়েগুলোর ভয়ে। সেন রাজাদের সে দাপট তো নেই। তা নইলে এখনও কি ওই মৌর্যপাড়ায় নেড়া-নেড়ীরা গেরুয়া পরে ঘোরে। তার ওপর ওরা আবার অবস্থাপন্ন। ওখানে ভজহরির খুব সমাদর। মশাই থাকত যদি সেন রাজাদের সেই যুগ। তবে বাছাধনরা বুঝত। সে যুগে বেদবাক্য শ্রবণ করলে শূদ্রদের কানে লৌহ শলাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হত । ব্রাহ্মণকে কটুবাক্য বললে তার জিহ্বা কর্তন করা হত, ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসলে তার নিম্নাংগ কেটে ফেলা হত-

পুরুষোত্তম বাধা দিয়ে বললেন-এখানেই তো ভুল হয়েছে মশাই। যদিও বল্লালী আভিজাত্য ব্যবস্থায় আমরা যথেষ্ট লাভবান হয়েছি। গৌড় রাঢ়ের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনের অসন্তুষ্টি সেন রাজত্বে ফাটল ধরিয়েছে। তা' নাহলে বিদেশী বিধর্মী ইখতিয়ারদ্দীন তুর্কী কি এত সহজেই রাঢ় গৌড় দখল করতে পারত ? আর বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে আপনাদের এই জলা ডোবার দেশে পালিয়ে আসতে হত ! তাছাড়া এখনি দেখুন না মহারাজা সেন সুবর্ণ গ্রামের (সোনার গাঁয়ে) স্বাধীন রাজা হয়েও এখন আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত দিন রাত্রি যাপন করছেন। ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য আর বজায় রইল কোথায়? দস্যু তস্করের উৎপাতে লোক অস্থির। ব্যবসা বাণিজ্য আগের মত নেই। তুলো চাষী আর তাঁতীরা রাজাকে শুল্ক দিতে চায় না । কলি, মশাই কলিকাল।

রামচরণের সম্ভ্রমে আঘাত লাগল। জ্ঞান বিদ্যায় তিনি নিজেও কম নন। রুষ্ট কণ্ঠে বললেন-দেখুন, ইতিহাস চর্চা আমি নিজেও কম করি নি। বংগালের রাজারা মার খেয়ে ধুলায় মিলিয়ে গেল জলন্ধরের ক্ষাত্র তেজোদ্দীপ্ত বর্মণ রাজাদের কাছে। এদেশ ব্রাক্ষণ্য ধর্মকে নূতন করে বাঁচিয়ে তুলেছিল তো তারাই। ওদিকে সুদূর কর্ণাট থেকে এসেছিল হেমন্ত সেন। এই সেন আর বর্মণরাই তো এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশে আবার ব্রাক্ষণ্যধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করল। তবে কলিকাল যে বলছেন সে কেবল আচারভ্রষ্ট ব্রাক্ষণদের কর্মফল দোষ। তা নইলে সেন রাজাদের যুগ তো স্বর্ণযুগ মশাই। এমন কুবেরের মত সম্পদ এদেশের লোক চোখে দেখেছে । হুঃ।

বজ্রযোগিনীর কুলীন পণ্ডিত ব্রাক্ষণ পুরুষোত্তমও তর্কে অবতীর্ণ হলেন-দেখুন কাব্যরত্ব মহাশয়, বিন্দু বিন্দু জলের সমষ্টি নিয়েই বিশাল সাগর গঠিত। এই সব রাঢ় গৌড় পুণ্ড্র বংগবাসীদের পরিশ্রমেই এ দেশে লক্ষ্মীর বসতি হয়েছিল। এ দেশের পণ্যে সমুদ্রগামী জাহাজ বোঝাই হয়ে বিদেশে যায় আর সোনাদানা নিয়ে ফেরে । উত্তরের স্থলপথ দিয়ে হাতী ঘোড়ার পিঠে করে এখানকার তৈরী দ্রব্য, মহার্ঘ মূল্যে কিনে নিয়ে যায় দূরদূরান্তের বণিকেরা। কিন্তু সে সব তৈরী করে কারা ? ওই যে সোনার থালায় ঘৃতান্ন খায় যে রাজপুরুষেরা তারা ? না আমরা ব্রাক্ষণরা, যারা নিষ্কর ভূমি দানদক্ষিণা আদায় করে পায়ে পা দিয়ে জীবন কাটিয়ে আসছি ! আমরা বলি কি করে যে তা আমাদেরই কর্ম প্রচেষ্টায়? উপরন্তু আমরা আর্য ক্ষত্রিয় ব্রাক্ষণ এই পুরাতন বোধ নিয়ে নিজেদের সর্বদা স্বতন্ত্র করে রাখতে চেষ্টা করে এসেছি। কাদের তৈরী এই সোনার দেশ ?

ক্রোধে উত্তেজনায় রামচরণ কাব্যরত্নের মুখাবয়ব রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তথাপি কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সংযত করে তিনি বললেন-আপনি কি বুদ্ধিবিলোপ ঘটিয়েছেন নাকি মশাই ? এসব অসংযত কথা বলে চলেছেন মূর্খের মত ।

-মূর্খ কি না জানি না। তবে দেখছি ব্রাক্ষণ্যধর্ম আজ কোন্ পথে। রাঢ়ে সেন রাজারা বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করে দিল অথচ শূদ্রকে ধর্ম দিল না । তাই তারা করে ধর্ম ঠাকুরের পূজা। এই ধর্ম ঠাকুর তো সেই বুদ্ধের রূপান্তর ।

এদিকে বংগালেও তাই। যাদেরকে আমরা ছোটজাত বলে

ঘৃণা করি দেবভাষায় লিখিত পুরাণ গ্রন্থাদি যারা পড়তে অপারগ তারা সেই প্রাচীন ধর্মে ফিরে গেছে। তাই আদিম লিঙ্গপূজাকে আজ কৃষকের দেবতা শিব

হয়ে পূজা পেতে দেখছি। মনসা আর সূর্য পূজা, তাদের আপন ধর্ম। এ কি আমাদেরই অবহেলার ফল নয় ?

রামচরণ আর ক্রোধ সম্বরণ করতে পারলেন না। বললেন-দোষ আমাদের? ওই যবন তুর্কীরা উদন্তপুরের বিহার ধ্বংস করল, জাজনগরের সম্পদের লোভে খোলা তরবারী হাতে হন্যে হয়ে ছুটে এল। এ দেশে তারা কি করছে?

চিরকাল এ দেশের সম্পদ যেমন বিদেশীকে লোলুপ করেছে তেমনি লুব্ধ হয়ে তারাও ছুটে এসেছে। তারা ধর্ম নিয়ে আসেনি, এসেছে রাজ্য জয় করতে, ধনসম্পদ কুক্ষিগত করতে। আর তার কি ফল হয়েছে জানেন ? যে রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের রক্ষক ছিল তারা আজ সিংহাসন বজায় রাখতে ব্যতিব্যস্ত। আর আমাদের মত ব্রাহ্মণেরা রক্ষকহারা হয়ে ছোট জাতের সঙ্গে মিশে যাচ্ছি। আমাদের দেবদেবী তাদের দেবদেবী এক হয়ে যাচ্ছে। শুনেছি ওদিকে ভাটি অঞ্চলে আর চাটিগ্রামে বহুলোক ওই যবন সাধুদের দীক্ষা নিয়ে (ইসলাম ধর্মালম্বী ওলী দরবেশ) একেশ্বরবাদী যবন ধর্ম গ্রহণ করছে। আমরা যদি এদের দূরে ঠেলে না দিতাম তাহলে এসব সম্ভব হত ?

টোলের ছাত্ররা অনেক আগেই চলে গিয়েছিল। বাড়ীর ভেতর থেকে সুস্বাদু রান্নার গন্ধ ভেসে আসছিল। একটি ছোট বালক এসে দাঁড়াল,

—বাবা। মা বলছেন রান্না তো হয়ে এল। অতিথির খাবার আসন কি এখন পাতা হবে ?

রামচরণ ধমকে উঠলেন – দূরহ হতভাগা। এই আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের পাত পেড়ে আমার বাড়ী অপবিত্র করে শেষে কি নরকের অগ্নিতে জ্বলব !

- পুরুষোত্তম চটে উঠলেন রসনা সংযত করে কথা বলুন। আমি আপনার বাড়ীতে পাত পাড়তে আসিনি। আমরাও বজ্রযোগিনীর কুলনী ব্রাহ্মণ। পুঁটি মাছের প্রাণ রাঢ়িদের চোখ রাঙানোকে ভয় পাই না ।

বলা বাহুল্য উত্তেজনা মুহূর্তে দু'জনেই শুদ্ধ সংস্কৃত কথোপকথন পরিহার করে গৌড় চণ্ডালী মিশ্রিত ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন ।

কাব্যরত্ন রাগে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে চীৎকার করে উঠলেন – কি বললেন? জানেন আমরা কুলীন হিসেবে আপনাদের চেয়েও উঁচুতে ? বজ্রযোগিনীর সাতশতী বামনরা জাঁক দেখাতে আসে পঞ্চান্ন গাঁয়িদের সাথে। মহারাজা

বল্লাল সেনের হাতে পায়ে ধরে কেটে তবে না কুলজী পেয়েছে ! তার আবার লাফালাফি ! সাতশতী আর বঙ্গজ বামুনরা তো রাঢ়িদের পদধূলি তুল্য।

পুরুষোত্তমের বংগাল দেশীয় জল হাওয়া পুষ্ট বংগাল ধাচের মেজাজ টগবগ করে উঠল – আরে সাতশতী আমরা নই, আপনারা। আমার দেশে এসে আমিদের ঠাঁট দেখাবেন না। এ আপনার লক্ষণাবতী নগরী নয়। ওই পদ্মা গাঙের বানের কুটোর মত ভেসে যাবেন ।

রামচরণ লাফিয়ে উঠলেন – কি ! কি ! এত বড় কথা ! এখুনি বামুন কায়েত ডেকে পঞ্চায়েত বসিয়ে কুলুজীর বিচার করাব। নয় হয় যাব সুবর্ণ গ্রামে রাজার কাছে। তারাই এর বিচার করুক।

দুই ব্রাহ্মণের ঝগড়ায় ইতিমধ্যে বেশ লোক জড় হয়ে গিয়েছিল। রামচরণ সবাইকে সাক্ষী মেনে গলা তুলে চীৎকার করতে লাগলেন — উঃ ! খুব তো কুলের জাঁক। তবে ওই বাউণ্ডুলে জাতভ্রষ্ট গায়েন বামুনটার ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে এসেছিল কেন ওই বলুক ।

অপমানিত ক্ষুব্ধ পুরুষোত্তমের এতক্ষণে সম্বিত ফিরল। সত্যিই তো বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে । প্রকৃতই যদি সবাই মিলে তাকে আচারভ্রষ্টের দলে ফেলে দেয় তখন উপায় ! আচারভ্রষ্ট বামুনের অবস্থা যে শূদ্রের চেয়েও শোচনীয়। কিন্তু পরক্ষণেই তার বংগাল জনোচিত কড়া মেজাজটি উদ্ধত হয়ে মাথা তুলল ।

রামচরণ এবং রাঢ়িখালের ব্রাহ্মণদের শাসাতে শাসাতে নৌকায় গিয়ে উঠল সে। বজ্রযোগিনীর দেবরা আজকাল সেনদের পরোয়া করে না ।

লোকজনদের জটলার মধ্যে নানারকম মুখরোচক মন্তব্য ব্যাপারটাকে যথাসম্ভব সরস এবং পণ্ডিত রামচরণ কাব্যরত্নকে উত্তপ্ত করে তুলল।

সহসা ঘোমটার মুখে আড়াল করে রামচরণের ব্রাহ্মণী এসে দাঁড়াল বেড়ার ধারে। ঘোমটার আড়াল থেকে বলল- ছিঃ ছিঃ কাজটা কি ভালো করলে। এই ভর দুপুরে অভুক্ত অতিথিকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। এতে যে অকল্যাণ হবে ।

— সাতশতী বামুন হয়ে বৈদিক বামুনের তেজ দেখাতে এসেছে। আমিও রামচরণ কাব্যরত্ব। শাস্ত্র পুরাণ কম পড়িনি। এর একটা নিষ্পত্তি না করেই

ছাড়ব ভেবেছ। বসুক না আমার সঙ্গে। তখনই বোঝা যাবে কার কত বিদ্যের দৌড়।

পণ্ডিত গৃহিনী ঝংকার দিয়ে উঠলেন।

- আঃ কি যে আবোল তাবোল বকছ। অতিথি নারায়ণ। তাকে অপমান করা তোমার কোন শাস্ত্রে আছে শুনি ?

রামচরণ এবার স্ত্রীর উপর চটে উঠলেন,

- আরে তুমি থামতো বামনী। হয়েছ তো পণ্ডিত ব্রাহ্মণের স্ত্রী। এক বর্ণ শ্লোক উচ্চারণ করতে জান না। নামেই কেবল সহধর্মিনী। জান, বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণের সহধর্মীরা হোম যজ্ঞে স্বামীর সহচরী হত। মুখ্য মেয়ে মানুষ। এই ম্লেচ্ছ চণ্ডালের দেশে এসে শিবের গীত মাঘমণ্ডল মনসা পুজো করতে শিখেছ কেবল -

ব্রাহ্মণী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল— কি বললে আমি মুখ্য ? টোলের পণ্ডিত হয়ে বড় বড় শ্লোক ঝাড়ো । এদিকে নুনপান্তা জোগাতেই হিমশিম। ভারী আমার পণ্ডিতি ফলাচ্ছে। জান আমার খুড়তুতো ভাই সেনরাজার যজমানী করে ! তোমার মত নাকি তারা ? সোনার থালায় খায় রূপোর ঘটিতে আচায়। আর আমাকে তুমি অপমান কর। এখুনি পাঠিয়ে দাও আমায় দাদার বাড়ী। পাটনী (মাঝি) ডেকে নৌকা লাগাতে বল ঘাটে। আমি আর গালমন্দ শুনতে পারব না ।

ক্রন্দনে ব্রাহ্মণীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। রামচরণ এতক্ষণে অসহায় বোধ করলেন। কী বিপদ ! মেয়েমানুষের এই ভাদুরে বৃষ্টির মত যখন তখন কান্নাকাটি ভারী গোলমেলে।

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করে স্ত্রীর কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বললেন – আহা ! বামনী চটছ কেন। আমি বিখ্যাত কাব্যরত্ন বাল্মীকির শ্লোকের ওপর যে টীকা পুস্তক লিখেছি, দেখো না সেটা শেষ হলেই তোমায় নিয়ে সুবর্ণগাঁয়ের রাজসভায় যাব । রাজার কাছ থেকে পুরস্কার নিয়ে তোমায় সাতনরী চন্দ্রহার আর খাড়ু গড়িয়ে দেব।

পণ্ডিত-গৃহিণী আঁচল দিয়ে চোখ মুছে মুখ টিপে হাসল- খুব হয়েছে, এবার খাবে এসো ।

রামচরণ কাব্যরত্ন মহাশয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে স্ত্রীকে অনুসরণ করে অন্দরবাটির দিকে যেতে যেতে বিড়বিড় করে শ্লোক আওড়ালেন :

স্ত্রীয়াস্য চরিত্রম।

দেব ন জানন্তি ।

কুতো মনুষ্যা ।

(স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে মানুষতো দূরের কথা দেবতারাও অজ্ঞ)

দুই

সারাদিন অবিশ্রাম বৃষ্টির পর বিকেলে সোনালী রোদের পাড় বসান কালো মেঘের ওপর দিয়ে সপ্তরংয়ের রামধনু আকাশে নানা রঙের আভা বিস্তার করেছে। গাঙের বুকে অসংখ্য নৌকা ভেসে চলেছে। রামধনু রঙের ঝিলিক শরীরে মেখে বর্ষার পূর্ণ যৌবনা নদীর উচ্ছল ঢেউ এসে বার বার আছড়ে পড়ছে কূলে। কমলকান্ত গাঙের ধারের উঁচু পাড় দিয়ে হেঁটে বাড়ী ফিরছিল। হঠাৎ গাঙের ধারে একটি বড় নৌকা ভিড়তে দেখে সে থেমে পড়ল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল একজন বিচিত্র দর্শন অদ্ভুত বেশধারী শুভ্র চুলদাড়ি সমাচ্ছন্ন বৃদ্ধ নৌকার ছৈয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। কমলকান্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ বিদেশী সন্দেহ নেই । কিন্তু কোথায় থেকে এল এখানে ।

মাল্লারা নৌকার নোঙ্গর ফেলে কূলে খুঁটির সঙ্গে দড়ি বাঁধছিল। কমলকান্ত কৌতূহলদ্দীপক কণ্ঠে প্রশ্ন করল- ও ভাই মাল্লা কোথা থেকে এল এ নৌকা? মাল্লা খুঁটির সঙ্গে দড়ি বাঁধতে বাঁধতে উত্তর দিল – বাকলা থেকে ঠাকুর ।

- কে এলেন ইনি ?

– ইনি এক পীর বাবা ।

- দেশ কোথায় ?

- তুমি কি চিনবে ঠাকুর। ইনি হলেন যবন সাধু। তা ঠাকুর তুমি আবার এদিকে এসো না যেন। তোমরা তো বামুন ।

— বামুন তাই কি হয়েছে ?

- ওমা ঠাকুর আমাদের বলে কি । তোমাদের জাত যাবে যে ।

কমলকান্ত ও মাঝিদের কথাবার্তা বৃদ্ধ বোধ করি বুঝলেন। সৌম্য চেহারায় স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন ঘরে যাও। আমরা সবাই একজনেরই সৃষ্টি। আমরা সবাই মানুষ । আমরা সবাই ভাই ভাই ।

বৃদ্ধের কথার মর্মার্থ কমলকান্ত বুঝল না। তবু এই আলোক উদ্ভাসিত চেহারার সৌম্য বৃদ্ধের হাসিটি তার বড় ভালো লাগল। কমলের ইচ্ছে হল বৃদ্ধের কাছে যায় । ইতস্তত করতে লাগল সে ।

বৃদ্ধ আবার হাসলেন- ঘরে যাও, পরে এসো। এখনও সময় হয় নি আসবার। অগত্যা ঘরের দিকে ফিরল সে।

নদীর ধারের গাছগুলির মাঝখান দিয়ে কদম পিচ্ছিল পথ ধরে গ্রামের দিকে মোড় নিল কমলকান্ত। বাঁশঝাড় গাব মান্দার আর নারকেল সুপারী বনের ডাল- পালার আড়াল দিয়ে এক টুকরো আকাশ দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে কমলকান্ত ভাবল – কে লোকটা ! কেন তাকে বলল সময় হয় নি। কিসের সময় ? হঠাৎ কেমন একটা শব্দে কমলকান্ত চকিত হল। বুড়ো তেঁতুল গাছটার পেছন থেকে কুহু কুহু কোকিলের মত মিষ্টি সুরের অনুকরণে কে যেন ডেকে উঠল । অবাক হল কমল। এই ভরা বর্ষার দিনে কোকিল পাখী আসবে কোথা থেকে ?

আবার কুহু কুহু রব। কমল ঘুরে দাঁড়াল। তারপর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গাছটার দিকে এগিয়ে গেল ! কিন্তু এ কি ! এবার যে চোখ গেল চোখ গেল রব ওই বাঁশ ঝাড়টার পাশে। কমলের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল। তরল কণ্ঠে কপট গাম্ভীর্য ফুটিয়ে ডাকল-মহুলা । দুষ্টুমী করিস না। বেরিয়ে যায় শিগ্রি।

বাঁশ ঝাড়ের চিকন ডালপালা দুলে উঠল। তার ভেতর থেকে শ্যামাঙ্গিনী একটি কিশোরীর সুকুমার মুখ দেখা গেল। এক ঝলক দেখা দিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আবার অদৃশ্য হল সে মুখ ।

কমল কণ্ঠস্বর উঁচু করে আবার ডাকল-মহুলা ! ধরতে পারলে কিন্তু তোর দুষ্টুমীর মজা টের পাওয়াব বলে দিচ্ছি। বেরিয়ে আয় তাড়াতাড়ি।

কমলের পাশে কদম গাছটার পাশ থেকে একটি সুমিষ্ট সুরেলা কণ্ঠ ছড়া গান গেয়ে উঠল,

ওলো সুরযাইর মা

তোমার সুরযাই ডাংগর হইছে

বিয়া করাও না ।

কমল গানের সুর লক্ষ্য করে কোমরে হাত দিয়ে মাথা দুলিয়ে হাসল ।

-ওরে দুষ্ট। একবার ধরতে পারলে তোকে কিন্তু খালের জলে ডুবিয়ে ছাড়ব বলে দিচ্ছি।

অদৃশ্য নায়িকা মহুলার কিন্তু আত্মপ্রকাশের কোন লক্ষণ দেখা গেল না । তেমনি মিষ্টি সুরে আড়াল থেকে সে আবার গেয়ে উঠল ।

বজ্রযোগিনীর বাউনের কইন্যা

মেইল্যা দিছে কেশ

তাই না দেইখ্যা সুরযি ঠাকুরে

ফিরবেন নানা দেশ ।

কমল এবার চটে উঠল-মৌলি থামবি তুই ? না মার খাবার সাধ হয়েছে।

গাছের আড়াল থেকে দুষ্টু হাসি হাসতে হাসতে মহুলা বেরিয়ে এল। গাছ কোমর করে জড়ান কার্পাশিকা শাড়ী পরনে তের বছরের মহুলা যেন এক স্ফুটনোম্মুখ ফুলের কুঁড়ি। পায়ের মল বাজাতে বাজাতে হেঁটে এসে কমলের কাছ থেকে নিরাপত্তমূলক দূরত্ব বজায় রেখে মুখভঙ্গী করে আবার গেয়ে উঠলঃ

বজ্রযোগিনীর বাউনের কইন্যা

মল খাড়ুয়া পায়

তাই না শুইন্যা কমল ঠাকুর

বিয়া করবার চায় ।

কমল ক্ষিপ্রগতিতে এসে মহুলার একটা হাত চেপে ধরল-কিরে এসব কি ঠাট্টা!

শ্যামলী কৈবর্তকন্যা মহুলার চোখের তারা ঝিকিয়ে উঠল-ঠাট্টা আবার কি ! সারা গাঁয়ের লোক জানে হরি ঠাকুরের ছেলে কমল ঠাকুরে বিয়ে বজ্রযোগিনীর বামুনের মেয়ের সঙ্গে। আর আমি বললেই বুঝি ঠাট্টা ।

কমল দৃঢ় মুঠিতে মহুলার হাত চেপে ধরল-দেখ মহুলী, তুই বড় বেশী বেড়েছিস। তোর কপালে দুঃখ আছে।

মহুলা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল-বেশী বড় কথা বল না, কমল ঠাকুর। আমার তো দুঃখ আছেই। তা নইলে মা যখন নিষেধ করত যে কমল ঠাকুরের বামুনের ছেলে, তার সঙ্গে অত মাখামাখি করিস না। হাজার বার সূযিব্রত করলেও শিব ঠাকুর বামুন বর দেবে না কৈবর্তর মেয়েকে । এখন সে কথা তো ঠিক হল ।

কমল ফিক করে হেসে ফেলল-ওঃ ! তুই বুঝি আমাকে মনে মনে তোর বর ঠিক করে রেখেছিস। ইস শখতো মন্দ নয় ।

মহুলার ডাগর চোখ বিস্ময়ে সরল হল ।

-ওমা ! মাঘমণ্ডলে সূযিব্রতে আমাদের বুঝি মনের মত বর চাইতে হয় না? ঘর বর ছেলে মেয়ে গোয়াল গরু নৌকা জাল সব তো চাইতে হয়। আর আমি সূয্যিব্রত করে যখন নিজের বর চাই তখন তোমাকেই যে মনে পড়ে যায়। তা আমি কি করব। জানো আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি আমি যেন মাঘমণ্ডলের ব্রতে আলপনা আঁকছি আর তুমি শোলার টোপর পরে আমার বর হয়ে আলপনার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছ ।

কমল উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। মহুলা ভ্রূ উৎক্ষিপ্ত করে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল-হাসছ যে বড় ।

–হাসব না তো কি । তোর বর হতে আমার বয়েই গেছে। আমি বামুনের ছেলে, কৈর্বত মেয়ে বিয়ে করে শেষে গাঙে মাছ ধরে বেড়াই আর কি ।

মহুলা ভারী শব্দ করে পা ফেলে পিছিয়ে গেল। তার ভাব ভঙ্গীতে যুদ্ধের আভাস ফুটে উঠল। ক্রুদ্ধ নিষ্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কমলের

দিকে। তার নাকের বাঁশী ফুলে উঠল। মুখের রেখা বদলাতে লাগল। তারপর হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কমলাকান্তর উপর। আঁচড়ে কামড়ে দুহাতে চুল টেনে কান্না বিকৃত কণ্ঠে বলতে লাগল-কেন তুই আমার বর হবি না ! একশ বার হবি। আমি শিব পূজা করি মাঘমণ্ডলের ব্রত করি....তুই কেন.....মিথ্যে বলছিস.....

কমল কোন রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁপাতে লাগল। তারপর সশব্দে চড় বসাল মহুলার গালে-নির্লজ্জ পাজী মেয়ে কোথাকার। উঃ ! আচড়ে আমার গালের মাংস তুলে ফেলেছে। মার খেয়ে মহুলার উচ্ছ্বসিত কান্না আরও বাড়ল- আমি তোকে বাড়ী থেকে পিঠে এনে খাওয়াইনি ? বেতুল (বেত ফল) পেড়ে লবণ লংকা দিয়ে ঝাঁকিয়ে দেইনি ? দে আমর সেই সব ফেরত দে।

কমলও রেগে গেল ।

ভেংচি কেটে বলল-উঃ ! দে সব ফেরত । কেন ফেরত দেব ? আমি তোকে বিল থেকে শালুক তুলে দিয়েছি। মজা পুকুরের জঙ্গল থেকে সিংগাড়া ফল (পানি ফল) এনে দিয়েছি। চড়ক পূজার মেলায় গিয়ে গুড়ের সন্দেশ কিনে দিয়েছি। সে সব তো খুব খেয়েছিস।

মহুলার কান্না থামল না। কাঁদতে কাঁদতে বলল- কেন দিয়েছিলি ? কে চেয়েছিল, চাই না। আর কোন দিন চাই না। আর তুই আমাকে জামগাছের ডাল থেকে পাখীর ছানা ধরবার জন্য ডাকবি না। মাছ ধরবার বঁড়শী বানিয়ে দিতে বলবি না। এই আমি চলমান বাড়ী। তুই যা ওই বজ্রযোগিনীর বামুনের ঘরজামাই হয়ে থাক গিয়ে ।

বড় বড় পা ফেলে মহুলা ফিরে চলল। কমল এবার একটু দমল। বুঝল তার বান্ধবী সত্যি চটেছে। আর তার নিজেও রাগের মাত্রাটা সীমা ছাড়া হয়ে গেছে। বেচারী মৌ ! যা লক্ষ্মী মেয়ে, কমলের জন্য ঢেপের খৈ ভেজে লুকিয়ে আঁচলের তলায় করে নিয়ে আসে। গাছতলার পাকা ফলমূলটা কুড়িয়ে পেলে কমলকে খাওয়ায়। কমলের মনটা নরম হয়ে গেল। পিছন থেকে ডাকল—এই মহুলী সন্ধ্যাবেলা একা একা তালতলা দিয়ে যাস না। বেহ্মদত্যি ধরবে।

মহুলা থামল না। হনহন করে হেঁটে যেতে যেতে বলল-ধরে তো ধরবে। মরলে পরে তুই তো একটা বেহ্মদত্যি হবি। কৈবর্তর মেয়ের হাতে জল খেলে বামুনদের জাত যায় তা কে না জানে। জাত যাওয়া বামুন মরলে কেউ পিণ্ডি

দেয় না, তারা বেক্ষ্মদত্যি হয়। শুনি নি বুঝি মার কাছে ?

কমল আবার ক্ষেপে উঠল-ওরে আমার জ্ঞান ঠনঠন সরা রে। তুই কেন আমায় ছোঁয়া খাইয়েছিলি রে মুখপুড়ী ? দাঁড়া এই সন্ধ্যাবেলা ব্রক্ষ্মশাপ দিচ্ছি মরে গিয়ে তুই যেন শাকচুন্নী পেত্নী হেসে ।

মহুলা থামল। কোমরে হাত দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল-দেখো কমল ঠাকুর সন্ধ্যাবেলা যা তা বলবে না বলে দিচ্ছি। তোমার মাকে বলে দেব।

কমল বেপরোয়া ভঙ্গীতে ঠোঁট উল্টাল-বল গিয়ে। আমি বড় কাউকেই ভয় পাই নাকি ?

-বেশ তো না পেলে যাও। আমি আর তোমার কাছে আসব না। আর তুমি যদি আমাদের গোয়াল ঘরের পেছন থেকে দুপুর বেলা আমায় চুপি চুপি ডাকো, আমি আসবই না ।

এবার থেকে আমি আমাদের পাড়ার ছেলে সুবলের সঙ্গে খেলব। গাঙে যাব। কৈবর্ত বরই হবে আমার। তুমি যাও ওই বজ্রযোগিনীর বামুনের মেয়ে বিয়ে কর গিয়ে ।

পনের বছরের কমলকান্তর নবীন পৌরুষে আঘাত লাগল, বলল—করবই তো। বজ্রযোগিনীর বামুনের ঘরজামাই হয়ে তোর নাকের ডগার সামনে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে নৌকায় উঠে চলে যাব। তখন বুঝবি মজা ।

মহুলা উত্তর দিল না। জোর পদক্ষেপে দম্ভ প্রকাশ করতে করতে এগিয়ে চলল। কমল চেঁচিয়ে উঠল-এই মৌ। একা যাসনা জঙ্গলের পথ দিয়ে, ওদিকে বুনোশুয়োর আছে। রাখ রাখ থাম। আমি তোকে গাঙ পাড়ের পথ ধরে এগিয়ে দিয়ে আসছি। আর তোর সঙ্গে ঝগড়া করব না। তুই যা বলবি তাই শুনব। লক্ষ্মী মৌ আমার ।

মহুলা থেমে গেল। তার চোখে মুখে বিজয়ের হাসি ছড়িয়ে পড়ল। সরু ঠোঁটে ঝিলিক তুলে হাসতে হাসতে ছড়া কাটল ।

যেমুন পাহাইড়া বইন্যা হাতী

শিকল বান্ধা পায়

তেমুন ঘরজামাইয়া শ্বশুর বাড়ী

বউয়ের লাথি খায় ।”

কমল মহুলার কাছে এসে হাসল- খুব হয়েছে এবার ক্ষান্ত দে। এই দিব্যি করছি কারো ঘরজামাই হব না আমি। আর তুই কিন্তু ওই সুবলটার সঙ্গে মিশতে পারবি না বলে রাখছি। মনে থাকে যেন ।

মহুলা কমলের হাত ধরে ভীত কণ্ঠে বলল কিন্তু এখন যে আমার ভয় করছে। একেবারে সাঁঝ হয়ে গেছে। বাড়ী ফিরলে মা আঁশবটি নিয়ে কাটতে আসবে।

কমল অভয় দিল ভয় নেই চল। আমি তোদের বাড়ীতে গেলে তোর মা রাগ করবে না। বামুন ঠাকুরকে দেখলে সব রাগ পদ্মার জল হয়ে যাবে ।

কমলের হাত ধরে মহুলা গাঙপাড়ের পথ ধরে কৈবর্ত পাড়ার দিকে এগিয়ে চলল। হাঁটতে হাঁটতে মহুলা বলল- আচ্ছা কমল ঠাকুর তোমার টোলের ছাত্ররা সবাই বলছিল তুমি নাকি পণ্ডিত মশায়ের কথা শোন না, পড়ালেখায় তোমার মন নেই ।

কমল মুখ দিয়ে তাচ্ছিল্যের শব্দ করল দুর ওসব শাস্ত্র পড়ে পণ্ডিত হতে আমার একটুও ভালো লাগে না। দেখিস এবার ভাদ্র মাসে আমি উজানের নাও চড়ে লক্ষণাবতীতে চলে যাব। সেখানে অনেক মজার জিনিস দেখবার আছে।

মহুলা আঁতকে উঠল – কি সর্বনেশে কথা বলছ, কমল ঠাকুর। শুনেছি ওখানে কোথাকার এক জাত লোক এসে মহারাজা হয়ে সিংহাসন দখল করে বসেছে। তারা খুব খারাপ ।

- কে বলল খারাপ ?

ওমা আমি বুঝি শুনিনি। আমাদের কৈবর্তপাড়ার মাল্লারা যে ওদিকে যায় মাঝে মাঝে। শুনেছি ওই দেশের নতুন লোকেরা গো-দেবতার মাংস খায়। কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। লোকের টাকাকড়ি সোনা দানা কেড়ে নেয় ।

- তাই দেখতেইতো যাব। জানিস বাবার কাছে শুনেছি ওরা নাকি পুজো করে না। আর আমাদের বলে হিন্দু।

- হিন্দু ! সে আবার কি ?

- কি যেন যারা পুজো করে তাদের সবাইকে ওরা হিন্দু বলে। সিন্ধু বলে গাঙের মত একটা নদী আছে যেন কোথায়, কোন দূরের দেশে, সেই নদীর : থেকেই ওরা নাকি আমাদের হিন্দু বলে।

- যাঃ। এটা আবার একটা কথা হল। সবাই তো আমাদের বংগাল বলে। এর মধ্যে আবার বামুন কায়েত বৈদ্য শূদ্র এই সব নাম ....

দূর থেকে বাজনার ঐক্যতান স্পষ্ট হয়ে উঠল। মহুলার কথা শেষ হল না । কৈবর্ত পাড়ার কাছাকাছি এসে পড়েছিল ওরা। ঢোল কাসি করতালের বাজনা শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠল মহুলা ।

দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বলল – এই যাঃ। একদম ভুলে গেছি। মা তাড়াতাড়ি গাঙ থেকে ফিরতে বলেছিল। আজ আমাদের পাড়ায় গান হবে। এতক্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে। ভালোই হল বাবা । চুপটি করে গিয়ে বসে পড়ব আসরের এক ধারে ।

কমল কৌতূহল উৎসাহিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল – কিসের গান রে ?

- কি যেন পদ্মা গাঙের ওপার থেকে কারা সব গাইয়ে এসেছে।

সন্ধ্যা বয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বর্ষণক্ষান্ত ভাঙা মেঘের আড়াল সরিয়ে দুই একটা তারা ঝিকমিক করে জ্বলে উঠেছে। গাঙের পাড়ের কৈবর্তপাড়ার খোলা আঙিনায় বাঁশেল খুঁটিতে বড় বড় মাছ ধরবার জাল টাঙিয়ে বাতাসে মেলে দেওয়া হয়েছে। ভেজা বাতাসে জাল থেকে আঁসটে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। দূর থেকে নদীর ঢেউয়ের ওঠা-পড়ার একটানা শব্দ ভেসে আসছে। খালের ধারে নরম মাটির ওপর কয়েকটি নৌকা উপুড় হয়ে পড়েছিল। কমল একটা নৌকার গলুয়ের ওপর বসে পড়ে বলল,

- আমি এখানেই বসি। তুই যা মহুলা ।

মহুলা অবাক হল – কেন গান শুনবি না ?

কমল উদাস কণ্ঠে জবাব দিল - না থাক। এখান থেকেই শুনতে পাচ্ছি। ওখানে কে আবার দেখে ফেলবে।

মহুলা আর দাঁড়াল না। পায়ের মলের রুমঝুম সিঞ্জন তুলে ছুটে চলে গেল। একা বসে রইল কমলকান্ত ।

গাঙের দিক থেকে হু হু করে হাওয়ার ঝাপটা আসছে। গাছপালার ডালে বাদুড় উড়ে বসছে। খাল দিয়ে ছপছপ করে বৈঠার শব্দ তুলে মাঝে মাঝে দু'একটা নৌকা যাচ্ছে। কৈবর্তপাড়ার দিক থেকে বর্ষা সন্ধ্যার সিক্ত বাতাস বয়ে গানের সুর ভেসে এল -

ওরে .... লক্ষ্মণ রাজারে ....

আহা কি কইমু রে আর ।

পশ্চিম হইতে আইল যবন

হাতে তলোয়ার ।

ঘোড়ার খুরে

ধুলা উড়ে

মাটি থর থর ।

যতেক গৌড়বাসীর প্রাণে

লাগে ভীষণ ডর।

আহা লক্ষ্মণ রাজারে ....

আহা কি কইমু আর ।

সোনার লক্ষ্মণাবতী

হইল ছার খার ॥

বৃদ্ধ কালে ঘটল রাজার

পরম আকাল

রইল পইড়্যা পঞ্চ ব্যঞ্জন

সোনার ঘাটি থাল ।

হায়রে বিধি নিদয়াল ।

সোনার দাঁড়ে সারী কান্দে

কান্দে পরিজন

- আকুল গাঙে ভাসল রাজা

দুঃখীর মতন ।

আহারে কি হইল শেষে

বিধির আদেশে

সোনার সিংহাসনের রাজা

আইল বংগাল দেশে ॥

সন্ধ্যা রাতের বাতাস বাদ্যমুখরিত গানের সুর ছড়িয়ে দিচ্ছিল নদীর বুকে। কমলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। গানের সকরুণ সুরের আর্তি সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলেও সিংহাসন হারা রাজার কথা ভাবতে ভাবতে সেই বিদেশী তুর্কীদের ওপর মনটা তার ভীষণ বিরূপ হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল তার নিজের বাবা ভজহরির কথা। তার বাবা কত চমৎকার গান বাঁধে। অথচ এই রাঢ়িখালের নাক উঁচু ব্রাহ্মণরা তার বাবার নাম শুনলেই নাক সিঁটকে বলে আচারভ্রষ্ট। কেন, বাবা তো কত ভালো। কাউকে ঘৃণা করে না। তাঁতী কৈবর্ত মাল বেদে সবাইকে ভালোবাসে। বলে, সবাই কৃষ্ণের সৃষ্ট জীব।

সহসা বাড়ীর কথা মনে করে উঠে বসল কমল। বাবা নিশ্চয়ই এতক্ষণ বাড়ী ফিরছেন।

কমলকে না দেখলে ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে বের হবেন। কমল উঠে বাড়ীর দিকে চলল । কৈবর্তপাড়ায় তখনও গান হচ্ছে -

‘ওরে লক্ষ্মণ রাজা রে – ”

তিন

আকাশে বৃষ্টিহীন সাদা মেঘ শরতের আমেজ ছড়িয়ে দিয়েছে। বিলের কালো বুকে অসংখ্য লাল পদ্ম হাওয়ায় দুলে বিলের কালো জল রক্তিম আভা বিকিরণ করছে। ঝাঁক বেঁধে সারস নেমেছে বিলের পাড়ে। আকাশে শঙ্খচিল ঘুরে

ঘুরে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রজ্জ্বল বেলায় করুণ কান্নার সুর ছড়িয়ে দিচ্ছিল। বিলের ধারের বইন্যা গাছের আড়াল দিয়ে দেখা যাচ্ছিল হাওয়ায় ঢেউ তোলা সবুজ ধান ক্ষেত, আর দূরে তাল নিম বাঁশ ঝাড়ে ঘেরা গ্রামের ছবি। ডোঙার লগি ঠেলতে ঠেলতে কমল বলল – ইস্ এখানে বড় দাম জমেছে। লগি আটকে যায়। ডোঙার আরেক প্রান্তে মহুলা বসেছিল। কমলের কথায় মুখ ফিরিয়ে তাকাল সে। মহুলার কানের রূপোর কুণ্ডল আর গলার হাসুলী রৌদ্রে চকচক করে উঠল। ব্যস্ত কণ্ঠে মহুলা বলল – তাড়াতাড়ি কর কমল ঠাকুর। আজ আবার হাটের দিন। বেলাবেলি বিল ছাড়িয়ে খালে না পড়লে মায়ের সঙ্গে মাছের ডালা নিয়ে হাটে যেতে পারব না ।

কমল লগি দু'হাতে চেপে ধরে সামনের দিকে তাকাল দেখেছিস মউলী ! কত পানকৌড়ি ! কেমন ডুব দিচ্ছে ! দেখ দেখ, ওই যে দূরে একটা বিরাট সাদা রঙের হাড়গিলে।

মহুলা কৌতূহলী হয়ে তাকাল। তারপর খুশীতে হাততালি দিয়ে উঠল ওমা কমল ঠাকুর কানা না কি। ওটা তো হাড়গিলে নয়। দূর থেকে একটা সাদা পালের নাও যাচ্ছে খাল দিয়ে।

কমল বিল ছাড়িয়ে ডোঙাটা খালের মুখে এনে বৈঠা তুলে নিল ।

বিলের হাওয়ায় মহুলার চুল উড়ে পড়ছে কপালে। শ্যামবর্ণ মুখের ওপর রোদ পড়ে লালচে ছোপ ধরেছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে। সেদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হল কমল । বলল – তুই ভারী সুন্দর মৌ। ঠিক যেন ওই বিলের পদ্মফুল।

মহুলার সুডৌল মুখে সত্যি রঙের ঝলক লাগল । সুন্দর গ্রীবা ভঙ্গী করে বলল যাঃ। আমি তো কালো। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল জানো কমল ঠাকুর বাবা না সুবলের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করছে। আমি কিন্তু সুবলের বউ হব না। সামনের আশ্বিন মাসে নাকি পাকা কথা হবে। আচ্ছা বল, আমি কেমন করে সুবলের বউ হব ! ওটাকে আমার একটুও ভালো লাগে না। আমি সেই কবে থেকে তোমাকে বর বলে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি।

কমলের মুখের ওপর দিয়ে মেঘের ছায়া ভেসে গেল যেন। অবিশ্বাস্য কণ্ঠে বলল – যাঃ, তা কি হয়। সুবলটা তোর বর হবে আমার বিশ্বাস হয় না ।

মহুলা মুখ ঘুরিয়ে তাকাল - তাহলে তুমি আমায় বিয়ে করবে না কি ?

কমল সহসা জবাব দিতে পারল না। একটু চুপ করে থেকে বলল – তাই বা কি করে হবে। তোরা যে কৈবর্ত । সত্যি ভারী বিশ্রী এসব। তুই আমি সবাই তো একই রকম মানুষ। জানিস ওই গাঙের ধারে এক বিদেশী সাধুবাবা এসেছেন। উনি বলেন, মানুষে মানুষে নাকি কোন তফাৎ নেই। সব মানুষ একই জাতের। তাছাড়া উনি কাউকে ঘৃণা করেন না। গাঙের ওপারে চরের অনেক মাল কারিগররা তাঁর কাছ থেকে এক নতুন ধর্ম নিয়েছে ।

মহুলা অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল তাই শুনেছি। তবে মা একদিন ওই সাধুবাবার কাছে গিয়েছিলেন। মায়ের জ্বর হয়েছিল। সাবুধাবা কি যেন মন্তর পড়ে জলে ফুঁ দিলেন মার জ্বর তাতেই সেরে গেল। আমাদের পাড়ার সবাই ওই সাধুবাবাকে খুব ভক্তি করে। একটু থেমে মহুলা বলল-আচ্ছা কমল ঠাকুর! চল না তুমি আর আমি একদিন লুকিয়ে সাধুবাবার কাছে গিয়ে বলি, 'সাধুবাবা' আমাদের বর দাও আমরা যেন দু'জনে বিয়ে করতে পারি ।

কমল হেসে ফেলল-দুর। তুই একটা আস্ত পাগোল। এমনিতেই শুনছি বজ্রযোগিনীর বামুন আর রাঢ়িখালের বামুনরা কোমর বাঁধছে কারা কাদের জাত মারবে সেই আয়োজনে। এদিকে সেনরাজার দল ওদিকে নরোত্তম দেবের দল।

ডোঙা খালের ধারে ভিড়ল। কমল বলল-এখানে নেমে যা মহুলা। আমি গাঙে যাব ।

মহুলা উঠে দাঁড়াল। শাড়ীর আঁচল কোমর জড়িয়ে কমলের কাছে এসে বলল—কাল এসো কমল ঠাকুর। আমি তোমার জন্য তালের বড়া ভেজে নিয়ে আসব গাঙের ধারে।

কমল তাড়া দিল-হয়েছে হয়েছে। এবার নাম দেখি। সুবলকে খাওয়াস গিয়ে তালের বড়া।

মহুলা ডোঙা থেকে লাফিয়ে কূলে নেমে ছলছল চোখে তাকাল কমলের দিকে—সত্যি খাবে না তুমি ?

কমল হেসে ফেলল-খাব না বলেছি অমনি কেঁদে ফেললি ? বলছি তো খাবো খাবো খাবো। এই তিন সত্যি, যা এবার ছুটে বাড়ী যা। তোর মা মাছের ডালা

নিয়ে বসে আছে।

মহুলা ফিক করে হেসে ফেলল। তারপর ছুটে মিলিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে। কমল ডোঙাটার মুখ ঘোরাতে গিয়েই যেন ভূত দেখে চমকে উঠল। স্বয়ং পণ্ডিত রামচরণ কাব্যরত্ন তাঁর প্রিয় ছাত্র শ্রীধরকে সঙ্গে নিয়ে খালপাড়ে দাঁড়িয়ে। শ্রীধর উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল-দেখলেন তো গুরুমশায়। আমি কি মিথ্যে বলেছি। ওই জেলের মেয়েটার সঙ্গে ওর দিন রাত ঘোরাফেরা খাওয়া শোওয়া সব ।

পণ্ডিত রামচরণের চেহারা ক্রোধে রক্তিম হয়ে উঠল। অত্যন্ত কঠিন কণ্ঠে তিনি বললেন-কমল। এসব তা'হলে সত্যি ! ছিঃ ছিঃ কি অনাচার। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে এত বড় অনাচার করতে তোর একটুও বাধল না ! আর বাধবেই বা কি করে ! যেমন বাপ তার তেমন ছেলে। কি রে কথা বলছিস না কেন কুলাংগার?

কমলকান্ত নতমস্তকে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। শ্রীধর ব্যঙ্গ করে উঠল—উঃ, উনি আবার হতে যাচ্ছিলেন বজ্রযোগিনীর বামুনের জামাই। জানেন গুরুমশাই ও না সব জাতের ছোঁয়া খায় ।

বজ্রযোগিনীর ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গে রামচরণ পণ্ডিতের মন আরও তিক্ত হল । ঘৃণা ভরা কণ্ঠে তিনি বললেন- আরে রাখ । রত্নেই তো রত্ন চেনে। তবে এর বিহিত না করলে এ অনাচারের পাপের ভাগী হব সবাই। শ্রীধর তুই যা। সাত গাঁয়ের বামুনদের খবর দে। আজ পঞ্চায়েত ডাকব। এতক্ষণে কথা বলল কমল-কেন কি করবেন ?

রামচরণ পণ্ডিতের ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘিত হল-ওরে দুরাচার। আবার কথা। কি করব তা কালকেই বুঝবি। তোদের ভিটেয় ঘুঘু চরাব। ঘুঘু। বুঝলি ? বল গিয়ে তোর গায়েন বাপকে । আর মালো ব্যাটাদেরও আমি ত্রিভুবনপাতাল দেখিয়ে ছাড়ব ।

অসহ্য রাগে জ্বলতে জ্বলতে পণ্ডিত রামচরণ ফিরে চললেন। মনে মনে অবশ্য উল্লসিতও হলেন। এতদিনে ভজহরিকে জব্দ করবার সুযোগ পাওয়া গেছে। তাছাড়া আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ বলে যদি একবার ওকে গাঁ ছাড়া করা যায়। তবে ভজহরির জমিজমা গাভী বলদ রামচরণই করায়ত্ত করতে পারবেন ।

কমল যেন প্রস্তরীভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রামচরণ পণ্ডিতের ব্রাহ্মণ্য প্রতাপের

কথা তার অজানা নয়। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থাকবার পর কমলকান্ত ডোঙাটাকে ধাক্কা দিয়ে কাদায় ফেলে মাটিতে নামল ।

চার

ভজহরি ঘরের দাওয়ায় বসে এক গোছা কলাপাতার ওপর গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাতাগোলা কালিতে খাগের কলম বুলিয়ে মনসা-মঙ্গল পালা লিখছিলেন।

শরতের বেলা পড়ে এসেছে। আঙিনার একপাশে বেলগাছটার সবুজ পাতায় সোনা রং ঝিলমিল করছে। সেই সোনালী রৌদ্রের টুকরো উঠোনের ওপর যেন এক স্বর্ণালী আলপনা এঁকেছে। বাড়ির পিছনে নারিকেল সুপারী বনের মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক টিয়া ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। লিখতে লিখতে উনমনা দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলেন ভজহরির ভেতর বাড়ীর পুকুরের পাড়ের বাঁশ ঝাড়ের দিকে। বৈকালী হাওয়ায় আন্দোলিত বাঁশ ঝাড়ের মাথার ওপর ছড়িয়ে রয়েছে অপরূপ নির্মেঘ নীলাকাশ। কাঠ-ঠোকরা গাছের ডালে ক্রমাগত ঠোঁট ঠুকরে কাজে ব্যস্ত। ডালপালার ভেতর দিয়ে দূরের ধানক্ষেত আর লাল শাপলা ভরা বিলের একাংশ দেখা যাচ্ছে। তাকিয়ে দেখে প্রসন্ন মনে ভজহরি আবার লেখায় মন দিচ্ছিলেন । মাঝে মাঝে আপন মনে গুন গুন করে পালার সুর ঠিক করছিলেন।

কমলকান্ত নিঃশব্দ সঞ্চারে বাড়ী ঢুকে কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে এসে দাঁড়াল ভজহরির পাশে। কিছুক্ষণ চুপ করে দাওয়ার খুঁটিটার মাথা ঠেকিয়ে কমল নীচু কণ্ঠে ঢাকল-বাবা ।

ভজহরি চোখ তুলে তাকালেন। অন্যমনস্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন-কি রে কমল কোথা থেকে এলি ?

ভজহরি কমলের উত্তরের অপেক্ষা না করে আবার লেখায় মনোনিবেশ করলেন। লিখতে লিখতে সুরেলা কণ্ঠে পালার একটি কলি গুন গুন করতে গিয়ে বাধা পেলেন । কমল ডাকল-বাবা ।

–আঃ, একটু দাঁড়া বাবা। এখন চাঁদ বেনের জাহাজ ডুবি হয়েছে। এই জায়গাটায় ছন্দটা একটু গাম্ভীর্যপূর্ণ করতে হবে।

কমল আপাতত নিজের সমস্যাটার কথা ভুলে বাবার লেখার দিকে ঝুঁকে পড়ল-কি লিখছ বাবা পুরাণের অনুবাদ ?

ভজহরি হেসে ফেললেন-দূর পাগোল। এতো মনসা মঙ্গল পালা। ওঃ, সেবার বিষহরির পুজোর সময় যে গানটা লিখেছিলাম না বেহুলার বিলাপ নামে। সবাই শুনে কেঁদে আকুল । এইবার দেখিস এই মনসা-মঙ্গল সকলে কেমন পছন্দ করে।

কমলও উৎসাহিত হয়ে উঠল। দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বলল-ওই মাল্লদের পাড়ায় সেদিন যা একদল গায়েন এসেছিল। যা চমৎকার গান হল বাবা ।

ভজহরি এবার লেখা বন্ধ করে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালের ছেলেন দিকে – কি গান রে কমল ?

-লক্ষণ রাজার পালা। আমি দূর থেকে শুনেছি, কিন্তু এখনও আমার মনে আছে। ভারী ভালো লেগেছে আমার ।

ভজহরি উৎসাহিত হলেন-তাই নাকি ? তুই গাইতে পারিস ? গেয়ে শোনা তো একটু।

কমল সলজ্জ হাসল। তারপর বেলগাছটার রোদমাখা ডাল-পালার দিকে চোখ রেখে মিষ্টি সুরে গাইল-----

“ওরে আমার লক্ষ্মণ রাজারে এ...

আহা কি কইমু রে আর ।

সোনার লক্ষণাবতী

হইল ছারখার ।

****

সোনার দাঁড়ে শারী কান্দে

কান্দে পরিজন-

আকুল গাঙে ভাসল রাজা

দুঃখীর মতন।”

ভজহরি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। ছেলের দিকে সপ্রশংস চোখে চেয়ে বললেন- বাঃ, ভারী মিষ্টি গানের গলাতো তোর। এবার থেকে তোকেও আমার সঙ্গে পালা গাইতে নেব ।

কমল মুহূর্তে বিষণ্ন হয়ে গেল। উপবীতের উপর আঙ্গুল স্পর্শ করে সে ব্যথিত কণ্ঠে বলল-কিন্তু আমরা যে বামুন বাবা ।

ভজহরি চোখেল দৃষ্টি স্নিগ্ধ হল—তাই কিরে ? সর্ব জীবে দয়া, মানুষকে ভালোবাসা এতো অন্যায় নয় কমল ।

কমল দৃষ্টি তুলল—তবে তোমায় কেন সবাই বলে হরি গায়েন আচার ভ্রষ্ট।

ভজহরির স্নিগ্ধ হাসিমাখা ঠোঁটের কোণে বেদনার ছায়া ফুটল-আচার সৃষ্টি করেছে মানুষ। আর মানুষ সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং ঈশ্বর। তবে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিষ্প্রাণ আচার আঁকড়ে পড়ে থাকলে যে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে হয় ।

কমলের মুখে হাসি ফুটল-তবে কেন মিছিমিছি এত জাতের কড়াকাড়ি, ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার আর কৌলীন্যের বড়াই ?

ভজহরি ছেলের মাথায় হাত রাখলেন- বাবা কমল। রাঢ়িখালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজ আমায় ঘৃণা করে। বলে হরি গায়েন মূর্খ। বেদ পূরাণ পড়ে না। ছোট জাতের কাছে যায়। ব্রাহ্মণ সমাজের কলঙ্ক ! কিন্তু বাবা। মানুষের অতি বাড়াবাড়ি তার পতন ঘটায়। লক্ষ্মণ সেনের বাবা রাজা বল্লাল সেন যদি কৌলীন্যপ্রথা চালু না করত তাহলে আজ যবন তুর্কীরা রাঢ় গৌড় দখল করে বসতে পারত না । তাছাড়া সত্যিই কি ব্রাহ্মণরা ধর্ম রক্ষা করছে ? তারা তো বল্লাল সেনের দেওয়া কৌলীন্যের গর্বে কে কত বড় কুলীন আর শাস্ত্রচর্চায় কার কতখানি পাণ্ডিত্য সেই রেষারেষির লড়াইতে অন্ধ ।

কমল চুপ করে শুনছিল। ভজহরির কথা শেষ হতে সে বলল-জানো বাবা ! পণ্ডিত রামচরণ কাব্যরত্ন পঞ্চায়েত বসিয়ে আমাদের না কি বিচার করবেন।

ভজহরি চমকে উঠলেন- সে কি রে ?

-হ্যাঁ বাবা। আমি.....আমি মাল্লদের মেয়ে মহুলার সঙ্গে ঘুরি তাই-আর-বলছিল

আমাদের ভিটেয় নাকি ঘুঘু চরাবে।

ভজহরি ব্যথিত নিস্তব্ধ ভঙ্গীতে বাঁশ ঝাড়ের মাথায় উপর তাকিয়ে রইলেন। তারপর অস্ফুটে বললেন-ভিটে ছাড়া করবে ! তাহলে এমন শাপলা ভরা বিল, এই নদী ধান ক্ষেত এসব ছেড়ে চলে যেতে হবে ! কোথায় যাব এমন দেশ ছেড়ে ? কমল বিষণ্ন উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করল-তাহলে আমরা সত্যি চলে যাব বাবা ! যাব কোথায় ? ভজহরি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে উত্তর দিল-জানি না ।

কমলের মা পুকুরে নাইতে গিয়েছিলেন। জলভরা তামার কলস কাঁখে নিয়ে ভেজা কাপড়ে বাড়ী ফিরে স্বামীপুত্রের নিস্তব্ধ ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে তিনি কিছু একটা বুঝলেন। জলের কলস নামিয়ে দাওয়ার সামনে এসে কমলের মা ধীর কণ্ঠে বললেন—ওগো শুনলাম গায়ের পণ্ডিতরা এ সপ্তাহে পঞ্চায়েত ডেকেছে। ঘাটে ভট্টচার্যি বাড়ীর ঠাকুরান বলছিলেন, আমাদের নাকি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সেন রাজার কাছে বিচার পাঠানো হচ্ছে। সারা বিক্রমপুর মণ্ডলে খবর গেছে। হ্যাঁরে কমল কি হয়েছে বল তো ? ভট্টচার্য ঠাকুরান তো আমায় খুব শুনিয়ে দিলেন ।

কমল দাওয়া থেকে নেমে পড়ল-আমি আর কি বলব মা। ঠাকুরানের কাছে তো শুনেই এলে । কমল আর না দাঁড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ।

কমলের মা কাপড় ছেড়ে দাওয়ায় ফিরে এলেন। স্বামীর পাশে বসে পড়লেন। ভজহরি তখনও তাকিয়ে আছেন দূরের বিলের দিকে। রৌদ্রের উজ্জ্বল রং ক্রমশ ম্লান বিবর্ণ হয়ে এসেছে। বকের পালকের মত একখণ্ড হালকা সাদা মেঘ আকাশের এককোণে যেন স্তব্ধগতি পাখীর মত আটকে আছে। কমলের মা ধীরে ধীরে স্বামীর বাহু স্পর্শ করলেন-আমি একটা কথা বলব শুনবে ?

ভজহরি দৃষ্টি ফেরালের সদ্যস্নাতা স্ত্রীর স্নেহময়ী মুখের দিকে-

কি বলবে ?

—বলেছিলাম একবার বজ্রযোগিনীতে যাও। আমার মামার বাড়ী সেখানে। তারা একটা কিছু বিহিত করে দেবে।

ভজহরি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন-কার কাছে আর যাব ব্রাহ্মণী । আমি তো জাত ছাড়া। কে আমার কথা দাম দেবে বল ! তাছাড়া এখন সেন রাজাদের স্বর্ণযুগ নেই। ব্রাহ্মণদের সেই প্রতাপও নেই। এমনিতেই শুনেছি সেখানকার

দেবরা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তারা আর সেন রাজাদের পরোয়া করছে না। আমরা ব্রাহ্মণরা তো নিজেদের মধ্যে মাথা ভাঙাভাঙি করে সর্বনাশের পথ ডেকে আনছি।

কমলের মা শিহরিত হলেন-ষাট বালাই। তুমি আবার কবে দলাদলি করলে। তবে শোন দেবরা তো আমার মামার পড়শী। তুমি না হয় তাদের কাছেই যাও।

ভজহরি নিরুত্তর রইলেন ।

শেষ বিকেলের আলোর আভাসটুকু এক সময় গাছপালার ওপর একরাশ অন্ধকার ঢেলে দিয়ে মিলিয়ে গেল। কমলের মা উঠলেন। -ওঠো তোমার সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় হয়েছে। এই জল গামছা দিচ্ছি হাত মুখ ধুয়ে নাও ।

পাঁচ

রামচরণ কাব্যরত্ন রাঢ়িখালের পণ্ডিত শিরোমণি বসে থাকার লোক নন। চর্মচক্ষে এত বড় অনাচার অধর্ম দেখে কুলীনশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হিসেবে তিনি তাঁর কর্তব্যে উঠে পড়ে লাগলেন। সাত দিনের মধ্যে সারা গায়ে ঢি ঢি পড়ে গেল। সুবর্ণগ্রাম থেকে রাজার লোকজনও এসে পড়ল। এবার বিচার বসিয়ে দিনক্ষণ দেখে শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী দুরাচারী ব্রাহ্মণ হরিকে সগোষ্ঠী দেশান্তরী করে দেওয়া গেলে তাঁর ইহকাল পরকালের পুণ্য অর্জিত হয় ।

আর ওই কৈবর্তপাড়ার মাল্লদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতবড় বাড় যে ব্রাহ্মণদের সাথে ওঠাবসা করতে চায় ! এই ধৃষ্টতা ঘুচিয়ে না দিলে পণ্ডিত রামচরণ কুলীনশ্রেষ্ঠ রাঢ়ি ব্রাহ্মণই নন ।

সন্ধ্যার পর নদীর বুক শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় যখন হীরে মুক্তোর আভরণ সজ্জিতা রূপসী নারীর মত ঝলমল করে উঠেছে তখন একটি বড় নৌকা এসে থামল কৈবর্তপাড়ার ঘাটে। নৌকা থেকে নামল একজন কৃষ্ণকায় তরুণ। তার পরনে খাটো ধুতি মালকোচা করে পরা। কাঁধ পর্যন্ত বাবড়ী চুল। কপাল ঘিরে একটি গামছা জড়ানো। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ যুবকটি হাতে একটি বর্শা নিয়ে নামল। তার পেছনে আরও কয়েকজন যুবক নেমে এগিয়ে চলল পাড়ার দিকে। অপরিচিত লোক দেখে কৈবর্ত পাড়ার কুকুরের দল সমস্বরে ডেকে উঠল। কুকুরের ডাক শুনে মহুলার বাবা বাঘাই বেরিয়ে চীৎকার করে উঠল-

কে ? কারা হে ? তোমরা কে আসছ ?

বাঘাইর চীৎকারে দলের পুরোভাগের যুবকটির শুভ্র দাঁতের সারি আর হাতের বর্শার ফলক জ্যোৎস্নার ঝলক দিয়ে উঠল। যুবক চেঁচিয়ে জবাব দিল-কে, বাঘাই খুড়ো নাকি ? আমি ঈশান মল্ল ।

—ঈশান ! ঈশান ফিরে এসেছিল। বাঘাই ছুটে এসে ঈশানকে জড়িয়ে ধরল। ইতোমধ্যে পাড়ার স্ত্রী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ যুবা অনেকেই বেরিয়ে এসেছিল। সকলের মুখেই বিস্ময় আনন্দে উচ্চারিত হচ্ছে—ঈশান। আমাদের ঈশান ফিরে এসেছে। বাঘাইর ভাই পো ।

বাঘাই সকলের দিকে তাকিয়ে হর্ষ-উত্তেজিত কণ্ঠে বলল-কই গো মেয়েরা বউরা। তোরা শাঁখ বাজা। উলু দে। আমাদের ঈশান আবার ফিরে এসেছে। ঢুলী খবর দে । পাঁঠা কাট। মা বিষহরি মনসা-আমার ঈশানকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

মুহূর্তে সারা পাড়ায় আনন্দের সোরগোল পড়ে গেল। বছরচারেক আগে এ পাড়ার জেলেদের একদল মাছ ধরতে গিয়েছিল ভাটিতে। সেখানে একদিন রাতে চরে নৌকা বেঁধে জেলেরা সবাই যখন রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত সেই সময় ঈশানকে সাপে কামড়ায়। সাপের বিষে অল্পক্ষণের মধ্যে জ্ঞান হারালে তার সাথীরা ঈশানকে মনসার নৈবদ্য জ্ঞানে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। ঈশানের সর্প দংশনকে মনসার ক্রোধ মনে করে ভীত জেলেরা মাছ ধরা বন্ধ করে ফিরে এসেছিল।

সেই ঈশান এত বৎসর পরে সশরীরে গাঁয়ে ফিরে এসেছে ! একে দেবীর কৃপা ছাড়া আর কি ভাবা যায় !

হর্ষের উচ্ছ্বাস কিছুটা কমে এলে ঈশান তার নিরুদিষ্ট জীবনের কাহিনী শুনিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল !

সাপের বিষে জ্ঞান হারান ঈশানের যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে এক বেদের নৌকায় শুয়ে। ডাকিনী জ্ঞানসিদ্ধ এক বৃদ্ধা বেদেনী ওঝা ঈশানের শরীর থেকে বিষ ঝেড়ে তাকে নতুন জীবন দান করেছে। এরপর বেদেদের সঙ্গেই কিছুদিন ঘুরেছে ঈশান মল্ল। কিন্তু জলচারী জীবনে ঈশান হাঁপিয়ে উঠল। তাই একদিন বেদেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঈশান নেমে পড়ল স্থলে।

হাঁটতে হাঁটতে উপস্থিত হল পট্টিকেরায় (বর্তমান নোয়াখালী থেকে ত্রিপুরা অঞ্চল)। পট্টিকেরার এক কৈবর্ত প্রধানের কাছে আশ্রয় মিলল তার। তার কাছে যুদ্ধবিদ্যা অস্ত্রচালনা শিখে কিছুদিনের মধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে ফিরে এসেছে ঈশান মল্ল তার নিজের দেশে।

খাওয়া দাওয়া গল্প শেষ হবার পর চাঁদ আকাশের মধ্যপথ অতিক্রম করে যখন নীয়দিকে নেমে আসছে তখন ঈশান সহসা চাপা দৃঢ় কণ্ঠে বলল- খুড়ো বাঘাই, আমরা মল্ল । সেন রাজাদের অধীনতা মানব না আর ।

বাঘাই ও অন্যান্য বর্ষীয়ান জেলেরা চমকে উঠল- সে কি কথা ঈশান। চুপ চুপ, সেন রাজার কানে গেলে আর উপায় নেই ।

ঈশান মল্ল প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠল। সে হাসি মাঝরাতের বাতাসে শিহরণের ঝাপটা তুলে ছড়িয়ে গেল উন্মুক্ত নদীর বুকে ।

ঈশান সাদা দাঁতে বালক তুলে বলল- সেন রাজাদের ভয় ঈশান মল্ল পায় না। আমরা স্বাধীন । আজ থেকে আমরা কারো অধীন নই । এই বংগাল আমাদের।

বাঘাই উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করল কিন্তু কি আছে আমাদের ? বাঁশের লাঠি সড়কী মাছ ধরার জাল নৌকা আর রাম দা। এ দিয়ে কি সেন রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় ঈশান ? তোর মাথা খারাপ হয়েছে। ঈশান আবার ভয়ংকর হাসল ।

মাথা খারাপ হয় নি খুড়ো। মাথাটা উঁচু হয়েছে। চিরটা কাল তো ছোট জাত বলে সকলের লাথি খেয়ে মাথাটা নীচু করেই রেখেছ। দেখেছ কোনদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে কতদূর পর্যন্ত দেখা যায় ? জানো সেন রাজাদের অস্ত্রের সে জোর আর নেই । তাদের বাধা দেবার মত ব্যবস্থা করেই আমি এসেছি। আর এখনই সময় ।

ঠিক এই সময়েই একটা সোরগোল ভয়ার্ত কান্নার রোল উঠল ।

গোলমালের মধ্যে বাঘাইর স্ত্রীর আকুল কান্না শোনা গেল ।

- ওলো আমার মাহুলীকে ধরে নিয়ে গেছে ডাকাতরা। ওরে মহুলা রে -

বাঘাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়াল ঈশানও। বাবড়ী চুলে ঝাঁকি দিয়ে বর্শা ঘুরিয়ে প্রচণ্ড চীৎকার করে উঠল সে-হা রে - রে -

চাঁদ অস্ত গিয়েছিল। পুরুষেরা সকলে উঠে পড়ল ঘর থেকে। দা কুড়োল সড়কী নিয়ে বের হল সবাই। ততক্ষণে কৈবর্তপাড়ার অনেকগুলো ঘর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। সেই আগুনের আভায় দেখা গেল অসংখ্যা ছিপ নৌকা এসে ঘিরে ফেলেছে কৈবর্তপাড়ার ঘাট। ছিপ থেকে বল্লম সড়কী হাতে ঝাঁপিয়ে নামল ঈশানের লোকেরা। সকলে এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠল। হা-রে-রে-রে-রে।

কৈবর্তপাড়ায় আগুন দিয়ে মহুলাকে ধরে নিয়ে যারা পালাচ্ছিল বিপাক দেখে তারা মহুলাকে গাঙের পাড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে প্রাণপণে ছুটে পালাতে লাগল। বেশীদূর যেতে পারল না তারা। ঈশান মল্লর তার সশস্ত্র বাহিনী এসে ধরে ফেলল তাদের। আসামীদের ধরে নিয়ে আসা হল বাঘাইর সামনে। পোড়া ঘরগুলোর আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছিল, তবু আগুন ধিক ধিক করছিল জ্বলে যাওয়া কুঁড়ের চালের বাতার বাঁশে ।

সেই লালচে আগুনের মত জ্বলে উঠল বাঘাইর চোখ। বাঘের মত হুংকার দিয়ে উঠল সে-কে তোরা ? আলো জ্বালিয়ে নিয়ে এল একজন। আলোতে ধৃত আসামীদের সারিতে তাকিয়ে চমকে উঠল বাঘাই-এ কি শিরিধর ঠাকুর বাবারা। এ কাজ তোমাদের ? বিস্ময়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল বাঘাইর। বুকের পেশী টান টান করে সামনে এগিয়ে এল ঈশান। কঠিন কণ্ঠে বলল- তোমাদের কুচি কুচি করে কেটে গাঙে ভাসিয়ে দিতাম। কিন্তু ব্রাহ্মণ হত্যা করে হাত কলঙ্কিত করব না আমরা, তবে শুনে রাখো মল্লরা স্বাধীন। তোমরা, সেনরাজাদের লোক, তোমরা আমাদের দাস। সেন রাজা আমাদের স্বাধীনতা না মানলে তোমাদেরও ছাড়া নেই। সকলে উল্লাসে চীৎকার করে উঠল—জয় ঈশান মল্লের জয় ।

মুহুর্মুহু জয়ধ্বনির মধ্যে আবার কান্নার রোল ওঠল। যারা গাঙের ধারে মহুলাকে খুঁজতে গিয়েছিল তারা ফিরে এসেছে। মহুলাকে পাওয়া যায়নি। সম্ভবত কুমীর ধরে নিয়ে গেছে। মহুলার মা মাটিতে মাথা ঠুকে বিলাপ করতে লাগল-ওরে মহুলারে। তুই কোথায় গেলিরে ।

ছয়

কৈর্বতপাড়ার এসব ঘটনা ঘটবার আগেই হৃষ্টচিত্তে শয্যাগ্রহণ করে পরম নিশ্চিন্তে মনে শুয়ে পড়ে ছিলেন পণ্ডিত রামচরণ। কারণ আজ বিকেলেই বিচার বসিয়ে ভজহরিকে জ্ঞাতি গোষ্ঠীসমেত শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী আচারভ্রষ্ট

করা হয়েছে। এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দক্ষিণের জঙ্গলাকীর্ণ পুণ্ড্র (পোদ) শূদ্রের আবাসে নির্বাসন আদেশ দেওয়া হয়েছে। কাল প্রভাতে সূর্য উঠার আগেই তাদের এ এলাকা ছেড়ে যেতে হবে। প্রভাতে উঠে তাদের মুখ দর্শন করলেও নরক প্রাপ্তি। তবে মনে মনে একটা কথা অবশ্য স্বীকার না কররে পারলেন না রামচরণ যে হরি গায়েনটা বাউণ্ডুলে বামুন হলে হবে কি কুলজী ঠিকুজীর ইতিহাস জানে। আর সাহসও আছে ওই কাণ্ডজ্ঞানহীনটার। কেমন বলে গেল যে রাঢ়ের রাজা শশাঙ্কের একবার সর্বশরীরে বিষাক্ত ঘা হয়েছিল। সেই দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য কান্যকুব্জ থেকে কযেকজন তেজোদীপ্ত শক্তিমান ব্রাহ্মণ আনা হয়েছিল। তারা চিকিৎসা করে মহারাজা শশাঙ্ককে রোগমুক্ত করে রাঢ়ভূমি থেকে দেশে ফিরে গেলে কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণকুল তাঁদের জাতে ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করে। কারণ তারা ম্লেচ্ছদেশে গমন করেছিলেন। জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণরা বিরস মনে রাঢ়ে ফিরে এসে ম্লেচ্ছকন্যাদের বিবাহ করে এদেশেরই স্থায়ী হয়ে যায়। এই ব্রাহ্মণদের মৃত্যু ঘটলে তাঁদের মুখাগ্নি করবার জন্য ব্রাহ্মণদের পূর্বপত্নীর গর্ভজাত পুত্ররা এদেশে আগমন করে। তারাও কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ সমাজ দ্বারা বিতাড়িত হয়ে আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ হয়ে এদেশে বসবাস করতে থাকে। এই ব্রাহ্মণদের বংশধররাই রাঢ়ী বরেন্দ্রী ব্রাহ্মণদের উত্তরপুরুষ। আর সাতশতী বামুনদের পূর্বপুরুষরা ছিল জাতে কিরাত। পেশায় শিকারী। এই কিরাত পাখী শিকারীদের উপবীত পরিয়ে বংগালের রাজা আদিশূর ব্রাহ্মণ উপাধি দান করেছিলেন।

সুতরাং রাঢ়ী, বরেন্দ্রী সাতশতী এরা কেউই যখন নির্দোষ ব্রাহ্মণ নয় তাহলে হরি গায়েনই বা বল্লাল সেনের সৃষ্ট উচ্চ-নীচ, কুলীন-শূদ্র, ইতর-ভদ্র প্রভৃতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা বিভক্ত সমাজের আচার অনুযায়ী আচারভ্রষ্ট হয়ে যাবে কেন ?

বলা বাহুল্য, এতে পঞ্চায়েতের গণ্যমান্যরা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিলেন। ছিঃ ছিঃ ব্রাহ্মণ হয়ে কৌলীন্যের নিন্দা গায় যে তার মুখ দর্শনেও নরকপ্রাপ্তি। প্রমাণ মিলিয়ে ভজহরিকে জাতিচ্যুত করতে দেরী হল না এবং রামচরণ পণ্ডিত ও তাঁর অনুগামী ও তাঁর গোঁড়া ব্রাহ্মণদের মনস্কামনা সিদ্ধ হল ।

রামচরণ কাব্যরত্ন পাশ ফিরে শুয়ে আবার মনে মনে হাসলেন। ওদিকে মাল্ল ব্যাটাদের পাড়াও এতক্ষণ আগুনে পুড়ে ছাই হচ্ছে। পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন রামচরণ। রামচরণ পণ্ডিত যখন সুখনিদ্রায়, তখন অশ্রু বিসর্জন

করতে করতে সপরিবারে রাঢ়িখালের ঘাটে বাঁধা নৌকায় উঠলেন ভজহরি। নৌকার রশি খুলে মাঝি নীরবে নৌকা বাইতে লাগল। এক সময় গাঙে মাঝামাঝি এসে প্রশ্ন করল-ঠাকুর, সামনে চরে নৌকা বেঁধে রাখব ? কাল সকালে সূর্য উঠবার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিকে বেয়ে যাব। রাতে ভুল হতে পারে।

ভজহরি উত্তর দিলেননা। চক্ষু মুদিত করে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। মাঝি আবার প্রশ্ন করল-কোন দিকে যাব গায়েন ঠাকুর ?

সুপ্তোত্থিতের মত জেগে উঠলেন ভজহরি। মাঝি বুঝি তাঁকে এক বিরাট জিজ্ঞাসার সম্মুখীন করেছে। মনে মনে আকুল হয়ে ভজহরি নিজেকে জিজ্ঞাসা কররেন, কোন দিকে ? এবার কোন দিকে ? যেন তাঁর জীবন এক প্রচণ্ড গতি পরিবর্তনের বাঁকের সামনে এস দাঁড়িয়েছে।

ভজহরি মাথা তুললেন-ওই দিকে যেখানে সেই যবন সাধু বাবার নৌকা বাঁধা। কমল ও তার মা যুগপৎ চমকিত ও ভীত হল-সে কি সেখানে কেন ? ভজহরি স্থির কণ্ঠে বললেন-ওই যবন সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করব।

ভজহরির স্ত্রী কেঁদে ফেললেন-ওগো এসব কি বলছ তুমি ?

ভজহরি দৃঢ় নিশ্চিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন-হ্যাঁ। ঠিকই বলছি। শুনেছি তাদের ধর্মে আচার অনাচার নেই। উচ্চ-নীচের তফাৎ নেই। ভেদাভেদ নেই মানুষে মানুষে । ব্রাহ্মণী তুমি আমায় ভুল বুঝ না। যে পবিত্র বাহ্মণ্য ধর্ম একদিন ছিল তা আজ কলুষিত হয়ে গেছে। অন্যায় অবিচারের শাস্তি মাথা পেতে নিয়ে আমাকে ভিটে ছাড়া হতে হয়েছে । তুমি কি বল আমাকে তা মেনে নিতে ?

কমলের মা দিশেহারা হয়ে কথা খুঁজে পেলেন না। এবার কথা বলল কমল, -সেই ভালো বাবা। এমন চোরের শাস্তি নিয়ে বেঁচে কি লাভ ! আমি ব্রাহ্মণ হতে চাই না । মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই ।

ভজহরির দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল-কমল, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম খারাপ নয়। মানুষই তাকে খারাপ করেছে ।

এক সময় নৌকা এসে লাগল যবন সাধুবাবার নৌকার সারির গায়ে ।

বৃদ্ধ দরবেশ আলো হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন-কে ? কে এলে তোমরা ? ভজহরি, তার স্ত্রী আর কমল বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইলেন

বৃদ্ধের স্বর্গীয় আলোকদীপ্ত চেহারার দিকে।

বৃদ্ধ হাসলেন । আলো নামিয়ে বললেন-বুঝেছি, এসো তোমরা, ভেতরে এসো। আল্লাহ্ করুণাময় তোমাদেরকে আলোর পথে নিয়ে এসেছেন ।

ভজহরি ও কমলের মা নৌকায় উঠে এলেন। কমলের দিকে হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধ হাসলেন-এসো। এখন তোমার সময় হয়েছে ।

নৌকার ভেতর ঢুকে চমকে উঠল কমল, একি। মহুলা এখানে ঘুমিয়ে যে ! কেমন করে এল এখানে ? বৃদ্ধ যেন কমলের মনের ভাষা পড়তে পাড়লেন। উজ্জ্বল হাসি হেসে বললেন-এই মেয়েটিকে ডাকাতরা গাঙের ধারে ফেলে দিয়ে গেছে। অন্ধকারে বুনো শূকরের সামনে পড়ে মরতে বসেছিল। আমি ওর চীৎকার শুনে তুলে নিয়ে এসেছি। এও আল্লাহরই ইচ্ছা।

কথাবার্তার শব্দে মহুলার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে বিহ্বল কণ্ঠে উচ্চারণ করল-এ যে কমল ঠাকুর। আমি কি স্বপ্ন দেখছি না কি ?

বৃদ্ধ আবার হাসলেন মা ! তুমি যে ঘুমের মধ্যে এরই নাম ধরে ডাকছিলে। আল্লাহ তোমাকে তাই মিলিয়ে দিয়েছেন ।

ভজহরি ও তার স্ত্রী বৃদ্ধের সামনে জোড় হস্তে বললেন-বাবা বড় দুঃখে আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমাদের দীক্ষা দিন ।

বৃদ্ধ ভজহরির হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন-ছিঃ, মানুষের পায়ে মাথা নত কোরো না। মাথা নত করে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে সেই এক নিরাকার আল্লাহর কাছে । আমরা তাঁর কাছেই নত হই ।

ভজহরির দুচোখে অশ্রুর ধারা বয়ে গেল। সেদিন রাতেই তারা একক নিরাকার ঈশ্বরবিশ্বাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। মহুলাও তাঁদের সঙ্গে রয়ে গেল ।

ধীরে ধীরে প্রভাত হল। অন্ধকার কেটে পুব আকাশে আলোর আভাস ফুটল-বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করলেন ।

আল্লাহু আকবর ।

নদীর বুকে বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে দূর থেকে দূরান্তে অন্ধকার সরিয়ে আলোর আভাস বয়ে ছড়িয়ে গেল সেই সুর।

মহুলা ও কমল নৌকার ছৈয়ের বাইরে এসে দাঁড়াল। মহুলা কমলের হাত ধরল-এই নামই তোমাকে আমাকে এই সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। কমল মহুলাকে বলল—ওই দেখ পুবের আকাশে আলো ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রচণ্ড প্রমত্তা নদী পদ্মা। এ নদী বার বার নতুন জলধারার প্লাবন আনে। প্লাবন বয়ে আনা নতুন পলি নবীন শস্যের আশ্বাস হয়ে মাটির জন্ম দেয়। এ নদী খেয়ালী। একদিকে সে ভাঙে আরেক দিকে গড়ে। আর দুই ধারে তাই যুগে যুগে এক জনপদ বিলীন হয়ে নতুন জনপদ সম্পদে স্বকীয়তায় ভাস্বর হয় ।

এককালের বিক্রমশালী সেন রাজাদের হীনবল সিংহাসন কম্পিত হয়। রাজ্যের সীমানা হতে থাকে সংকুচিত। যেন ভাঙতে ভাঙতে বিলীন হতে থাকে। আর নতুন চরের মত জেগে ওঠে স্বাধীন বংগালরা। সেনদের পরাধীনতার জোয়াল ছুড়ে ফেলে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ঈশান মল্ল। এদেকি বজ্রযোগিনীর দেবরাও স্বাধীনতা ঘোষণা করে সেনদের বিরুদ্ধে।

সেনদের ব্রাহ্মণ্য প্রতাপের অপব্যবহারে ও অন্যায়ে বিরক্ত হয়েই দেবরা প্রথমে অস্ত্র তুলে নেয়। তারপর দেবরাজদের রাজ্য বিস্তৃত হতে হতে মুছে দেয় সেনদের চিহ্ন।

আর প্লাবন বহা পলি হয়ে এল নতুন ধর্ম ইসলাম। সাধক দরবেশ পীর আউলিয়াদের প্রচারিত ধর্মের ছায়ায় এসে আশ্রয় নিল দলে দলে সম্মানহারা মানুষ। সেনরাজাদের প্রচণ্ড প্রতাপে যে বৌদ্ধ সমাজপন্থীরা ধর্মহারা হয়েছিল অথচ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তাদের গ্রহণ না করে অস্পৃশ্য করে ঠেলে দিয়েছিল তারা ক্রমশ অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরল এই নতুন ধর্মকে ; পলির সবুজ শস্যের মত যে ধর্ম মনুষ্যত্বের সম্মান দিয়ে তাদের উজ্জীবিত করে তুলল --

ভাঙনের নদী পদ্মা মেঘনা

গড়ার নদী পদ্মা মেঘনা ।

সপ্তম অধ্যায়

এক

পদ্মা ব্রহ্মপুত্র যমুনার ধারা নিরন্তর বয়ে চলে। এর দু'কূলে ভাঙাগড়ার অবিরাম গতিবেগের সঙ্গে নতুন মানব স্রোতধারা প্রবাহিত হয়ে শ্যাম সবুজ তরুরাজী নীল বংগালকে করে তোলে সমৃদ্ধ। এর পলি উর্বর মাটিতে ফলে সোনা, বাণিজ্যে আসে সাত সমুদ্র তের নদী পারের হীরা মাণিক্য। প্রাচুর্য সম্পদে সম্পদ-শালী দুর্গম বংগালের ঝলকে চিরদিন বিদেশী কৃপাণধারীরা বার বার ছুটে আসে এই কোমল পলির দেশে। সুদূর উত্তরের উষর ভূমির অধিবাসীরা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে থামে এই উত্তাল নদী প্রবাহিনী বংগালের প্রান্তে। একদিন সেন রাজাদের স্বর্ণসিংহাসন গৌরবচ্যুত হয়। রাজদণ্ড তুলে নেয় তুর্কীরা। লক্ষ্মণাবতীতে যখন তারা প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করে তখনও স্বাধীন সত্তায় মাথা উঁচিয়ে থাকে বংগাল । ইখতিয়ার উদ্দিনের গৌড় বিজয়ের প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর গৌড় পুণ্ড্র বংগাল আসে তুর্কী মুসলমান শাসনাধীনে। গঠিত হয় বৃহৎ বংগাল। নতুন জাতি নতুন রক্ত- স্রোতের ধরায় বিচিত্রতর হয় এই শাশ্বত আদিম সমুদ্র ছোঁয়া নদী প্রবাহিনী বংগাল ।

একদিন শরতের মাঝামাঝি আকাশ যখন অপরূপ নীলের ছটায় উদ্ভাসিত, টান ধরেছে গাঙের পানিতে। খাল বিলে সাদা মেঘের ছায়া তখন গঙ্গা-যমুনা সংগম অতিক্রম করে পদ্মার ধু-ধু চরের উপর ঘোড়ার খুরে বালির মেঘ উড়িয়ে একজন অশ্বারোহী বিদেশী সৈনিক এসে থামল গাঙের ধারে। নদীর ধারে একটা আম- গাছের ছায়ায় এসে ক্লান্ত হয়ে নেমে পড়ল সে। বিদেশী সৈনিকের মাথায় পাগড়ী। পায়ের চামড়ার জুতা। পরনে সালোয়ার কোর্তা আর মতি চুমকীর কাজকরা কোটি ।

ঘোড়াটাকে বেঁধে কোমর থেকে কোষমুক্ত তরবারী মাটিতে নামিয়ে রেখে আকাশে তাকিয়ে সে বেলা অনুমান করল। তারপর নদী থেকে ওজু করে গাছের নীচে নামাজে দাঁড়াল ।

তখন পড়ন্ত বেলা। নদী থেকে মেয়েরা কলসী কাঁখে পানি ভরে গ্রামের পথে চলেছে। ক্ষেতে কিষাণরা কাজ শেষ করে এনেছে। বিলের লাল শাপলার বনে ঝাঁক বেঁধে নেমেছে বেলে হাঁস সরালী। ডুব সাঁতার কেটে খেলায়

মত্ত পানকৌড়ি। আর খালের পাশে ঝোপের ধারে ডাহুক পরিবার নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরা করছে। গাছে গাছে আরও কত নাম না জানা পাখীর ডাকাডাকি। নামাজ শেষ করে বিদেশী সৈনিকটি অবাক বিস্ময়ে তাকাল চতুর্দিকে। ক্রমে তার পথশ্রান্ত দৃষ্টিতে মুগ্ধতা ফুটে উঠল। এমন সুন্দর দেশ এমন নরম মাটি, সবুজ ঘাস, নীল নদী আর পাখীডাকা স্নিগ্ধ সবুজ বনের শোভা সে কোথাও দেখেছে কি না মনে করতে পারল না।

মুগ্ধ বিস্ময়ে সে আপন মনে উচ্চারণ করল - এ যেন বালাখানা। ঠিক সেই সময়ে একজন কিষাণ ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে কাস্তে হাতে পাশের পায়ে চলা পথ দিয়ে গ্রামের দিকে চলছিল। বিদেশী অচেনা লোকটাকে দেখে সে থেমে পড়ল। একটু ইতস্তত করে প্রশ্ন করল – কে গো তুমি ? কোন্ রাজ্য থেকে আসছ ? বিদেশী স্মিত হাসল আমার নাম হায়াত মাহমুদ খান। দেশ আমার সুদূর কান্দাহার। এখন আসছি দিল্লী থেকে। তবে আমরা পাখতন (পাঠান) বলেই পরিচিত। তোমার কি নাম ভাই বংগাল ? বাড়ী কোন্ দিকে?

কিষাণ মাথার বোঝা নামিয়ে কাপড়ের খুটে কপালের ঘাম মুছে জবাব দিল আমার নাম আলী আফসার। এই সামনে মানিকনগর গ্রামে আমার বাড়ী। তা তুমি বোধ হয় সুলতানের সৈন্য। বংগালে কি খাজনা তুলতে এসেছ ?

ক্লান্ত হায়াত মাহমুদের কণ্ঠস্বরে দৃপ্ত হল ভাই বংগাল, পাখতন হায়াত মাহমুদ খান কারো গোলামী বরদাস্ত করে না। পাখতনরা স্বাধীনতাপ্রিয়। শুনেছি বংগালরাও কারো গোলামী পছন্দ করে না। তাই এলাম বংগাল দেখতে ।

নিরীহ সরল আলী আফসারের দৃষ্টি থেকে তখনও শংকা কাটে নি। শংকিত ভাবেই প্রশ্ন করল সে বংগালে সোনাদানা কড়ি কুড়োবার জন্যই তো বিদেশীরা আসে । এই বংগালদেশে আর দেখবার কি আছে ।

হায়াত মামুদ উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল ভয় পেও না দোস্ত। আমি কিছু কুড়োবার জন্য আসি নি। একদিন ভাগ্য-অন্বেষণে কান্দাহার থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়ে পৌছলাম হিন্দুস্থানে। কিন্তু সেখানে আমার মন বসল না বেশী দিন । তারপর নানা দেশ ঘুরে এসে পৌছলাম এই বংগালে। আর এ দেশ দেখেই আমার ভালো লেগে গেল। বড় সুন্দর সবুজ গালচার মত এদেশের মাটি। খুবসুরত জানেমনের (প্রিয়তমা) চোখের তারার মত নীল এ দেশের নদী আর আকাশ। রুবাবের মিঠে সুরের মত অসংখ্য পাখীর ডাকে এখানকার বাতাস

মুখরিত। এ দেশ যেন বেহেশত । এখানে কোথাও আমার একটু থাকবার জায়গা দেবে ভাই ?

কিষাণ আলী আফসারের চোখের দৃষ্টি থেকে উদ্বেগের মেঘ সরে গেল । বিদেশী বিচিত্র-বেশী গৌরবর্ণ উন্নত নাসা পাখতন হায়াত মাহমুদ খানকে তার বেশ ভালোই লাগল। বন্ধুসুলভ সরল স্নিগ্ধ বিশ্বস্ত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে বলল বন্ধু হায়াত মাহমুদ, আমি গরীব চাষী। হাল চাষ করে খাই। মাটির কুঁড়েতে থাকি। যদি তোমার অসুবিধা না হয় তবে আমার মেহমান হও। আমি আর আমার স্ত্রী বড় খুশী হব তা হলে । ওই তো কাছেই আমাদের গ্রাম ।

হায়াত মাহমুদ এগিয়ে এসে দু'হাত তার জড়িয়ে ধরল - মেহেরবানী তোমার দোস্ত। আমি বড় ক্লান্ত ক্ষুধার্ত। তোমার ঘরে স্থান পেলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব।

আলী আফসার ধানের বোঝা মাথায় তুলে বলল- চল আমার সঙ্গে। হা হা করে বাধা দিল হায়াত মাহমুদ। বলল- আরে ভাই, আমার এই ঘোড়াইতো রয়েছে। ওর পিঠে বোঝাটা চাপিয়ে দাও। তারপর দু'জন গল্প করতে করতে হেঁটে গ্রামের পথ দিয়ে গেলে তার মর্যাদা বরং দশ জনের চোখে বেড়েই যাবে।

ঘোড়ার পিঠে বোঝা চাপিয়ে দু'জনে হেঁটে গ্রামে পথে রওনা হল ।

হায়াত মাহমুদকে নিয়ে আলী আফসার যখন বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছল তখন দূরের গাছপালার আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গোধূলির রক্তিমাভায় আকাশ লাল। কিষাণরা ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে সারি বেঁধে গাঁয়ের দিকে ফিরছে। রাখাল গরুর পাল নিয়ে মাঠ থেকে ফিরে আসছে। দূরে নদীতে পাল উড়িয়ে ভেসে চলেছে নানা আকৃতির নৌকা। নদীর নীল প্রতিম্বিত বুক এখন আবিরের মত লাল ।

বাড়ীর সামনে নারকেল গাছে ঘোড়া বেঁধে আলী আফসার ঘরের সামনে এসে ডাকল জরিনা ও জরিনা, মেহমান এসেছে। জলদি উঠোনের ধারে মুখ ধোওয়ার পানি দে । খাবার জোগাড় কর। হায়াত মাহমুদ বাধা দিল-আরে এত ব্যস্ত হবার কি হয়েছে দোস্ত । আমাকে শুধু এখন একটু হাত পা ছড়িয়ে আরাম করবার জায়গা দাও তাহলেই হবে। ঘোড়ার পিঠে বসে বসে কোমরে ব্যথা হয়ে গেছে। আর ঘোড়াটার কিছু দানা পানির ব্যবস্থা করে দিলেই হবে।

আলী আফসার ঘরের দাওয়ায় পাটি পেতে দিল। বলল-এখানে এসে আরাম কর দোস্ত । আমি খাবার জোগাড় দেখছি।

সন্ধ্যার রক্তবর্ণ বিবর্ণ হয়ে এসেছিল। দূরে কোথায় মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠল। সেই সঙ্গে আরেক দিক থেকে ভেসে এল উদাত্ত আজানের ধ্বনি। হায়াত মাহমুদ উঠে দাঁড়াল-চল নামাজ পড়ে নেওয়া যাক ।

দু'জনে অন্দর বাড়ীর উঠোনের মধ্যে এসে দাঁড়াল। আলী আফসারের স্ত্রী জরিনা উঠোনের ধারে অজুর পানি রেখে সরে গিয়েছিল।

অজু করে নামাজ শেষ করে দু'জনে ঘরের মধ্যে এল। ঘরের মাটির নিকানো মেঝেতে পাটি পেতে খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভাত মাছ তরকারী।

ভাত মাছ মুখে তুলে হায়াত মাহমুদের মুখ বিকৃত হল । ডাল রুটি মাংস খাওয়া মুখে বিচিত্র স্বাদের মাছ বিস্বাদ বোধ হল। সেই মুহূর্তে অলংকারের সিঞ্জন তুলে একটি শ্যামল সুডৌল হাত দরজার থেকে এগিয়ে এল ।

হায়াত মাহমুদের দৃষ্টি ওই শ্যামল সুগঠিত হাতটিকে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত আকৃষ্ট হয়ে গেল । প্রদীপের কম্পিত আলোয় সহসা চোখ পড়ল ঘোমটা টানা একটি মুখের ডাগর কৌতূহলী দু'টি চোখে ।

বিদেশী পাখতন হায়াত মাহমুদ সহসা আবছা গভীর দু'টি চোখের দৃষ্টিতে যেন আজ দুপুরে দেখা বংগালের নীলাকাশের ছায়া, নদীর ছলছল, লাল শাপলা রক্তিম দীঘির গভীরতা অনুভব করল ।

আলী আফসার বলল-খাও বন্ধু, গরীবের বাড়ীতে আর কি দিয়ে মেহমানদারী করব বল।

হায়াত মাহমুদ হাসল- আমি পাখতন মুনাফেকি জানি না। তোমার মেহমান হয়ে আমি এই বংগালদেশে সারা জীবনের মেহমান হয়ে যেতে চাই ।

দুই

আকাশে ছাড়া ছাড়া ভাঙা সাদা মেঘ। ফিরোজা রঙের আসমানে মসলিনের ওড়নার মত মিহি কুয়াশা আর মেঘের আবরণ সরিয়ে ভেসে চলেছে বাঁকা একটুকরো চাঁদ । আলী আফসারের বাড়ীর সামনের নারকেল সুপারী বাগানের

মাথায় ঝিরি ঝিরি হাওয়ার কম্পনে মৃদু মর্মরধ্বনি উঠেছে। খড়ের পালানের একধারে বসে হায়াত মাহমুদ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আকাশের দিকে। তার হাতে একটি রুবাব। নিজেই তৈরী করেছে। আকাশের হাল্কা মেঘের দিকে তাকিয়ে আনমনে রুবাবের তারের ওপর অন্যমনস্ক আঙ্গুল বুলাচ্ছিল হায়াত মাহমুদ। টুং টাং মিষ্টি শব্দ সুরের ফানুসের মত ছড়িয়ে পড়ছিল বাতাসে। আর সেই ভাঙা সুর বেয়ে হায়াত মাহমুদের মন এই জ্যোৎস্নালোকিত নদী বন সবুজ মাঠ ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল দূরে অনেক দূরে ।

সেই মরুভূমির দেশ, যেখানে ধু-ধু বালি পাহাড় রুক্ষ পরিবেশে তেজী ঘোড়া খুরের ঘায়ে পাষাণ কম্পিত করে ছুটে যায় জীবনের প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে। যেখানে খোবানী আংগুর আখরোট বাগানের ছায়ায় সুনীল নয়না স্বর্ণকেশিনী পাখতন রমণী চম্পাকলী আঙ্গুলে পাথরের জাঁতায় হাতল ঘুরিয়ে গম ভাঙে, রৌদ্রদগ্ধ দিনান্তে দরিয়ায় সোরাই ভরতে যায় ওড়নায় মুখ ঢেকে। পাহাড়ে মেষের পাল নিয়ে চরিয়ে বেড়ায় পাখতন বালকেরা ।

গ্রীষ্মের শেষে একদিন সুদূর উত্তর থেকে হাড় কাঁপানো হিমেল হাওয়া ছুটে আসে। গাছের পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে। তুষারে ছেয়ে যায় পাহাড়ের আঁকা বাঁকা চূড়া। তুষার হিম হাওয়ায় শন শন আকুতির মত শব্দ তোলে পাইনের সারি। তখন পাথর আর কাঠের তৈরী ঘরে আগুনের কুণ্ডলী ঘিরে তাঁবুর চাঁদোয়ার নীচে বসে ছেলে বুড়ো স্ত্রী শিশু পরিবারের সকলে শরীর উত্তপ্ত করে। রুটি আর ঝলসানো সুগন্ধি মাংস খেতে খেতে পরিবারের বয়োবৃদ্ধ বণিকেরা সুদূর হিন্দুস্থানের গল্প করে। সেখানে সোনা দানা মণিমাণিক্যের ঝিলমিল। শাহী আমিরিয়ানার খানদান । রইসদের মজলিসের খোশবু....

অপর দিকে হিন্দু মন্দিরের স্বর্ণচূড়ায় আর দেবদেবীর চারিধারে অগাধ ঐশ্বর্যের চোখ ধাঁধান ঝলক, শ্রেষ্ঠীদের সম্পদ আকর্ষণ। আরও আছে পুবে এক দেশ। নাম তার বংগাল। সে তো জান্নাত। সে দেশের মেয়েদের দীর্ঘ পালক ঘেরা কালো চোখ ঢেউ তোলা চুল পুরুষকে পাগোল করে দেয়।

সোনায় দানায় সে জমজমাট দেশ। কিন্তু হলে কি হবে, সে যে বড় দুর্গম। নদী নালা খাল বিল দিয়ে ঘেরা। সাপ বাঘের আড্ডা। কম জাতের দেশ। সুদূর কান্দাহারের তরুণ যুবকদের আর্য রক্তধারা ছলকে ওঠে। ঐশ্বর্য আর সম্পদের জন্য তারা উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে ছুটে যেতে পারে দূরদূরান্তে। প্রিয়াকে ছিনিয়ে আনতে তারা প্রতিদ্বন্দ্বীর বুকের রক্ত ঝরাতে দ্বিধা করে না।

অজানার হাতছানিতে তারা অস্থির। মুক্ত উদার আকাশের নীচে গড়ে ওঠা স্বাধীন ইচ্ছার মত তারা বাধা মানতে জানে না। তারা ইচ্ছা চরিতার্থ করতে উদ্দাম অস্থির নিষ্ঠুর।

সেখানকার ছেলে হায়াত মাহমুদ খান। তুষার ঝরা রাতে তাঁবুর ভেতর আগুনের কুণ্ডলীর লালচে আগুনের আভায় বসে ওই সুদূর দুর্গম দেশের গল্পের মধ্যে দিয়ে যেন এক স্বপ্নের দেশ দেখতে পায়। সে দেশ তাকে প্রতিনিয়ত হাতছানি দিয়ে ডাকে ।

তাঁবুর ভেতরে লোমের কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে সে স্বপ্নে দেখতে পায় দীঘল কেশ শ্যামবরণী কাজল নয়না আদেখা কোন প্রিয়তমাকে ।

ঘুমের আবছায়ায় পাইন বনের হিমেল হাওয়া যেন কোন বিশাল নদীর ঢেউ ওঠাপড়ার শব্দ তরঙ্গ হয়ে তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে ।

শীতের শেষে বসন্ত আসে। সবুজ গম ভুট্টা জোয়ারের ক্ষেতে ঢেউ জাগে । নালা বেয়ে নেমে আসে পানির ধারা। বরফ গলা জল ঝর ঝর করে ঝরনা হয়ে নুড়ি পাথরের বাধা ঠেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নীচে। রূপালী ঝরনাধারার পাশে পাশে জমিতে মসৃণ দেহ সুদৃশ্য ঘোড়ার দল কেশর ফুলিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। কাঠ গোলাপ আপেল আর আনারের মুকুলিত কুড়ি বাতাসে স্নিগ্ধ সুরভি ছড়ায়।

কোথায় কোন্ দূরে আমু দরিয়া সির দরিয়ায় বাতাস উচ্ছ্বাস তোলে । আর এক বিস্তীর্ণ উদার অসীম দিগন্তছোঁয়া আকাশ ক্রমাগত হাতছানি দিয়ে অস্থির করে তোলে হায়াত মাহমুদকে। হায়াত মাহমুদের ইচ্ছা হয় মুহূর্তে ঘোড়ার পিঠে জিন চড়িয়ে ধূলি উড়িয়ে ওই দিগন্তের আবরণ ছিঁড়ে চলে যায় সেই দূরান্তের দেশে। সেই সম্পদশালী দেশ, সেখানে আছে ঐশ্বর্য, আছে মোহ, আছে স্বপ্নময়ী কোন নারীর আকর্ষণ। সেই স্বপ্নের নারী ।

সন্ধ্যায় দিকচক্রবালে গোধূলির আবির রঙ ছড়িয়ে যখন সূর্যাস্ত যায়, হায়াত মাহমুদ তার প্রিয় ঘোড়াকে দানাপানি খাইয়ে তার একান্ত প্রিয় রুবারটি নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে ঝরনার ধারে পাথরের ওপর বসে থাকে। গোধূলি রক্তিম আকাশে তারা ফোটে। ভেসে আসে সুন্দরীর বাঁকা ঠোঁটের হাসির মত আবছা আলোর আভাস নিয়ে বঙ্কিম এক টুকরো চাঁদ। রুবারের ঝংকার তুলে সহসা উন্মুক্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ে হায়াত মাহমুদের কণ্ঠের সুমধুর সুরেলা

সংগীত......

আয়....জানে মন

সুমা খোয়াবে মন আস্ত-

চশমে সুমা চে খুব সুরাত আস্ত

বরায়ে সুমা মন দেওয়ানা হাস্তম ।

(হে আমার প্রিয়তমা

তুমি আমার স্বপ্ন

তোমার চোখ না জানি

কত সুন্দর।

তোমার জন্য আমি

পাগোল হয়েছি।)

আংগুরের লতায়-পাতায় কেঁপে কেঁপে আখরোট গাছের ডালে শিহরণ তুলে সে সুর ভেসে যায় প্রান্তরের উন্মুক্ত বাতাসে ।

একদিন যখন ভোরের কুয়াশা কেটে আকাশে প্রভাতের আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে, মসজিদের মিনার থেকে মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করে ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। তখন ঘোড়ায় জিন বসিয়ে হিন্দুস্থানগামী একদল খোরাসানী সওদাগরের কাফেলার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল হায়াত মাহমুদ খান।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসে পৌছল হিন্দুস্থানে। এখানকার পরিবেশে হায়াত মাহমুদ তার স্বপ্নের ছায়া খুঁজে পেল না। সুলতানের সেনাবাহিনীতে কিছুদিন সৈনিকের জীবন-যাপন করে হাঁফিয়ে উঠল সে। ভালো লাগে না। যদিও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রক্তধারায় রয়েছে অস্ত্রের ঝনঝনার উন্মাদনা। তবুও মাঝে মাঝে উদাস উন্মনা হয়ে যায় হায়াত মাহমুদ। এই গোলামীর জীবন তার ভালো লাগে না ।

চিরদিনের স্বাধীনতা পিয়াসী পাখতন রক্তধারা উত্তাল হয়ে ওঠে। সৈনিক হায়াত মাহমুদ খান বেরিয়ে পড়ে। দীর্ঘপথ দুর্ভেদ্য অরণ্য নদী নালা পেরিয়ে এসে থামে এক আশ্চর্য দেশে। এ দেশের মাঠ সবুজে স্নিগ্ধ। আকাশ অপরূপ নীলিমায় উজ্জ্বল । বাতাসে নদীর ঢেউয়ের ওঠাপড়ার গান। সবচেয়ে আশ্চর্য, এ দেশের কালো মানুষগুলোর মনে অসীম মমতার উচ্ছ্বাস। যে মমতা তুর্ক আফগান পাখতন সেনানীদের সম্পূর্ণ অজানা। হায়াত মাহমুদ ভাঙা মেঘে ঢাকা পড়া চাঁদের দিকে তাকিয়ে মৃদু একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর সহসা রুবারের তারে ঝংকার তুলে আবছা কোমল কণ্ঠে সুর তুলল

আয় ... জানে মন

সুমা খোয়াবে মন আস্ত

চশমে সুমা চে খুব সুরাত আস্ত

হায়াত মাহমুদের সুরেলা কণ্ঠ সন্ধ্যার রাতের বাতাস বেয়ে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। সুরে প্রাণ ঢেলে হায়াত মাহমুদ উন্মনা হয়ে ভাবল কোথায় সেই মানসী প্রিয়া ! তার দেখা তো সে আজও পায় না। মেঘের আবরণ সরিয়ে আবার চাঁদ হাসল । হায়াত মাহমুদের সামনে কার ছায়া পড়ল। গান থামল। বাতাসে তখন রুবারের মিঠে ঝংকার। আধো আলো ছায়ায় হায়াত মাহমুদ দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে নিকষ কালো একটি তরুণী। তার সুঠাম দেহলতা ঝাপসা চাঁদনীতে যেন একটি ভাস্কর্য শিল্পের মত মনে হচ্ছে। পরনে খাটো সুতী শাড়ী । খোঁপায় লাল ফুল।

তার চোখে তাকাল হায়াত মাহমুদ। আর সেই চোখে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সে। শন শনে ঝড়ো উদ্দামতায় যেন আমু দরিয়া সির দরিয়ার ঢেউ উছলে উঠল বুকে। মেয়েটির কালো চোখের তারায় চাঁদনী ঝিলিক দিল। রুবাবের মিষ্টি বোলের মত ঝংকার উঠল তার কণ্ঠস্বরে – কি গান গাইছিলে তুমি পাখতন ?

হায়াত মাহমুদ বুঝি স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নের মাঝেই যেন এসে দাঁড়িয়ে বেহু কল্পনার রং দিয়ে তৈরী সেই স্বপ্নময়ী। কথা বললেই সে মিলিয়ে যাবে অলীক মরীচিকার মত। সারা শরীরে ঢেউয়ের উচ্ছলতা জাগিয়ে হেসে উঠল মেয়েটি আমার কথা কি তুমি বুঝতে পারো না ?

রুবাব নামিয়ে রাখল হায়াত মাহমুদ – পারি, তুমি কে ?

মেয়েটি আবার হাসল- আমি ! আমার নাম রূপসী। ওই গাঙের ঘাটে বেদের যে বহর ভিড়েছে, আমি ওই বেদে বহরের মেয়ে। মাটিতে আমাদের ঘর বাড়ী নেই। আমরা নদী-নালায় ভেসে বেড়াই। আমাদেরকে বলে বাইদ্যা ।

হায়াত মাহমুদ বিস্মিত হয়ে বলল-সারা বছর পানিতে ভেসে বেড়াও, আশ্চর্য তো !

সারা শরীরে অপরূপ মাদকতা ছড়িয়ে হেসে উঠল রূপসী-ডাঙায় আমাদের মন বসে না। আমরা কেবল সাপ ধরবার জন্য ডাঙায় নামি, তাছাড়া তুকতাক দিয়ে রোগব্যাধি সারাই । অনেক তুক জানি তোমার মত বিদেশীকে যাদু করে খোঁপার ফুল বানিয়ে রাখতে পারি ।

রূপসীর সাদা ঝকঝকে দাঁতের সারিতে অদ্ভুত হাসির ঝিলিক। সেদিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে গেল হায়াত মাহমুদ খান ।

রূপসী আবার শরীরে ঢেউ তুলে হাসল-কি গো পাখতন ভয় পেলে নাকি ? এমন বিরাট পুরুষ মানুষটা বাইদ্যার মেয়ে দেখে একেবারে হা হয়ে গেলে ?

এতক্ষণে হায়াত মাহুমদ আত্মস্থ হল। মৃদু হেসে বলল- আমি আফগান, নওযোয়ান। তোমার মত সামান্য মেয়ে মানুষ দেখে আমরা ভয় পাই না। তবে সুন্দরী তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। মনে হয় তুমি যেন আমার স্বপ্নের জগৎ থেকে নেমে এসেছ।

রূপসী তার মাথার ডালাটা নামিয়ে বসে পড়ল হায়াত মাহমুদের সামনে। বাঁকা ঠোঁটে হাসির রেশ ফুটিয়ে বলল-বাঃ, তুমি তো চমৎকার কথা বলতে পারো বিদেশী !

-তোমার মত সুন্দরীকে দেখে সুন্দর কথা যে এমনিই আসে বংগাল সুন্দরী ! রূপসী হেসে লুটিয়ে পড়ল। বলল-জানো আমি সাপের বিষদাঁত ভাঙি এই হাত দিয়ে। আবার এই হাত সাপের সামনে ঘুরিয়ে সাপ নাচাই। তাকাও আমার এই হাতে।

সাপ নাচানোর ভঙ্গীতে হাতটায় ঢেউ তুলল রূপসী ।

মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল হায়াত মাহমুদ। একটু চুপ করে থেকে বলল-

তোমার ওই সাপ ধরার মন্ত্র আমায় শেখাবে রূপসী ? রূপসী হাসল-তার বদলে আমায় তুমি কি দেবে বল ?

নারকেল গাছের ডালপালার উতলা হাওয়ার মর্মরধ্বনি। আকাশে ঝিকমিক করে জ্বলছে তারার টিপ। সুপারী গাছের পিছে কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ হেলে পড়েছে। সে দিকে দৃষ্টি মেলে কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে রইল পাখতন হায়াত মাহমুদ খান। তারপর ধীরে ধীরে কালো মেয়েটির হরিণী নয়নে তাকিয়ে বলল-'আউ চশমে বংগালন' (হরিণী নয়না বাঙালিনী) আমি মুসাফির। আমার সবচেয়ে মূল্যবান একটি বস্তুই আছে। তা আমার হৃদয়। সেই মনটাই আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম ।

রূপসী বিচিত্র হাসল-পাখতন, আমরা বাইদ্যা। সাপ ধরি, দা কাটারী ফেরি করি। গাঙে গাঙে ভেসে বেড়াই। তোমার ওই মন নিয়ে আমি কি করব বল। যাই উঠি রাত হল ।

উঠে দাঁড়াল রূপসী । সঙ্গে সঙ্গে হায়াত মাহমুদের দুর্বার রক্তস্রোত উন্মত্ত ঝড়ের আবেগ উত্তাল হয়ে উঠল। এক হাত দিয়ে রূপসীকে বেষ্টন করে কাছে টেনে আনল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল-কোথায় যাবে তুমি ? জানো তোমার জন্য কত পাহাড় মরু প্রান্তর অতিক্রম করে আমি এই বংগাল দেশে এসেছি।

সাপের শরীরের মত তীব্র ঝিলিক দিল রূপসীর শরীর। চিকচিকে ক্রূর চোখে তাকিয়ে দাঁতের সারিতে হিংস্র ঝলক তুলে রূপসী ফুঁসে উঠল-খবরদার ! আমার শরীর স্পর্শ করবে না। জানো আমার এই ডালার ভেতর কাল কেউটে রয়েছে-- এখনও ওর বিষ দাঁত ভাঙিনি।

মুহূর্তে ডালার ভেতরে হাত দিয়ে গর্জনরত কেউটের মাথা দু'আঙ্গুলে টিপে বের করে এগিয়ে ধরল রূপসী ।

ক্রুদ্ধ বন্দী সাপটা লেজ দিয়ে বার বার রূপসীর হাত জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে, ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে ধমকে উঠল রূপসী-আমায় কেন তেজ দেখাচ্ছিস ! ওই ঘোড় সওয়ার পাখতন শত্তুরকে খা। হায়াত মাহমুদ শিউরে পিছিয়ে গেল। উঃ, ভয়ংকর মেয়ে ।

রূপসী সন্ধ্যারাতের বাতাসে তরঙ্গ তুলে খিল খিল হেসে উঠল। সাপটা হাতে ধরে দোলাতে দোলাতে নিজের শরীরে ঢেউ তুলে বলল-কেন গো নওয়োয়ান,

ভয় পাচ্ছ কেন ? মন দিতে মন নিতে হলে বিষের জ্বালাও যে সইতে হয় ।

যেন সম্বিত হারা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল হায়াত মাহমুদ। সহসা পেছন থেকে কার কোমর উদ্বিগ্ন কণ্ঠ বেজে উঠল-ভাইজান সরে এসো। চলে এসো ওখান থেকে।

হায়াত মাহমুদ ফিরে তাকাল। আলী আফসারের স্ত্রী জরিনা অন্দর বাড়ীতে যাবার বেড়ার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। ডুরে শাড়ীর ঘোমটা মাথা থেকে খসে গেছে । চাঁদের আলোয় তার নাকের নথ গলার মাদুলী হার ঝিকমিক করছে।

হায়াত মাহমুদ পিছিয়ে এল। সে যেন তার সেই সুদূর কান্দাহারে ফেলে আসা মমতাময়ী বোনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। জরিনার মমতামাখা উদ্বিগ্ন আহ্বানে রুবাব তুলে নিয়ে চলে এল হায়াত মাহমুদ ।

রূপসী তখন সাপটা ডালায় ভরে হাসতে হাসতে ফিরে চলেছে। কিছুদূর গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ রাগে বলল-মনটা তা'হলে আর দিলে না গো পাখতন । যাও ভীতু পুরুষ। তোমার ওই বোনের হাতে দুধ কলা খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা কর। তারপর সাপের মন্তর শিখতে এসো ।

জরিনা সভয়ে বলল-ডাইনী। হায়াত মাহমুদের বুকের রক্ত আরেক বার চঞ্চল হল। ওই বন্য ঝাঁজাল মেয়েটির মোহময়ী চাহনী আর শরীরের অপূর্ব মাদকতা এখনও যেন ছড়িয়ে আছে বাতাসে। মুহূর্তে একবার তার মনে হল এ মেয়েকে না পেলে তার জীবন অর্থহীন ।

জরিনা আবার ডাকল-ঘরে এসো ভাইজান। তোমার খাবার জোগাড় করেছি।

তিন

শীতলক্ষ্যা বুড়িগঙ্গা মেঘনার তরঙ্গ চুম্বিত সমৃদ্ধশালী নগর সোনারগাঁও। এখানকার লোকে বলে সোনারগাঁও। প্রাচীন রাজবংশীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থরা বলে সুবর্ণগ্রাম ।

বংগালের রাজধানী সুবর্ণগ্রামে হাবসী সুলতানের প্রতিনিধি সুবেদারীর তখতে সমাসীন। দেশ বিদেশের বহু বাণিজ্য-তরী সোনার গাঁয়ের বন্দরে ভিড় করে আছে।বংগালের রেশম, সোরা, মসলিন, হাতীর দাঁতের তৈরী মহার্ঘ বস্তু, সোনা- রূপার সূক্ষ্ম কারুকার্যে সোনারগাঁয়ের কারিগরেরা বিখ্যাত। কেনা-

বেচা লেনদেন জমজমাট সোনারগাঁয়ের বন্দর। বিদেশী নাবিক আর বণিকেরা বিচিত্র বেশে ঘুরে বেড়ায় হাটে বাজারে। রাজপথের দুই ধারে সুরম্য অট্টালিকা, মসজিদ, মন্দির, মক্তব, মনোলোভন পণ্যশোভিত বিপণীকেন্দ্র অতি সহজেই পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নগর প্রাচীরের বাইরের দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেত, আর নীল গাছের আবাদ। অতি উৎকৃষ্ট নীল তৈরী হয় এখানে। বিদেশী বণিকেরা মহার্ঘ মূল্যে এখানকার নীল, শঙ্খের অলংকার, মসলিন কিনে নিয়ে বিক্রী করে সুদূর ইউরোপ এশিয়া মাইনরের বাজারে, ভেনিস, জেনোয়া, ফ্লোরেন্সে। মাধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য শীতলক্ষ্যা নদীর বুকে লক্ষ হীরার মালা হয়ে জ্বলছে। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। কেবল গাঙচিল আর কোড়ালের ঝাঁক জেলেদের নৌকার চতুর্দিকে চক্রাকারে ঘুরছে। সহসা দুই নদীর সংগমস্থল হতে দূরে দূরে চক্রবালে একটি জাহাজের মাস্তুলের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জলপথ প্রহরারত বজরাগুলি থেকে নৌরক্ষী বাহিনীর দামামা বেজে উঠল ।

দামামা শুনেই বন্দরের নিকটবর্তী কেল্লার শিখরে প্রহরায় নিযুক্ত প্রহরীরা ঘোর রবে দামামা ধ্বনি করল। সেই গম্ভীর ধ্বনি নদীর বুক থেকে নগরে, প্রান্তরে, গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। নীল চাষীরা উৎকর্ণ হয়ে শুনল। জেলে, তাঁতী, কৃষক, গন্ধবণিক, মালাকার, পুরোহিত, মক্তবের ওস্তাদ, মসজিদের ইমাম সকলেই শুনল । নারী পুরুষ বৃদ্ধ শিশু সবাই শুনল সুলতানের ফরমান নিয়ে বজরা আসছে। সকলেই উদ্বিগ্ন, উৎসুক ! আবার কি ফরমান জারী হল।

দামামা বাজাতে বাজাতে ফরমান জারীর বজরা ঘাটে এসে ভিড়ল ।

আলী আফসার ও হায়াত মাহমুদ রাজপথের ধারে উদ্বিগ্ন জনতার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল । হায়াত মাহমুদ শুনল একজন দোকানী ভীত কণ্ঠে বলছে—উঃ আল্লাহ ! ওই জালেম হাবসীরা আবার কি জ্বালাতন করতে এসেছে কে জানে। দেশটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল ব্যাটারা। রাঢ় গৌড় বংগাল কোথাও মানুষ শান্তিতে বাস করতে পারবে না।

হায়াত মাহমুদ কৌতূহলী হয়ে দোকানীকে প্রশ্ন করল-কেন ভাই কি করে এরা? দোকানী সন্দিগ্ধ চোখে হায়াত মাহমুদকে দেখল। বলল-তুমি তো মনে হচ্ছে তুর্কী ।

এবারে আলী আফসার হাসল-না ভাই এ আমার দোস্ত । পাখতন ।

দোকানী কিছুটা আশ্বস্ত হল। তবু আপন মনে বলল-কি যেন বাবা হাবসী সুলতানের গুপ্তচর-টর কিনা কে জানে । আজকাল তো কাউকেই বিশ্বাস নেই।

হায়াত মাহমুদের গৌরবর্ণমুখ অপমানে রক্তিম হয়ে উঠল। কোমরবন্ধনীলগ্ন তরবারী স্পর্শকরে দৃপ্ত করে বলল-দেখ ! আমি ওই কমবখত হাবসীদের গোলাম নই। এক আল্লাহ ছাড়া কারো গোলাম বলে নিজেকে পরিচয় দিতেই ঘৃণা বোধ করি। আমি বিশ্বাস করতাম বংগালরা তেজী, স্বাধীনতাপ্রিয় জাত আমাদেরই মত । কিন্তু .....

আলী আফসার ব্যস্ত হয়ে হায়াত মাহমুদের হাত ধরল-হায়াত খান, হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে পড়লে কেন ? এতদিন ধরে বংগালে এসেছ, জানই তো বংগালের রইস ধনী গরীব হিন্দু মুসলমান সকলেই হাবসী সুলতানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। কারো জান-মালের নিরাপত্তা নেই । সেই জন্যই তো...

আলী আফসারের কথা রুদ্ধ হয়ে গেল। পথের দু'ধারে জনতা সভয়ে সরে গেল। রাজপথ কম্পিত করে উন্মুক্ত তরকারী হাতে কয়েকজন হাবসী সৈন্য টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল। তার পিছে সুসজ্জিত হাতীর হাওদায় সুলতানের রাজকীয় কর্মচারী বসে আছেন। হাবসী সৈন্যদের ভয়ংকর চেহারায় পথচারীরা ভীত হয়ে কুর্নিশ জানাতে লাগল । হাতীর হাওদার পিছে ডংকা ধ্বনি করে একজন পাইক সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে করতে চীৎকার করে ফরমান পড়তে লাগল ।

–শোন শোন সব যত বংগাল চাষী তাঁতী জেলে দোকানী মহাজন সবাই! বংগালের স্বাধীন হুজুরেওয়ালা শাহানশাহ শামসুউদ্দিন মুজাফফরের নয়া ফরমান জারী হয়েছে। এবার থেকে শস্যের খাজনা, মাছ ধরার ভাগ সব কিছুর ওপর সুলতানের খাজাঞ্চীখানার জন্য আগের চেয়ে তিন ভাগ বেশী কর দিতে হবে। রেশম, সুতী, মসলিনের ওপরও কর বসান হয়েছে....

ফরমান বাহী সশস্ত্র হাবসী বাহিনী সম্মুখে এগিয়ে গেল ।

ডংকা ধ্বনি আর উদ্ধত অশ্বখুরের শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে পথচারীদের একজন বিবর্ণ মুখে আলী আফসারের সামনে এসে দাঁড়াল-ভাই কি জুলুম বল দেখি ! ব্যাটা গোলামের জাত ভূতের মত চেহারা হাবসীটা হয়েছে বাদশাহ্।

দেশটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিল, আবার বলে কি না স্বাধীন সুলতান। মানুষের পেটে নেই ভাত, পরনে নেই কাপড় তার ওপর ওই হাবসীদের পাইকদের অযথা মারধোর । পেটে খেলে পিঠে সয় ভাই। এই দেখ না সেদিন এক ব্যাটা পাইক চাবুক পেটা করে আমার পিঠের চামড়া খুলে নিয়েছে।

আলী আফসার ম্লান মুখে বলল- শুনলাম গরু ছাগল হাঁস মুরগী গাছের ফলমূলের ওপর কর দিতে হবে।

আগন্তুক রুদ্ধ কণ্ঠে বলল-তাইত বলছি, সেদিন চাষের বলদ জোড়া কেড়ে নিয়ে গেল। আমাদের গাঁয়ের জোলাদের মসলিনের গাঁট শুদ্ধ তুলে নিয়ে গেল একটি কড়িও দিল না। আমরা বলেছিলাম কাজীর কাছে নালিশ দেব। তাই কি জুলুমটাই করল। গাঁয়ের যোয়ানগুলোকে গাছের সঙ্গে বেঁধে চাবুক পেটা করল । তাঁতে আগুন ধরিয়ে দিল। তার ওপর ভাই গেরস্থদের সুন্দরী বয়স্থা বউ-ঝিদের ধরে বজরায় তুলে নিয়ে গেল সুলতানের হারেমের বাঁদী -বানাতে। উঃ, আর সহ্য হয় না। এর চাইতে সেই দিল্লীর সুলতানী আমলই ভালো ছিল।

ও পাশ থেকে একজন বৃদ্ধ বিষণ্ণ আক্ষেপে বলল-আর দিল্লীর সুলতানী ! আমাদের জন্য সব বরাবর। সেই যে ইখতিয়ার উদ্দীন তুর্কী ঘোড়া ছুটিয়ে লক্ষ্মণাবতীতে এল তার পর থেকে সিংহাসন নিয়ে মারামরি কাটাকাটির অন্ত নেই । যেই যখন সুযোগ পায় সেই বংগালের স্বাধীন সুলতান হয়ে বসে।

প্রথম আগন্তুকটি নীম্ন কণ্ঠে জবাব দিল-তা চাচা বলেছেন বটে। তবু আমাদের বাপ দাদার কাছে শুনেছি কিছু কিছু সুলতান ভালোও ছিল। তাঁরা রাস্তাঘাট তৈরী করেছে, ধর্মশালা মুসাফির খানা বানিয়েছে। জঙ্গল আবাদ করিয়ে দরবেশ আউলিয়াদের শানদার মসজিদ গড়েছে। গরীব-গাবরাকে দান খয়রাত করেছে।

এবার আলী আফসার কথা বলল-তা যা বল না ভাই। এই হাবসীদের মত এমন করে মানুষকে আর কেউ জ্বালায়নি। তবে হাবসীদের মধ্যে ভালো সুলতান যে হয়নি একথা বলাও ঠিক হবে না।সুলতান ফিরোজ হাবসী কি ভালো মানুষটাই না ছিলেন। আহা,গরীব দুঃখীকে দান খয়রাত করে খাজাঞ্চিখানাই খালি করে ফেলেছিলেন। বড় দয়ালু ছিলেন গো ! হোক না গোলাম বংশের হাবশী । ক'টাদিন মানুষ একটু সুখে ছিল ।

বৃদ্ধ একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল-আর বাবা বেল পাকলে কাকের কি ।

নাসিরুদ্দীন শাহর ছেলে রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ শখ করে সেই কোন্ কাফ্রির দেশ (আবিসিনিয়া) থেকে এক পাল আলকাতরা কালো কোঁকড়া চুল ঠোঁট মোটা জালেম হাবসী গোলাম নিয়ে এল, তখন তো আর ভাবে নি যে ওই তার গোলামের জাতেরাই একদিন তাদের মুনিবদের মেরে কেটে নিজেরা সিংহাসন দখল করে বসবে।

আলী আফসার বলল-তাই বটে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় আর উলুখড়ের প্রাণ যায়। শুনেছি লক্ষ্মণাবতী ঘোড়াঘাট সাত গাঁয়ের যত লেখাপড়া জানা বিদ্বান বুদ্ধিমানদের ধরে ধরে হাবসীরা কচু কাটা করেছে। আর তুর্কী আফগান রইসদের তো প্রায় নির্বংশ করে এনেছে। তাছাড়া তাঁতী হিন্দু মুসলমান বুদ্ধিমান লোকদেরও তো নিস্তার দিচ্ছে না। কিন্তু বাবা এই সিদিবদর দেওয়ানা সবাইকে টেক্কা দিয়েছে ।

হায়াত মাহমুদ এদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়েছিল দূরে দ্বি-প্রহরের সূর্যালোকিত তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত রূপালী নদীর বুকে। দূরে চরের সবুজ সতেজ ধানের ক্ষেতে বাতাস ঢেউ তুলেছে, শুভ্র কাশফুলের বনে সাদা মেঘের ছায়া । অসংখ্য জেলে নৌকা, বজরা, ডিঙি, মাল বোঝাই দূর পাল্লার নৌকা ভাসছে নদীর বুকে। নদীর ঘাটে বালক-বালিকারা ঝাঁপাঝাঁপি করে সাঁতার কাটছে। গ্রাম্য বধূরা কলস ভরে ফিরে চলেছে। মাল্লারা গুন টানছে, সেদিকে তাকিয়ে সুদূর আকাশের আনত চিকচক্রবাল সীমারেখার মত অস্পষ্ট আকাঙ্খা রেখাপাত করল হায়াত মাহমুদ খানের মনে ।

সহসা মুখ ফিরিয়ে আলী আফসারের দিকে তাকিয়ে বলল-সিদিবদর দেওয়ানটা আবার কে ?

আলী আফসার হাসল-কে আর ওই হাবসী সুলতান শামসুদ্দীনেরই আসল নাম। হুঃ, নাম পাল্টে রইস সেজেছে। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি বলল- হায় রে খোদা, কি যে আছে কপালে ! নতুন ফরমান জারী হল। হয় খাজনা দিয়ে ঝি-পু নাতি-পুতি নিয়ে না খেয়ে মরতে হবে, নয়তো মরতে হবে হাবসী পাইকদের হাতে। উঃ, যা ভয়ংকর শাস্তি ওরা দেয়। আস্ত মানুষের শরীরের চামড়া ছাড়িয়ে লবণ ছিটিয়ে দেয়। পাগলা হাতী ছেড়ে দিয়ে অবাধ্য প্রজাদের হাতীর পায়ে পিষে মারে....উঃ, আল্লাহ্ বিচার কর জালেমদের। এদিকে বংগাল বলে থুথু ছিটায় আবার ওদিকে বংগাল মেয়েদের ধরে নিয়ে হারেমে ভরে। হায়াত মাহমুদ আবার তাকাল দূরের আকাশে। ঝকঝকে নীলাকাশ। কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে

থেকে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলল-আচ্ছা ওই সিদিবদরের সৈন্যবাহিনীতে কত সৈন্য আছে জানো কিছু ?

আলী আফসার মাথা নাড়ল। উত্তর দিল তার সম্মুখে দাঁড়ান লোকটি । গামছা দিয়ে মুখ মুছে এদিক ওদিক তাকিয়ে ত্রস্তে একটু তাকিয়ে বলল- সেন্য মোটামুটি কম নেই । তবে আমি খবর শুনেছি.....হায়াত মাহমুদ প্রশ্ন করল- কি খবর ?

—শুনেছি সিদিবদর তার সৈন্যদের বেতন কমিয়ে দিয়েছে। কেবল তার হাবসী প্রধানদেরই বেশী সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। সেইজন্য তার সেনাবাহিনীতে নাকি খুব গোলমাল দেখা দিয়েছে।

বৃদ্ধটি দু'হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গীতে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল-আল্লাহ্ নেগাহ্বান, ওর সৈন্যদের হাতেই তাহলেই ও মরবে। মানুষের রক্ত চুষে টাকা কড়ি সোনা দানা মোহর আশরফির গদির ওপর শরাবের নেশায় চুর হয়ে দিন রাত গড়াগড়ি যাচ্ছে লোভী শকুনটা, ওর মরণও কোন গুপ্ত ঘাতকের হাতে হবে ।

আলী আফসার হাসল-তাতে আমাদের কি এসে যায়। একজনকে মেরে কেটে আর একজন মসনদে বসবে। আর আমাদের মত চাষী জেলে তাঁতী কর্মকারদের রক্ত পানি করা পয়সায় আয়েস করবে। আমরা একই থাকব ।

হায়াত মাহমুদ আলী আফসারের চোখে স্থির অগ্নিঝরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে অবিচলিত দৃপ্ত কণ্ঠে বলল না ।

–কি না ?

-এই জুলুম আর চলবে না। আমি পাখতন। যোদ্ধার জাত। জালেমকে মুনাফেক ক্ষমা করি না আমি। আমি যুদ্ধ করব ।

উপস্থিত কয়েকজন বংগালবাসীর চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল। আলী আফসার অত্যন্ত ভীত হয়ে হায়াত মাহমুদের হাত চেপে ধরল-বলছ কি দোস্ত । চুপ কর। চুপ কর। মুখ দিয়ে আর অমন কথা বের কোরো না। হাবসীদের তুমি চেন না। ওরা সব করতে পারে।

হাত ঝাড়া দিয়ে ছাড়িয়ে নিল হায়াত মাহমুদ-কমবখতের মত কথা বোলো না। আমার নাম হায়াত মাহমুদ খান। আমাদের জবানের নড়চড় হয় না। আমি যা

বললাম তা করব।

আলী আফসার ব্যস্ত হয়ে হায়াত মাহমুদের হাত চেপে ধরল-চুপ কর দোস্ত, চুপ কর। ওই যে সুলতানের পাইকরা এদিকে আসছে ।

হায়াত মাহমুদ অগত্যা চুপ করল। পাইক দু'জন ঘোড়া টগবগিয়ে রাস্তা কম্পিত করে চলে গেল ।

এতক্ষণে ভীত কম্পিত বৃদ্ধটি গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খেয়ে বলল-উঃ, দাপট বটে এই পাইকগুলোর। যেমন দজ্জাল ওই হাবসী খোজারা তেমনি তাদের পাইক । ভাটি গৌড় রাঢ়ের মানুষকে এরা শান্তিতে থাকতে দিল না। ইলিয়াসী শাহী সুলতানেরা কোন্ শখেই যে সেই আবিসিনিয়া মুলুক থেকে একপাল কদাকার চেহারার হাবসী বাহিনী নিয়ে এসেছিল। ওই দুশমনগুলো যে শাহী বংশের সুলতানদের মেরে কেটে নিজেরা গদী নিয়ে মারামারি করছে এখন কেমনটা হল !

প্রথম যে পথচারীটি এসে দাঁড়িয়েছিল হায়াত মাহমুদের কাছে, সে এদিক ওদিক ত্রস্তে চকিতে তাকিয়ে ঠোঁট মুচড়ে বলল-উঃ, এনেছিল তো সুলতানদের পাঁচশ' বেগমে বোঝাই হারেম পাহারা দিতে। খুবসুরাত ইরানী তুরানী বেগমরা যদি বেগতিক করে কারো সঙ্গে কেটে পড়ে। হুঃ, ফলে হল ছুঁচোর হাতী গেলার দশা । তা যাকগে, ওসব হারেম বেগম নফরের কেচ্ছায় আমাদের আর কি আসে যায় ।

বৃদ্ধ ভ্রূ কুঁচকে তাকাল-আসবে যাবে নাই বা কেন হে ! ওই যে বলে না রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়। সিংহাসন নিয়ে মারামারি কাটাকাটির তো শেষ নেই। আজ রাতে ঘুমুতে যাবার আগে শুনলাম একজন সুলতান। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙেই শুনলাম তপ্ত উলটে গেছে, সুলতান হয়েছে আরেক জন ।

হায়াত মাহমুদের রক্তিম মুখে এক কঠিন দৃঢ়তা ফুটে উঠল। বলল- শোন ভাইরা। আমিও যোদ্ধার জাত। বেইমানী মুনাফেকী করা আর জুলুমবাজদের জুলুমও সইতে পারি না। চল আমরা এর বদলানেব। আমিও নিজেকে আজ থেকে এই বংগালের লোক মনে করছি। আলী আফসার চমকে উঠল-বল কি দোস্ত । তুমি কি পাগোল হলে !

হায়াত মাহমুদ আগের মতই দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল-না হইনি । পাগোল

তোমরা যারা পাইকদের লাথি আর চাবুক খেয়ে গোলামীর জীবন কাটাচ্ছ ধোপার গাধার মত। জান্নাতের মত দেশ এই বংগাল। এখানে আল্লাহ নেয়ামতে ভরে দিয়েছেন। এমন সোনার দেশের মানুষ হয়েও তোমরা কম জাতের গোলাম বনে আছ ।বল এ জীবনের কি দাম ?

সহসা রাজপথের চৌমাথার কাপড় হাটের দিক থেকে প্রচণ্ড ভয়ার্ত একটা কোলাহল উঠল। লোকজন ভীত ত্রস্ত হয়ে ছুটে পালাতে লাগল। কে একজন পথচারী ছুটতে ছুটতে খবর দিয়ে গেল, পালাও পালাও হাবসীদের পাইকরা এলপাতাড়ি চাবুক চালাচ্ছে ।

আলী আফসার আর হায়াত মাহমুদের চারপাশের জনতা উধাও হল। ঘাটের নৌকাগুলো লোকজনে বোঝাই হয়ে পালায়নে তৎপর হল ।

রুখে দাঁড়াল হায়াত মাহমুদ। দৃপ্ত কণ্ঠে বলল- না পালিও না, আলী আফসার। আমি দেখে আসি কি ব্যাপার ।

আলী আফসার ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পাখতন হায়াত মাহমুদ খানের দিকে। বন্ধুর বিবর্ণ ম্লান মুখের দিকে একপলক দৃষ্টি ফেলে বীর দর্পে এগিয়ে গেল হায়াত মাহমুদ ।

ভীড় ঠেলে ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়িয়ে পলকের জন্য নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না সে। ঘটনার কেন্দ্রস্থলে যে, সে একটি তরুণী। তরুণীটি আর কেউ নয়। রূপসী বেদেনী। তার সারা পিঠ জুড়ে চাবুকের রক্তাক্ত দাগ। পরনের কাপড় অবিন্যস্ত। একজন ঘোড়সওয়ার হাবসীর হুকুমে দু'জন পাইক তাকে মাটিতে ফেলে নিষ্ঠুরভাবে কোড়া মারছে। মাটিতে মুখ গুঁজে ছটফট করতে রূপসী। তখনও সে জ্ঞান হারায় নি। হায়াত মাহমুদ ছুটে এসে দাঁড়াল ঘোড়সওয়ার হাবসীর সামনে। দু'হাতে পাইক দু'জনকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে রূপসীর সামনে ঝুঁকে ব্যাকুলভাবে দু'হাত দিয়ে তার দেহ আড়াল করে বেদনার্ত কণ্ঠে ডাকল-জানেমন (প্রিয়তমা) ।

রূপসী অতিকষ্টে মুখ তুলে তাকাল। যন্ত্রণা বিকৃত অস্ফুট আর্তনাদ করল-পাখতন ।

ঘোড়সওয়ার হাবসীর চাবুক এসে পড়ল হায়াত মাহমুদের মুখের ওপর ।

উদ্ধত কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল-কে রে এই কমবখত পাখতন। ছোট জাত

বেদেনীর দরদে হাবুডুবু

হায়াত মাহমুদ ঘুরে দাঁড়াল। তার ঠোঁট বেয়ে তখন রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই। এক হাত দিয়ে ঘোড়সওয়ারের চাবুক প্রবল শক্তিতে চেপে ধরল সে। তার নীল চোখের তারা জ্বলতে লাগল দপদপ করে। প্রচণ্ড ধমকে সে চীৎকার করে উঠল-খামোশ নাদান। একজন দুর্বল মেয়ে মানুষের উপর চাবুক চালাতে তোর সরম হয় না।

প্রহরারত পাইক দু'জনকে এক হাতে চেপে ধরল হায়াত মাহমুদ খান ।

ঘটনার অভাবনীয় আকস্মিকতায় সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই পাইক দু'জন হায়াত মাহমুদের হাত ঝাড়া দিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইতোমধ্যে আরও কয়েকজন পাইক এসে পড়েছিল, তাদের পিছে ঘোড়সওয়ার গৌরবর্ণ একজন সুপুরুষ যুবক। পরনে তার রাজকীয় লেবাস। ঘোড়সওয়ার যুবকটি এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন-কি ব্যাপার এখানে ?

জবাব দিল ঘোড়সওয়ার হাবসীটি-জনাবে আলা এই বেদেনীকে একজন রইস কিনে এনেছিলেন। এখানে এই হাটে বেদেনীর বদলে তিনি একটা বাচ্চা হাতী খুঁজছিলেন। আর ঠিক এই সময়ে বেদেনীটা কাপড়ের তলা থেকে একটা সাপ-বের করে ছেড়ে দিয়ে সবাইকে ভয় পাইয়ে দিয়ে পালাচ্ছিল। আমাদের পাইকরা জনাব এই বান্দীকে ধরে এনে তার সাজা হিসেবে বিশবার কোড়া মারছিল। এমন সময় কোথা থেকে এই ব্যাটা আফগান এসে গোলমাল বাধিয়েছে।

ঘোড়সোয়ার যুবক পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন হায়াত মাহমুদের দিকে । হায়াত মাহমুদও তাকাল উন্নত নাসা প্রশস্ত ললাট গৌরবর্ণ রাজপুরুষটির দিকে। এক পলক দু'জন দু'জনকে দেখল তারপর যুবক স্মিত হাস্যে প্রশ্ন করলেন-

-দেশ কোথায় ? কি নাম তোমার নওযোয়ান !

যুবকের বিদ্বেষহীন প্রশ্নে হায়াত মাহমুদের কণ্ঠস্বর কোমল হল-দেশ বহু দূর সেই আমুদরিয়া সিরদরিয়ার পাড়ে। এখন আমি বংগালেরই অধিবাসী

—বেশ বেশ। তা তুমি মেয়েটিকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে দিলেনা কেন ? জানো না এই হাটে বাঁদী গোলাম কেনা-বেচা হয় ।

হায়াত মাহমুদের চোখে আবার আগুনের ঝিলিক দিল- মানুষ বেচা-কেনা ছিঃ! আল্লার বান্দার এই নফরত।

- সবাই এবার প্রচণ্ড বিদ্রূপে হেসে উঠল। কে যেন বলল পাগল না কি পাখতনটা। দুনিয়ার এমন দেশ কোথায়ও আছে যেখানে মানুষ কেনা-বেচা হয় না ? ব্যাটা যেন মক্কা থেকে এল ।

কথাটা হায়াত মাহমুদের কর্ণগোচর হল। রক্তিম উত্তেজিত মুখে সে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ঘোড়সোয়ার রাজকর্মচারীটি নেমে এলেন। হায়াত মাহমুদের কাঁধে হাত রেখে বন্ধুসুলভ প্রশংসনীয় হাসি নিয়ে বললেন— কি নাম তোমার ভাই বললে না তো ?

— ' হায়াত মাহমুদ খান ।

- তোমার মহৎ হৃদয় ও সৎসাহসের পরিচয় পেয়ে সত্যিই আমি মুগ্ধ, আমার নাম আলাউদ্দীন হোসেন। আমি সুলতানের দরবারের কর্মচারী।

এসো আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার সঙ্গে চলো সুলতানের সেনাবাহিনীতে উচ্চ পদে তোমাকে বহাল করবার ব্যবস্থা করে দেব।

হায়াত মাহমুদের ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসির ঝিলিক দিল ।

বলল জনাবে আলা, এই বান্দা কোন রইস না হতে পারে তবুও সে গোলামী ঘৃণা করে ।

আলাউদ্দীন হোসেনের চোখে মুগ্ধ বিস্ময় ফুটল। তিনি বললেন শোন ভাই, আমিও তোমার মতই সাধারণ লোক ছিলাম। আজ আল্লার ইচ্ছায় আমি সিদিবদর দেওয়ানার উজীর। আমার নিজের প্রয়োজনেই তোমাকে ডাকছি। তুমি অমত কোরো না ভাই ।

এতক্ষণে হায়াত মাহমুদের মুখে হৃদ্যতার হাসি ফুটে উঠল।

উপস্থিত পাইক আর হাবসী কর্মচারীরা নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে ছিল, আশপাশে কিছু দর্শকও দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

হায়াত মাহমুদ বলল এই বেদেনীকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করুন হুজুরেওয়ালা। দুর্বল মেয়ে মানুষের ওপর এই অমানুষিক শাস্তি রীতিমত কাপুরুষের কাজ।

তাছাড়া এই মেয়েকে আমি আমার হৃদয়ের অধিশ্বরী করেছি। এমন মেয়ের জন্যই আমি কান্দাহার থেকে দেওয়ানা হয়ে ছুটে এসেছিলাম একদিন বংগাল মুলুকে ।

হায়াত মাহমুদের আবেগ মাখা কথাগুলোর অদৃশ্য পুষ্প বর্ষণের মত যেন ঝরে পড়ল বিস্তস্ত রক্তাপ্লুত রূপসীর অবয়বে। অতি যন্ত্রণার মধ্যেও তার কালো চোখের তারা কৃতজ্ঞতা আর অনুরাগে ছলছলিয়ে উঠল।

রূপসীকে যিনি বিক্রী করতে এসেছিলেন তিনি এতক্ষণে ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়ালেন। তার দিকে তাকিয়ে আলাউদ্দীন হোসেন প্রশ্ন করলেন- তুমি এর মালিক ?

জ্বী হুজুর। ওর বাবা ওকে আমার কাছে বিক্রী করেছে। কিন্তু মেয়েটা যেন সাক্ষাৎ কাল কেউটে । কিছুতেই বশ মানছে না। তাই ভাবছিলাম ওকে বেচে দেব।। আর হাটে এসেই যত বিপত্তি ।

আলাউদ্দিন হোসেন এক মুঠো স্বর্ণমুদ্রা ছুঁড়ে দিলেন লোকটির সামনে তারপর বললেন- এর বদলে এই মেয়েকে আজাদ করে দাও । আজ থেকে ও স্বাধীন।

রূপসী এসেই আলাউদ্দীন হোসেনের পায়ের কাছে নত হয়ে পড়ল আপনি - হুজুর, দেবতা ।

আলাউদ্দীন হোসেন মৃদু হাসলেন – তুমি কি তোমার মা বাবার কাছে ফিরে যাবে না এই পাখতুনের জীবন সঙ্গিনী হবে। শুনলে তো এই পাখতন নওযোয়ান তোমার জন্য কত মরু প্রান্তর পর্বত নদী পার হয়ে এসেছে।

রূপসীর মুখে যেন গোলাপী মেঘের ছোয়া ফুটল। লক্ষ্যা নদীর ঢেউয়ের মত ছল ছল করে উঠল কালো হরিণ চোখের নিবিড় পালক ।

হায়াত মাহমুদ হাসল - ওর কাছে আবার সাপ লুকোন নেই তো ।

চোখ তুলল রূপসী। হায়াত মাহমুদের দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিয়ে আবছা স্থির কণ্ঠে বলল – আমি সারা জীবন তোমার বাঁদী হয়ে থাকব পাখতন ।

হায়াত মাহমুদের দৃষ্টিতে পেলব সোনালী আলো ঝলমল করল । অস্ফুটে বলল- বাঁদী নয় জানেমন । আমি আজ থেকে তোমার গোলাম হলাম ।

এক পলক দু'জনের চারটি চোখের দৃষ্টি একই অনুরাগে আবদ্ধ হল ।

আর এই এক পলকে বর্তমানের সমস্ত কিছু যেন দূরে চলে গেল। হায়াত মাহমুদের চেতনায় যেন রুবাবের মিষ্টি ঝংকার বেজে উঠল। আর কোন সুদূর আংগুর লতার পাতা ছুয়ে মরুভূমির বাতাস বয়ে ভেসে এল যেন গানের কলি–

আয় জানেমন

চশমে সুমা চে খুব সুরত আস্ত ।

বরায়ে সুমা

দেওয়ানা হাস্তম ।

চার

মানিকনগর গ্রামের ওপর দিয়ে যেন একটা ধ্বংসের ঝড় বয়ে গেছে। সুলতানের পক্ষ থেকে খাজনা তুলতে এসেছিল কর্মচারী। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল হিংস্র রক্তলোলুপ একদল পাইক। গরীব চাষীরা খাজনা দিতে পারে নি। কিন্তু খাজনা উশুল না করেই কি ফিরে যাবে তারা ! দরকার হলে কি করতে হয় তাকি তাদের জানা নেই ! অনেক ... অনেক দৌলতের নেশায় সুলতানের আমীর ওমরাহরা যে বেহুঁশ ।

আলী আফসার এগিয়ে এসেছিল ভাই ধান-পান যা পাই তাতে বকেয়া শোধ করতেই শেষ হয়ে যায়। নতুন খাজনা রোজ রোজ আর দেব কোথা থেকে ?

কর্মচারী ধমকে উঠেছে চোপ ব্যাটা বেতমিজ ! নাকি-কান্না রেখে কড়ি ফ্যাল। নইলে চাবকে গাঁ শুদ্ধু সব ক'টা চাষা ব্যাটার পিঠের ছাল তুলে দেব। আর তোদের মেয়েগুলোকে হেরেমে নিয়ে তুলব ।

আলী আফসারের মাথায় হঠাৎ যেন রক্ত চড়ে গিয়েছিল-মুখ সামলে রেখো। আমাদের ঝি বউর ইজ্জত তুলে কথা কইবে না বলে দিচ্ছি।

–বটে ! সাহস তো কম নয় কমবখতটার ? এই কোথায় রে পাইকরা ? এটাকে ধরে সুপুরী গাছের সঙ্গে বেঁধে আচ্ছা করে চাবকে দে। আর গাঁয়ের সব ক'টা ঘরে হানা দে ।

এখন আগুনে পোড়া গ্রামের নদীর ধারে উদ্ভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে আছে আলী আফসার। তার সারা শরীরের নির্যাতনের চিহ্ন। চোখ কোটরাগত, মুখ শুকনো, আলী আফসারকে ঘিরে আরো কিছু গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে, প্রত্যেকেরই চেহারায় আতঙ্ক আর বিহ্বলতার চিহ্ন। আলী আফসারের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ থেকে এখনও ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠেছে। গতকাল সুলতানের হাবসী পাইকরা আলী আফসারের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে জরিনাকে ধরে নিয়ে গেছে ।

আলী আফসারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নন্দলাল বলল – উঃ, কি পাষাণ মন ওই সব হাবসীদের। ওরা কি মানুষ নয় দাদা ? নইলে মানুষের ওপর মানুষ এত জুলুম করতে পারে ! আর মুসলমান হয়ে মুসলমানের বউ ঝি লুঠে নিয়ে যায় ।

অপর একজন বলল-আরে রাখো দেখি ওরা আবার মুসলমান ! গাঁয়ের মক্তবের বুড়ো মৌলবী সাহেবকে গাছের সঙ্গে বেঁধে কি মারটাই মারল গো। বুড়ো নিরীহ মানুষ । আরবী ফারসী বয়াত শিখাত ছেলেদের, তাই অন্যায় হয়ে গেছে ।

আর হবে নাই বা কেন, শোননি সিদি বদর দেওয়ানা সিংহাসনে বসেই হলেন মুযাফফর। আর পুরোন জ্ঞানী বিচক্ষণ কর্মচারীদের বের করে দিয়ে যত সব অকাট মূর্খদের করেছে সভাসদ। মূর্খের শাসন তো এমনিই হয় ।

আলী আফসার এতক্ষণে গভীর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। বলল-নন্দ ভাই, আমরা গরীব বংগাল। সারাটা দিন খেটে যা উপার্জন করি তার অর্ধেকেই যায় সুলতানের খাজাঞ্চীখানায়। আমরা গরবী তো, সেই গরীবই ছিলাম। আর তাতেও সুলতানের খায়েস মেটেনি। আরও ধনরত্ন চাই। বংগাল প্রজাদের ঘর দোর জ্বালিয়ে ক্ষেতের ফসল কেড়ে নিয়ে স্ত্রী-কন্যাকে বেইজ্জত করে হাবসী সুলতান তার শাহী মহলে পারসী গালিচায় তাকিয়া হেলান দিয়ে আরামে বিলাসে বেহেস্ত সুখ ভোগ করছে বল, একি সহ্য করা যায়। কেনই বা সহ্য করব ।

নন্দলাল বিস্মিত ভীত দৃষ্টিতে তাকাল-তা'হলে কি করব আমরা ?

আলী আফসার জবাব দিল-কি করব ? তাই তো কি করব !

তার দৃষ্টির সামনে জরিনার অসহায় ব্যাকুল মুখ ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার

সারা শরীরের রক্তস্রোত সমুদ্রের ঢেউয়ের মত প্রবল গর্জনে আছড়ে পড়ল যেন। আলী আফসারের মুখ কঠিন হল। চোখের দৃষ্টি আক্রোশে জ্বালায় জ্বলে উঠল। দৃঢ়কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল সে-এর প্রতিশোধ নেব। ওই হাবসী পিশাচ সুলতান আর তার হাবসী অনুচরদের রক্তে এই গাঙের পানি লাল করে দেব। আমার দোস্ত হায়াত মাহমুদ খান বাকলায় আবাদ করে ঘাঁটি বানিয়েছে। সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন সাহায্য করছে গোপনে। হাবসী অত্যাচারের বিহিত একটা হবেই ।

নন্দলাল বিষণ্ন উৎসাহে বলল-কি যেন কি হবে ? তবে এই যে এত চোখের জল নদীর বুকে বয়ে সমুদ্দুরে পড়ছে, এই জলই একদিন মেঘ হয়ে এসে অভিশাপের ঝড়ে অত্যাচারীকে নির্মূল করবে।

আলী আফসার মৃদু হাসল-বলেছ বটে ভাই ! তবে শুধু চোখের জলে নয়। আমার বন্ধু হায়াত মাহমুদ বলত, কব্জির জোর বাড়াতে হবে। তা না হলে চিরদিনই আমরা মার খাব। আর আমাদের শরীরের রক্ত পানি করা সম্পদে অত্যাচারী সুলতানরা বিলাসে আমোদে দিন কাটিয়ে যাবে ।

নন্দর কণ্ঠে কিছুটা আশ্বাস ধ্বনিত হল-তা দাদা, আলাউদ্দীন হোসেন কিন্তু বড় লোক ভাল গো। দেশের চাষাভুষো গরীব দুঃখীর ওপর বড় দয়া। আর মানুষটাও যেমন সুন্দর তেমনি সুন্দর ব্যবহার। শুনেছি তার সঙ্গে সুলতানের মনোমালিন্য চলছে। সেদিন এক পাইক তো হাটে এসে বলেই ফেলল যে, ‘আমরা আর সিদি বদল দেওয়ানার হুকুম মানব না। আমাদের মনিব সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ।'

আলী আফসার কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল-অন্যায় অবিচার কোন ভালো মানুষই সহ্য করতে পারে না। আমার দোস্ত হায়াত খানের কাছে শুনেছি আলাউদ্দীন বংগাল ভাষায় লেখাপড়া করতে ভালোবাসেন। যদিও তিনি আরবী ফারসীতেও যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন ।

সহসা কথা বন্ধ করে দূরের নদীবক্ষের দিকচক্রবালে তাকিয়ে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে আলী আফসার বলর- দেখ দেখ দূরে একটা জাহাজের মত নৌকা দেখা যাচ্ছে না ?

নন্দলালও তাকাল – তাই তো মনে হচ্ছে। ব্যাপারখানা কি বল তো দাদা ? আলী আফসারের চোখে আলোর দীপ্তি। অনেকটা আত্মগত কণ্ঠে বলল – এ

নিশ্চয়ই আমার বন্ধু হায়াত মাহমুদের বাহিনী। মানিকনগর জ্বালান পোড়ানর খবর তো বাকলার বাদায় পৌঁছে গেছে।

বিরাটাকার নৌকাটা ততক্ষণ অনেক কাছে এসে গেছে। ক্রমে নৌকার সম্মুখ ভাগে দাঁড়ান আরোহীদের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠল ।

আনন্দের আবেগে চীৎকারে করে উঠল আলী আফসার – আল্লার রহমতে তুমি এসে পৌঁছেছ দোস্ত ।

নৌকা থেকে হাত তুলে হায়াত মাহমুদ খানও সজোরে উত্তর দিল – আল্লাহ নেগাহবান দোস্ত ।

নৌকা ঘাটে ভিড়ল। লাফিয়ে নামল হায়াত মাহমুদ খান এবং আরও অচেনা কিছু লোক ।

হায়াত মাহমুদ এসে দাঁড়াল আলী আফসারের সামনে। নীচুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা, করল- খবর কি দোস্ত ? আমার বোন জরিনা কেমন আছে ?

আলী আফসারের শূন্য দৃষ্টিতে যে দীপ্তি জ্বলে উঠেছিল তা বিলীন হয়ে গোধূলির রক্তিমাভা ভেসে উঠল। নদীর বুকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আলী আফসার বলল—সে নেই । সুলতাদের পাইকরা ধরে নিয়ে গেছে ।

হায়াত মাহমুদ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বেদনায় বুঝি তার ভাষা রহিত হল । কোথায় সেই আমুদরিয়া সিরদরিয়া ? কোথায় দ্রাক্ষাকুঞ্জের ছায়ায় সোরাইতে পানি ভরতে ভরতে ঊষর ধু-ধু প্রান্তরে ব্যাকুল আঁখি মেলে তাকিয়ে থাকে নিরুদিষ্ট ভাইয়ের প্রতীক্ষায় যে বোনের আঁখি, সেই পদ্মপলাশ আঁখি এই কোমল মাটির দেশ বংগালের এক কুঠির অঙ্গনের ললনার দৃষ্টিতে অনুভব করছিল। যে কোমল মায়ার স্নেহডোরে কান্দাহারের পাখতন হায়াত মাহমুদ খানের রুক্ষ হৃদয় স্নেহের ফল্গুধারা অনুভব করেছিল সে আজ নেই। সেই স্নেহময়ী আজ অত্যাচারী হাবসীর অনুচরের শিকার হয়েছে। ভাই হয়ে এ অবমাননা সহ্য করতে হবে হায়াত মাহমুদ খানকে ! না । কখনই না ।

কঠিন চাপা কণ্ঠে উচাচারণ করল হায়াত মাহমুদ— বদলা নেব। এর বদলা নিতেই হবে ।

হায়াত মাহমুদ তার সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল গোপীনাথ ! কেশব ছত্রি !

তোমরাও হাবসীদের হাতে আত্মীয়-পরিজন হারিয়েছ ! হাবসীদের পোষা কুত্তা ওই পাইকরা তোমাদের ঘরদোর জ্বালিয়েছে। চাবুকের সঙ্গে তোমাদের পিঠের চামড়া তুলে নিয়েছে । আজ এই মানিক নগরে তাকিয়ে দেখ .....

গোপীনাথ, কেশব আর তার পেছনের বাহিনী চীৎকার করে উঠল- হাবসীদের নির্বংশ করব। আমাদের মনিব আলাউদ্দীন শাহ। আমাদের ওস্তাদ হায়াত মাহমুদ । আমরা বংগালরা এর বিরুদ্ধে লড়াই করব ।

অল্পক্ষণেরই মধ্যেই গাঙের ধারের জটলা বিরাট আকার ধারণ করল । ক্ষণ পার হয়ে ঘণ্টা দিন আর মাসের আবর্তনে পদ্মা যমুন লক্ষ্যা নদীর প্রচণ্ড ধারার মত বিক্ষুব্ধ এক জনসমুদ্র উত্তাল হয়ে ফুঁসে উঠল বিদ্রোহের গর্জনে। 'হাবসী সালতানাতের অবসান চাই। অবসান চাই নির্মম অর্থলোলুপ সিদিবদর দেওয়ানার লোভী হাতের শাসন দণ্ডের। বংগালের মানুষ আর সহ্য করতে প্রস্তুত নয় ।'

পাঁচ

রক্তলাল গালিচার ওপর শৌখিন পানপাত্রে টলটলে রঙিন পানীয়ের সরঞ্জামের মধ্যে অর্ধ সংজ্ঞা রহিত সিদিবদর দেওয়ানা। সুরা পান করতে করতে অসম্ভৃত চীৎকার করে উঠছিল – আরো শরাব আনো ! গোলাম জান !

- বন্দা হাযির হুজুরেওয়ালা ।

খোজা হাবসী গোলাম জান ইরানী শরাবের পাত্র এগিয়ে ধরল।

গোলাম জানের দিকে রক্তচক্ষু মেলে আবার চীৎকার করে উঠল সিদি বদর।

কমবখত হাবসী। তোমার ও মুখ আর দেখতে চাই না। ইলিয়াশ শাহী আমলের রইস ওমরাহরা সব কোথায় ?

- হুজুর ! আপনিই তো তাদের চাকরী থেকে বের করে তাড়িয়ে দিয়েছেন একদিন ।

- খামোশ ! নাদান !

- জ্বী হুজুরেওয়ালা ।

- আমার পাইকরা কই ?

- তারা হুজুর বিদ্রোহী হয়ে হুসেন শাহর সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

- বটে। আমার খাজাঞ্চীখানার সোনা চাঁদী হীরা জহরত মোহরের ভাণ্ডার কি শেষ হয়ে গেছে ? শরাব দাও।

গোলাম জান শরাবের পাত্র এগিয়ে দিল। একটু চুপ করে বলল- জনাবে আলা! আপনি যে সব নতুন কর্মচারীদের রইসিয়ানা দিয়েছেন, তারা সব খাজাঞ্চীখানা ভাগাভাগি করে নিয়ে হারেমের বেগমদের সঙ্গে আয়েস করছে!

- বটে ! বটে ! কমজাতদের এত সাহস। আমার সেনাপতিরা সব কোথায় ? সৈন্য নামিয়ে পাগলা হাতী ছেড়ে এই সব কমজাত আর বিদ্রোহীদের গুঁড়িয়ে দিতে পারে না !

গোলাম জান হাবসী মাথা চুলকাল- তাই বা কি করে সম্ভব। সৈন্যদের ভাতা তনখা সবই তো আপনি কেটে দিয়েছেন। অসন্তুষ্ট সৈন্যরা আধ পেটা খেয়ে অস্ত্র ধরতে নারাজ ।

ওঃ, চুপ কর। চুপ কর গোলাম। আমি বংগালের সুলতান মুযাফ্ফর শাহ । এখনও আমার হুকুমে এ দেশ চলছে। যাও হারেম থেকে নতুন ধরে আনা পাঁচশ বাঁদীকে নিয়ে এসো। ওদের উদোম পিঠের ওপর আমার সামনে কোড়া মারো । ওদের পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়া তাজা খুনে যখন আমার এই গালিচা ভিজে উঠবে তার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে আমি ঘোড়ায় উঠব। যুদ্ধ করব। দেখব কত শক্তি হুসেন শাহ আর তার বিদ্রোহী সাঙ্গপাঙ্গদের কব্জিতে ।

গোলাম জান একটু ইতস্ততঃ করল— জনাব। আপনি এখন নেশার ঘোরে আছেন !

প্রচণ্ড ধমক দিল সিদিবদর- চুপ কর বেঈমান। যাও নিয়ে এসব বাঁদীদের। নারীদেহের টাটকা মাংস কাটা রক্ত দেখলে আমার শরীরের রক্তও চাংগা হয়ে উঠবে ।

গোলাম জান আর দ্বিরুক্তি না করে চলে গেল।

শরাবের নেশায় চুর হাবসী সুলতান সিদিবদর দেওয়ানা আপন মনে বিড় বিড় করল- আমি গৌড় বংগাল রাঢ়ের সুলতান মোযাফ্ফর শাহ। দশ হাজার পাইক

এখনও আমার আঙুলের নির্দেশে পাঁচ হাজার বেঈমানের মাথা কেটে আনতে পারে । আমার চারিদিকে বসরার গোলাপের মত, সিরাজের সুগন্ধি আতরের মত রংদার খুশবুদার হুরপরীর মত হারেম আলো করা বেগমরা ঘিরে থাকতে পারে। আমার খাজাঞ্চীখানা আলো করে হীরে জহরতে রাতের চমকদার তারকারাও ম্লান হয়ে যায়। আম এখনও কম কিসে ! দুনিয়ার সব দৌলত আমার চাই। দুনিয়ার সেরা খুবসুরত আওরতদের দেহের সুবাসে আমার প্রাসাদ ভরে তুলতে চাই। আমি হব সারা জাহানের বাদশা। হুঃ, দু'পাতা লেখাপড়া জানা ওই হুসেন শাহ পারবে আমার সাথে – এত বড় দিল...

হঠাৎ প্রচণ্ড রাগে সামনের সুদৃশ্য চমকদার সুরাপাত্রটাই দু'হাতে তুলে আছাড় মারল সিদিবদর। ঝন ঝন কাঁচ ভাঙা শব্দে গৃহরক্ষী অস্ত্রধারী হাবসী খোজারা ছুটে এল,

- কি চাই হাজুরে মাখলুকাত ?

শরাব আনো আরো। বাঁদীদের ধরে আনো। নর্তকীদের আসতে বল। শরাব ... শরাব আনো ।

ইতিমধ্যে এক খোজা গৃহরক্ষী এত্তেলা আনল— জনাবেওয়ালা এক বেদেনী এসেছে। তুকতাক মন্ত্রতন্ত্র জানে। ভেল্কীবাজীর খেলা জানে। আপনার মজলিশে তার কসরৎ দেখাতে চায় ।

অসম্বৃত হস্ত সঞ্চালনে সুলতান সিদিবদর আদেশ দিল – নিয়ে এসো দেখি সেই বেদেনীকে এই জলসা ঘরে ।

গৃহরক্ষী খোজারা বিনা বাক্যব্যয়ে নিজেদের মধ্যে অবাক দৃষ্টি বিনিময় করল। কারণ কিছুদিন আগে বিদ্রোহী প্রজাদের সঙ্গে নিদারুণ সংঘর্ষ হয়ে গেছে সুলতানের পাইক সেনাদের। দু'পক্ষেই যথেষ্ট হতাহত হয়েছে। বাকলায় আবাদ করে হোসেন শাহ নাকি হোসেনাবাদ নামে স্বাধীন রাজধানী স্থাপন করেছে। হোসেন শাহের প্রধান সেনাপতি হায়াত মাহমুদ খান। ঘোড়াঘাটের আফগান দুই যোদ্ধা এসে যোগ দিয়েছে তার সঙ্গে। তারা তোপখানা বসিয়েছে আবাদ কেটে নয়াবাদ নাম দিয়ে (নয়াবাদ গ্রাম বর্তমান পঃ বঙ্গের ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত)। গুপ্তচরেরা খবর আনছে হায়াত মাহমুদ খানের সঙ্গে এক দুর্ধর্ষ বেদেনী আছে। গুনতুক যাদুতে পাকা । কি যেন সেই বেদেনীই ছদ্মবেশে কোনও মতলবে যাদু করতে এল কি না !

কিন্তু কিছু তো বলবার উপায় নেই। সুলতান বদর দেওয়ানা সত্যিই বোধ হয় দেওয়ানা হয়ে গেছে। তা'নাহলে এই শত্রু-কবলিত দিনেও যাকে তাকে প্রাসাদে ঢুকবার হুকুম দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে খোজা গোলাম জানের পিছে পায়ে জিঞ্জির পরা বাঁদীরা এসে প্রবেশ করল মজলিশ ঘরে।

সারি সারি জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গৃহবধূ গৃহস্থ-কন্যাদের চোখে মুখে আতংক মাখা উদভ্রান্ত দৃষ্টি। জরিনাও তার মধ্যে দাঁড়িয়ে। সেদিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল সিদিবদর- এই বাঁদীরা হা করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

মাথায় ঝাপি নিয়ে সুরেলা চিকন সুরে গান গাইতে গাইতে খোজা রক্ষীর পেছনে পেছনে প্রবেশ করল এক বেদেনী। চোখে মুখে তার অপরূপ মায়াবী মাদকতা আর মন ভুলান চটকের ঝিলমিল ।

তাকে দেখে সিদি বদর দেওয়ানার নেশার রং যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠল । বাইরে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে রাত নেমেছে। বেদেনীকে দেখে এক জনের দৃষ্টি চমকে উঠল। অস্ফুট উচ্চারণে সে ফিসফিস করল 'রূপসী বেদেনী' ।

সভার কারো কানে তার সে উক্তি পৌছল না। রূপসী বেদেনী কিন্তু ঠিকই শুনতে পেল। জরিনার কণ্ঠস্বর ডুবিয়ে দিয়ে তটিনীর কলস্বরের মত ছল ছল করে উঠল সে- বাদশা সুলতান নামদার। হুজুরেআলা ফরমাস করেন তো আমার ভানুমতীর খেলা শুরু করি। এ খেলায় এমন যাদু দেব আপনার খোজা অনুচররা বান্দী নিয়ে স্ফূর্তি করবার তাগত ফিরে পাবে। আপনি হবেন সিংহের মত শক্তিশালী। হাজার বেগম নিয়ে আপনি বেহেস্ত সুখ ভোগ করবেন। কিন্তু ইনাম দিতে হবে গো বাদশাহ নামদার। সহসা ঘুরে ফিরে ঝাঁপি দুলিয়ে উচ্চ কণ্ঠে গান ধরল রূপসী বেদেনী -

সুলতান শাহ মুযাফ্ফর ।

দুনিয়ায় তোমার মত

এত বড় বাদশাহ

নাই যে আর ।

ভানুমতীর খেল দেখাব

জাদু তুকের খেল দেখাব

হুসেন শাহের জারিজুরি করব

যে ছারখার ।

গানের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গীর ঢেউ তুলে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল বেদেনী। কেউটে সাপের মত তারা সারা শরীর দুলছে। কালনাগিনীর ফণার মত কাঁপছে। কালো চোখের তারায় বিদ্যুতের অগ্নিশিখার ঝিলিক।

সহসা দূর থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জনের মত শব্দতরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ল বাদশার প্রাসাদের অলিন্দে। ঘোড়ার খুরের শব্দ আগুনের আভা ছড়িয়ে ঘিরে ফেলল প্রাসাদের চতুর্দিকে। সেই অশ্বাবাহিনীর অগ্রভাগে রয়েছে হায়াত মাহমুদ খান, ছুটি খান, পরাগল খান, সারওয়ার মাহমুদ পাখতন ।

রঙিন ঝাড় সুশোভিত অলিন্দের আড়াল দিয়ে বাঁকা দৃষ্টিতে দূরের সে দৃশ্য দেখে নাচে গানে আরও উদ্দাম মোহময়ী হয়ে উঠল রূপসী বেদেনী ।

চারিদিকের মুগ্ধ শ্রোতারা দূরের সে গর্জন ধ্বনি যেন শুনতে পেল না । তাদের পুরুষত্বহীন দেহমনে তখন যৌবন তাগদ ফিরে পাবার অলীক লালসা। সুলতান সিদিবদর দেওয়ানা ক্রমাগত শরাব পান করে চলেছেন। জড়িত কণ্ঠে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছেন ।

— মারহাবা। মারহাবা। সাবাশ বেদেনী ।

রূপসী বেদেনী তার ঝাঁপি নিয়ে ঘুরনীপাক নাচের ঝড় তুলে সুলতানের একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল হুজুরেওয়ালা বাদশাহ শানদার এবার আমার ভানুমতীর খেল দেখাব ।

দূরের জনস্রোতের বিক্ষুব্ধ গর্জন ধ্বনি তখন সুলতানের প্রাসাদে এসে আছড়ে পড়ছে। এবার খোজা অনুচররা সচকিত হল। কি ব্যাপার ? কিসের সোরগোল! প্রাসাদরক্ষীরা ছুটে গেল ত্রস্তে। চারদিকে ছুটোছুটি ব্যস্ততা। সুলতানের কোন দিকেই খেয়াল নেই। রূপসী বেদেনীর একটা হাত চেপে ধরে জড়িত অসম্বৃত সংলাপে বলল,

—কই, কোথায় তোমার ভানুমতীর খেলা।

-দেখাচ্ছি বাদশাহর মানদার । সবুর করুন।

সহসা সারা শরীরের হিংস্র ঝিলিক তুলে রূপসী তাঁর ঝাঁপিতে হাত ঢুকিয়ে এক জোড়া গর্জনরত কেউটে টেনে বের করল। তারপর চোখের পলকে ছুঁড়ে দিল সুলতানের দিকে। বিষাক্ত গর্জনরত সাপ দু'টি ফণা তুলে ছোবল দিল সুলতানের বুকে ।

তীব্র হাসি হেসে রূপসী লুটিয়ে পড়ল- খা খা, দুশমনরে খা। অত্যাচারীর বুকের রক্ত খা, যে কুত্তা মানুষের রক্ত চুষে খায়, মানুষের ইজ্জত ছিনায় তারে খা।

গর্জনরত সাপ দু'টি ছোবলের পর ছোবল দিতে লাগল। সারা ঘরে আতংক। ভীত সন্ত্রস্ত ছুটাছুটি চারিদিকে এই ভয়াবহ কাণ্ডে ।

ওদিকে বিদ্রোহীরা তখন প্রাসাদে ঢুকে পড়েছে। সমুদ্রের গর্জনের মত উত্তাল গর্জন উঠেছে। সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের জয়। “সিদি বদর দফা হও।'

সাপ দু'টিকে ক্ষিপ্র হাতে ধরে রূপসী যখন ডালায় ভরছে সিদিবদর দেওয়ানা লুটিয়ে পড়েছে গালিচার ওপর ।

রূপসী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল জরিনাকে-বোন ।

শৃঙ্খলিত জরিনা কেঁদে ফেলল ঘটনার আকস্মিকতায়। অতি কষ্টে বলল, -কোথায় আমার ভাই ? আমার স্বামী ?

—সবাই আছে। আমি তাদের সঙ্গেই আছি। আমি তো পণ করেছিলাম ওই পিশাচ সুলতানকে আমার নিজের হাতে শেষ করব।

হাবসী খোজা গোলাম জান কিন্তু পালায় নি। সিদিবদর দেওয়ানার সে ছিল একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর। মনিবের মৃত্যুতে সেও ক্ষেপে উঠে সরে গিয়েছিল আড়ালে। জরিনা আর রূপসীর আলাপের সুযোগে বিষমাখা ছুরি এনে আমূল বিদ্ধ করল রূপসীর পিঠে ।

আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল রূপসী। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে ঘরে ঢুকল বিদ্রোহী বাহিনীর একটি খণ্ডের অগ্রভাগে হায়াত মাহমুদ খান। গোলাম জান ছুটে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। তরবারীর আঘাতে তার শির খণ্ডিত হয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে ।

হায়াত মাহমুদ ছুটে এসে ব্যাকুল বাহুর আলিঙ্গনে রূপসীর রক্তাপ্লুত দেহ তুলে নিল বুকে-জানেমন। আমার জানেমন। তোমাকেই শেষ পর্যন্ত হারালাম। রূপসী অতি কষ্টে হাসল-প্রিয় পাখতন। রূপসী বেদেনীর জীবন সার্থক......

হায়াত মাহমুদের বুকে মাথা রেখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল রূপসী বেদেনী।

ছয়

নয়াবাদের নতুন কাটা দীঘির পাড়ে রুবাব হাতে নিয়ে বসে থাকে এক দরবেশ। যখন নারকেল গাছের সারির ঝিলমিল পাতার আড়াল দিয়ে কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ নীলাকাশে ভেসে আসে। ঝিরঝিরি হাওয়ায় মর্মরিত হয় সুন্দরীর দীর্ঘ খোলা কেশের মত পাতার সারি। দীঘির বুকে ছোট ছোট ঢেউ সির সির করে কেঁপে ওঠে। রক্ত শাপলার কলি থির থির করে কাঁপতে কাঁপতে পাপড়ি খুলে দেয় তখন এক বেদনাবিধুর সুর রুবাবের ঝংকারে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে-

আয়.....জানেমন......

সুমা খোয়াবে মন আস্ত,

বরায়ে সুমা দেওয়ানা হাস্তম ।

হায়াত মাহমুদের সকরুণ বেদনার আর্তি যেন মানব-মানবীর প্রেমের সীমা অতিক্রম করে এক মহান প্রেমার্তির রূপ পেয়ে বিশ্ব চরাচরে ছড়িয়ে পড়ে। লোকে বলাবলি করে, প্রেম বটে। জাতি-ধর্ম মানুষের ভেদ-বিভেদের ওপরে দরবেশ হায়াত মাহমুদ ।

ক্রমে দরবেশ হায়াত মাহমুদের প্রেমের সংগীত ছড়িয়ে পড়ে দূরদূরান্তে। রাঢ় গৌড় পুণ্ড্র বংগাল সব স্থানের লোকেই এই পাখতন আর নীচু জাতের কন্যা বাইদ্যার মেয়ে রূপসীর প্রেমগাথা শ্রদ্ধা ভরে বয়ান করে। এরই মধ্য দিয়ে এক কিশোর নতুন এক প্রেম-ভাব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। সে নবদ্বীপের নিমাই।

পণ্ডিত বংশের ছেলে। শাস্ত্র-পুরাণ পড়ে। সংস্কৃতের চর্চা করে। আবার সুফী সাধক দরবেশের সংস্পর্শে এসে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চর্চাও করে। নিমাইর বন্ধুবান্ধব গুরুজনরা ধিক্কার দেয়। পণ্ডিত ঘরের ছেলে হয়ে এ কি বিকার। জাত- বেজাতের বাছ বিচার নেই।এ কি অনাচার। নিমাই হাসে, ‘মানব-প্রেমই প্রভুর প্রেমের সিঁড়ি বন্ধুরা। মানুষকে না ভালবাসলে কি আর প্রভুকে

পাওয়া যায়।' উন্নাসিক ব্রাহ্মণরা নিমাইকে ভর্ৎসনা করে । এমনকি বিষ্ণুদেব পূজারী সম্প্রদায়ভুক্ত বয়োবৃদ্ধরাও উপদেশ দিতে আসে নিমাইকে। বলে-ওসব আজগুবী খেয়াল ছাড় নিমাই। পিতৃ-পিতামহের ধর্মের অবমাননা করিস না। ওতে স্বর্গে গিয়েও তাঁরা শান্তি পাবে না ।

নিমাই নির্বিকার উদাসীন। আনমনে নদীর ঘাটে বসে কি যেন ভাবে সে। আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে যায়। নদীর বুকে নীলাকাশ সেই মেঘের ছায়ার আলপনা প্রতিবিম্বিত হয়। দূর-দূরান্তের বাণিজ্যতরী এসে নদীর ঘাটে ভেড়ে। তরুণ গৌরকান্তি নিমাই সব কিছুর মধ্যে এক অদেখা প্রভুর সুনির্দিষ্ট পরিচালনা অনুভব করে। নদীর ঘাটে বসে বাউল ফকির দরবেশরা গান গায়। সে গানে আত্মবিস্মৃত হয়ে যায় নিমাই। অস্থির অনিবৃত অজানা প্রেম-ভাবের যন্ত্রণায় ছটফট করে সে পিঞ্জরাবদ্ধ শারীর মত ।

জল-স্থল, আকাশ-বাতাস যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে নিমাইকে 'আয় আয়। ঘর ছেড়ে বাঁধন কেটে বেরিয়ে আয়।' দেহাতীত প্রেমই প্রভুর প্রেম। মানবের মঙ্গল কামনাতেই সে প্রেমের বীজ অংকুরিত। যন্ত্রণাবিদ্ধ নিরুপায় নিমাই অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে ছুটে বেড়ায় ।

দিন যায়। সন্ধ্যার সূর্য আরেকটি দিন আনে। ঋতুচক্রের আবর্তনে অতিক্রান্ত হয় বৎসর। তরুণকান্তি নিমাই যৌবনের স্বর্ণদ্বারে এসে এক সুপুরুষ যুবক হয়ে ওঠে। কিন্তু সংসারে তার আসক্তি কই ! আসক্তি কই চিরাচরিত মায়াবন্ধনে আকর্ষণে ! দিন দিন নিমাই আরও উদাসীন, আরও আত্মগত হয়ে ওঠে ।

নিমাইয়ের মাতা শচীদেবী নবীন যুবকের মুখে তাকিয়ে সচকিত হয়ে ওঠেন। 'ও কিসের আলোকচ্ছটা তার ছেলের সারা অঙ্গ ঘিরে। অচেনা জ্বালা নিয়েচিন্তায় ব্যাকুল হয় মায়ের মন। নিমাই যখন দাওয়ায় বসে ধ্যানস্থ নিমগ্ন হয়ে থাকে। সেদিকে তাকিয়ে বুক অজানা আশংকায় জ্বলে ওঠে মায়ের। মনে হয় নিমাই যেন অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। কোন বাঁধন দিয়ে বাঁধবেন তিনি তার একমাত্র নাড়ীছেঁড়া ধনকে।

ঘটকী আসে। শচী দেবীর দাওয়ার ওপর হাঁটু মুড়ে বসে বলে-মা জননী । পুত্তুর যে তোমার শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সোনার বরণ যৌবনে এসে দাঁড়াল। ছেলেকে বিয়ে দিয়ে সংসারী কর গো। এখনও সময় আছে গো মা জননী। নইলে ছেলে যে তোমার বাঁধন কেটে উড়ে যাবে। দেখেছ মা তোমার ছেলের

মুখ। মনে হয় যেন সাক্ষাৎ কেষ্ট ঠাকুর।

শচী দেবী ব্যাকুল হয়ে ঘটকীর হাত জড়িয়ে ধরলেন-ব্যবস্থা করে দাও গো মেয়ে। আমিও যে চিন্তায় রাতে ঘুমুতে পারি না ।

ঘটকী পা ছাড়িয়ে আয়েশ করে বসে। মুচকি হেসে মুখে পানের খিলি পুরে দেয়—তাই তো বলছি গো মা জননী। মেয়ে জাত হল শক্তিদেবী। মায়ার বাঁধনের চাবিকাঠি । শ্রীরাধার জাত। এখন বল তো তোমার কেষ্ট ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীরাধিকার জোড় মিলিয়ে দিই । স্ত্রী শক্তিই ঠাকুরকে বাঁধতে পারবে।

শচী দেবী পানের থালা ধরে দেয় ঘটকীর সামনে-তোমার দু'খানা হাত ধরছি মা। ছেলেকে আমার সংসারী করে দাও ।

-দেব গো দেব। সতী লক্ষ্মী সুলক্ষণে কন্যে এক আছে। তারই সমাচার এনেছি।

ঘটকী আরো কয়েক খিলি পান মুখে পুরে পাত্রীর রূপ গুণ সততার ব্যাখ্যান করে। এমন সময় আঙিনায় এসে দাঁড়িয়ে নিমাই ডেকে উঠল-মা। খেতে দাও।

ঘটকী জিভ কেটে উঠে দাঁড়াল-চলি গো মা জননী। দাদা-ঠাকুরের সেবা দাও। ঘটকী চলে যেতে দাওয়ায় আসন পেতে ছেলের খাবার জায়গা করে পাখা নিয়েবসে শচী দেবী কথা পাড়লেন-বাবা নিমাই। আমার তো বয়স হল । এবার আমায় ছুটি দে, বাবা ।

খেতে খেতে অবাক বিস্ময়ে মুখ তুলল নিমাই, সপ্রশ্ন কণ্ঠে বলল- কেন মা কি হল ?

-কি আর হবে বাবা। আমি পোড়াকপালী। তুই আমার দুখিনীর ধন। মনে বড় সাধ রে বাবা, তোকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করে আমি ঠাকুরের সেবা করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিই ।

নিমাই হেসে ফেলল-তাই বুঝি ঘটকীর আনাগোনা ।

শচী দেবী উৎসাহিত হলেন—হ্যাঁরে, বাবা ! বড় ভালো বড় সুলক্ষণা একটি মেয়ের সন্ধান পেয়েছি। তুই অমত করিস না বাবা ।

নিমাই উৎফুল্ল হল না। খাওয়া থেকে হাত গুটিয়ে বিষণ্ণ হয়ে বলল-কিন্তু সংসার যে আমার মন টানে না মা। সংসারের হীনতা নীচতা কুশ্রীতা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দিনরাত আমায় অস্থির করে তোলে। এই সংসাররূপী কারাগারে তুমি আমায় বন্দী করে কি সত্যি সুখী হতে পারবে ?

শচী দেবী আঁচলে চোখ মুছলেন-বন্দী কেন করব বাবা। আমি যে তোর সুখের জন্য....তোর এই ছন্নছাড়া উদাস মুখ সারাক্ষণ আমার বুকে যে কাঁটা হয়ে বিধছে নিমাই । মায়ের অবাধ্য হোস না বাবা। আর কষ্ট দিস না মাকে ।

নিমাই আবার খাওয়ায় মন দিল—মায়ের মনে কেন-কোন মানুষের মনেই আমি কষ্ট দিতে পারি না মা। আমার বিয়ে দিয়ে তুমি যদি সুখী হও তবে তাই হোক মা ।

উঠোনে আমগাছটার ঝাকড়া মাথায় বসে পাতার আড়াল থেকে একটা পাখী মিষ্টি সুরে ডেকে উঠল 'বউ কথা কও' ।

বাইরের আঙ্গিনা থেকে কে যেন ডেকে উঠল-নিমাই। আমি সনাতন এসেছিরে। নতুন খবর এনেছি একটা। চল নদীর ধারে আমার সঙ্গে ।

নিমাই খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল-কি রে। কি খবর এনেছিস ? সনাতন উচ্ছল মুখে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। বলল-নতুন সূর্য উঠেছে রে। নতুন সূর্য উঠেছে। এমনটি আর কখনও হয় নি ।

নিমাই দ্রুত নেমে এল-কি ব্যাপার সনাতন ঠাকুর। কিছু তো বুঝতে পারছি না । শচী দেবীও উৎসুক্য ভরা দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলেন-কি হয়েছে গো ঠাকুর ?

সনাতন হাসতে লাগল-সুলতান হোসেন শাহ্ নতুন ফরমান জারী করেছেন।
-কি রকম ?

-এবার থেকে বংগালে ফারসীর সঙ্গে বংগাল ভাষাও চলবে।

শচী দেবী বিস্ময়াবিষ্ট প্রশ্ন করলেন—বল কি গো সনাতন ঠাকুর ! এ কি বিশ্বাস হবার মত কথা !

সনাতনের হাসি আরও বিস্তৃত হল-হ্যাঁ গো মাসী। এবার থেকে টোলে পাঠশালায় মক্তবে মাদ্রাসায় ছেলেরা কেবল আরবী ফারসী সংস্কৃত পড়বে না, বংগাল ভাষাও পড়বে।

শচী দেবী বিস্ময়ে গালে হাত রাখলেন-বলছে কি সনাতন ঠাকুর। বংগাল ভাষা যে মেচ্ছ ভাষা বলে শুনে এসেছি এতদিন। তবে কি..

শচী দেবীকে বাধা দিয়ে সনাতন বলে উঠল-আরে রাখো মাসী। আমি বামুনের ছেলে ক'টা শাস্ত্র পুরাণ পড়েছি বল দেখি। যজমানী করে খাবার জন্য নিষ্কর ভূমিতে বসবাস করে ক'টা মন্ত্রোচ্চারণ শিখেছি মাত্র। যাই বল না বাপু, আমার ওই মনসামঙ্গল, বেহুলার ভাসান, সূর্যি ব্রতের গাথা শুনতেই বেশী ভালো লাগে।

নিমাই বলল-চল সনাতন বাইরে যাই ।

দু'জনে গল্প করতে করতে আঙ্গিনা পার হল ।

গ্রামে গঞ্জে হাটে মাঠে তখন এক বিস্ময় আনন্দের ঢেউ। সুলতানের ফরমান জারী করতে বেরিয়েছে ফরমানদার পাইকরা ।

হাটুরেরা হাটের পথে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে। আনন্দে উচ্ছ্বসিত একজন আরেকজনকে ডেকে বলে—শুনেছ না কি ছমির চাচা, এবারে যে দেশে নতুন হাওয়া এল।

বৃদ্ধ ছমির মণ্ডল হাটের দিকেই চলেছিল। চোখের ওপর হাত রেখে উত্তর দিল—হ্যাঁ তা শুনেছি বৈ কি। তা বাবা এ বড় বিপদ হল গো। দেশ থেকে আরবী ফারসী কি উঠে যাবে নাকি ?

হাট থেকে হারু ভট্টাচার্যি ফিরছিল। সেও দাঁড়াল-সংস্কৃত হল দেবভাষা দাদা সেটাও কি বন্ধ হয়ে যাবে না কি ?

প্রথম বক্তা আলিমউদ্দীন যেন এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিল সব যুক্তি-আরে রাখো রাখো। এত দিন তো হাবসীদের মারে সব ভাষা চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়েছিল। তখন মুখ খুলতে পারো নি ? শোন ওই তো ফরমানদারেরা আসছে। সুলতানের ফরমানদাররা নয়া ফরমান জারী করে চলেছে মহা উৎসাহে-“শোন শোন যত বংগাল ভাই ! আজ থেকে মহামান্য সুলতানের আদেশ বংগাল ভাষা হল এদেশের দ্বিতীয় প্রধান ভাষা। ফারসীতে সুলতানের রাজসভায় দলিল দস্তাবেজ আইন-কানুন লেখা হবে। আর বংগাল ভাষাতেই দরবারে কথাবার্তা চলবে ! আর ফারসী-তুর্কী বলতে হবে না। শোন শোন ভায়েরা আরো আছে নয়া ফরমান। যত সংস্কৃত আরবী ফারসী জানা পণ্ডিত আলেম আছে তারা যেন

সুলতানের দরবারে হাযির হয়। দেশের সব জ্ঞানীগুণীদের সসম্মানে দরবারে নিয়ে যাওয়া হবে ।

আরো শোন ফরমান। সব নেমকহারাম বেঈমান হাবসীদের দফা করা হয়েছে। সুলতানের দরবারে পুরানা রইস, উপযুক্ত কাজের লোকদের ডাকা হয়েছে। হিন্দু- মুসলমান বলে ভেদ নাই। সুলতান গৌড়েশ্বর আলাউদ্দীন হুসেন শাহ সব উপযুক্ত লোককেই সভাসদ করবেন, সম্মানী দেবেন। দেশে যত জ্ঞানী-গুণী আছেন সবাইকেই সভাসদ করা হবে....”

ফরমানদাররা দামামা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যায়।

ছমির মণ্ডলের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়-তবে আর চিন্তা কি। যাই বাড়ী যাই। আমার নাতিটা মাদ্রাসা থেকে ফারসী ভাষা শিখে ফারসী বয়াত লেখে। নাতি আমার এবার নিশ্চয়ই বড় চাকুরে হয়ে যাবে।

হাসি ফুটে ওঠে হারু ভট্টাচার্যির মুখেও-এ মহা সুসংবাদ দাদামশাই। আমরা বামুনরা পেটভরা সংস্কৃত ভাষার বিদ্যে নিয়েও যজমানী করে কোন রকমে খাওয়া পরাটা চালিয়ে আসছিলাম। যাক এবার তা'হলে সুলতানের বদৌলতে একটা উপায় হল । সম্মানীও পাব ।

আলিমউদ্দীন হাসতে হাসতে বলল-যাও যাও ছুটে গিয়ে ঢোল ধরে ফেল ঠাকুর মশাই । আমিও পা চালিয়ে বাড়ী যাই। সুখবরটা পাড়ায় পাড়ায় পৌঁছে দিই।

খবর খবর খবর। সবাই শুনল খবর। তাঁতী জেলে কিষাণ কারিগর মালাকার কৈবত বাগদী সবাই হাতের কাজ ফেলে কান পেতে যেন এক অবিশ্বাস্য মধুর স্বপ্নের খবর শুনল। আর সকলেই নিজেকে মনে মনে গর্বিত জনপদবাসী ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করল ।

নদীর বুকে আলোকে উদ্ভাসিত প্রতিবিম্ব ফেলে নতুন সূর্য ওঠে। চিরদিনের নিপীড়িত বংগালেরা আকাশেও যেন নব দিগন্তের সূচনা করে নবীন সূর্যোদয় হয়। সে সূর্য মহামতী সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ।

সেই আলোকরশ্মির প্রভায় হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঝলক নিয়ে ঝলমল করে মূল্যবান সম্ভারের মত চিরদিনের অবহেলিত মানুষের অবহেলিত মুখের ভাষা। বংগাল ভাষা ।

সাত

একদিন ফাল্গুনের সন্ধ্যায় নবদ্বীপের ঘাটে একটি সুসজ্জিত নৌকা ভিড়ল। নৌকা থেমে নেমে বরবেশী নিমাইর সঙ্গে গাটছড়া বাঁধা নববধূ বিষ্ণুপ্রিয়া এসে উপস্থিত হল শচী দেবীর ঘরে।

বিবাহ আচারের আনন্দ উৎসব স্তিমিত হলে ফুলশয্যার রাতে বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল নিমাই। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। এলমেলো ফাল্গুনের হাওয়ায় গাছপালায় মর্মর ধ্বনি উঠেছে। থেকে থেকে ডাকছে ‘চোখ গেল' ‘ফটিক জল' পাখী ।

নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়া চন্দনচর্চিত মুখটি তুলে ধরল। মৃদু কণ্ঠে ডাকল-প্রিয়া ।

বিষ্ণুপ্রিয়া সলজ্জ আনন্দমাখা চোখ তুলে তাকাল-বলুন ।

-তুমি প্রেম বোঝ ?

বিষ্ণুপ্রিয়া দৃষ্টি নত করল। নব বধূর ব্রীড়া আরক্তিম মুখে উত্তর দিল-সে শিক্ষা তো তোমার কাছেই পাব ।

নিমাই মৃদু হাসল-বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রেম কি কাউকে শেখাতে হয়। সে যে হৃদয়ের আপন সৃষ্টি। মানুষকে কি ভালোবাস না ! এই বিশ্বপ্রকৃতির সর্ব সৃষ্টি এক মধুর প্রেমের স্রোতে নিত্য প্রবাহিত। সে প্রেমের আলো কি কখনও অনুভব করেছ ?

দুর্বোধ্য বিচিত্র দৃষ্টি মেলে তাকাল নববধূ। বলল—আমি যে তোমার কথা সব বুঝতে পারছি না।

নিমাই হেসে বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাছে টেনে নিল-বুঝবে প্রিয়া। নিশ্চয়ই বুঝবে। আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা যত গভীর হবে তোমার অন্তরের দ্বার তত খুলবে। মানুষকে ভালোবাসলেই প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারবে। আর তাহলেই সেই মহান প্রেমের সন্ধান পাবে ।

বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর বুকে তার কোমল একটি হাত রাখল-তুমি কি সব মানুষকে ভালোবাস ?

সস্নেহ বেষ্টনে স্ত্রীকে বক্ষলগ্না করল নিমাই-হ্যাঁ প্রিয়া। আমি হিন্দু, মুসলমান, বামুন, কৈবত সবাইকে এক মনে করি। সব জাতের ছোঁয়া জল খাই আমি ।

বিষ্ণুপ্রিয়া শিহরিত হল-সে কি ! তাতে তো জাত যায় যে !

নিমাই প্রশস্ত উদার হাসল-স্রষ্টা তো একটাই জাত সৃষ্টি করেছেন, তার নাম হল মানুষ । তার মধ্যে আমি কোন ভেদাভেদ দেখতে পাই না ।

কিশোরী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে এক অপূর্ব মুগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ল। মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল –তুমি কাউকে ঘৃণা কর না ?

-না প্রিয়া। ঘৃণা কেন করব। ভালোবাসা দিয়ে যে সব ঘৃণাকে মুছে দেওয়া যায়।

জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল ঘরে। সেই স্নিগ্ধ আলোয় নিমাইর মুখ যেন এক অপার্থিব উজ্জ্বলতায় আলোক বিকিরণ করছিল। স্বামীকে বিষ্ণুপ্রিয়ার অনেক দূরের জগতের মানুষ মনে হল। আবছা ভাবে সে অনুভব করল এ মানুষ যেন ধরা ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে ।

সহসা স্বামীর পদপ্রান্তে বসে পড়ে বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদে ফেলল-ওগো আমার মনে হচ্ছে তুমি বোধ হয় কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা। একদিন তোমার অভিশাপের কাল কেটে গেলে আমায় ফেলে তুমি চলে যাবে। আমি তোমার যোগ্য নই ।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে দু'হাতে বুকে নিল নিমাই-প্রিয়া আমায় ভুল বুঝ না। আমি দেবতা নই। আমি মানুষ। মানুষের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাতেই আমি সারাক্ষণ যন্ত্রণায় ভুগি। এ যন্ত্রণার অবসান ঘটাতেই হবে। তাতে যদি কোনদিন তোমায় ছেড়ে যাই তুমি দুঃখ পেও না বিষ্ণুপ্রিয়া। সত্যকে যে জানতেই হবে। জানো সেদিন নদীর ঘাটে এক সুফী দরবেশ হাফিজের বয়াত গাইছিল ।

নিমাই মৃদু সুরে সুফী সাধকের গানের কলি গেয়ে উঠল-

আয় ব'দে, আগার

ব’গুলশানে আহবাব ব’গোজারী

যিনহার আরযা জোন বা ।

উদাস মিষ্টি সুরের অচেনা সংগীতে বিষ্ণুপ্রিয়া অজানা এক পুলকের শিহরণ অনুভব করল। ধীরে ধীরে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াল – ভারী সুন্দর তো এ গান ! এ গানের অর্থ কি ?

নিমাই হাসল - ফারসী আমি কিছুদিন পড়েছিলাম। সত্যি এই গানের অর্থ শুনতে চাও বিষ্ণুপ্রিয়া ? তোমার কি ভালো লাগবে ?

-হ্যাঁ লাগবে । তোমার যা ভালো লাগে, আমারও তা নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার কপালে একটি স্নেহচুম্বন এঁকে দিয়ে সুগভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করল -

আমার বধুয়ার ফুলের কাননে

হে বাতাস যদি বহিতে চাও ।

অনুনয়ে তব পদযুগ তলে করি,

প্রাণেশ্বরে অঙ্গনে মম প্রেমের

আকুতি কহিয়া দাও ।

মুগ্ধ আবেশে বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখের পাতা ভারী হল। স্বামীর বুকে মাথা রেখে পরম সুখে চোখ বন্ধ করল সে। তার মনে হল পরম ভাগ্যবতী মেয়ে সে।

একদিন চৈত্রর উদাস হাওয়ার ঝাপটায় হাহাকারে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফাল্গুন বিদায় নিল। প্রচণ্ড উত্তাপের খরপ্রভায় জ্বলতে জ্বলতে এল ক্ষ্যাপা বিশ্বামিত্র মুনির সাধন দহনের জ্বালা নিয়ে বৈশাখ। তারপর শ্রাবণের ঘনঘটায় নীল মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন করে এল প্রবল বর্ষা। নীল বনরাজির ওপর নীলাভ মেঘের ছায়া আর বিদ্যুতের ঝলকের আলোকে নতুন সাজে সাজল আকাশ পৃথিবী। ঢল নামল খালে বিলে । নদীতে এল জোয়ার ।

আর এক নতুনের জোয়ারে ভেসে গেল নবদ্বীপের নিমাই। দিন রাত সে অসহ্য উন্মাদনায় অস্থির। বিশ্বপ্রকৃতিতে ব্যাপ্ত এক মহান প্রেমের জোয়ারে সে যেন ভেসে যাবে। মাতার স্নেহ, জায়ার প্রেম, সংসারের বন্ধন কেটে বেরিয়ে পড়ার জন্য সে উন্মুখ। সত্য তাকে প্রতিনিয়ত ডাকছে। সত্যকে জানতেই হবে ।

প্রায়ই বাড়ী থাকে না সে। সুফী দরবেশের আসরে, সংসারত্যাগী বৈরাগী মুর্শিদদের গানের মোহে সে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে বেড়ায় নির্জনে। কখনও দুঃস্থ মানুষের আশপাশে ।

বর্ষা শেষে শরতের উজ্জ্বল দুপুরে ঘরের দাওয়া লেপছিল বিষ্ণুপ্রিয়া । নদী

থেকে স্নান করে কলস নিয়ে বাড়ী ঢুকলেন শচী দেবী। শাশুড়ীকে দেখে মাথায় কাপড় টেনে দিল বিষ্ণুপ্রিয়া। কলসী রেখে ভিজে কাপড়ে ঘরে উঠতে উঠতে শচী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে লক্ষ্য করে বললেন—

হ্যাঁ গো বৌ মা, নিমাই বুঝি কাল থেকে বাড়ী ফেরে নি ?

বিষ্ণুপ্রিয়া হাতের কাজ রেখে নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল ।

শচীদেবী সপ্রশ্ন দৃষ্টি ফেললেন বৌর মুখে–কি হল ? কথা বলছ না কেন ? বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে অস্বস্তির রেখা ফুটল। করুণ কণ্ঠে বলল তিনি যে কখন কোথায় যান, কখন ফিরবেন তাতো আমায় কিছু বলে যান না মা ।

উদ্বেগ ব্যাকুল কণ্ঠে কিছুটা উষ্মা মিশিয়ে শচী দেবী বললেন সুলক্ষণে মেয়ে খুঁজে বিয়ে দিলাম। তা তুমিও পারলে না ছেলেটাকে সংসারী করতে। ছেলে আমার দিন দিন আরও বৈরাগী হয়ে গেল। কপাল আমার চিরকালেরই দুঃখের। তোমাকে আমি আর কি দোষ দেব মা।

এবারে বিষ্ণুপ্রিয়ার ঠোঁট থর থর করে কেঁপে উঠল। দুচোখ ছাপিয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল–মা, আমায় ক্ষমা করুন। জানি না আমি সৌভাগ্যবতী না হতভাগী। তবে আপনার দেবতুল্য ছেলের কিছুমাত্র যোগ্য আমি নই । তিনি অনেক বড়। অনেক মহৎ ।

বাইরের আঙ্গিনায় সনাতনের কণ্ঠে শোনা গেল – মাসী ! ও মাসী !

শচী দেবী ডাকলেন – এসো বাবা ।

সনাতন ভেতরে এল। বিষ্ণুপ্রিয়া দ্রুত হাতে আসন পেতে দিল দুয়ারে – আসুন ঠাকুরপো বসুন ।

সনাতন ভেতরে এসে ব্যস্ত কণ্ঠে বলল – না বউঠাকুরানী বসব না। এখন তাড়া আছে। একটা সুখবর দিতে এলাম ।

শচী দেবী প্রশ্ন করলেন – কি খবর বাবা ।

- হাসিতে উজ্জ্বল হল সনাতন - আশীর্বাদ কর মাসী। তোমাদের আশীর্বাদে আমি সুলতানের রাজসভায় খুব ভালো চাকরি পেয়েছি গো। তা নিমেটা গেল কোথায় আবার ?

শচী দেবীর মুখ ম্লান হল - কি যেন সে তো আজ দু'দিন বাড়ী নেই । কোথায় যে গেছে তাও বলে যায় নি ।

- বটে। ওকে যে কি সন্ন্যেসের নেশায় পেয়েছে। কত বললাম চল যাই গৌড়ে সুলতানের দরবারে। জ্ঞানী-গুণী বলে সমাদর হবে। ওঃ, কি বলব মাসী ! সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের দরবার নয় তো, যেন চাঁদের হাট বসে গেছে। সংস্কৃত আরবী ফারসী যত পুঁথি পত্তর আছে সুলতানের হুকুমে সব বংগাল ভাষায় অনুবাদ হাচ্ছে। রামায়ণ, মহাভারত, ইউসুফ জোলেখা, জঙ্গনামা কত বই যে বংগাল ভাষায় লেখা হচ্ছে । মানুষ তো নয় সুলতান, সাক্ষাৎ দেবতা।

শচী দেবী ছোট একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপলেন। তারপর বললেন – হ্যাঁ, শুনেছি সব। তা আমার নিমাইও তো কম পণ্ডিত ছিল না। কিন্তু কেন যে ছেলেটা এমন বিবাগী হয়ে গেল ।

বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরের খুঁটি ধরে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। সনাতন উঠল – চলি মাসী। নিমাইকে খবরটা দিতে এসেছিলাম । দেখা তো আর হল না। আজই গৌড়ে চলে যাচ্ছি। বাড়ী এলে সুখবরটা দিও।

সনাতন আর বসল সা।

সনাতন চলে যেতে শচী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে তাকালেন- অমন কাঠের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন গো। যাও পাট সেরে ফেল। দেখি ছেলেটা আবার কখন ফেরে। রাজ্যির লোক রাজদরবারে হোমরা চোমরা হয়ে গেল এই সুযোগে । আমার যে শূন্য হাঁড়ী তো সেই শূন্যই ।

বিষ্ণুপ্রিয়া আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারল না। প্রবল উচ্ছ্বাসে কেঁদে ফেলল- তাঁকে অত ছোট করে দেখবেন না মা। তিনি যে অনেক ওপরের মানুষ । তিনি যে দেবতা ।

শচী দেবী সজল চোখে বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথায় হাত রাখলেন – কেঁদ না মা। সে কি আমি জানি না। আমার গর্ভের ধন আমার চাইতে তা কে বেশী জানে বাছা। তবুও তো মায়ের মন যে বুঝ মানে না ।

- এমন সময় দুয়ারে এসে দাঁড়াল নিমাই। বিষণ্ন গম্ভীর কণ্ঠে ডাকল – মা । চমকে ফিরে তাকালেন শচী দেবী ।

নিমাই এসে উঠোনে দাঁড়িয়েছে। পরনে গৈরিক বেশ। মুখে উজ্জ্বল আলোর আভা। শচী দেবী ছুটে গেলেন ছেলের কাছে। ছেলের গায় মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন – কোথায় ছিলি দু'দিন বাবা । আমি যে ভেবে ভেবে অস্থির ।

নিমাই হাসল ভাববার কি আছে। সারা বিশ্ব জুড়েই তো তোমার সন্তানরা রয়েছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর হাত-মুখ ধোওয়ার জল দিয়ে দ্রুত খাবার জোগাড় করতে গেল।

হাত-মুখ ধুয়ে অন্যমনস্ক ভাবে খাওয়া সেরে উঠল নিমাই ।

ঘরে চিকন পাটি পেতে তালপাতার পাখা নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া এসে দাঁড়াল – ঘরে - এসো। একটু বিশ্রাম করবে। আমার তো সাধ হয় তোমাকে একটু সেবা করি ! না কি সে সুযোগটুকুও আমায় দেবে না ! সূর্যের কাছে থেকেও যে আলো পায় না তার মত দুঃখিনী আর কে আছে !

আবছা একটু হাসির আভাস ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে নিমাই হাসল প্রিয়া ! দুঃখ যে ভালোবাসারই আর এক নাম। হরির প্রেমে পাগোল হয়ে আমি দুঃসহ ব্যথায় অস্থির হয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াই। আমার মনটা কি তুমি বোঝ না প্রিয়া ?

বিষ্ণুপ্রিয়া ম্লান হাসল। স্বামীর হাত ধরে ঘরে এনে পাখার বাতাস করতে করতে মৃদু কণ্ঠে বলল – যার স্বামী স্ত্রী থাকতেও বিবাগী হয়ে যায় মানুষ যে তাকে ক্ষমা করে না ।

সহসা অনুনয়ে ভেঙে পড়ে বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর দু'টি হাত জড়িয়ে ধরল- ওগো আর তুমি অমন করে বাইরে বাইরে ঘুরো না। বাড়ীতে থেকে কি ধ্যান করা যায় না ? হরির প্রেম পাওয়া যায় না ? সত্যকে জানা যায় না ? বল ।

নিমাই সন্তর্পণে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। উন্মনা হয়ে তাকিয়ে রইল জানালা দিয়ে বাইরের সুদূর আকাশে। গাছপালার মাথায় শরতের সোনা ঝরান রৌদ্রোজ্জ্বল নীলাকাশ এক অসীম দুর্বার আকর্ষণে তাকে ডাকে। ওই উদার আকাশের মত সৌন্দর্যসিগ্ধ হরির প্রেম কত সুন্দর। কত আলোকময় তা এই মুহূর্তে বিষ্ণুপ্রিয়াকে কেমন করে বোঝাবে সে। কি করে বোঝাবে সংসারের অসংখ্য অন্যায়, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, ঘৃণা-বিদ্বেষ তাকে যন্ত্রণায় অস্থির

করে তোলে ।

নিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর মুখে নির্নিমেষে তাকিয়ে একসময় প্রশ্ন করল – কি ভাবছ ? নিমাই সচকিত হল - ভাবছি। ভাবছি এবার বোধহয় আমার সংসারের বন্ধন কেটে বেরিয়ে পড়বার সময় এসেছে। তোমরা আমায় মিছে মায়ার বাঁধনে বেঁধে আমার সাধনাকে বাধা দিও না ।

বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদে ফেলল – সত্যি তুমি সংসার ত্যাগ করবে ? আমি কেমন করে কি নিয়ে বাঁচব বল তা'হলে ?

নিমাই অবিচলিত কণ্ঠে বলল মন শক্ত কর প্রিয়া। হরিকে ডাক। হরিই তোমায় শান্তির পথ দেখিয়ে দেবেন। জানো প্রিয়া, আমার মনে হচ্ছে সত্যকে আমি খুঁজে পাবই । এই গলিত শবের মত পোকা ধরা হিন্দু সমাজকে আমার নতুন পথ দেখাতে হবে। আমি জানি হরির সৃষ্ট মানুষই সব চেয়ে বড়। মানুষকে ঘৃণা করলে হরির প্রেম কেমন করে পাওয়া যায় বল। বিষ্ণুপ্রিয়া উত্তর দিল না। কেঁদেই চলল ।

রাতে গাছপালার ওপর আস্তগামী চাঁদটা যখন নেমে এসেছে, শেষ শরতের আকাশে হৈমন্তী কুয়াশার মায়াজালে আবছা হয়ে জ্বলছে তারার আলো, স্নিগ্ধ করুণায় নিমাইর অন্তর ভরে গেল। ধীরে ধীরে স্ত্রীর কপালে হাতের স্পর্শ দিয়ে নিমাই ডাকল – 'প্রিয়া, ওঠ। আর ঘুমিও না ।'

ঘুম ভেঙে ব্যাকুল উদ্বেগ নিয়ে উঠে বসল বিষ্ণুপ্রিয়া – কি ? কি হয়েছে ? নিমাই মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়াল আমায় বিদায় দাও প্রিয়া। আমি চললাম । আর মাকে দেখো ।

বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদল না। স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর গড় হয়ে স্বামীর পদযুগল স্পর্শ করে প্রবল শক্তিতে নিজেকে সম্বরণ করে উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক তাকিয়ে রইল স্বামীর আলোক উদ্ভাসিত মুখে। অদ্ভুত যান্ত্রিকতায় বলল - এসো ।

নিমাই এক পা এগিয়ে এক পলক দাঁড়াল। বলল - হরি সকলের সহায় ।

ঘরের কপাট খুলে দিল বিষ্ণুপ্রিয়া। নিমাই ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে উঠোন পার হয়ে বেরিয়ে গেল। ঘরের দরজা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে নিস্তব্ধ বিষ্ণুপ্রিয়া দাঁড়িয়ে রইল পাষাণ মূর্তির মত ।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল বোধহয় তার জ্ঞান নেই। সহসা শচী দেবীর ব্যাকুল কান্নায় তার চেতনা ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে যেন তার পায়ের নীচের মাটি সরে গেল । অস্ফুটে উচ্চারণ করল,

- তিনি চলে গেছেন মা। কথা ক'টি উচ্চারণ করেই অচেতন হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল বিষ্ণুপ্রিয়া ।

আট

আশ্বিনের মিষ্টি রোদ ছড়ান বিকেলে মেহেরপুরের মেঠো রাস্তা দিয়ে একখানা গরুর গাড়ী চলেছে। বেলা বেড়েছে কিন্তু রৌদ্রে উত্তাপ নেই। শস্যকাটা মাঠে ঝাঁক বেঁধে নেমেছে শালিক ঘুঘু হরিয়াল ।

গাড়োয়ান গাড়ী চালাতে চালাতে গান ধরেছে -

ও আমার পীর মুর্শিদ

সত্যপীর তোমাদের দোহাই

আহা পরমায়ু দেও হুসেন শাহকে

সে যে সবারই ভাই ।

আহা সোনার বংগাল

বানাইল সে তার যে

জুড়ি নাই ।

আরে তারই কৃপায়

বং থেকে বাংলা

দুঃখী আমরা পেট ভরে

ভাত খাই ।

গাড়ীর সোয়ারী একটি পুঁথি পাঠে অভিনিবেশিত ছিল। আরোহীর পরনে খাটো ধুতি আর উড়ানী। গাড়োয়ানের গানে আকৃষ্ট হয়ে সে মুখ তুলে তাকাল –

গাড়োয়ান ভাই, তুমি তো চমৎকার গান গাও । এ গান শিখলে কোথায় ?

গাড়োয়ান গান থামিয়ে হাসল – কেন গো, এ গান হাটে মাঠে সবাই গায়। সেবার সত্যপীরের মেলায় যে কবিওয়ালদের গান হয়েছিল, সেখান থেকেই তো এ গান সবাইর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল ।

আরোহী উৎসুক প্রশ্ন করল - তা সুলতানকে তোমরা সবাই বড় ভালোবাস তাই না ?

ভালোবাসব না কর্তা ! বলছেন কি আপনি ! এমন দরদী সুলতান কি কেউ দেখেছে এ দেশে ! এমন সুখ-শান্তি তো দেশের গরীব দুঃখীরা শ'বছরেও পায়নি। আহা শত বছর পরমায়ু হোক আমাদের সুলতানের। সত্যপীরের দরগায় আমরা তার নামে মানত করি গো ।

আরোহী সৌম্য হাসল – সত্যি বলেছ বটে। এ দেশের মানুষের এত স্বাধীনতা এমন সম্মান আর কখনও বোধহয় হয়নি। এই যে হিন্দু-মুসলমান কেউ কাউকে হিংসে করছে না। একসাথে সত্যপীরের মানত করছে। পাঁচালী গাইছে। এমন সম্প্রীতি সত্যি আশ্চর্য। তা কতদূর এলে গো ? গৌড়ে পৌছতে আর কত প্রহর লাগবে ।

গাড়োয়ান গরু দুটোকে তাড়া দিয়ে গতি বাড়িয়ে বলল আর বেশি দূর নয় গো, বরেন্দ্রর সীমানা তো পেরিয়ে এলাম। তা আপনি বুঝি সুলতানের সভায় চলেছেন ? কর্তার কি গান টান বাঁধা হয় না কি ?

আরোহী মৃদু হাসল—আমি একজন কবি। তা গান বাঁধি বলতে পারো । টোলের পণ্ডিত ছিলাম। গানও লিখতাম। সবাই বলত পরমেশ্বর গায়েন। সুলতানের কৃপায় আজ আমি গাঁয়ের কোণ থেকে রাজসভার কবি হয়েছি।

তোমরা তো শুনেছ সুলতান আদেশ করেছেন সব বিদ্বান কবি লেখকদের ফারসী আর সংস্কৃতে যত পুঁথি-পত্তর আছে সব বংগাল ভাষায় অনুবাদ কর। যেন একটা নতুন প্রাণের সাড়া জেগে গেছে ।

পরমেশ্বরের সব কথা বোধকরি গাড়োয়ানের বোধগম্য হল না। শুধু সে বুঝল বংগাল ভাষায় বিস্তর পুঁথিপত্তর লেখা হচ্ছে। মনটা তার ভারী খুশী হল। খুশী ভরা কণ্ঠে বলল – তা'ছাড়া দেশের মানুষের ওপরই দরদ কত। বিনা পয়সার দাওয়াখানা করে দিচ্ছে এখানে সেখানে। কত মাদ্রাসা মক্তব টোল বসিয়েছে।

বিনা পয়সায় সেখানে সবার ছেলেপুলে লেখাপড়া শিখতে পারবে। গরীব চাষী তাঁতী সবাইকে ভাতা দিচ্ছে। যাতে সবার উন্নতি হয়, দেশের দশের উন্নতি হয় ।

গাড়োয়ান আবার গান ধরল ।

সন্ধ্যা নাগাদ গাড়ী এসে পৌছল গৌড় নগরীতে। সুদৃশ্য হর্য্যরাজি মসজিদ মন্দির বিপণীকেন্দ্র সুশোভিত গৌড় নগরী বিশাল সুবিস্তৃত বংগাল দেশের প্রাণকেন্দ্র। আজ সুলতানের সভায় বিশেষ উৎসব। জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতদের আজ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। সেই উপলক্ষে আজ নগরী অপরূপ আলোকসজ্জা সজ্জিত। তা'ছাড়া উৎসবের আরেকটা বিশেষ কারণ আছে। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খান মগ উৎপীড়িত চাটিগ্রাম (চট্টগ্রাম) করায়ত্ত করে সেখানে শান্তি ফিরিয়ে এনেছে।

উৎসব কোলাহল মুখরিত নগরী সুলতানের বিজয়ধ্বনিতে মুখরিত। দলে দলে কবি-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী-কলাবিদ পরিবৃত হয়ে সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ বেরিয়ে এলেন রাজসভা থেকে। বাইরে এসেই রাজপথে দরাজ গ্রাম্যসুরে গানের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সুলতান থেমে পড়লেন। দেহরক্ষী কেশব ছত্রিকে ডাকলেন কেশব।

কেশব এগিয়ে এল – ফরমায়েশ করুন জনাব।

- কে গান গায় দেখে এসো তো ?

কেশব আরো দু'জন রক্ষী নিয়ে এগিয়ে গেল পথের দিকে।

সুলতানের সঙ্গে সেই গরু-গাড়ীর আরোহী কবি পরমেশ্বরও ছিল। সে সামনে - এল।

- এ কণ্ঠস্বর আমি চিনি জনাবেওয়ালা ।

— কে বলুন তো।

— লোকটি একজন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান। ওর গাড়ীতেই আমি আজ গৌড়ে এসেছি। একবার ডেকে এনে শুনুন ওর গান, এ গান না কি এ দেশের সবার খুবই প্রিয় ।

ইতোমধ্যে কেশব ছত্রির সঙ্গে গাড়োয়ান এসে উপস্থিত ।

সুলতান তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন ।

তুমি গান গাইছিলে ?

সসংকোচ গাড়োয়ান উত্তর দিল,

- গাইছিলাম জনাব ।

- কি নাম তোমার ?

- ওসমান বিশ্বাস ।

পড়ালেখা কিছু জানো ?

বিনয়ে সংকোচে অবনত হল গাড়োয়ান ওসমান ।

- তা' ছেলেবেলায় মক্তবে ওস্তাদজীর কাজে কিছু আরবী ফারসী হরফ শিখেছিলাম । বাপজান তো বেশী পড়তে দিলেন না। বললেন ...

সুলতান হেসে ওসমানকে থামিয়ে দিলেন,

– ঠিক আছে। তুমি তোমার গানটা শোনাও দেখি সবাইকে ।

ওসমান চত্বরের ওপর বসে পড়ল। একটু ইতস্তত করে গান ধরল -

ও আমার পীর মুরশিদ

সত্যপীর তোমাদের দোহাই –

আহা পরমায়ু দেও হুসেন শাহকে

সে যে সবাইর ভাই ।

আরে তারই কৃপায়

দুঃখী আমরা পেট ভরে

ভাত খাই ।

রাজপথের ভীড় এসে চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়াল। সমবেত সকলে যেন ওসমানের গান শুনতে শুনতে আলোকোজ্জ্বল নগরী ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তে মাঠঘাট নদী প্রান্তরে হৃদয়ের আনন্দ ধ্বনি শুনতে পেল। যেন সারা বংগাল দেশ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের জোয়ারে ভেসে গেল ।

আর সেই সমৃদ্ধির জোয়ারের সঙ্গে একদিন আরেক জোয়ারের তীব্র স্রোত প্রবল বেগে ধেয়ে এল।

ভক্ত পরিবৃত শ্রীগৌরাঙ্গ সত্যের সন্ধান নিয়ে গেয়ে উঠলেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য'।

এই শ্রীগৌরাঙ্গ আর কেউ নন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী নিমাই। তাঁর প্রচারিত ধর্ম বৈষ্ণব মতবাদ' ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত দিকে দিকে গ্রামে প্রান্তরে নগরে। একদিকে সুফী দরবেশ আউলিয়াদের মতবাদ আর হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত বিশ্বাসের রূপ 'সত্যপীর' বংগালের ধর্মীয় জীবনেও বয়ে আনল নতুন ধারা।

শান্তির স্নিগ্ধতায়, জ্ঞান চর্চার উদারতায় স্থাপত্য কলাশিল্পের উৎকর্ষে আর মানববাদী উদ্দীপ্ত হয়ে আলোকিত হল হুসেন শাহের বংগাল। নদীবিধৌত সোনার বংগাল ।

অষ্টম অধ্যায়

এক

স্বর্ণপ্রসবিনী দেশ বংগাল। মণিমুক্তা হীরা জহরতের দেশ বংগাল । পান্না চুনীর ঝলক বিকিরিত দেশ বংগাল। সম্পদ সম্ভারপূর্ণ সাগর বণিকদের স্বপ্নের আকর্ষণের দেশ বংগাল ।

সুদূর উত্তর-ভারতের মণিমাণিক্য খচিত সিংহাসনে বসে আতর গোলাপ সুরভিত গোঁফ মুচড়ে আয়েশী শানদার মোঘল বাদশাহরা বলেন, মাটির দেশ তো নয় বংগাল, ও হল জান্নাত-উল বেলাত । অর্থাৎ দুনিয়ার বেহেস্তী সুখখানা।

তাঁদের যুদ্ধবাজ সেনাপতিরা কারুকার্যখচিত অসিকোষে আঙ্গুলের স্পর্শ দিয়ে অসহিষ্ণু কণ্ঠে উচ্চারণ করে 'বুলাখ খানা' বংগাল। অর্থাৎ বিদ্রোহীদের আড্ডাখানা বংগাল দেশ।

আর আরব, দিনেমার, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ফরাসী, আর্মেনিয়ান জলপথ স্থলপথ অতিক্রমকারী নাবিক আর বণিকেরা বলে অতি আশ্চর্য সম্পদের দেশ বেঙগলা। দেশ তো নয় যেন মায়াবিনী যাদুকরী। তাতে একবার প্রবেশ করলে আর বেরিয়ে আসা যায় না। এর পণ্যের সম্ভার বণিকদের নেশায় পাগোল করে দেয়। কোনটা ফেলে কোনটায় চোখ রাখবে তুমি।

সারা জাহানের সারা দেশ এই বংগালের সম্পদই সারা দুনিয়ার হাটে বাজারে হিন্দুস্থানী সম্ভার নামে পরিচিত ।

মোগল বাদশহরা সেদিকে শেয়ানা। শেষ হেমন্তের কুয়াশার মত যে রেশমী কাপড় মসলিন, সোনার চেয়েও যা দামী, একটি আংটির ভেতরে পুরো কাপড়খানা গলিয়া দেওয়া যায়, সেই স্বপ্নসদৃশ মহার্ঘ বস্তুর জন্য সারাটা দুনিয়া পাগোল, পৃথিবীর অভিজাত সমাজে যার এত কদর তা কেন বংগাল দেশের নামে পরিচিত হবে। সারা দুনিয়া জানুক এটা হিন্দুস্থানের সম্পদ। আর বংগালের নীল ! এমন নীল তামাম জাহানে কোথাও কি পাওয়া যায় ? বংগালের লবণ সে তো সোনার চেয়ে দামী। তাছাড়া এর শঙ্খ সোনা রূপা তামা কাঁসার ওপর নক্সা তোলা কাজ। ছাঁচে ফেলা পোড়া ইটের নক্সা, এমনটি কোন দেশে আছে ! এ দেশকে তো কব্জায় রাখতেই হবে।

কিন্তু রাখতে চাইলেই কি রাখা যায় ? স্বর্ণ ময়ূরীর পেখম বিস্তারে হাজার নীলার ঝলক দেয় বটে কিন্তু তার নখরের বিস্তার বিষধর সর্পের মত শত্রুকে করে ছিন্ন- ভিন্ন। ওই কোমল মাটির বুকে কোথায় যেন আছে স্বাধীন সত্তার অস্তিত্ব। বিদ্রোহে বার বার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সে। সে কম্পনে সুদূর দিল্লীর শাহী মসনদ টলমলিয়ে ওঠে। যুদ্ধপটু সেনা-নায়কদের বার বার ছুটে আসতে হয় সুবা-ই- বংগালের বিদ্রোহ দমাতে। তা না হলে যে প্রমাদ। বিশাল মোঘল সেনাবাহিনী যাকে দিয়ে সাম্রাজ্যলোভী বাদশাহরা সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তার করে চলেছে তার রক্ষণাবেক্ষণের মোটা রসদ আসবে কোথা থেকে। সুবা-ই-বংগাল ছাড়া এত টাকা তো খুব কম সুবা থেকেই আসে। অতএব, কামধেনু স্বর্ণদায়িনী দেশ বংগাল, বেহেস্তখানা বংগাল বিদ্রোহে যত মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক না কেন, তাকে হাত ছাড়া করে কোন বেবুঝ বুবরাক !

বিদ্রোহে টলমল বংগাল। কিন্তু সে বিদ্রোহের পুরোভাগে রয়েছে আফগান শক্তি। তিনশ' বছর হিন্দুস্থানে যে তুর্ক আফগানরা শাসনযন্ত্র হাতে রাখায় গৌরবান্বিত ছিল। তাদের শক্তির মোকাবেলায় এল মোংগল শক্তি। যুদ্ধে পরাজিত বিতাড়িত পাঠানরা এসে ঘাঁটি পাতল নদী নালার দেশ বংগালে। আর এই দুর্ভেদ্য জলাকীর্ণ দেশে এসে মোংগল বিরোধিতায় উদ্ধত হয়ে মাথা তুলল আফগান শক্তি ।

বিশেষ করে কয়েকটি পরিবার লোদী আর লোহানীর দুর্গ গড়ে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি প্রস্তত করল মোঘলদের বিরুদ্ধে ।

কিন্তু বাংলার মানুষের পরিবর্তন নেই।

- বিশাল মোঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু দিল্লী। ঐশ্বর্যে জ্ঞানের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। বাদশাহ মহামতি আকবরের দু'জন সভাসদ নীম্ন কণ্ঠের আয়েসী আলাপে মগ্ন কথা বলছেন আবুল ফজল আমার মনে হয় বংগাল দেশের ঝামেলাটা না মিটলে সম্রাট আর নিশ্চিত মনে বসতে পারবেন না ।

- টোডরমল্ল একটু ঠোঁট মুচড়ে হাসলেন - আরে রাখুন আপনার বংগাল। পুঁটি পান্তা খাওয়ার জাত। দু'বার কামান দাগলেই কুপোকাৎ। বিপদ তো হল যে এমন এক জঘন্য দেশ ! দুনিয়ার বন বাদাড় আর নালায় ভরা। তা না হলে কবে ওদের ঠাণ্ডা করে দেওয়া যেত !

আবুল ফজল কিন্তু হাসলেন না। গম্ভীর চিন্তিত কণ্ঠে বললেন- যত আফগানী

পাঠানরা তাড়া খেয়ে আড্ডা গেড়েছে বংগালে। ওরা যে যোদ্ধার জাত তাতে কোন সন্দেহ নাই । তবে আমার কি মনে হয় জানেন ?

- কি মনে হয় ? ভ্রূ বাঁকিয়ে গোঁফে তা দিলেন টোডরমল্ল ।

- মনে হয় বংগাল সম্বন্ধে আমাদের নীতি পরিবর্তন করা দরকার।

- কি রকম ?

- এই যে বংগাল দেশের লোকদের আমরা নীচু চোখে দেখে থাকি । এদের কোন উঁচু সরকারী কর্মচারী পদে নেওয়া হয় না। সেনাবাহিনীতে বংগালদের ভর্তি করা নিষিদ্ধ। এটা বোধহয় ঠিক নয়। এতে বংগাল সেনাদের অনায়াসে দলে টানছে পাঠান বিদ্রোহীরা ।

টোডরমল্ল একটু বিরক্ত হলেন – আপনি এমন বিদ্বান লোক হয়ে এমন অবুঝের মত কথা যে কি করে বলেন বুঝতে পারি না। চিরকালের ছোট জাত বংগাল। রাজপুত মারাঠা জাঠ মোংগলদের সঙ্গে ওদের তুলনা করা চলে ? আর আফগানদের কথাই বা তুলছেন কেন। সুলায়মান কররানীর ছেলে দাউদ কররানী খুব তো মাথা চাড়া দিয়ে হাঁক ছেড়েছিলে সম্রাট আকবরের কর্তৃত্ব মানি না। কিন্তু কি করতে পারল বাছাধন। রাজমহলের যুদ্ধে একেবারে স্বর্গ প্রাপ্তি। সুবা-ই-বংগালে আর কার সাহস আছে মোঘলদের বিরুদ্ধে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

আবুল ফজল বাধা দিলেন থামুন থামুন। অত উত্তেজিত হবেন না । বংগালদের অত ছোট করে দেখবেন না। জানেন তো বাদশাহরা বংগালের নাম দিয়েছে, ‘জান্নাত-উল-বেলায়েত' (ভূস্বর্গ) তা কি এমনিই। বংগালদেশে বাণিজ্য করবার জন্য বিদেশী বণিকেরা বাজের মত চোখ মেলে রয়েছে। নজরানায় ভরে দিচ্ছে বাদশাহর দরবার ।

টোডরমল্ল বিরক্ত হরেন - আরে রাখুন রাখুন। বাদশাহের খাজাঞ্চীখানায় যেন সোনা দানা আশরফীর কিছু কমতি আছে ।

আবুল ফজল মৃদু হাসরেন রাজা টোডরমল্ল ! এই দিল্লী আগ্রা ফতেপুরের রইসদের দেখে আর শাহী দরবারের চটকে আপনার মথার কিছুটা গোলমাল হয়েছে। রইস নয় একবার মানুষের কথা ভাবুন। এদিকে বাদশাহ তো ফিরিঙ্গী পর্তুগীজদের বংগালে ব্যবসা করবার সনদ দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে

তারা কি করছে জানেন...।

বেলা দ্বিপ্রহর। শরতের নীল আকাশের প্রতিবিম্ব বুকে নিয়ে নীলাম্বরী শাড়ীর মত ঝলমল করছে সাগর। সাদা কাশ ফুলের মত শুভ্র ফেনিল ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস এসে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে সোনাদ্বীপের (সন্দ্বীপ) বালুকাময় তটে। সাগরের বালুকাকীর্ণ তট ছাড়িয়ে ঘাসের আবরণ ঢাকা নাবাল জমিতে সুপুষ্ট গাভী মহিষ ছাগলের পাল চরে বেড়াচ্ছে।

মহেশ মাঝি বসে বসে নৌকায় গাব আলকাতরা মাখাচ্ছিল। আর গুন গুন করে গান গাইছিল । দিনটা আজ সত্যি সুন্দর আর উজ্জ্বল। স্বচ্ছ আকাশের কোণে কোণে হালকা মেঘের আঁচড়। দূরে চাটিগ্রামের ঘন সবুজ বনাচ্ছন্ন পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে। মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বেলে হাঁস কলরব করতে করতে উড়ে গেল। মহেশের বারো বছরের ছেলে চনডু বাবাকে কাজে সাহায্য করতে করতে সেদিকে তাকিয়ে বলল - দেখেছ বাবা, এবার শীত না আসতেই পাখীর ঝাঁক আসতে শুরু করেছে। আমি কিন্তু এবার ফাঁদ পেতে অনেক পাখী ধরব। হাটবারের দিন মগদের কাছে বিক্রী করব ।

মহেশ মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে করতে বলল হুঃ। যত আজগুবী কথা। জেলের ছেলে । কোথায় সাগরে যাবে। মাছ ধরবে। শুঁটকী দেবে তা না বেদেদের মত পাখী ধরবার শখ ।

চনডু উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। মনটা তার ওই উড়ন্ত হংস বলাকাদের সঙ্গে কোথায় যেন উড়ে যেতে চায়। এমনিই হয় তার। সোনাদ্বীপের বন্দরের জাহাজ ঘাঁটে যখন দূর দূরান্ত থেকে জাহাজ এসে ভিড় জমায়, তখন জাহাজ ঘাটায় বসে এমনি উদাসীনতা অনুভব করে। ঘাট প্রহরীর কাছ থেকে সে জানতে পারে কোন্ জাহাজটা কোন্ দেশ থেকে এল। বিচিত্র সে সব দেশের নাম রোসাঙ্গ, সুমাত্রা, জাভা, যবদ্বীপ, লংকাদ্বীপ, চীন, আরব, আফ্রিকা – পর্তুগাল, দিনেমার, আরমেনিয়া – নাম তো নয় যেন এক ঝাঁক উড়ন্ত বলাকার পাখার মায়াবী হাতছানি। চনডু অবাক হযে ভাবে কেমন সে সব দেশ। সুনীল সাগর পেরিয়ে আসা জাহাজগুলো যেন বিচিত্র অদৃশ্য ভাষায় চন্ডুকে ডাকে ।

হাটবার দিন চনডু কিন্তু বেচাকেনা দেখবার জন্য হাটে যায় না। বিচিত্র সম্ভারপূর্ণ সোনাদ্বীপের হাটে মহার্ঘ সম্পদের কেনাবেচার মধ্যে অবাক হয়ে

বিদেশী বণিকদেরই দেখে। কারো গায়ের রং লাল টকটকে। টিয়া পাখীর মত বাঁকানো নাক । আপাদলম্বিত আলখাল্লা । মাথায় সাদা রুমাল ।

কেউ কুচকুচে কালো। মাথার চুল আশ্চর্যরকম কোঁকড়া। কারো চামড়া হলদে। চোখ দুটো অসম্ভব ছোট। সবচেয়ে ভালো লাগে ফিরিঙ্গী বণিকদের। কেমন জুতো, জামা, কেমন সোনা রঙের চুল। আর ওই চ্যাপ্টা মুখ মগগুলোকে চনডুর কেন যেন ভালো লাগে না ।

মহেশ তাড়া দিল – হা করে বসে আছিস কেন ? হাত চালা ।

চনডুর কিন্তু কাজে তেমন মন লাগে না। বালির উপর ভেঙে পড়া নীল ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে উন্মনা কণ্ঠে বলল – আচ্ছা বাবা, ওই যে হাটের কাছে 'জেসুইট ফিরিঙ্গী' পাদরীরা গীর্জা তৈরী করেছে ওখানকার ফিরিঙ্গী সাহেবগুলো কিন্তু বড় ভালো । একটুও ঘেন্না করে না'। গেলে কি যে ভালোবাসে ।

মহেশ মুখ খিঁচিয়ে উঠল – খুব ভালোবাসে ! ওঃ কি আমার ভালোবাসারে। চুপ কর হতচ্ছাড়া পাজী। ফের ওদের কথা মুখে এনেছিস তো মজা টের পাবি ।

হঠাৎ সাগরের দিকচক্রবালে একসারি জাহাজের রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। সেদিকে চোখ রেখে চনডু চীৎকার কর উঠল - দেখো বাবা । দেখো একসার জাহাজ আসছে। কোন্ দেশের জাহাজ ওগুলো ?

মহেশ হাতের কাজ ফেলে ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠা জাহাজের সারির দিকে তাকিয়ে রইল। ইতিমধ্যে মহেশের পনেরো বছরের মেয়ে কাঞ্চি মহেশের খাবার নিয়ে এলে ।

মাথার ওপর থেকে খাবারের থালা নামাতে নামাতে কাঞ্চি বলল- নতুন জাহাজ এল বুঝি রে চনডু ?

চনডু মহা উৎসাহে বলল - হ্যাঁরে দিদি ! চল না, বাবার খাওয়া হয়ে গেলে " আমি আর তুমি জাহাজ ঘাটায় গিয়ে একবার দেখে আসি ।

কাঞ্চিও উৎসাহিত হল। উজ্জ্বল মুখে মহেশের দিকে তাকিয়ে বলল সত্যি বাবা যাব ? মেয়েটিকে মহেশ বড় আদর করে। তার সরল ডাগর চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল মহেশ – পাগলী আমার। চনডুর মত তুইও ক্ষ্যাপা

হয়েছিস।

কাঞ্চি মুখ ভার করল বাবা ! তুমি আমায় এমন যা তা বললে আমি আসব না কিন্তু বলে দিচ্ছি !

মহেশ হেসে ফেলল, তারপর কোমল কণ্ঠে বলল – যা। আর রাগ করতে হবে না । তবে বেশী ভীড়ের মধ্যে যাস না আবার ।

কাঞ্চি চনডুর হাত ধুরে খুশী কণ্ঠে বলল নে চনডু চটপট ভাত খেয়ে নে। বাবার খাওয়া হলেই আমরা ছুটে যাব জাহাজ ঘাটায় ।

দুই

দুপুরের রৌদ্রালোকে হীরকখচিত বঙ্গোসাগরের বুকে বুঝি তখন আরেক প্রহসন। রোসাঙ্গ (আরাকান) রাজ্যের যুদ্ধ জাহাজগুলো অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হিংস্র হাঙ্গরের মত জল কেটে কেটে অগ্রসর হচ্ছে সোনাদ্বীপের দিকে। সম্পদে ঐশ্বর্যে গৌরবে ঝলমল সোনাদ্বীপ। এমন স্বর্ণখণ্ড বিদেশী অর্থগৃধ্ন শকুণীকে তো আকর্ষণ করবেই । সুদূর দিল্লীর মসনদে বসে মোঘল বাদশাহ প্রান্তসীমার দেশে বিদেশীদের বাণিজ্য কবার সনদ দিয়ে নিশ্চিত। কিন্তু নিশ্চিত কি ? বিদ্রোহী বংগালের নাম তখন বারো বংগাল। ভাটির বিদ্রোহী বারোজন ভূস্বামী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে মোঘল আধিপত্যের বিরুদ্ধে। এই স্থানীয় হিন্দু রাজা আর পাঠান জমিদারদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে মোঘল সেনাবাহিনী ক্লান্ত। ভাটি বংগালের আবহাওয়ায় মোঘল সেনারা অতিষ্ঠ। কিন্তু তাতে কি হবে ! সম্রাটের আদেশ ভাতা বাড়িয়ে দাও বংগালের সেনাবাহিনীকে। বারো ভূঁইয়াকে যে দমাইতেই হবে। স্বর্ণহংসী বংগালকে কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। যতদিন যুদ্ধ করতে হয় চলুক যুদ্ধ। ওমরাওরা মাথায় হাত দিয় আফসোস করে, আহ্, কেন যে সম্রাট আকবর পর্তুগীজদের কুঠি তৈরী করবার অনুমতি দিয়েছিলেন বংগালে। এ তো খাল কেটে কুমীর আনা। যত পর্তুগীজ ফেরারী আর জলদস্যু এসে আস্তানা গেড়েছে সেখানে এই সুযোগে। আর যুদ্ধপটু এই পর্তুগীজদের সাহায্যে বারো ভূঁইয়ারা মোঘল সেনাবাহিনীকে বারবার হটিয়ে দিচ্ছে। ওদিকে চাটিগ্রাম সোনাদ্বীপ তো হাত বদল হয়েই চলেছে। একবার দখল করেছে ভুলুয়ার রাজা। একবার কেড়ে নিচ্ছে আরাকানরাজ। উঃ কি ঝঞ্ঝাট আর জঞ্জালের দেশ। কিন্তু মোঘল শক্তিই বা কম কিসে। কোষমুক্ত তরবারী হাতে তুলে নিলেন শাহজাদা সেলিম। বুলখখান বংগালের দফা

করতে হবেই ।

জাহাজঘাটার পথে চনডু আর কাঞ্চি ছুটে চলছিল। গীর্জার পাশ দিয় যাবার সময় একজন পথ আগলে দাঁড়াল। বিদেশী টানা উচ্চারণে ডাকল – কাঞ্চি !

থমকে দাঁড়াল কাঞ্চি। গীর্জার দেওয়ালের পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণ যুবা।

কাঞ্চি অস্ফুটে বলল – সিলভেরিয়া তুমি !

পর্তুগীজ নাবিক সিলভেরিয়ার ঠোঁটে হাসির ঝিলিক দিল। সে হাসিতে কাঞ্চির বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। সাগরের উদ্দাম হাওয়ায় সিলভেরিয়ার সোনালী চুল উড়ে কপালে এসে পড়েছে। সাগরের মত চোখের তারায় নীলের মুগ্ধচ্ছটা। লালচে তামাটে গায়ের রং অপরাহ্ণের রৌদ্রে আগুনের আভা বিকিরণ করছে যেন ।

চনডু বোনের কানের কাছে মুখ ফিসফিস করে প্রশ্ন করল- ফিরিঙ্গী লোকটা তোর নাম জানল কেমন কর রে দিদি !

কাঞ্চির গালে লালছে আভা ধরল। চনডুর হাতটা ঝাড়া দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল- 'জানি না যা।' তারপর একটু থেমে বলল – তুই এগিয়ে যা চনডু। আমি আসছি।

চনডুর নতুন জাহাজ দেখবার নেশায় মন চঞ্চল। দিদির ব্যবহারের ভাবান্তরের দিকে লক্ষ্য করবার তার অবসর নেই। ছুটে চলে গেল চনডু।

সিলভেরিয়া ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল কাঞ্চির পাশে। গভীর কণ্ঠে ডাকল কাঞ্চি!

কাঞ্চির ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। কালো চোখে অনুরাগের আভা ছড়িয়ে সিলভেরিয়ার দিকে দৃষ্টি তুলল সে।

সিলভেরিয়া হেসে ফেলল – আমায় তুমি এখনও ভয় পাও কাঞ্চি ? কাঞ্চি দৃষ্টি নত করল। সিলভেরিয়া কাঞ্চির কাঁধে একটা হাত রাখল – কি কথা বলবে না ? আমাকে বিশ্বাস হয় না বুঝি ?

এবারে মুখ তুলল কাঞ্চি – কি করে বিশ্বাস করব ! তুমি যে বিদেশী। আজ তোমার জাহাজ এখানে আছে। কালই হয়তো আবার ভেসে যাবে কোন দূর

দেশে ।

ঝকঝকে উজ্জ্বল হাসল সিলভেরিয়া, কাঞ্চির হাতটা ধরে একটু আকর্ষণ করল হরিণী নয়না ! তোমার দুই চোখে হাজার সাগরের হাতছানি, সাগর যেমন সারাক্ষণ হাতছানি দিয়ে ডাকে, পাগাল করে তোলে। তোমার ওই চোখের সাগর আমাকে তেমনি পাগোল করেছে। ওই চোখের নেশার আকর্ষণ ছেড়ে আমি কোথায় যাব বল ।

কাঞ্চি হেসে ফেলল তুমি এমন সুন্দর করে কথা বলতে পার। আচ্ছা সিলভেরিয়া, তোমরা তো খ্রীষ্টান। তোমাদের জেসুইট পাদরীরা আমাদের বলে প্যাগান। আমরা নাকি অন্ধকারে আছি। আমি যদি খ্রীষ্টান না হই তাহলে তো তুমি আমায় নিয়ে ঘর বাঁধতে পারবে না ?

সিলভেরিয়া কিছুক্ষণ উন্মনা হয়ে তাকিয়ে রইল দূরে যেখানে নীল সাগরের ফেনিল ঢেউগুলো ক্রমাগত বালির তটে প্রবল গর্জনে আছড়ে পড়ছে। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল কাঞ্চির দিকে আমি, ধর্মযাযাক নই, লিবসন থেকে পোপের আদেশ নিয়ে টেগাস নদীতে জাহাজ ভাসাই নি। তা'ছাড়া আমি সেনানায়কও নই । এই সোনদ্বীপে পর্তুগীজরা যে সব দুর্গ তৈরী করেছে কুঠি বানাবার নামে, আমি তাদেরও লোক নই। আমি একজন নাবিক মাত্র। জাহাজে ভেসে ভেসে দেশদেশান্ত রের বন্দরে ঘুড়ে বেড়াই। আমাকে কি ভয় বল ? তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। ঘরের নেশা আমায় ডেকেছে। তোমাকে নিয়ে আমি এই সোনাদ্বীপেই ঘর বাঁধব। শুধু তুমি আমায় বিশ্বাস কর কাঞ্চি ।

সিলভেরিয়ার বুকে মাথা রেখে কাঞ্চি মুগ্ধপুলকে কোন রকমে উচ্চারণ করল – বিশ্বাস করি। অনেক বিশ্বাস করি।

- কাঞ্চির চুলে ঠোঁটের স্পর্শ দিয়ে সিলভেরিয়া ফিসফিস করল কাঞ্চি আমার কাঞ্চি ।

চনড়ু ছুটতে ছুটতে এল। ভীত উদভ্রান্ত কণ্ঠে বলল- দিদি। সর্বনাশ হয়েছে। মগদের জাহাজ এসে সোনাদ্বীপ ঘিরে ফেলেছে। ওদিকে দুর্গগুলোতেও কামান গোলা সাজিয়ে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে ।

সিলভেরিয়া সচকিত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দ্রুত ব্যস্ত হয়ে বলল – বাড়ী

চলে যাও কাঞ্চি, আর দেরী করো না। মনে হচ্ছে আরকান রাজ পর্তুগীজদের দমাবার জন্য যুদ্ধবহর পাঠিয়েছে।

কাঞ্চি সভয়ে সিলভেরিয়ার হাত আঁকড়ে ধরল - তুমি কোথায় যাবে সিলভেরিয়া?

সিলভেরিয়া হাসল পালিয়ে যাব না নিশ্চয়ই। আমি জাহাজে যাচ্ছি। তোমরা বাড়ী যাও চনডু-কাঞ্চি ।

দুপুরের সাগরের বুকে যেন ভয়াবহ বাজের ছায়া পড়ল। আরকান রাজ মোঘল নৌবহরের সহায়তা নিয়ে সোনাদ্বীপ আক্রমণ করেছে। পর্তুগীজ প্রাধান্য নির্মূল করবার জন্য শাহজাদা সেলিম চিরশত্রু আরাকান রাজ্যের সঙ্গে একজোট হয়েছে। কারণ পর্তুগীজরা দুর্গ ঘর বাড়ী গীর্জা বানিয়ে শুধু যে পাকাপোক্ত হয়ে বসেছে সোনাদ্বীপে তা নয়, তারা মোঘল সুবাদারের তোয়াক্কা করছে না। বিনা শুল্কে বাণিজ্য তো চালাচ্ছেই। তাছাড়া বিদেশী বণিকদের কাছ থেকেও কর আদায় করছে। এমনকি বাকলায় (সুন্দরবন বরিশাল অঞ্চল) চাটিগ্রামেও তারা হাত বাড়াচ্ছে ।

দুপুর থেকে প্রচণ্ড গোলা বারুদের বর্ষণে সোনাদ্বীপের আকাশ ধোঁয়াটে হয়ে রইল । পর্তুগীজ বাহিনী পিছু হটে ক্রমশ পরাজিত হয়ে জাহাজে উঠে ভেসে পড়ল।

তারপরই শুরু হল অগ্নি সংযোগ আর লুঠপাট ! যুদ্ধজাহাগুলো লবণের গুদাম থেকে লবণ, কাপড়ের গুদাম থেকে কালো রং কাপড় (তৎকালীন বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট ধরনের বস্ত্র), নীল, চাউল, সোরা, রেশম আর বন্দী দাস-দাসীতে বোঝাই হল। মোঘলদের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে রোসাঙ্গ-রাজ এই যুদ্ধলব্ধ বস্তুর অধিকারী হল। এসব দুর্মূল্য বস্তু বিদেশী ওলন্দাজ বণিকেরা খুশী হয়ে কিনে নেবে। আর বন্দী-বন্দিনীরা আরাকানে দাসরূপে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করবে। বংগাল রমণীরা বিক্রি হবে সোনার দরে। উপরন্তু সোনাদ্বীপের বাণিজ্যের শুল্ক এক-চতুর্থাংশ মোঘল সুবেদার তুলে দেবে রোসাঙ্গ রাজের তোষাখানায়।

সিলভেরিয়ার জাহাজে মহেশ তার ছেলেমেয়ে এবং আরো কিছু হিন্দু ও মুসলমান পরিবার উঠে সোনাদ্বীপ ছাড়ল। জাহাজ কিছুদিন সাগরে ঘুরে ঘুরে অবশেষে এক নির্জন দ্বীপে এসে থামল ।

সিলভেরিয়ার জাহাজ যখন কূলে ভিড়ল তখন সন্ধ্যা আসন্ন। আজ দু'দিন

আকাশ ঘোলাটে মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের রং সীসার বর্ণ ধারণ করল। সেই সঙ্গে এলমেলো ঝাপটার বাতাস বৃষ্টি কণা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়র মসীবর্ণ সাগরের বুকে। এক জাহাজ লোকের মুখ কালা হয়ে উঠল মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত। দ্বীপের অধিবাসী তারা, আকাশের এ চেহারা সাগরের সর্বনাশা ক্ষ্যাপামী তাদের অজানা নয় ।

চিন্তিত মুখে মহেশ এসে দাঁড়াল জাহাজের পাটাতনের পুরোভাগে সিলভেরিয়ার পাশে। সিলভেরিয়া চোখে লম্বা কাঠের দূরবীক্ষণ লাগিয়ে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে তাকিয়েছিল দূরের বনাকীর্ণ স্থলভূমির দিকে ।

মহেশ বিমর্ষ চিন্তিত কণ্ঠে বলল— ঝড় আসছে ফিরিঙ্গী সাহেব। দেখেছ সাগরের দিকে তাকিয়ে ! এখন কি উপায় হবে ?

সিলভেরিয়া ফিরে তাকাল- তাই তো ভাবছি। এক শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেলাম । এখন আকাশের শত্রুতা থেকে রক্ষা পাব কি না কে জানে !

মহেশ আরো বিমর্ষ হল- সাগরের জেলে আমরা। আকাশের রং আর হাওয়ার গতি দেখেই বলে দিতে পারি যে বান আসবে, এখন কি হবে সাহেব ?

সিলভেরিয়া ম্লান হাসল - দেখা যাক কি হয়। তবে মনে হচ্ছে এ রাত করে মাটিতে নামার চেয়ে জাহাজে থাকাই বোধহয় ভালো ।

ইতিমধ্যে বাতাস আরো জোরাল হয়ে উঠল। ফেনিল ঢেউয়ের মাথাগুলো সশব্দ গর্জনে উত্তাল হয়ে দোলা দিল সিলভেরিয়ার জাহাজে।

ক্রমশ নিশ্ছিদ্র কালো অন্ধকারের ডানায় আবৃত হল আকাশ। ক্রুদ্ধ এলোমেলো বাতাসের ঝাপটা আছড়ে পড়তে লাগল জাহাজের মাস্তুলে। এক জাহাজ যাত্রীর শংকিত ত্রস্ততায় চঞ্চল হল। হিন্দু যাত্রীরা প্রাণপণে হরিনাম জপ করতে লাগল। ক্রিশ্চিয়ানরা বুকে ক্রস আঁকল। মুসলমান বয়োবৃদ্ধরা আজান দিতে শুরু করল । রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের গতিবেগ বাড়তে লাগল ।

ঢেউয়ের ঝাপটায় প্রবল উচ্ছ্বাসে জাহাজের পাটাতনের ওপর দিয়ে জলস্রোত বয়ে যেতে লাগল ।

জাহাজের মাস্তুলের ধারে নির্বাক স্তব্ধতায় দাঁড়িয়েছিল সিলভেরিয়া। বাতাসের ঝাপটায় ধাক্কা খেতে খেতে সিক্তবস্ত্র একটি নারীমূর্তি এসে দাঁড়াল তার পাশে।

সিলভেরিয়া চমকে ফিরে তাকাল – এ কি ? কাঞ্চি তুমি ওপরে উঠে এসেছ কেন ? ইস ভিজে যে একাকার হয়ে গেছ। ভয় পেয়েছ কি খুব ?

ভেজা শীতার্ত শরীরে কাঁপতে কাঁপতে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পাখীর মত সিলভেরিয়ার বুকে আছড়ে পড়ল কাঞ্চি ।

- কি হবে সিলভেরিয়া ? আমরা হয় তো কেউ বাঁচব না। আমরা বাতাসের গোঙানীতে কাঞ্চির কণ্ঠস্বর ঢাকা পড়ল ।

প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কায় প্রবল বেগে দুলে উঠল জাহাজ। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে মাস্তুলের অগ্রভাগ ভেঙে পড়ল ।

এক হাতে কাঞ্চিকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটি কাঠের খুঁটি আঁকড়ে ধরে নিস্তব্ধ হয়ে রইল সিলভেরিয়া। যেন এক হাতে সে তার প্রেয়সী আর এক হাতে দিয়ে তার প্রিয় এবং বাঁচার একমাত্র অবলম্বন ধ্বংসমুখী জাহাজটিকে ধরে রাখতে চাইল নিরুপায় নাবিকের শেষ আত্মবিশ্বাস দিয়ে ।

কাঞ্চি সেলিভেরিয়ার বুক থেকে মুখ তুলে বলল – সিলভেরিয়া তোমাকে নিয়ে কোনদিন হয় তো আর ঘর বাঁধতে পারব না। তবে যদি সাগরে ডুবে মরি, দু'জনে যেন এক সঙ্গে মরতে পারি ।

সিলভেরিয়া নিস্তব্ধ হয়ে রইল। ক্রমাগত ঢেউয়ের আঘাতে টলমল করছে জাহাজ। ঝড়ের আঘাতে এক এক করে ভেঙে পড়ছে মাস্তুলের কাঠ। ঝঞ্ঝাবায়ুতে ভিজতে ভিজতে দু'টি দেহ নিবিড় হয়ে ভয়াবহ অনিশ্চয়তার সামনে একই স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনায় যেন মূক হয়ে রইল আসন্ন বিচ্ছেদের মুখোমুখি ।

ঝড়ের তাণ্ডবে শিহরিত হয়ে কাঞ্চি ভেজা ঠোঁটে অস্ফুট উচ্চারণ করল সিলভেরিয়া – অন্ধকারে কাঞ্চির সিক্ত ঠোঁটে ওষ্ঠের স্পর্শ দিয়ে সিলভেরিয়া বলল কাঞ্চি ?

আর সেই মুহূর্তে যেন প্রলয় ঘটে গেল। প্রবল আতচীৎকার ছাপিয়ে সমুদ্রের প্রচণ্ড গর্জন নিষ্ঠুর আততায়ীর মত আছড়ে পড়ল জাহাজের ওপর। সমুদ্রের উত্তাল জলোচ্ছ্বাসে সিলভেরিয়ার জাহাজ মোচার খোলার মত ঢেউয়ের আঘাতে ওলট পালট হতে হতে বিচূর্ণ হয়ে গেল ।

তিন

দেয়াংয়ের (বর্তমান পতেংগার নিকট কর্ণফুলী নদীর অপর পাড়ে আনোয়ারা থানার অন্তর্গত) পর্তুগীজ উপনিবেশের জেসুইট গীর্জার প্রধান যাযক ম্যানরিক গীর্জা সংলগ্ন বাগানের মধ্য ধীরে ধীরে পায়চারী করছিলেন। পর্তুগীজদের আনা পেঁপের চারা আর আনারসের আবাদ এখানে বেশ ভালোই হয়েছে। সকালের উঠতি রোদে পেঁপে গাছের পাতাগুলো ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে যাযক ম্যানরিকের দৃষ্টি যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন কবে এমন সতেজ পেঁপে গাছগুলোর মত এদেশের মানুষের মধ্যে সুদৃঢ় সতেজ প্রভাব বিস্তার করবে যেসাসের পবিত্র ধর্ম। বোধহয় সেদিন আর খুব দূরে নয় যখন এই কর্ণফুলীর ধারে ধারে মাথা তুলে দাঁড়াবে যেসুইট মিশনারীদের গীর্জার সারি। গীর্জার গুরুগম্ভীর ঘণ্টার ধ্বনি এই প্যাগান বৌদ্ধদের ঘণ্টার শব্দ, হিন্দু মন্দিরের পূজার বাজনা আর মুসলমান মসজিদের আজানের শব্দকে ম্লান করে দিয়ে সগৌরবে ভেসে বেড়াবে নদীবক্ষের সান্ধ্য বাতাসকে পবিত্র করে ।

অন্যমনস্ক চিন্তামগ্ন ম্যানরিক খেয়াল করলেন না তাঁর পাশে একজন দীর্ঘকায় পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে।

- সুপ্রভাত ফাদার ম্যানরিক ।

ম্যানরিক মুখ তুলে তাকালেন – ওঃ, সিলভেরিয়া। সুপ্রভাত। খবর ভালো !

সিলভেরিয়ার বয়স বেড়েছে। কিন্তু মুখের হাসি তেমনি তারুণ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। হাসল সিলভেরিয়া – খবর ভালো। নদীর ওপারে আমাদের মিশনের শাখা খোলা হয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে ফাদার ।

ম্যানরিক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে তাকালেন – কি ব্যাপার সিলভেরিয়া ?

সিলভেরিয়া কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইল, তারপর নদীর দিকে দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে বলল -

ফাদার ! আমরা বোধহয় যেসাসের আলোর ধর্ম প্রচারের আদর্শ থেকে সরে যাচ্ছি ।

ম্যানরিকের রেখাংকিত কপালে কুঞ্চনের আঁকাবাঁকা ঢেউ উঠল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

সিলভেরিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন তুমি কি বলতে চাচ্ছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সিলভেরিয়া !

নদী বক্ষ থেকে দৃষ্টি ফিরাল না সিলভেরিয়া, বলল ফাদার ! অত্যাচার আর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে জোর করে ধর্মান্তরিত করাকে আমি খ্রীষ্টের ধর্মের অবমাননা মনে করি ।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ম্যানরিক। তারপর বললেন—ভুলে যেও না সিলভেরিয়া একদিন তোমাকে আর তোমার প্রেমিকাকে অচেতন অবস্থায় নদীর ধার থেকে আমি তুলে এনে সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছিলাম। তোমার প্রেমিকা সেই দেশীয় প্যাগনটি স্বেচ্ছায় ব্যাপটাইজড হয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল ।

সিলভেরিয়া দৃষ্টি অবনত করল- সে কথা আজও আমি ভুলি নি ফাদার। তার জন্য সারাটা জীবন আমি কৃতজ্ঞ থাকব কিন্তু আমি....আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না ফাদার ।

সিলভেরিয়া কণ্ঠের যন্ত্রণার অভিব্যক্তি সচকিত করল ম্যানরিককে, উদ্বিগ্ন হলেন তিনি – কি ব্যাপার বল তো ! তুমি যেন বেশী বিচলিত মনে হচ্ছে ।

নদীর বুকে ভাসছে অসংখ্যা সাম্পান, জেলে নৌকা। মাঝে মাঝে দুই একটি বণিকের জাহাজ ঢেউ কেটে এগিয়ে চলেছে মোহনার দিকে। ঝাঁক বেঁধে নদীতে ঢেউয়ের বুক ছুঁয়ে উড়ছে সিন্ধু-পাখীর ঝাঁক। ওপারে দূরে সবুজ টিলার সারির ওপর রৌদ্রের অপরূপ আভা। সেদিকে তাকিয়ে সিলভেরিয়া যেন উন্মনা হয়ে গেল । ম্যানরিক সন্ধানী দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক উদাস সিলভেরিয়াকে দেখলেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন কি হয়েছে সিলভেরিয়া। যাযক বৃত্তিতে কি তুমি শান্তি পাচ্ছ না ?

সিলভেরিয়া ঈষৎ চমকাল। একটু থেমে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল সত্যিই শান্তি পাচ্ছি না ফাদার। জানেন সারারাত আমি ঘুমুতে পারি না। কি করে পারব বলুন। যখন হানা দিয়ে ধরে আনা বন্দী-বন্দিনীদের এনে জড়ো করা হয় গীর্জার চত্বরে, সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আমার দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। গলায় রশি বেঁধে অংকুশ মারতে মারতে যে সব বন্দীদের আমার সামনে আনা হয় তাদের সামনে আমি দাঁড়াতে পারি না ফাদার। তাদের পিঠের ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে পবিত্র যেসাসের মূর্তির

পদতল রক্তাক্ত হয়ে যায়। হাতের তালু ফুটো করে বেতের হালিতে বেঁধে অর্ধচেতন যে সব মানুষগুলোকে এনে ফেলা হয় তাদের গালের দু'পাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে রক্ত। নারীদের অবস্থা আরও করুণ। অর্ধ উলঙ্গ সেই সব নারী-দেহ লোলুপ বহরদার আর নাবিকদের অত্যাচারে রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত। সেই সব ভীত অসহায় অর্ধমৃত মানুষদের সামনে আমি বাইবেল বুকে নিয়ে গিয়ে যখন দাঁড়াই, তাদের চোখের করুণ অব্যক্ত দৃষ্টি দেখে নিজেকে আমার দানব বলে মনে হয়। অসম্ভব। অসম্ভব ফাদার। যেসাসের পবিত্র শান্তির বাণীকে আমি এমন করে কলঙ্কিত করতে পারব না। আমায় আপনি বলুন আমি কি সত্যি যাযকের কাজ করছি ?

ম্যানরিক কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর স্থির দৃষ্টি ফেললেন সিলভেরিয়ার মুখে। বললেন - সিলভেরিয়া ভুলে যেও না তুমি পর্তুগীজ। জানো পবিত্র ক্রুশকাঠ স্পর্শ করে পর্তুগীজরা শপথ করে পর্তুগাল ছেড়েছিল যে এদেশে যেমন করে হোক খ্রীষ্টের ধর্ম তারা প্রচার করবেই। তুমি কি জান না মুসলমানরা দীর্ঘকাল পর্তুগালকে পদানত করে রেখেছিল। সুতরাং এ দেশের নরম মাটির মত গলে যেও না। মনে রেখো তাহলে আমাদের আর অস্তিত্বই থাকবে না ।

অস্থির উত্তেজনায় ফটফট করে উঠল সিরভেরিয়া কিন্তু ফাদার ! কবে মুসলমানরা পর্তুগালে আধিপত্য খাটিয়েছিল তাই তার প্রতিশোধ কি সুদূর দেশে নিরীহ মানুষদের ওপর নিতে হবে ? আর তাই যদি হয় পর্তুগীজরা এখানে স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারল না কেন এখনও ? ভালো নৌ-যোদ্ধা হয়েও শুধু সম্পদের লোভে তারা ভাড়াটে সৈনিকের কাজ করছে। একদিন তারা আরাকানী মগদের সঙ্গে শত্রুতা করে মোঘলদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। আরেকদিন তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মগ বাহিনীর পক্ষ নিচ্ছে। আবার হয়তো সুযোগ বুঝে দেশীয় বারো ভূঁইয়াদের পক্ষ হয়ে মোঘল বহিনীকে হটিয়ে দিচ্ছে। এতে কি সৈনিকের চরিত্র বজায় থাকছে ? এদিকে তো পুরো চাটিগ্রামে সোনাদ্বীপে আরাকানী অধীনতাই বজায় রয়েছে ।

এতক্ষণে একটু হাসলেন ফাদার ম্যানরিক ।

- তুমি ঠিক সেনানায়কের মত কথা বলছ ! মনে মনে তুমি একজন পর্তুগীজ সৈনিক সিলভেরিয়া । তাই বোধ হয় যাযক বৃত্তিতে তোমার অরুচি ।

সিলভেরিয়ার মুখে অসন্তুষ্টির রেখা ফুটল- আপনি আমায় ভুল বুঝেছেন

ফাদার। আমি যোদ্ধা, নাবিক পর্তুগীজ কিছুই নই। আমি মানুষ । তাই মানুষের ওপর এই বর্বর অত্যাচার আমাকে পাগোল করে তুলেছে ।

ম্যানরিক সহসা ধীরপদক্ষেপে চার্চের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। সিলভেরিয়াও অনুসরণ করল তাঁকে।

হাঁটতে হাঁটতে ম্যানরিক বললেন সিলভেরিয়া মানবতা বোধ যদি তোমার এত গভীর হয়ে থাকে তবে তুমি শুধু পর্তুগীজদের দোষ দেখছ কেন ? এই বংগালে অত্যাচার কি শুধু একা পর্তুগীজরাই করেছে। তুমি কি জানো না মগ দস্যুরা রাজশক্তির ছত্রছায়ায় থেকে কি রকম অত্যাচার, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন করছে সারাটা দেশ জুড়ে। এমনকি মোঘল সুবেদারের ঘাঁটি বুড়ীগঙ্গার তীরে সদ্য স্থাপিত মোঘলদের সুবা-ই-বংগালের রাজধানী জাহাংগীরনগর পর্যন্ত তারা হানা দিয়েছে। সেখানেও লুঠ করে আনা হচ্ছে ধন সম্পদ। স্ত্রী পুরুষ শিশুদের ধরে দাস-দাসী রূপে বিক্রী করছে। তারা অন্যায় করছে না ?

আর এ দেশের সাধারণ মানুষের জন্য কারই বা এত দরদ বল। দিল্লীর মোঘল বাদশাহরা যদিও শুনেছি বড় বড় কেল্লা তৈরী করছে, ইমারত গড়ছে, পথ-ঘাট বানিয়েছে সে তো তোদের নিজেদের আধিপত্য স্থায়ী করবার জন্য। তাদের পাঁচ শ' আর হাজারী সেনার অধিনায়করা তাদের হস্তী আর অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে সশস্ত্র হয়ে আছে বারো ভুঁইয়া মগ আর পর্তুগীজদের উচ্ছেদ করে সারাটা ভাটি বংগাল কব্জা করবার চেষ্টায়। এদেশেল সাধারণ মানুষদের জন্য তাদেরও দরদ নেই । আর দেশীয় ভূঁইয়াদের কথাই ধর না, নিজের দেশের লোকের দুঃখে তারা যদি সত্যি দুঃখিত হত তবে কি পর্তুগীজ হার্মাদ আর মগরা যারা নিরীহ জনপদবাসীর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। গ্রামের গ্রাম বিরান হয়ে যাচ্ছে .... সেখানে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখবার জন্য তারা সেই পর্তুগীজ মগদের সঙ্গে হাত মিলাত মোঘলদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য ? এদেশের সবাই ক্ষমতালোভী। এদেরকে আমি স্বাধীনচেতা বলব না। নিজের দেশে দুঃখ দুর্দশায় যাদের প্রাণ কাঁদে না তারা কিসের দেশপ্রেমিক। তারা সাম্রাজ্যলোভী। এই যখন এদেশের অবস্থা তখন মনবতার দোহাই দিয়ে সরে যাবার মত বোকামী আর কি আছে সিলভেরিয়া ।

সিলভেরিয়া নিরুত্তর রইল। তার নীলাভ দৃষ্টির ওপর দিয়ে বিষাদের ছায়া ভেসে গেল ।

স্তিমিত বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল – সত্যি ফাদার ! এদেশের সাধারণ মানুষের কথা কে ভাবে। এই তো সেবারের ঝড়ে আর সামুদ্রিক বানে অসংখ্য উপকূলবাসী প্রাণ হারাল। শিশু নারী যুবক বৃদ্ধ অগণিত আবাল বনিতায় মৃতদেহ সাগরে ভেসে গেল । হাঙ্গর কুমীর আর সামুদ্রিক মাছের খাদ্য হল। লবণ জল আটকে কত উর্বর ভূমি বন্ধা হয়ে গেল। কোন রাজা বাদশাহের প্রাণ কাঁদল ! তারা তো ক্ষমতার লড়াই আর অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় উন্মাদ। তাই তো ভাবি............

- কি ভাব সিলভেরিয়া ?

ফাদার ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন ।

সিলভেরিয়া যেন আত্মগত হয়ে উচ্চারণ করল – বংগাল দেশকে সবাই দখল করতে চায়। অথচ এ দেশের মানুষকে কেউ ভালোবাসতে চায় না। তাই তো ..... ফাদার আমি এদেশের নিরীহ অত্যাচারিত মানুষগুলোর জন্য অন্তরে এত বেদনা অনুভব করি । এ কি আমার অন্যায় ফাদার, আপনিই বলুন ।

ফাদার ম্যানরিক কণ্ঠস্বর এবার গম্ভীর করলেন। বললেন- তোমার হৃদয়াবেগকে কমাও সিলভেরিয়া, এ যুগে হৃদয়াবেগ দিয়ে কাজ করা যায় না।

ফাদার ম্যানরিক কথা বলতে বলতে গীর্জার সামনে এসে দাঁড়ালেন। সকালে ঝিকিমিকি রোদের উজ্জ্বল আভা গীর্জার মাথার উপরের পবিত্র ক্রস চিহ্নটার উপর সোনালী ঝলক ফেলেছে। সেদিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল সিলভেরিয়া।

আপন মনে বলল - ওই পবিত্র প্রতীককে যে আমি আমার হৃদয়ে এঁকে

নিয়েছি। কেমন .... কেমন করে আমি নিষ্ঠু হব ।

একজন দেশীয় দাস বাগানে কাজ করছিল। ফাদারকে দেখে সে এগিয়ে এল।

মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল ফাদার দু'জন কাপ্তান সাহেব এসে বসে আছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবার ন্য।

ফাদার আদেশ করলেন - কোথায় তারা নিয়ে এসো তাঁদের রূপচাঁদ ।

দাস রূপদাদ গোমেজ চলে গেল ।

কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘদেহ দু'জন পর্তুগীজ নাবিক এসে উপস্থিত হল। ফাদার

ম্যানরিক সসম্ভ্রমে তাদের আহ্বান করলেন — আসুন আসুন ক্যাপ্টেন কার্ভালো। ক্যাপ্টেন গনজালেস। খবর ভালো তো !

দু'জন অভিবাদের উত্তর দিল।

ফাদার ম্যানরিক সিলভেরিয়ার দিকে তাকিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন – এই যে এর সঙ্গে আলাপ আছে নিশ্চয়ই। ইনি সিলভেরিয়া। নদীর ওপারে যে নতুন পর্তুগীজ পত্তন বসিয়েছি। ওখানকার চার্চের প্রধান যাযক ইনি ।

সিলভেরিয়া মৃদু হাসল ওদের আমি চিনি ফাদার। একদিন আমিও নাবিক ছিলাম । বণিক হয়ে এসেছিলাম এদেশে। আমারও ছিল সমুদ্রের নেশা ।

গনজালেসের ঠোঁটের কোণে ঝকঝকে ধারাল এক টুকরো হাসি ফুটল। তার নীল চোখের তারায় আর তামাটে লাল মুখে কেমন বন্য আবেগ ফুটে উঠল। সিলভেরিয়াকে লক্ষ্য করে বলল- শুধু কি সমুদ্রেরই নেশা। আর কিছুর নয় ? কেন এদেশের মেয়েদের কোমল দেহ, সরল চোখ, এখানকার লোকগুলোর নির্বোধ ভালোমানুষী আর এখানকার সোনা রুপো ... কি বলেন ফাদার !

সিলভেরিয়া কর্ণমূল লাল হয়ে উঠল এ - দেশে তো অনেক পর্তুগীজ এসেছে। কেউ ব্যবসা করে পয়সা লুঠছে। কেউ দেশীয় জমিদার আর রাজাদের কর্মচারী হয়ে কাজ করেছে। কেউ করেছে ভাড়াটে সৈনিকের কাজ। আমরা করছি অস্ত্রের জোরে ধর্ম প্রচার .... |

ফাদার ম্যানরিক বিব্রত হয়ে বাধা দিলেন- আহা। কি আবোল তাবোল বকছ সিলভেরিয়া ।

সিলভেরিয়া থামল না। আরো উত্তেজিত হয়ে বলল – একটুও আবোল তাবোল বকছি না ফাদার। যা সত্যি তাই বলছি। ক্যাপ্টেন গনজালেস আপনি তো জানেন পর্তুগালের ফেরারী জঘন্য চরিত্রের অপরাধীরাও এখানে আস্তানা গেড়েছে। তারা মানুষ নামের কলংক । পর্তুগালের ইতিহাসকে তারা কলংকিত করে যাচ্ছে চিরদিনের জন্য ।

গনজালেসের মুখ উত্তেজনায় ভয়ংকর হয়ে উঠল - সিলভেরিয়া। আপনি সংযত হয়ে কথা বলুন। গনজালেসকে আপনি হয়তো ঠিক চিনে ওঠেন নি। জনেন প্রয়োজন হলে আমি সব কিছু করতে পারি। ধর্মযাযক হত্যা করতেও আমার হতা কুণ্ঠিত হয় না ।

এবারে বাধা দিল ক্যাপ্টেন কার্ভলো আঃ থামো গনজালেস। শুধু শুধু নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে কি লাভ। আপনি কিছু মনে করবেন না সিলভেরিয়া ।

সিলভেরিয়া উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল ।

কার্ভালো এবার ফাদার ম্যানরিকের দিকে ফিরল - শুনুন ফাদার, আপনাকে যে কথা বলতে এসেছিলাম ।

বিক্রমপুরের কেদার রায় আমাদের সাহায্য নিয়ে একদিন সোনাদ্বীপ দখল করেছিল। তারপর মোঘল বাহিনী সোনাদ্বীপ কেড়ে নিয়ে সেখানে একজন শাসনকর্তা বসিয়ে রেখেছে। তবে তা নামেই মোঘল অধিকারভুক্ত। মজা লুটছে তো আরাকানীরা। শুনছি দিল্লীতে সাজ সাজ রব পড়েছে। মোঘল বাহিনী বিরাট বহর নিয়ে এগিয়ে আসছে চাটিগ্রাম সোনাদ্বীপ আরাকানীদের হাত থেকে মুক্ত করবার জন। এবার টনক নড়েছে ভূঁইয়াদের। ওদিকে ভুলুয়ার রাজা আর যশোরের প্রতাপাদিত্য তার ওপর আরাকান রাজ এক জোট হয়েছে মোঘলদের বাধা দেবার জন্য। তারা দূত পাঠিয়েছে আমার কাছে, পর্তুগীজ গোলন্দাজ নৌ-বাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করে । আপনি কি বলেন ফাদার ম্যানরিক ?

ফাদার ম্যানরিক কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন এটা ভাববার বিষয় বটে। যদিও আরাকানী মগরা সময় সময় পর্তুগীজদের সঙ্গে শত্রুতা করছে তবু তারা পর্তুগীজ গাঁজা উননিবেশ এগুলো বসানর ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। শুনেছি বাকলার (বরিশালের) সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলোতে রীতিমত জমজমাট মগ বসতি গড়ে উঠেছে। তারা তাদের লুঠপাট নিয়েই ব্যস্ত। আর চাটিগ্রামের মগ শাসনকর্তাকে তো আমরা হাত করেই রেখেছি। কিন্তু মোঘল শক্তি যদি একবার এসব এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে তবে আমাদের জন্য খুব শুভ হবে না সেটা ক্যাপ্টেন কার্ভালো

কার্ভালো ফাদার ম্যানরিকের দিকে তাকিয়ে বলল- তা'হলে এদের সাহায্য করতে কোন আপত্তির কারণ নেই ?

এবারে কথা বলল ক্যাপ্টেন গনজালেস ।

রুঢ় কণ্ঠে বলল – কিসের আপত্তি ! পর্তুগীজ নৌবহরের নাম শুনলে যে কেউ

নদীতে সাগরে জাহাজ ভাসাতে ভয় পায়। অশ্ব আর হস্তী-বাহিনীর গর্বে গর্বিত মোঘলদের হটাতে পর্তুগীজদের কিছুমাত্র বেগ পেতে হবে না ।

বেলা বেড়েছে। দীপ্ত সূর্যে রশ্মি ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠেছে। সিলভেরিয়া বলল আমি এবার চলি ফাদার । আপনারা কথাবার্তা বলুন ।

সিলভেরিয়া আর দাঁড়াল না। ধীরে ধীরে হেঁটে গিয়ে নদীর ঘাটে বাঁধা খেয়া পারকারী কোষা নৌকায় উঠে বসল ।

সিলভেরিয়া চলে যেতে মুখ দিয়ে বিরক্তিকর তাচ্ছিল্যের শব্দ করল গনজালেস। বলল ফাদার ম্যানরিক, আপনার এই ধর্মযাযক সিলভেরিয়াকে আমার মোটেই ভালো লাগে না। এবং ওকে একজন পর্তুগীজ ভাবতেও আমার লজ্জা বোধ হয় ।

কার্ভালো ফিরে তাকিয়ে হাসল- তোমারও তাহলে লজ্জা আছে গনজালেস ?

গনজালেস উত্তপ্ত হল – আমাকে তুমি কি মনে কর কার্ভালো ?

কার্ভালো নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দিল—ভাটি বংগালের বিভীষিকা হার্মাদ গনজালেস। যার নামে ঘুমের শিশুও ঘুম ভেঙে কাঁদতে ভুলে যায় ।

গনজালেস হেসে ফেলল—ঠাট্টা রাখো কার্ভালো ।

ফাদার ম্যানরিক এতক্ষণে কথা বলরেন- সিলভেরিয়া লোক খুব একটা অবিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে এ দেশের জল হাওয়া মাটির প্রভাবে একটু নরম স্বভাবের হয়ে হয়ে গেছে এই যা। তবে আশা করি অল্পদিনের মধ্যে ওসব ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা চলুন আপনারা. দুপুরের খাবারের সময় হয়ে গেছে খেতে খেতেই সব কথা হবে ।

চার

রাত গভীর হয়েছে। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের ম্লান জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে পোর্ট গ্রাণ্ডী (চট্টগ্রাম) শহরের প্রান্ত সীমানায়, নদীর ধারের পর্তুগীজ পত্তনের ঘর বাড়ীর ওপর। নদীর দিক থেকে হু হু করে হাওয়া বয়ে আসছে। পর্তুগীজ স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত বিশাল গীর্জার টানা বারান্দার ওপর বিষণ্ণ চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়েছে। গুচ্ছ গুচ্ছ কাশের মত সাদা মেঘ দক্ষিণ সমুদ্রের

হাওয়ায় আকাশে ভেসে চলেছে। ভাঙা মেঘের আড়ালে কখনও লুকিয়ে পড়ছে চাঁদটা, আবার মেঘ সরে যেতে ঝিকিমিকি তারার কুচি নিয়ে জেগে উঠছে নীলাভ স্নিগ্ধ আকাশের পটভূমি । গীর্জার ভিতরে যেসাসের ক্রুশবিদ্ধ মূর্তির সামনে মোমের আলোয় এক মনে বাইবেল পড়ছিল যাযক সিলভেরিয়া ।

সহসা কার মৃদু পদধ্বনি জাগল পেছনে। সিলভেরিয়ার মনোযোগ কিন্তু ভঙ্গ হল না। পেছন থেকে খুব সংকুচিত ক্ষীণ একটি শিশুকণ্ঠ বেজে উঠল- ফাদার।

পেছন ফিরে তাকাল সিলভেরিয়া। দেখল আট ন'বছরের একটি শীর্ণ কালো ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটিকে চিনল সিলভেরিয়া। তাদের এই পাড়ারই ছেলে। দু'মাস আগে ছেলেটাকে ব্যাপটাইজড করে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়। ওর নাম রাখা হয়েছে অ্যান্টনিও। বাকলার ওদিকে হানায় বেরিয়ে এক জাহাজ বন্দী-বন্দিনী ধরে আনা হয়েছিল । অ্যান্টনিওকে সেই সঙ্গেই ধরে আনা হয় ।

সিলভেরিয়ার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটল- কি ব্যাপার আন্টনি। এত রাতে যে ! ঘুমোও নি তুমি ?

অ্যান্টনিও কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে নিশ্চুপ রইল। তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টি তুলল। সিলভেরিয়া দেখল বালকের কালো টানা দুই চোখে জল ।

সিরভেরিয়া উঠে এল। অ্যান্টনিওর পিঠে হাত রেখে স্নেহ কোমল কণ্ঠে বলল কি হয়েছে অ্যান্টনি ?

অ্যান্টনিও চোখের জল মুছে ফেলল - ফাদার আমার নাম ছিল আফজাল ।

আমি তা জানি ।

আপনি তবে আমাকে সে নামে ডাকেন না কেন ?

সিলভেরিয়া হেসে বলল - কিন্ত তুমি এখন খ্রীষ্টান হয়ে গেছ। তাই তোমার নামও বদলে গেছে।

- নাম বদলালেই কি মানুষ বদলায় ?

সিলভেরিয়া বোধহয় কোন উত্তর খুঁজে পেল না ।

স্নেহভরে বলল ওসব কথা থাক, তুমি এখন শুয়ে পড়ো গিয়ে অ্যান্টনিও।

অ্যান্টনিও বিষণ্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ সিলভেরিয়ার দিকে। বিষণ্ণ কণ্ঠেই বলল- আমি যীশুর কাছে প্রার্থনা করতে এসেছি ফাদার ।

- এখন তো প্রার্থনার সময় নয় ।

নাই বা হল, আমি একা একা যীশুর সামনে প্রার্থনা করে বলব, প্রভু ! আমাকে আবার আমাদের সেই গ্রামের ফিরিয়ে নিয়ে চল, ফিরিয়ে দাও আমার মাকে বাবাকে, আমার দাদাকে, আমার বোন পরীবানুকে। ফিরিয়ে দাও আমাদের খড়ের ঘর, নারকেল বাগান, সেই যে এমনি জ্যোৎস্না রাতে বাবা কাপড় বুনত, মা চরকা কাটত। আমি সেই বাহারী নক্সাদার কাপড়ের বুনন দেখতে দেখতে ঘরের দাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়তাম। দাদীমা আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে শাহজাদী গুলবানুর কিসসা শুনিয়ে দুধ-ভাত মাখিয়ে গালে তুলে খাইয়ে দিতেন। ঈদের দিন মা ফিরনী জরদা রান্না করত, পরীবানু বাহারী শবনম শাড়ী পরত, আমি রেশমী জামা গায় দিয়ে বাবার সঙ্গে ঈদের জামাতে যেতাম। কোথায়..... গেল সব। আমি সারা রাত তোমাদের যীশুর কাছে প্রার্থনা করে বলব আমার সেইসব ফিরিয়ে দিতে..... দেবেনা ফাদার ? যীশু ইচ্ছে করলে ফিরিয়ে দিতে পারে না ?

আমি যে কিছুই ভুলতে পারি না। জানো, আমার মা আর বোনকে হার্মাদরা কোথায় যেন নিয়ে গেল। আমার দাদীমা বুড়ো মানুষ। ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল হার্মাদ ডাকাতরা। সেই ঘরের মধ্যে পুড়ে মরে গেল আমার দাদীমা। আর.... আমাকে আর.....বাবাকে......

অবরুদ্ধ কান্না অ্যান্টনিওর কথা রুদ্ধ হয়ে গেল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অসহায় ভাবে কাঁদতে লাগল সে।

সিলভেরিয়া যেন প্রস্তরীভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আকাশের ম্লান চাঁদ কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে আবার। মোমবাতির আলো কাঁপছে। রোরুদ্যমান বালকটির সামনে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইল সিলভেরিয়া।

দুর্ভাগা বালক জানে না ওর মাকে কোচিনের হাটে বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে। ওর বাবাকে দাস হিসেবে ভেট পাঠান হয়েছে আরাকানরাজের কাছে। ওর বোনকে নজরানা হিসেবে পৌছে দেওয়া হয়েছে গোয়ার শাসনকর্তার হারেমে।

এই সব ছিন্নমূল দুর্ভাগাদের কান্না আর কত শুনতে হবে সিলভেরিয়াকে। না না সে আর পারবে না ।

এমন সময় দূর থেকে শোরগোল উঠল। নদীর ঘাটে জাহাজ এসে ভিড়েছে। হানা সেরে নতুন কোন জাহাজ এল বোধহয়। সিলভেরিয়ার সারা শরীর শিহরিত হল। হানা থেকে ফেরা জাহাজ এই পত্তনির ঘাটে এসে লাগা মানেই এক বীভৎস অমানুষিক দৃশ্যের সম্মুখীন হওয়া ।

অ্যান্টনিও ছুটে চলে গেল। চকিতে একবার মুখ ফিরিয়ে বলল-আবার জাহাজ এসেছে। হয় তো ওই জাহাজে আমার বাবা মা পরীবানু আছে।

সিলভেরিয়া কিছুই বলতে পারল না। ফেরাতেও পারল না এ্যান্টনিওকে। যদিও তার অজানা নয় এখুনি পর্তুগীজ পত্তন পাহারাদারীতে নিযুক্ত নির্দয় রক্ষীরা শিকলের চাবুক মেরে মেরে বালককে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলবে। স্থাণূর মত দাঁড়িয়ে থাকা সিলভেরিয়া মনশ্চক্ষে দেখতে পেল এক জাহাজ মৃত প্রায় নারী পুরুষ শিশু বালক বৃদ্ধকে চাবুক মারতে মারতে শিকল পরা অবস্থায় হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বন্দীখানার দিকে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাদের শরীর। হতভাগ্য বন্দীদের অসহায় আর্ত-চীৎকারে মধ্যরাতে বাতাস নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সিলভেরিয়া যেন আর সহ্য করতে পারল না। মাথা নুইয়ে লুটিয়ে পড়ল খোলা বাইবেলের ওপর যীশুর মূর্তির পদপ্রান্তে । মোমবাতিটা কেঁপে কেঁপে নিভে গেল ।

কতক্ষণ মাথা নুয়ে পড়েছিল সিলভেরিয়া বুঝতে পারেনি। হঠাৎ কোমল স্পর্শ অনুভব করল পিঠে । মুখ তুলল সিলভেরিয়া ।

- কে ?

—আমি কাঞ্চি । এখনও তুমি এখানে। কি হয়েছে ?

—ওঃ তুমি ।

উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সিলভেরিয়া। বলল-আবার হানা থেকে জাহাজ এল শুনতে পেয়েছ কাঞ্চি ?

কাঞ্চি ম্লান কণ্ঠে উত্তর দিল-পেয়েছি। কিন্তু কি আর করবার আছে। চল ঘরে চল । কাল আবার ওদের ব্যাপটাইজড করা হবে। ঝামেলা আছে মেলা। আজ

একটু বিশ্রাম করে সুস্থ হয়ে নাও ।

সিলভেরিয়া কান্নার মত করে হাসল-বিশ্রাম সুস্থ....আমি যে এখনও অমানুষ হয়ে যেতে পারি নি যেসুইট মিশনারীর অন্যসব পাদরীদের মত।

কিছুক্ষণ অন্ধকারে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল দু'জন ।

আবার চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়ল ঘরের মেঝেতে। আবছা আলোতে দু'জনের মুখাবয়ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। সিলভেরিয়া জানালা দিয়ে দূরের মেঘের আড়াল থেকে হঠাৎ ঝিকমিক করে জ্বলে ওঠা এক ঝাঁক তারার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে বিষণ্ণ বিধ্বস্ত কণ্ঠে বলল-কাঞ্চি, এ অনাচার অত্যাচার ঈশ্বর আর কতদিন সইবেন বল ? জানো বিখ্যাত যোদ্ধা ক্যাপ্টেন কার্ভালো খুন হয়েছে যশোরের প্রতাপাদিত্যের হাতে। যার হয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে যুদ্ধ করে একদিন মোঘল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে হটিয়ে দিয়েছিল কার্ভালো। এ অপমৃত্যু কি কোন কিছুর সূচনা করে না ! এমনি করে সবাই যাবে। রডা, ফ্রান্সিস, পেড্রো, গঞ্জালিস সবাই যাবে......এত আতচীৎকার এত নিরীহ মানুষের রক্তপাত এত পাশবিকতা, এ তো ঈশ্বর সহ্য করবেন না।

চাঁদনী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। গীর্জার দরজার সামনে এক দীর্ঘকায় পুরুষের ছায়া পড়ল। গম্ভীর কর্কশ কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তুলে গমগম করে বেজে উঠল প্রার্থনা গৃহের অভ্যন্তরে।

-সিলভেরিয়া । আমি ক্যাপ্টেন গনজালেস ।

চমকে ফিরে তাকাল কাঞ্চি আর সিলভেরিয়া। নির্বাক হয়ে তাকিয়ে দেখল প্রার্থনা গৃহের দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন গনজালেস। শব্দ করে হাসল গনজালেস। বিদ্রূপ মাখা কণ্ঠে বলল- ক্যাপ্টেন কার্ভালোকে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য বিশ্বাসঘাতকতা করে খুন করেছে আর তার খণ্ডিত মস্তক উপহার পাঠিয়েছ রোসাঙ্গের রাজসভায় ।

রাজাকানীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পর্তুগীজ ক্যাপ্টেনকে হত্যা করেছে সে। এতেই সে তার স্বাধীনতার অধিকার পেয়ে গেছে ? আর মোঘলদের তো কার্ভালোই হটিয়ে দিয়ে গেছে। সে কথা থাক, কার্ভালো মরেছে কিন্তু গনজালেস এখনও মরেনি। আজকের হানার জাহাজে আমি প্রত্যাপাদিত্যের রাজ্যসীমা থেকে বন্দী- বন্দিনী ধরে এনেছি। আগুন দিয়ে ছারখার করে দিয়ে

এসেছি গ্রামের পর গ্রাম-যাক সে কথা। কাল একশ' জনকে হত্যা করা হবে, তাদের খণ্ডিত মস্তক আমি উপহার পাঠিয়ে দেব প্রতাপাদিত্যের রাজসভায়। আর শুনুন সিলভেরিয়া আমি আপনার এই পত্তনিতে বাজার বসাব। বিভিন্ন দেশের বণিকরা এখানে জাহাজ নিয়ে আসবে, সেই হাটে আমি দাস দাসী বিক্রী করব।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল কাঞ্চি। সে শব্দে প্রচণ্ড রোল তুলে অট্টহাস্য হাসল গনজালেস। ভারী পায়ের শব্দ তুলে হেঁটে এসে কাঞ্চির সামনে এসে দাঁড়াল।

–কে এই নারী ?

সিলভেরিয়া একটিও কথা বলল না ।

কাঞ্চি ভীত কম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করল- আমি যেসাসের সেবিকা ।

—উঃ মাদার । তা চেহারাটি তো বড় খাসা। কার হানায় ধরা পড়েছিলে ?

এতক্ষণে মুখ খুলল সিলভেরিয়া-ক্যাপ্টেন গঞ্জারেস, আপনি শ্লীলতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। ভুলবেন না এটা ঈশ্বরের পবিত্র গৃহ ।

প্রচণ্ড রবে ঘর কাঁপিয়ে আবার হাসল গনজালেস-শ্লীলতা ? গনজালেসকে তুমি চেনো নি সিলভেরিয়া। সে পর্তুগীজ ফেরারী। আইন কানুন সভ্যতা ভব্যতা এগুলো তার কাছে নিতান্তই হাস্যকর। মানুষ হত্যা করা তার নেশা, ধন সম্পদ সোনা রূপা সুন্দরী নারী পেলে সে আর কিছুই চেনে না। জানো আজ বংগালের সব নদ-নদী আমার দখলে ? জানো সন্দ্বীপ আজ গঞ্জালেসের? সে মোঘল আরাকানীদের পরোয়া করে না, আর তুমি তো তুচ্ছ একজন যাযক মাত্র ।

কাঞ্চি একটা স্তম্ভের আড়ালে সরে গিয়ে ভীত পারাবতের মত থর থর করে কাঁপছিল ।

–সেদিকে তাকিয়ে গনজালেস একটু হাসল-সুন্দরী যীশুর সেবিকা। কোথায় পালাবে তুমি, গনজালেস যার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে তার পালাবার পথ নেই । আচ্ছা । চলি, আজ আমি ক্লান্ত, জাহাজে গিয়ে বিশ্রাম নেই। কাল দেখা হবে।

দীর্ঘ পদক্ষেপে হেঁটে বেরিয়ে গেল গনজালেস ।

যেন বিবর্ণ জ্যোৎস্নায় ছায়া ফেলে ভয়াবহ কোন দানবের কালোছায়া সরে গেল। স্তম্ভের ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল কাঞ্চি। নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সিলভেরিয়া। যেন সান্ত্বনার কোন ভাষা তার জানা নেই। সহসা গীর্জা চত্বর থেকে একটু দূরেই একটি বালক কণ্ঠের আতচীৎকার ভেসে এল। দ্রুত প্রার্থনা গৃহ থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দীর্ঘ ধাপগুলি অতিক্রম করে নীচে নেমে এল সিলভেরিয়া । গীর্জার সামনের সরু গলিটার সামনে দিয়ে একটি বালককে চাবুক মারতে মারতে নিয়ে চলেছে রক্ষীরা। বালক রক্ষীদের হাত ছাড়বার জন্য ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে প্রাণপণে চীৎকার করছ।

-ছেড়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি জাহাজে যাব। আমার মা- বাবা.... আমার বোন পরীবানুকে খুঁজে বের করব খুঁজে বের করব। ছেড়ে দাও। তোমাদের পায় পড়ি....

এ কণ্ঠ যে আর কারো নয়, অ্যান্টনিওর, তা বুঝতে কিছুমাত্র দেরী হল না সিলভেরিয়ার। ছুটে গিয়ে দু'হাতে তার রক্তাপ্লুত দেহ বুকে জড়িয়ে ধরল সিলভেরিয়া। রক্ষীরা একটু সরে থমকে দাঁড়াল। সিলভেরিয়া বেদনার্ত কণ্ঠে বলল-কেন এই অবুঝ শিশুকে এমন করে মারছ তোমরা ?

একজন রক্ষী উত্তর দিল-ও জাহাজে উঠে পালাতে চাইছিল। ক্যাপ্টেনের আদেশ....।

তার কথা থামিয়ে দিয়ে গোঙানীর সুরে বলল অ্যান্টনিও-আমি পালাতে চাইনি ফাদার। আমি....আমি......আমার মা বোনকে খুঁজতে গিয়েছিলাম।

সিলভেরিয়া রক্ষীদের বলল- তোমরা যাও। আমি ওর দিকে লক্ষ্য রাখছি।

অসন্তুষ্ট রক্ষীরা চলে গেল। অ্যান্টনিওর অর্ধচেতন দেহ কোলে তুলে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলল সিলভেরিয়া। তার পেছনে ছায়ার মত নিঃশব্দে এল কাঞ্চি ।

অ্যান্টনিওকে সেবা-শুশ্রূষা করে কিছুটা সুস্থ করে তুলতে রাত্রির শেষ প্রহর প্রায় অতিক্রান্ত হয়ে এল। কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদটা তখন নদীর অপর পাড়ে বনানী ঘেরা টিলার মাথায় নেমে এসেছে।

অ্যান্টনিওর মাথার কাছে প্রস্তরমূর্তির মত বসে ছিল কাঞ্চি। সিলভেরিয়া তার কাছে এসে দাঁড়াল। নীচু কণ্ঠে বলল-একটু বাইরে এসো কাঞ্চি। তোমার সঙ্গে

জরুরি কথা আছে ।

বারান্দায় বেরিয়ে এল দু'জন। সিলভেরিয়া বলল- গনজালেসের সব কথা শুনলে তো ।

—শুনেছি।

—কিন্তু এ আমি কিছুতেই হতে দেব না কাঞ্চি। কতকগুলো নিরীহ মানুষের রক্তে আমার এ পত্তন রক্তাক্ত হয়ে যাবে....এখানে গরু-ভেড়ার মত দাস-দাসী বিক্রী হবে....উঃ অসহ্য। এ অসহ্য ! আমার প্রাণ থাকতে আমি তা হতে দেব না ।

—কিন্তু কি করবে তুমি একা ?

-কি করব ? তাই তো কি করব। কি করব আমি !

আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে উত্তেজিত হয়ে পায়চারী করতে লাগল সিলভেরিয়া ।

এক সময় সে থেমে পড়ল। তারপর কাঞ্চির কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে নীচু সাবধানী কণ্ঠে এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনার কথা শোনাল ।

শিহরিত হয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল কাঞ্চি ।

–কি সর্বনাশ ! একি কখনও সম্ভব। সারাটা নদীতে হার্মাদের নৌকাগুলো টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর এরা যে কি ভয়ানক হিংস্র তা কারো অজানা নেই। ধরা পড়লে তোমাকে পর্যন্ত ওরা প্রাণে রাখবে না ।

সিলভেরিয়া অবিচলিত ।

-যা হয় হবে। কিন্তু এ আমি করবই। তুমি তো জানো শহরে উত্তর প্রান্তে সুফী দরবেশের আস্তানা। আমি সেখানে চললাম। তারা আমায় নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। রাত আর বেশী নেই, এর মধ্যেই আমার যা করবার করে ফেলতে হবে। তুমি ঘরে যাও কাঞ্চি । আমি চললাম ।

জ্যোৎস্না আচ্ছন্ন কুয়াশা মলিন শেষ রাত। কালো চাদরে সারা দেহ আবৃত করে নিঃশব্দে সাবধানে পর্তুগীজ ডেরা থেকে বেরিয়ে গেল একজন সকলের

দৃষ্টির অগোচরে। রাত্রি তখন অন্ধকারের আবরণ সরিয়ে বিদায় নিতে চলেছে। বন্দীশালার দরজায় এসে দাঁড়ায় কাঞ্চি। তাকে দেখে সসম্ভ্রমে লোহার ফটক খুলে দিল দ্বারী।

শুভ্র বস্ত্রে আপাদমস্তক ঢাকা পোশাকে গলায় ঝুলান পবিত্র ক্রুশ চিহ্ন আঁকা লকেটে সর্বোপরি তার মুখের এক দৃঢ় অভিব্যক্তি উজ্জ্বল আলোক আভায় কাঞ্চিকে এক মহিয়সী নারীর মত লাগছিল ।

কাঞ্চি বলল-দ্বারী প্রহরীদের বল বন্দীদের বাঁধন খুলে দিতে। ওদের ব্যাপটাইজড করবার জন্য নিতে এসেছি। ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই ।

কাঞ্চির আলোক উদ্ভাসিত মুখে তাকিয়ে দ্বারী আর প্রহরারত রক্ষীরা তার কথার অবাধ্য হতে পারল না। বন্দীদের বাঁধন খুলে দিল তারা।

কাঞ্চি ঘুরে দাঁড়িয়ে রক্ষীদের লক্ষ্য করে বলল-তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। আমি এদের নিয়ে যাচ্ছি।

কাঞ্চির ইংগিতে বন্দীরা দল বেঁধে বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে এল । গুপ্তপথ দিয়ে কাঞ্চি তাদের নিয়ে চলল ।

এক সময় ভোরের আভা ফুটল আকাশের বুকে। দু'একটি তারা শুধু দূরে তাকিয়ে রইল মাটির পৃথিবীর দিকে। বন্দীদের নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে এসে পৌছল কাঞ্চি আর সিলভেরিয়া ।

জঙ্গলাকীর্ণ দরবেশের আস্তানায় নিরাপত্তায় পৌছে দিয়ে ফিরে চলল সিলভেরিয়া।

কাঞ্চি এসে দাঁড়াল তার পাশে-তুমি একা কেন ফিরে চললে ? ওরা যে তোমায় খুন করে ফেলবে ।

সিলভেরিয়া ম্লান হাসল-তবু আমায় ফিরে যেতে হবে কাঞ্চি। যীশুর পদতল ছেড়ে আমি কোথায় যাব ! সেখানে যদি আমার মৃত্যু হয় তো হবে ।

কাঞ্চি দৃপ্তকণ্ঠে বলল-শোন। দাঁড়াও। আমাকেও নিয়ে চল তোমার সঙ্গে । –না কাঞ্চি, তোমার যাওয়া হবে না ! গনজালেসকে তুমি এখনও চেন নি ? কাঞ্চি নির্ভয়ে হাসল-প্রভু যার সঙ্গে আছেন সে কাউকেই ভয় পায় না । সিলভেরিয়া ভোরের আকাশে এক পলক দৃষ্টি মেলে সন্তর্পণে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল ।

তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল-চল ।

পরদিন প্রভাত-সূর্যের রক্তিম আলোক রশ্মিতে নদীর বুক যখন উদ্ভাসিত তখন এক অভাবনীয় দৃশ্যের সম্মুখীন হল পর্তুগীজ পত্তনের জনসাধারণ ।

গীর্জার সামনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন যেশুইট মিশনের পর্তুগীজ পাদরীরা। তাদের পেছনে আছে ক্যাপ্টেন গনজালেস ও তার দলবল এবং আরো পর্তুগীজ অধিবাসী ।

সম্মুখে হাতে-পায়ে বেড়ী পরান বন্দী যাযক সিলভেরিয়া।

ফাদার ম্যানরিকের গুরুগম্ভীর আদেশ বাণী ধ্বনিত হল-এই হীনচরিত্র পর্তুগীজ নাবিক একজন যাযকবেশী বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতকতা সে শুধু পর্তুগীজদের সঙ্গেই করেনি, পবিত্র যেসাসের ধর্মের সঙ্গেও করেছে। তাকে আমরা ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছি। পবিত্র যাযকবৃত্তির প্রতি সে অবমাননা দেখিয়েছে এবং ঈশ্বর-পুত্র যীশুকেও সে অসম্মান করেছে। এই ব্যক্তি আমাদের ধর্ম ও জাতির কলংকস্বরূপ । প্রাণদণ্ডই তার একমাত্র শাস্তি।

মাথা উঁচু করে নির্ভয়ে উজ্জ্বল মুখে দাঁড়িয়ে রইল সিলভেরিয়া।

সকালের আলোর রশ্মি এসে যখন লুটিয়ে পড়ল তখনি ঘাতকের অস্ত্রের আঘাতে রক্তের ফিনকি দিয়ে সিলভেরিয়া দ্বিখণ্ডিত দেহ গড়িয়ে পড়ল পবিত্র যীশুর প্রার্থনাগৃহের চত্বরে। সেই সঙ্গে আরেকটি মৃতদেহ মুখগুজে পড়ল পবিত্র যীশুর পদতলে। নিজ হাতে নিজের বুকে আমূলে ছুরিকা বিদ্ধ করেছে কাঞ্চি। তার বুকের লাল রক্ত সকালের সূর্যের আলোয় মিলে লাল রেখা এঁকে গড়িয়ে গেল ঈশ্বর-পুত্র যীশুর পবিত্র মূর্তির পদপ্রান্ত থেকে মেঝে বয়ে সিঁড়ির দিকে। সেখানে সিলভেরিয়ার রক্তের সঙ্গে মিলিত হল ।

দুইটি রক্তের ধারা ক্রমশঃ ঝরে ঝরে পড়তে থাকল সিঁড়ির পর সিঁড়িতে ।

পাঁচ

জাহাংগীর নগরের রাজপথ দিয়ে টগবগিয়ে এগিয়ে চলেছে রাজকীয় অশ্বারোহীর দল । পথের দু'পাশে মোঘল স্থাপত্য-রীতিতে নির্মিত সুদৃশ্য অট্টালিকা। পথের শেষ মাথায় বাজার। যার নাম চকবাজার। নানা রকম মহার্ঘ মনোলোভন পণ্যে চকবাজার ঐশ্বর্যদীপ্ত। চকের একটি দোকানের সামনের চত্বরে দাঁড়িয়ে পান

আর শরবত বিক্রী করছিল একটি মধ্যবয়সী পুরুষ। এই শরবত বিক্রেতা আর কেউ নয় সোনাদ্বীপের চণ্ড।

চণ্ডুর পাশে দাঁড়িয়ে একটি বালক কাজে সাহায্য করছিল। অশ্বারোহীদল এগিয়ে যেতে ছুটে কিছুদূর তাদের পেছন পেছন গেল সে। তারপর এক সময় ফিরে এল। চণ্ডুর কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে বলল-বাবা কি সুন্দর ঘোড়সওয়াররা গেল বাবা ! দেখেছ তুমি ?

চণ্ডু কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক জবাব দিল-হুঁ ।

-আচ্ছা বাবা, আমরা অমন ঘোড়সওয়ার হতে পারি না ? আমি কিন্তু বাবা বড় হয়ে সৈনিক হব। যুদ্ধ করব। কামান দাগব ।

একজন ক্রেতা শরবত কিনবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছিল। মুচকি হেসে বালককে জিজ্ঞাসা করল-তা বাবা সৈন্য হয়ে লড়াইটা করবে কার সঙ্গে শুনি ?

চণ্ডুর ছেলে মানিক। তার ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথা দুলিয়ে দুচোখে উৎসাহ ফুটিয়ে বলল—কেন মোঘল সেনাদের সঙ্গে ।

চতু ছেলেকে ধমক দিল-চুপ। চুপ। খবরদার অমন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবি না মানিক।

ক্রেতা লোকটি টিপ্পনী কাটল-উঃ কি আমার বাহাদুর রে। প্রতাপাদিত্য গেল, কেদার রায় গেল, মাসুম খান, ঈশা খান দফা হল, উনি চিংড়ী ফড়িং যাবেন মোঘল সেনাদের সঙ্গে লড়তে। দেব নাকি ব্যাটাকে থানাদারদের হাওলা করে।

চতু এবার নীম্ন কণ্ঠে বলল-ছাড়ো ভাই ছোট ছেলের অবুঝ কথা। ওর কি বা বুদ্ধি আছে। তা তোমাকে তো চিনতে পারলাম না ভাই, মনে হয় কোন আশরাফের ঘরের লোক তুমি ।

বক্তা শরবত পান শেষ করে গোঁফে তা দিয়ে গর্বিত কণ্ঠে বলল-তা ধরেছ বটে আমি নুরুল্লাপুর লাখেরাজ তালুকের মালিকের হুঁকাবরদার। রইসদের সঙ্গে ওঠা বসা করি তো তাই একটু রইসিয়ানা ভাব এসে গেছে ।

চণ্ড তাড়াতাড়ি একটা সালাম ঠুকে বলল-ধরেছি ঠিক। আপনার হাব ভাবেই বোঝা যায় আপনি যে সে লোক নন। বসুন ভাই পান খান ।

চণ্ড এক খিলি পান বানিয়ে তবকে মুড়ে হুঁকাবরদার সাহেবের সামনে এগিয়ে ধরল। পান পেয়ে নুরুল্লাপুর তালুকের মালিকের হুঁকাবরদারের মেজাজ যথেষ্ট সুপ্রসন্ন হল। দোকানের সামনের কাঠের টুলটায় জাঁকিয়ে বসল সে। পান চিবুতে চিবুতে বলল-তা তোমার বাড়ী কোথায় হে ?

চণ্ড দ্রুত হাতে দোকানের কাজ করতে করতে জবাব দিল-বাড়ী তো ছিল সোনাদ্বীপে। ঝড়ে জাহাজ ডুবি হয়ে ঠেকেছিলাম এই চরে। সেখানকার এক কারিগর আমায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানেই বড় হয়েছি। তাঁত বোনা কারিগরি কিছু শিখেছিলাম। কিন্তু ভালো লাগল না। তাই একদিন বেরিয়ে পড়লাম। নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে এসে ঠেকলাম এখানে, নানারকম ব্যবসা ধরলাম। কোনটাই শেষ পর্যন্ত টিকল না। আচ্ছা ভাই শুনেছি লাখেরাজ তালুকের মালিকের মেলা ক্ষমতা। সুবেদার থেকে শুরু করে খাস বাদশাদের নেকনজরে আছেন তারা । আমার একটা কাজ করে দেবে ভাই ?

–কি কাজ ?

—কোন জমিদার তালুকদারের অধীনে যদি কোন চাকরি বাকরি একটা জুটিতে দিতে পারো বড় ভালো হয়। পানের বরজ থেকে পান কিনে সুপুরী কিনে ব্যবসা আর চালাতে পারছি না। বউ ছেলেপুলেদের দু'মুঠো অন্ন জোটানই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

-হুঁ। বড় কঠিন কথা বলেছ বটে। সত্যি কথাটা বলি তা'হলে আমি একজন সামান্য হুঁকাবরদার। সময়ে পাইকদেরও ধমক খাই বুঝলে ভাই পানওয়ালা, এই পাইকগুলো মানুষ নয়। একেবারে পশুর অধম ।

-কি রকম ?

–কি আর বলব। তোমাকে বলতে বাধা নেই। তুমি বেশ সাদাসিধে লোক বলেই তো মনে হচ্ছে। কথাটা কি জানো। এই যে পাঁচশ' হাজারী, দু'হাজারী মনসবদার থেকে শুরু করে আমির ওমরাহ সবাই আছে পয়সা লুটবার তালে। এই বংগাল মুলুক তো পয়সা লুঠবারই জায়গা। দিল্লীর মসনদে বাদশাহরা বসে এত দূরের দেশ বংগালকে দমাবে কি শুধু গোলা কামান অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে ? তা কি আর অত সোজা রে ভাই। তাই তো এই লাখেরাজ নিষ্কর ভূমির বিরাট মালিকানা দিয়ে যত তাঁবেদার রইসদের জায়গীর দিয়ে বসিয়েছে। হুকুম দিয়েছে তোমরা যত পারো লুঠে নাও। আর তোমাদের লাঠিয়াল পাইকদের

দিয়ে খাজনা আদায় করে পাঠাও দিল্লীর খাজাঞ্চীখানায়।

-আরে ভাই শুনেছ ইসলাম খাঁও নাকি নিজে সুপুরীর ব্যবসা করে বিস্তর পয়সা জমিয়েছে ।

এবারে কথা বলল মানিক-বাবা, সুবাদার ইসলাম খাঁ নাকি খুব ভালো লোক তুমি যে বল ! তুমি যে বল ইসলাম খাঁ এসে তবেই না দেশটার হাল ফিরল। তরিতরকারী ফলমূল হাঁস মুরগী গরু ছাগল চাল ডাল কত সস্তায় পাওয়া যায়।

চতু ছেলের দিকে ফিরে মুখ খিঁচিয়ে উঠল-চুপ কর হতচ্ছাড়া পাজী ছেলে । সব সময় বড়দের কথায় নাক গলান চাই ।

মানিক কাঁদ কাঁদ হয়ে অসহায় ভঙ্গীতে বলল-বারে। সবাই তো বলে। সেই যে আমায় একদিন কেল্লার কাছে বেড়াতে নিয়ে গেলে। আমি বাড়ী ফিরে মাটি দিয়ে অমন একটা ছোট কেল্লা তৈরী করলাম, তুমি বললে-বাঃ কি সুন্দর হয়েছে, একদিন ইসলাম খানের দরবারে নিয়ে দেখিয়ে ইনাম নিয়ে আসব। আমি যা হতে চাই তাতেই তোমার রাগ। বললাম সৈনিক হব তো তাতেও দোষ। বলেছিলাম পাথর কাটা কারিগরির কাজ শিখব তাও তুমি রাগ কর। থাক আমি কোন কিছুই হতে চাই না । আর কোন কথাও বলব না ।

চণ্ডু এবার ছেলেকে আদর করল-থাক থাক। আর রাগ করতে হবে না। এবার মহররমের মেলায় তোকে কত কি কিনে দেব দেখিস।

নুরুল্লাপুর পরগনার মালিকের হুঁকাবরদার বিদায় নিতে চণ্ডু ছেলেকে বলল-ছুটে যা তো বাড়ীতে তোর মায়ের রান্না শেষে হয়েছে না কি দেখে আয় ।

মানিক চলে গেল চণ্ডু উদাস দৃষ্টিতে একবার আকাশের দিকে তাকাল । দুপুরের রোদ ঝলকান আকাশটা যেন জ্বলে পুড়ে ছারখার হচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে চতুর আবছা মনে পড়ল কবে সেই কত....দিন আগে সাগরের হাতছানিতে উন্মনা হয়ে যেত। নাবিক হতে চাইত.....কে সে। সে তো কবে সেই ঝড়ের রাতে হারিয়ে গেছে। এখন ! শিল্পী হবার, সৈনিক হবার একটা অসাধারণ কিছু হবার অচেনা জ্বালায় ছটফট করে যে মানিক তারই বাবা চতু এখন সে। সে এক জীবন সংগ্রামী সৈনিকই তো বটে। সংগ্রাম নয় তো কি। চণ্ডু ভাবল। এই জাহাংগীর নগরে এসে কত দেশের কত চরিত্রের কত অবস্থার লোকের সঙ্গে পরিচয় হল। ওই তাঁতীপাড়া, রায়ের পাড়া কে না চেনে। ধোলাই নদীর পাড়ে

পাড়ে বন জঙ্গল কেটে বসতি বসিয়েছে আশপাশের গ্রাম এলাকার লোকের এসে। সন্ধ্যায় বুড়ীগঙ্গার বুকে যখন সূর্য দিনান্তের ছায়া ফেলে তখন নগর পরিভ্রমণে বের হন দেওয়ান সাহেব। হাতীর হাওদার ওপর রেশমের ছাতা ধরে বসে ছত্রি। ছাতার দু'ধারে থাকে মসলিনের পরদা। পুরু তাকিয়ে হেলান দিয়ে আগে পিছে ঘোড় সওয়ার নিয়ে সোনালী সাচ্চা জরির কাজ করা কাপড়ে সুশোভিত হয়ে দুলতে দুলতে দেওয়ান সাহেব বের হন । পথের দু'পাশের জনতা মাথায় হাত তুলে অভিবাদন জানায়। কিন্তু এ মুহূর্তে চণ্ডু ভাবল দেশের লোকের অবস্থার কতটুকু খোঁজ পায় ওই সুবেদর ফৌজদার দেওয়ান সাহেব আয়েসী তাকিয়ে হেলান দিয়ে। ওই তো নদীর ওপারে যে তাঁতীপাড়া। কত রংবেরংয়ের বাহারী কাপড় বুনতে যারা মগ্ন, ওই যে যারা শঙ্খের সোনা রূপা তামা কাঁসার সূক্ষ্ম কারিগর আর যারা চাষ করে মাছ ধরে তাদের কোথায় সম্মান, সমাদর ! তাদেরকে এখনও তো সবাই ছোটজাত কমজাত নামে হেয় করে। হিন্দুরা যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থ আর শূদ্রের ব্যবধান করে এক শ্রেণীকে দূরে ঠেলে রেখেছে, মুসলমানরাও তেমিন শরীফ আর কমজাতের বিভেদ সৃষ্টি করেছে। মোঘল পাঠান শেখ সৈয়দ না হলে রইসিয়ানার মালিক হয় না। চণ্ডু ভাবল এই মোঘল বাদশাহরা এসেই সমাজে এই বিভেদটা প্রচলন করে দিয়েছে। তাই তো কমজাতের লোকেরা উদয়াস্ত খেটেও ডাল ভাত খায়। অথচ তাদের তৈরী জিনিসপত্রের নাম দেশ দেশান্তরে।

খরিদ্দার এসে দাঁড়াল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চণ্ডু আবার কাজে মন দিল। খরিদ্দার দু'জন শরবত পান করতে করতে নিজেদের মধ্যে আলাপে মগ্ন। চণ্ডু কান পাতল তাদের আলাপে। একটু দীর্ঘকায় সুদেহী পাগড়ী পরা ব্যক্তিটি তার খর্বাকৃতি সঙ্গীকে বলল- জানো নাকি হে ! আজ কাটরার চত্বরে গানের মাহফিল বসবে। দেশ বিদেশ থেকে বড় বড় ওস্তাদ আর কাওয়ালরা আসবে। শুনলাম মিয়া তানসেনের সাকরেদরাও আসবে। তোফা হবে কি বল ! এতদিন তো কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ। তার ওপর হার্মাদ আর মগদের উৎপাত ! এতদিনে কিছুটা শান্তি হয়েছে বটে।

চণ্ড সহসা বলে ফেলল- তা' জনাব, এখনও তো সোনাদ্বীপ চাটিগ্রাম আর ভুলুয়ায়, সমানে মগ আর হার্মাদরা আধিপত্য খাটিয়ে যাচ্ছে। সেখানকার মানুষগুলোর তো দুর্ভোগের সীমা নেই। দীর্ঘকায় ব্যক্তি শরবত পান শেষ করে গোঁফ মুছে আমুদে কণ্ঠে বলল-বাঃ, আমাদের শরবতওয়ালা দেখছি নানা খবর রাখে। তবে ভাই একথা তো অস্বীকার করতে পারবে না এই বার

বংগাল এখন মোঘলদের কজায়। এত কেল্লা দুর্গ মসজিদ পথ ঘাট সরাইখানা বংগালে কি আগে তৈরী হয়েছিল ? এমন ব্যবসা-বাণিজ্য সোনার বসতি আর কবে হয়েছিল। বংগাল রাজ্যের সীমানাই বা এত বড় হয়েছিল কবে। আমি তো ভাই আফগানী পাঠান। এককালে মাসুম খানের পক্ষে মোঘলদের সঙ্গে লড়াইও করেছি কিন্তু....

তাকে থামিয়ে দিয়ে এবারে খর্বাকৃতি লোকটি কথা বলল- আমি তো ভাই মোঘল দেওয়ানের সহিসের চাকরি নিয়ে এসেছি, তবে আমার একটা কথা মনে হয় ভাই। এই বংগাল আর পাঠানদের স্বভাবে কিছুটা মিল আছে। এই দুই জাতই কারো কাছে মাথা নোয়াতে জানে না। তবে আশ্চর্য এই যে এদের নিজেদের মধ্যে একতা নেই। যে যখন শক্তি বাড়াতে পারল অমনি মাথা চাড়া দিয়ে বলে উঠল আমরা আর দিল্লীর শাসনকর্তার অধীনতা মানি না, আমরা স্বাধীন। আরে বাবা নিজেদের মধ্যে একতা না থাকলে কি আর শক্তি টেকে। এই যে মোঘল বাদশাহর আদেশে যে সব জায়গীরদার বসানো হয়েছে ; এরা সোজা বান্দা ভেব না। আজ দেশের নীচু শ্রেণীর লোকদের ওপর জুলুম করে ধন সম্পদ বাড়িয়ে চলেছে। বাদশাহরাও সব কিছু বুঝে চোখ বন্ধ করে আছে।তবে আমি হলফ করে বলতে পারি সুযোগ পেলেই এরা নিজেদের স্বাধীন বলে শির খাড়া করবে।

পাঠান খরিদ্দার এবার মুচকি হাসল-এ ব্যাপারে পাঠানরাই সবার আগে কি বল দোস্ত। যেমন দুশমনী করতেও আমরা ওস্তাদ। তেমনি দোস্তিতেও পাক্কা। তা'না হলে ওসমান ভূঁইয়া মরল মোঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আবার ঈশা খাঁর ছেলে মুসা খাঁ হাত মিলাল মোঘলদের সঙ্গে। চল এবার নদীর ধারটা ঘুরে আসি ।

বেলা বেড়েছে। চণ্ড এবার দোকান বন্ধ করে দিল। মনে মনে ভাবল বিকেলের পর মানিককে নিয়ে একবার গানের জলসা ঘুরে আসবে। ছেলেটা এ বয়সেই যেন কেমন একটু অন্য রকম। দিন রাত পাথর কেটে মাটি নিয়ে কাঠ খোদাই করে নানা রকম সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরী করবে। আর গানের নেশাও খুব। যা চমৎকার কীর্তন আর মুর্শিদী গাইতে পারে। না, আর ছেলেটাকে সে বকবে না। কে জানে বড় হয়ে তার মানিক হয় তো নাম করা কেউ হবে ।

ছয়

জাহাঙ্গীরনগরের সুদৃশ্য রাজপথ দিয়ে বাদশাহের ফরমান নিয়ে হাতী চলেছে। নদীর পাড় বেয়ে বাতাসে সে ফরমান ছড়িয়ে পড়ছে। পথের দু'ধারের জনতা উৎকর্ণ হয়ে শুনেছে ফরমান। ফরমানদাররা বলছে এক খবর, "দিল্লীশ্বর শাহানশাহ্ বাদশাহ্ শাহজাহানের প্রিয়তমা সম্রাজ্ঞী মমতাজের অকাল মৃত্যুতে বাদশাহ্ শোকে মূহ্যমান । রাজ্যপাট অচল । বাদশাহ্ মনস্থির করেছেন তাঁর প্রিয়তমার সমাধির উপর এমন এক মর্মর প্রাসাদ তৈরী করবেন যা সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে থাকবে। বাদশাহর কর্ম- সচিবরা তামাম হিন্দুস্থানের প্রান্তে প্রান্তে খবর পাঠিয়েছে দেশের যত বিখ্যাত শিল্পী, ভাস্কর, কারিগর, ওস্তাগার আছে সবাই এসে জমায়েত হোক দিল্লীতে। উপযুক্ত লোককে বাছাই করে কাজে লাগাবেন তাঁরা। ওস্তাগারদের যথেষ্ট ইনাম দেওয়া হবে। এমনকি জায়গীরও মিলে যেতে পারে ।

ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল মানিকও। সে এখন বালক নয়। রীতিমত অনিন্দ্যকান্তি এক তরুণ। ফরমান শুনে সে ছুটে চলল বাড়ীর দিকে ।

পুকুর পাড় দিয়ে ছুটে যাবার সময় সহসা তার পায়ের ধাক্কা লেগে কার মাটির কলসী ভেঙে আছড়ে পড়ল । বাধা পেয়ে একটু থমকে আবার দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল সে। তরুণী কণ্ঠের ঝংকারে থেমে পড়তে হল। গাছ-কোমর করে পরা ডুরে শাড়ী, গায়ে ভেজা গামছা জড়ান, ভেজা চুল বেয়ে টপ টপ করে পানি ঝরছে তরুণীর। তীব্র ঝংকারে তরুণী বলল-দাঁড়াও মানিক দাদা। অসময়ে লাথি মেরে আমার কলসী ভেঙে দিয়ে গেলে । পেয়েছটা কি !

মানিক ঘুরে দাঁড়াল। কাচুমাচু করে বলল-এই দেখ বাঁশী, আমার না এখন একটু দাঁড়াবার সময় নেই। রাগ করিস না লক্ষীটি। বিকেলেই তোকে ধোলাই গাঙের পাড়ের কুমোর পাড়া থেকে দু'খানা মেটে কলস এনে দেব। এখন পিছু ডেকে শুভ কাজে বাধা দিস না।

ভেজা কাপড় নিংড়ে পানি ঝরাতে ঝরাতে বাঁশী ভ্রূ উৎক্ষিপ্ত করল। বলল-কি এমন দিগ্বিজয়ের কাজে ছুটে চলেছ শুনি ?

মানিক ব্যস্ত হয়ে বলল-এখন একটুও কথা বলবার সময় নেইরে। পরে শুনিস, আসিস ওবেলা আমাদের বাড়ী সব বলব ।

বাঁশীর চোখে এবার অনুসন্ধিৎসা ফুটল। মানিকের উৎফুল্ল উত্তেজিত মুখে তাকিয়ে বলল-বড় যে তাড়া। ব্যাপারটা কি ?

মানিক বিরক্ত হল-আঃ, তুই তো আচ্ছা নাছোড় বান্দা। বলছি বিকেলে আসিস আমাদের বাড়ী সব বলব তখন ।

বাঁশী এবার মুখ ভার করল-উঃ, জাঁক কত। থাক আমি শুনতেও চাই না। না বল না বলবে। তা আমার কলসীটা যে ভাঙলে তার খেসারতটা কি দিতে হবে না ? হাতেনাতে পাওনা মিটিয়ে দাও নইলে ছাড়ছি না। আমিও 'মোগো' মেয়ে (সেকালে মগ ফিরিঙ্গী কোন মেয়েকে স্পর্শ করলে তাকে 'মোগো' বা ফিরিঙ্গী-ছোঁয়া বলে সমাজে একঘরে করে দেওয়ার কড়া নিয়ম প্রচলিত ছিল হিন্দু সমাজে)।

সিক্তবাসনা উদ্ভিন্নযৌবনা বাঁশীর দিকে তাকিয়ে চোখের দৃষ্টি মুগ্ধ স্নিগ্ধতায় কোমল হল মানিকের। মৃদু হেসে বলল-তুই নিজেকে সব সময় অমন 'মোগো মেয়ে' রটিয়ে বেড়াস কেন রে ?

বাঁশী বাঁকা ঠোঁটে মোচড় দিয়ে ঝিলিক তুলে হাসল বা রে। মগ ছুঁয়েছে বলে সবাই আমাকে একঘরে করেছে। জঙ্গলের ধারে ভাগাড়ের কাছে কুঁড়েতে থাকি । পথ দিয়ে হেঁটে গেলে ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত পেছন থেকে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে বলে 'মোগো পরী'। তা' এ কিন্তু মন্দ হয়নি মানিক দাদা। বলতে পারো এ আমার শাপে বর। কুলীন বামুনের মেয়ে আমি। পাল্টা কুলীন ঘরে বিয়ে দিতে গিয়ে বাবা হয়তো আমায় ঘাটের মড়া কোন বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিত। আর বুড়োটি একদিন পটল তুললে সবাই মিলে ধরে বেঁধে আমায় চিতায় তুলে জীবন্ত পুড়িয়ে 'সতী' বানাত। যাক বাবা এই ভালো। ভাগ্যি আমায় মগ ছুঁয়ে দিয়েছিল তাই সারা জীবনেও আমার আর বিয়ে হবে না।

বাঁশীর বলার ভঙ্গীতে সরলতা থাকলেও কোথায় যেন হৃদয় স্পর্শ করা অসহায়তার আকুতি ছিল। সেই দুঃখের সুরটা স্পর্শ করল মানিককেও। কিছুক্ষণের জন্য উন্মনা হয়ে গেল মানিক। মনে পড়ল খুব বেশীদিনের ঘটনা নয় । কয়েক বৎসর আগের কথা। সেদিন বুঝি ছিল কি এক মেয়েলী ব্রত উদযাপনের দিন। মেয়েরা দল বেঁধে কুলায় নৈবেদ্য সাজিয়ে নদীর ধারের মন্দিরে গেছে পূজা দিতে। সুন্দর নির্মল সকালের আকাশটায় যেন কোন ক্ষুধার্ত শিকার অনুসন্ধানী ভয়াবহ বাজের ছায়া পড়ল। দস্যু মগদের একটি দল

বিদ্যুৎগতিতে নৌকার বহর নিয়ে নদীতীর ছেয়ে ফেলল। মন্দির চত্বরে মেয়েরা ভয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটে পালাতে লাগল। বাঁশীও ছিল মেয়েদের মধ্যে। ছুটে আসা মগ দুর্বৃত্তদের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মন্দিরসংলগ্ন দীঘিতে। ডুবে রইল অনেকক্ষণ। ওপরে এক ভয়াবহ কাণ্ড চলেছে। কিছু সময় ডুবে থাকার পর একসময় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসায় মাথা তুলে ভেসে উঠেছিল বাঁশী। ঠিক সেই সময়েই একটি মগ দস্যুর চোখে পড়ে গিয়েছিল সে। দস্যুটি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দীঘিতে। বাঁশী তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে আবার ডুব দিয়েছিল পানির নীচে। সম্ভবত বেশ অনেকক্ষণ ডুব সাঁতার কেটে দস্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য দীঘির জলের নিচে তোলপাড় করে একসময় অচেতন হয়ে পড়েছিল বাঁশী। মগদস্যু তার চুল ধরে সাঁতরে ঘাটের পাড়ে নিয়ে এসেছিল। ওদিকে তখন ফৌজদারের সেনারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে মন্দিরের চারিদিকে ঘেরাও করে ফেলেছিল। কিছু সংখ্যক দুর্বেত্ত নৌকায় উঠে পালিয়ে গেলেও বাকিরা বন্দী হয়েছিল মোঘল সেনাদের হাতে। যে দস্যুটি বাঁশীকে চুল ধরে পাড়ে নিয়ে এসেছিল সেও বন্দী হল। এক সময় বন্দীদের নিয়ে সেনারা চলে গেলে লোকজন ভীড় করে এল। বাঁশী তখনও অচেতন হয়ে পড়েছিল ঘাটের ওপর। মানিকের মনে আছে সকলের কথা অগ্রাহ্য করে বাঁশীর দেহ মাথায় নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার পেটে জমা পানি ঝরিয়েছিল সে। কবিরাজ ডেকে এনে ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করেছিল। মানিকের মা-বাবা বন্ধু প্রতিবেশীর ভর্ৎসনা করেছিল ‘মোগো’ মেয়ের জন্য বাড়াবাড়ি করায়। বাঁশীর মা-বাবা সজল চোখে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। আর বাঁশী জ্ঞান ফিরে পেয়ে দুর্বল কণ্ঠে বলেছিল- মানিক দাদা, আমি তো এখন 'মগ' ছোঁয়া মেয়ে, আমাকে কেন বাঁচিয়ে তুললে। আর আমার জন্য এত ছুটোছুটিইবা করছ কেন। আজ থেকে আমি সমাজ ছাড়া হলাম। বাবা- মা আমায় ঘরে তুলবে না। কেউ আমার ছোঁয়া খাবে না। কোন দিন আর স্বামী- সংসার হবে না ।

বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল বাঁশী। বলেছিল-আমি গলায় কলস বেঁধে আবার ওই জলেই ডুবে মরব। মানিক ধমকে উঠেছিল-কি পাগোলের মত বকছিস। তোকে মরতে দিলে তো আমি ।

চমকে বিস্মিত দৃষ্টি ফেলেছিল মানিকের মুখে বাঁশী। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—কিসের জোরে ?

মানিকের তখন কোন কিছুরই খেয়াল ছিল না বোধহয়। আচমকা বলে ফেলেছিল—মনের টানের জোরে ।

বাঁশী দৃষ্টি নত করে সন্তর্পণে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল-তোমার মাথা খারাপ হয়েছে মানিক দাদা ।

এই মুহূর্তে মানিক ভাবল সে দিন বোধহয় সত্যিই তার মাথা খারাপ হয়েছিল। তা না হলে সে ছোটজাতের ছেলে হয়েও একটা মগস্পর্শ দুষ্ট বামুনের মেয়েকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য এমন ব্যাকুলতা কেন অনুভব করেছিল। আর কিইবা করতে পেরেছিল সে। বাঁশীর বাবা-মা সমাজের ভয়ে মেয়েকে ঘরে তুলতে পারে নি মাঠের একধারে কুঁড়েতে থেকে হাটে বাঁশের আর বেতের তৈরী জিনিসপত্র বিক্রী করে দিন কাটায় সে। আর মানিক আশ্চর্য হয়ে দেখল মেয়েটার পরিবর্তন। মা-বাপ পরিত্যাজ্য কলংকের ছাপ নিয়ে সেই লাজুক মেয়েটি দিনে দিনে কেমন মুখরা প্রখর রুক্ষ হয়ে উঠল । অথচ তার মনোমোহিনী রূপের দিকে তাকালে যে-কোন পুরুষেরই বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে। মানিক তো নিজের মনের খবর নিজেই জানে ।

ভাঙা কলসীর টুকরোগুলো কুড়িয়ে এক জায়গায় জমা করে মানিকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল বাঁশী-কি হল মানিক দাদা। হঠাৎ অমন থমকে চুপ করে গেলে কেন ? তোমার শুভ কাজে সত্যি কি বাধা দিলাম ?

মানিক চমকে ফিরে তাকাল। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল-হ্যাঁ রে। তোর কলসীটা ভেঙে ফেলায় সত্যি মন খারাপ হয়ে গেছে ।

বাঁশী তার স্বরূপে ফিরে গেল। মুখে চোখে বিদ্রূপের ঝলক তুলে বলল-মিথ্যে বলবার আর জায়গা পাওনি। ঠিক আছে যাও তুমি। অপয়া মেয়েকে বেশীক্ষণ দেখলে শুভ কাজে বাধা পড়বে ।

এবারে সত্যিই হেসে ফেলল মানিক-ওই দ্যাখ অমনি রাগ করলি তো। কেন কাদা দিয়ে তোর যে মূর্তিটা তৈরী করে আমার ঘরে রেখেছি সেটা বুঝি দিন রাত দেখছি না ! এবার দেখিস পাথর খোদাই করে চমৎকার একটা মূর্তি গড়ে দেব। অনেক দিন থেকে মনে বড় সাধ তোর একটা শ্বেত পাথরের মূর্তি গড়ি। গড়ব আমি ঠিকই দেখে নিস তুই ।

বাঁশীর মুখের ওপর দিয়ে ম্লান ছায়া ভেসে গেল ।

ম্রিয়মাণ কণ্ঠে সে উচ্চারণ করল-তুমি এখন যাও মানিক দাদা। তোমার বোধহয় অনেক দেরী হয়ে গেল ।

আর দাঁড়াল না বাঁশী। ভেজা শাড়ীতে শব্দ তুলে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ।

সেদিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত কেমন এক প্রকাশহীন বেদনার অভিব্যক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে রইল মানিক। দূরে তখনও ফরমানদারদের দামামা শোনা যাচ্ছে। 'বাদশাহ তার প্রিয়তমার সমাধির ওপর অভূতপূর্ব বিস্ময়কর শিল্পকলা খচিত মর্মরপ্রাসাদ গড়ে তুলবেন।'

সাত

দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত প্রায়। জাহাঙ্গীর নগরের প্রান্ত ছোঁয়া নদীর ঘাটে বৃহদাকৃতির একটি সাম্পান থেমে আছে। নদীর ঘাটে আজ বহুলোকের সমাগম হয়েছে। যাত্রীরা অনেকেই সাম্পানে উঠে পড়েছে। ঘাটের বাঁধান সিঁড়ির ওপর নদীর মৃদু তরঙ্গ এসে ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলছিল মানিক। মা বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে আজ দিল্লীতে যাত্রা করছে। সম্রাট পত্নীর সমাধির ওপর যে প্রাসাদ তৈরী করবার জন্য শিল্পী নির্বাচন করা হয়েছে এখান থেকে তার মধ্যে মানিকও একজন। গর্বে খুশীতে বৃদ্ধ চণ্ডুর বুকটা যেন দশহাত হয়ে উঠেছে। ঘাটের ওদিকটায় একটা শৌখিন বজরা এসে ভিড়ল। সম্ভবত কোন জায়গীরদার বা স্থানীয় কোন রাজ কর্মচারী হবেন তার আরোহী। বজরা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। বজরা থেকে চোগা চপকান পরা সুপুরুষ এক পাঠান আরোহী বেরিয়ে এলেন।

সকলে গুঞ্জন তুলল-আরে এ যে নুরুল্লাপুর পরগনার জায়গীরদার ।

রইস আরোহীর সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন বের হল। তাকে দেখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল চণ্ড। সহসা তার মনে পড়ল আরে এতো সেই হুঁকাবরদার। সেই যখন তার শরবতের দোকান ছিল তখন আলাপ হয়েছিল। এরপর সে হয়ে গিয়েছিল চতুর একরকম বাঁধা খরিদ্দার। জাহাঙ্গীরনগরে এলেই সে চণ্ডুর দোকানে আসত ।

চণ্ডু চীৎকার করে ডেকে উঠল-ও ভাই, এই যে এদিকে একটু দয়া করে শুনে যাবেন ।

হুঁকাবরদার শুনতে পেয়েছিল। তার মনিব নীচে নামতে এক ফাঁকে সে চতুর কাছে এল—এই যে কি খবর। তা কোথাও যাওয়া হচ্ছে না কি ?

চতুর মুখ হাসিতো উজ্জ্বল হল। গর্বিত কণ্ঠে বলল-আমার ছেলে খোদ বাদশাহ শাহজাহানের মেহমান হয়ে দিল্লী চলেছে। সেখানে কাজ করবে। ইনাম পাবে, হয় তো বাদশাহ খোশ হলে জায়গীরও মিলে যেতে পারে।

হুঁকাবরদারের মুখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল। অবাক দৃষ্টিতে মানিকের আপাদমস্তক তাকিয়ে অবিশ্বাস্য কণ্ঠে বলল- কেন হে তোমার ছেলে কি আরবী ফারসী এলেম শিখে আলেম হয়েছে না কি যে খোদ বাদশাহ ডেকে পাঠিয়েছেন!

এবারের কথা বলল মানিক। বিনীত লাজুক ভঙ্গীতে বলল-আজ্ঞে আমি আলেম হইনি, আমি একজন শিল্পী ।

হুঁকাবরদার বলল-তা' বেশ বেশ, সুখবর ।

চণ্ডু প্রশ্ন করল-দিল্লী যেয়ে পৌছাতে কটা দিন তো পথে কেটে যাবে। মুখের কথা তো নয়। রীতিমতো দূরপাল্লার পথ। এখন ভালোয় ভালোয় গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়। নৌকায় কতদিন থাকতে হয় কে জানে ।

হুঁকাবরদার সবজান্তা ভঙ্গীতে হাসল। বিজ্ঞোজনোচিত কণ্ঠে বলল-না, এত বড় শহরটায় থেকেও তুমি একেবারে বংগালই রয়ে গেলে। আরে বাবা এ তো সবাই জানে পাঠান শের খাঁ সারাটা হিন্দুস্থানের বুকের উপর দিয়ে পথ ঘাট তৈরী করে রেখে গেছে। কত চওড়া সে সব পথ ঘাট। আটটা ঘোড়সওয়ার পাশাপাশি ছুটে যেতে পারে। এখান থেকে নৌকা গিয়ে ভিড়বে গৌড়ে। সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়ী আছে, পালকী আছে, হাতীর হাওদা আছে। একটিতে চড়ে বসলেই হল। আর বাদশাহর মেহমানরা যখন যাচ্ছে তখন তো কথাই নেই। পথে ধারে ধারে সরাইখানা। গাড়ী বদলীর আড্ডা। আর কত বড় বড় গাছ লাগিয়ে রেখে গেছে। ওই পথ দিয়ে আমাদের হুজুরের সঙ্গে একবার রাজমহল পর্যন্ত গিয়েছিলাম। তাজ্জব ব্যাপার তাই এই বংগালের সীমানা থেকে শুরু করে একেবারে হিন্দুস্থানের উত্তরের শেষ মাথা পর্যন্ত রাস্তা। বাপরে সোজা ব্যাপার নাকি ।

চণ্ডু ও হুঁকাবরদারের আলাপের স্থান থেকে একটু দূরে সরে এল মানিক। ঘাট থেকে কিছুটা দূরে। লাল পাড় ঝরনা শাড়ী পরে দাঁড়িয়ে আছে বাঁশী।

মানিকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে ম্লান বিষণ্ণ একটু হাসল। মানিক সবার দৃষ্টির আড়াল থেকে সরে গিয়ে বাঁশীর সামনে দাঁড়াল ।

ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে বলল-তুই তাহলে এসেছিস বাঁশী ! তোর কথাই বার বার মনে পড়ছিল। ভাবছিলাম তুই বোধ হয় আসবি না ।

ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়ল বাঁশীর সারা মুখে। মৃদু কণ্ঠে বলল-আমার মত হতভাগী অপয়ার মুখ দর্শন করে যাত্রা করলে কি শুভ হবে মানিক দাদা ?

মানিক ব্যথিত হল। বলল-ছিঃ, এসব কথা তুই কেন বলছিস বাঁশী ! তোকে আমি কত যে ভালোবাসি তা কি আজও বুঝতে পারলি না ।

বাঁশী দৃষ্টি নত করল। চোখ না তুলেই অস্ফুট কণ্ঠে বলল-জানি। তুমি আমায় ভুলে যাবে না তো মানিক দাদা ?

মানিক বিষণ্ণ হাসল-কোন দিন নয় রে বাঁশী। কোন দিন নয় আর-

মানিকের কথা শেষ হল না। মাল্লারা ডাকাডাকি শুরু করল যাত্রীদের। নৌকা ছাড়বার সময় হয়েছে।

চণ্ড ঘাট থেকে চেঁচিয়ে ডাকল-কোথায় রে মানিক। আয়রে সময় হয়ে গেছে।

মানিক আর দেরী করল না। ছুটে এসে যাত্রীদের সারিতে দাঁড়াল। চণ্ডুর স্ত্রী একটা পোঁটলা তুলে দিল মানিকের হাতে। আঁচল দিয়ে চোখ ঢেকে কান্না রোধ করতে করতে বলল-বাবা মানিক, এ পোঁটলায় চিড়ে, পাটালী আর নাড়ু আছে, পথে এই দিয়ে জল খাস ।

চণ্ডু ধমকে উঠল— আঃ, থাম তো মানিকের মা। যাবার সময় চোখের জল ফেলে যাত্রা নষ্ট কোরো না তো।

মানিক গিয়ে নৌকায় উঠল। হুঁকাবরদার এক গাল হেসে চণ্ডুকে লক্ষ্য করে বলল-আরে ভাই কিসের চিড়ে নাড়ুর জল খাবার। ছেলে তো তোমার এবার শাহী খানা খাবে। কোর্মা পোলাও জরদা ফিরনী......

মানিককে নিয়ে নৌকা তখন ছেড়ে দিয়েছে।

মানিক গলুয়ের সামনে একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল। সেদিকে নির্মিমেষে

তাকিয়ে রইল চণ্ডু, চণ্ডুর স্ত্রী আর বাঁশী

ধীরে ধীরে নৌকা দূরে সরে যেতে যেতে এক সময় দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। আকাশে এক ঝাঁক গাঙ কবুতর উড়ছিল সেদিকে তাকিয়ে বাঁশীর মনে হল অমন নিরুদ্দেশের পাখায় ভর করে তার একমাত্র বন্ধু, একান্ত আপন জন বুঝি হারিয়ে গেল অনেক দূরে ।

আট

বংগাল দেশের আকাশে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত বারবার নানা রঙের ঝলকে রঙিন হয়ে ওঠে। পদ্মা যমুনা মেঘনা ভাঙাগড়ার খেলার মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হয় সোনার বংগালের সীমানা। বংগালের কৃষক ফসল কাটে, তাঁতী তাঁত বোনে, কুমার হাঁড়ী, কলস গড়ে, জেলে মাছ ধরে, বণিক আর সওদাগরেরা বাণিজ্যের পশরা নিয়ে ভেসে যায় দূর দূরান্তে। কিন্তু রদবদল হয় শাসন ব্যবস্থায়। আজ যে আছে কাল সে নেই । বংগালরা ক্ষেতে হাল চাষ করতে করতে ফরমানদারের ফরমান জারীতে ক্ষণেক কান পেতে নিরুৎসাহে বলে- নতুন সুবেদার এল বুঝি ! পরক্ষণের দামামার শব্দ বাতাসে যাবার আগেই বলে-এবার বৃষ্টি পেলে এদিকে ফসল খুব ভালো হবে ।

আরেকদিকে গড়ে ওঠে এক অভিজাত সম্প্রদায়। তারা শাহী মেজাজের খবর রাখে। বলে-আহ এমন সুখ আর এদেশে কবে হয়েছিল। আল্লাহর তরফ থেকে এ দেশের হাল হকিকতের মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যই বুঝি মোঘল বাদশাহরা ভাটি বংগালকে সুবা-ই বংগাল করে হাতে তুলে নিয়েছিল ।

আর দুমশন দুর্মুখ সুযোগ সন্ধানীরা আড়ালে ঘোট পাকায়.....-আরে বাদশাহ শাহজাহান এক তাজমহল তৈরী করতে তামাম জাহানের হীরা জহরত খরচ করেছে। ওদিকে দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মানুষ যে ধুঁকছে সে খবর রাখো ? তার ওপর দেখ না ইংরেজ বণিকদের কুঠি তৈরী করতে দিয়েছে সাতগাঁয়ে। সে ব্যাটারা তো নজরানা আর ভেট পাঠিয়ে বাদশাকে খুশী রেখে মজায় ব্যবসার সুযোগ লুটছে। তবে হ্যাঁ হুগলীতে পেটান দিয়েছে বটে ফিরিঙ্গীদের। এতদিন পরে বাছাধনরা ঘুঘু ধরার ফাঁদ দেখেছে। একেবারে নির্বংশ ।

টিপ্পনীকারীদের কয়েকজন বলে- ওদিকে না হয় শায়েস্তাখান ফিরিঙ্গী মেরে শায়েস্তা করল, এদিকে খাল কেটে আরেক কুমীর যে এসে পড়ল !

-কি রকম ! কি রকম !

-কি রকম আবার ! এক কথা কে না জানে বাদশাহজাদী রওশন আরার শরীরে আগুন ধরে পুড়ে ঝলসে গিয়েছিল। হেকিমি এলাজে কোন ফল তো হচ্ছিল না । শাহজাদী রোগ যন্ত্রণায় কেঁদে খুন। আগুনে ঝলসানো বীভৎস চেহারা নিয়ে তিনি বেঁচে থাকতে রাজী নন। তখন এসে দাঁড়াল এক ইংরেজ হেকিম । বলল-শাহজাদীর চিকিৎসার ভার আমি তুলে নিলাম। আমি ডাক্তার।

কিন্তু তা কেমন করে হবে ! পর্দানশীল মোঘল অন্তঃপুরিকার সুরত দেখবে ভিনদেশী ভিনজাতের বেগানা পরপুরুষ ! কিন্তু কি আর করা। জানের চেয়ে তো আর কিছু বড় নয় । জান বাঁচান ফরজ। তারপর তো ভেল্কিবাজী । ইংরেজ ডাক্তারের চিকিৎসায় শাহজাদী সুস্থ হয়ে নতুন জীবন পেলেন ।

বাদশা খুশী হয়ে ইংরেজ হেকিমকে প্রশ্ন করলেন-কি ইনাম চাই ? সোনা রূপা হীরা জহরত আশরফী কত দরকার ?

বিদেশী হাঁটু মুড়ে বিনীত প্রার্থনা করল, সোনা দানা হীরা জহরতে তার দরকার নেই। খালি ইংরেজ বণিকদের দিতে হবে ব্যবসায় করবার সুবিধা আর কুঠি তৈরী করবার হুকুম।

শাহজাদীর প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। বাদশাহ তো পারলে তার বদলে তামাম জাহানটাই দিয়ে দিতেন। কুঠি নির্মাণ করবার প্রার্থনা মঞ্জুরীতে দেরী হল না। কিন্তু ব্যাপার দেখো ব্যবসায় ফরাসী ওলন্দাজ দিনেমার সবার চাইতে আখের তৈরী করে নিচ্ছে ইংরেজরা। বাদশাহর নেক নজর আছে যে ।

দিল্লীর হাওয়ায় হাওয়ায় নানা মুখরোচক খবর আর গুজব ভেসে বেড়ায়। কিন্তু আগ্রায় যমুনা তীরে নির্জন কুটিরে বসে এক যুবক নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে যমুনার নীল জলের উপর প্রতিবিম্ব ফেলে দাঁড়িয়ে থাকা শ্বেত মর্মর অপরূপ প্রাসাদ তাজমহলের দিকে। বাদশাহ শাহজাহানের প্রিয়তমার সমাধির ওপর নির্মিত প্রাসাদের নামকরণ হয়েছে তাজমহল ।

সন্ধ্যায় নীল আকাশে ঝিকমিক করে জ্বলে অসংখ্য তারা। যেন নীলাম্বরী শাড়ীতে সোনার আভা বিস্তার করে সাচ্চা জরির কারুকার্যের ঝলক। রূপসীর বাঁকা হাসির মত এক ফালি চাঁদ যমুনার বুকে আবছা আলোর ঢেউ তোলে। বিরহীর দীর্ঘশ্বাসের মত হালকা হাওয়ায় গাছপালা আন্দোলিত হয়ে মর্মর ধ্বনি

জাগায়। রাত গভীর হয়। আকাশে আরো তারা ফোটে। উল্কা ঝরে যায়। কুটির প্রাঙ্গণে বাঁশীর করুণ সুর বেজে ওঠে। বাঁশী বাজায় বসে মানিক। নদীর বুকে হাওয়ায় সুর ছড়িয়ে পড়ে।

বাঁশীতে বংগাল রাগে মেঠো সুর ঢালতে গিয়ে মানিকের দুচোখ সজল হয়ে ওঠে। মনে পড়ে দেশের কথা। মা-বাবা আর বাঁশীর কথা। এখানে সে যখন তাজমহল তৈরীর শিল্প কারুকার্যে মন ঢেলে নিজেকে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল, ভুলে গিয়েছিল সবার কথা—তখন কেমন করে যেন একটি একটি করে বছর পার হয়ে গিয়েছিল একটুও বুঝতে পারেনি। তারপর একদিন যখন কাজ শেষ হল তখন বাইরে তাকাবার অবকাশ পেল মানিক। নিজের কাজে ক'টি বছর সে এত মগ্ন হয়েছিল যে মা-বাবা আত্মীয় বন্ধু কারো খবর নিতে পারেনি ।

বাদশাহের ইনামের অপেক্ষা না করেই সে ছুটেছিল দেশে। আর দেশে গিয়ে দেখল সবাইকে সে হারিয়েছে। মহামারীতে মরেছে মা-বাবা দু'জনেই। আর তার প্রিয়তমা বাঁশী মানিকের পথ চেয়ে অপেক্ষায় দিন গুনে গুনে অবশেষে নিজের গ্লানিময় জীবনের বোঝা আর বইতে না পেরে একদিন কোন এক রইস পয়সাওয়ালা লোকের বজরায় উঠে তার হারেমের বাঁদী হয়ে গেছে। দেশে মন টেনে নি মানিকের। শূন্য বুক নিয়ে সে আবার আগ্রাতেই ফিরে এসেছিল। তাজমহলের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর বাঁশীর একটি মর্মর মূর্তি তৈরী করেছিল মানিক। নিখুঁত নিটোল ভাস্কর্যটি তার হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসার স্পর্শে যেন সজীব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কোথায় বাঁশী। তাকে তো সে খুঁজে পায়নি। ব্যর্থ মানিক বাঁশীর মর্মর মূর্তিটি সযত্নে ঘরের একধারে রেখে দিয়েছে। তার হাতের তৈরী বাঁশীকে সে হারায় নি। বাদশাহর অনুগ্রহে সে আগ্রাতে যমুনার ধারের বাসস্থানটুকু পেয়েছে। আর কোন পুরস্কারই সে নেয় নি ।

আজো সন্ধ্যার পর নদীর ধারে এসে উদাস মনে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল মানিক। ঝিরঝিরে বাতাসে গাছপালা মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না দূরে তাজমহলের শুভ্র গম্বুজের ওপর অজস্র ধারায় আলোর দাক্ষিণ্য ঢালছে। দূরে কোথায় যেন ময়ূরের কেকা রব শোনা গেল । কুল কুল শব্দে তরঙ্গ তুলে বয়ে চলেছে যমুনা। সহসা কার মৃদু পদধ্বনি জাগল মানিকের পেছনে। কম্পমান ছায়া পড়ল চন্দ্রালোকিত জলের ওপর। ছায়ামূর্তিটি কায়া হয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। একটি নারী এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে মানিকের

পাশে। মানিক মুখ ফিরিয়ে তাকাল- কে ?

নারী মূর্তি তার সারা অংঙ্গের আভরণে জ্যোৎস্নার ঝিলিক তুলে আশ্চর্য মায়াবী কণ্ঠে বলল-

-আমি গুলরুখ ।

এবারে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল মানিক ।

গুলরুখের পরনে রক্তলাল মখমলের সালোয়ার। চুমকি বসান লাল রঙের রেশমী কামিজ । কুয়াশার মত হালকা ওড়নায় তার মুখ ঢাকা ।

মানিক সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলল-আবার তুমি এসেছ গুল ? তোমার কি ভয় বলতে কিছু নেই ?

ঝরনার জলধারার মিষ্টি মত মধুর কণ্ঠে হাসল গুলরুখ। হাসির ছন্দে তার সারা শরীর হিন্দোলিত হল। ওড়না খসে গিয়ে তার জরি চুমকি সজ্জিত সযত্নে রচিত দীর্ঘ বিনুনী দুলে উঠল। মানিকের পাশ বসে পড়ল গুলরুখ। ঠোঁটে হাসির রেশ ধরে রেখে বলল-জানো মহলের পাহারাদারগুলো আমার কত তাঁবেদার ! হারেমে তো কত মেয়ে আছে। কই কেউ পারে এমন ফুটফুটে চাঁদনীর মধ্যে দিয়ে অন্দরের কড়া পাহারা এড়িয়ে বেরিয়ে আসতে !

তাছাড়া জানো না বুঝি আমি শাহাজাদী জাহান আরার খাস বাঁদী ! মানিক সন্তর্পণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল-জানি সবই জানি। তুমি এক মহিয়সী নারী। কিন্তু এই অধম দীনের ওপর তোমার এত করুণ কেন গুলরুখ ?

গুলরুখের হাসিতে এবার বেদনা ফুটল- আমার ব্যবহারে তুমি কি কেবলই করুণাই দেখল । আশ্চর্য !

-নয় তো কি। তুমি এক শাহী হারেমের খুবসুরত আওরত। গোলাপের পানিতে স্নান কর। কস্তুরী মৃগীর সুবাসিত....

মানিককে থামিয়ে দিল গুলরুখ। বেদনাবিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল-মানিক ! বনের স্বাধীন পাখীকে সোনার পিঞ্জরায় আটক করে রাখলে সে কি নীল আকাশের স্বপ্ন ভুলে যায় ? যখন তোমরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাদশাহের প্রিয়তমার সমাধির ওপর প্রাসাদ নির্মাণ করেছ তখন কি একবারও তোমাদের মনে হয়েছে অতি সাধারণ মানুষের রক্ত পানি করা টাকায় এর দুষ্প্রাপ্য হীরা

জহরত জোগাড় হচ্ছে ! মানিক তুমি বংগালদেশের মানুষ। শুনেছি তোমার দেশ নাকি সোনার দেশ। তাই বোধহয় অভাব কি তা জানো না। তুমি কি জানো গুজরাট, খান্দেশ দাক্ষিণাত্যের দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মরেছে। তুমি কি জানো আমার চাচা পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সামান্য কিছু গমের বদলে আমাকে দালালের কাছে বিক্রী করেছিল। তাই তো, হ্যাঁ তাই তো ওই শাহী আমিরিয়ানাকে আমি ঘৃণা করি । ঘৃণা করি মানুষের খুন চুষে নেওয়া টাকায় তৈরী ওই মহলকে, ওই সব বড় বড় শানদার মশনদ মোকামকে ।

দূরে আকাশের এক কোণে মসলিনের টুকরোর মত এক খণ্ড মেঘ ভেসেছিল। সেদিকে চোখ রেখে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল মানিক। তারপর ধীরে ধীরে বলল-গুল। বংগাল দেশের সব মানুষকে তুমি ধনী রইস ভেব না। যেখানে এই ধনী আয়েশী আমীর ওমরাহরা আছে সেখানেই সাধারণ মানুষের আছে দুঃখ-দারিদ্র্য, ক্ষুধার জ্বালা আর অসম্মান। এদিক দিয়ে সব দেশের খেটে খাওয়া মানুষগুলোর একই অবস্থা ।

গুলরুখের কণ্ঠের উত্তেজনায় সঙ্গে বিদ্রূপের ঝিলিক ঝলসাল-এত মানুষের কষ্ট বদদোয়া হয়ে কি লাগে না ওই হাসি খুশী আমোদ স্ফূর্তিতে ভরপুর শাহীখানায় ।

মানিক অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিল-কি যেন হয় তো লাগে। হয় তো লাগে না। সারা শরীরে ঝাপটা তুলে গুলরুখ ভয়ংকর হাসল-লাগে। আমি জানি লাগে । জানি তো শাহী মহলের খবর। শান্তি নেই। শান্তি নেই। বাদশাহ শাহজাহান বুড়ো হয়েছেন। ওদিকে শুরু হয়েছে ষড়যন্ত্র। বংগালের সুবেদার সুজা, আরেক দিকে শাহজাদা আওরঙ্গজেব আর ওদিকে মুরাদ। ময়ূরসিংহাসনের ঝলকের নেশায় কারো চোখে আর ঘুম নেই। এর ওপর রওশন আরা আর জাহান আরা দুবোনের তো মুখ দেখাদেখি বন্ধ ।

মানিক নির্বিকার হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বলল-সিংহাসনে তো কত রাজা বাদশাহ আসে যায়। কিন্তু তাতে তোমার আমার মত মানুষের কি হয় বল গুলরুখ ?

গুলরুখ দৃষ্টি না ফিরিয়ে পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে জবাব দিল-ধরতে গেলে হয় না কিছুই আমরা পেট ভরে দুটো খেয়ে নিশ্চিন্ত ঘুমুতে পারলেই হয়তো শান্তিতে

থাকতাম । কিন্তু আল্লাহর কি মর্জি জানি না, সব দুঃসময়ে দুঃখের বোঝা যে আমাদেরই বইতে হয়।

যমুনার বুকে চিকমিক করে জ্বলছে চাঁদের আলো। গুলরুখ তার সুরমা সুশোভিত টানা চোখ দুটি মেলে ধরল মানিকের চোখে। অদ্ভুত স্বপ্নিল কণ্ঠে বলল-বংগাল ! বাজুতে যে তোমার কত শক্তি আছে তার প্রমাণ তো কোন দিন দিলে না ।

মানিক সচকিত দৃষ্টি ফেলল গুলরুখের চোখে—তুমি কি বলতে চাচ্ছ গুল ?

গুলরুখ জলতরঙ্গের সুর তুলে হেসে উঠল—কম বখত নওয়োয়ান এতদিন দিল্লী আগ্রায় থেকেও বাজুর জোর কি তা বুঝলে না ? শুনেছি বংগালরা না কি খুব বুদ্ধিমান হয়।

মানিক হেসে ফেলল-সোজা করে বল। জানো তো বংগালরা সোজা কথার মানুষ ।

-জানি গো জানি। তবে বল কতদিন আমি আর ওই সোনার পিঞ্জরায় বন্দী থেকে নিরুপায় পাখীর মত মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে ডানা ঝাপটে মরব। তোমার বাজুর শক্তি কি আমাকে এ খাঁচা ভেঙে বাইরে আনতে পারে না !

মাথা নত করে রইল মানিক ।

গুলরুখ মানিকের একটা হাত ধরে ব্যাকুল ঝাকুনি দিল-বল, চুপ করে আছ কেন ! বল, জবাব দাও ।

মানিক মাথা নত করেই বলল-জবাব আমার জানা নেই ।

একটা ঝটকায় উঠে দাঁড়াল গুলরুখ। পদ্ম পাপড়ীর মত রক্তিম স্ফুরিত অধর ঝকঝকে সাদা দাঁতে কামড়ে ধরে নিরুদ্ধ আক্রোশে বলল—কমবখত, কমিন, বেঈমান ।

আর দাঁড়াল না সে। সারা শরীরে ঢেউয়ের ঝাপটা তুলে ক্ষীপ্র পায়ে হেঁটে জ্যোৎস্নায় মিলিয়ে গেল ।

নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল নিরুপায় মানিক ।

নয়

আগ্রার রাস্তা দিয়ে মানিক হাঁটছিল। পেছন থেকে কে ডাকল। থমকে দাঁড়াল মানিক। তাকাতেই দেখতে পেল একজন হাবসী খোজা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। হাবসীর হাতছানিতে প্রথম হকচকিয়ে গেল মানিক। তারপর ক্রমশঃ ধাতস্থ হয়ে পথচারীর ভীড় ঠেলে হাবসী খোজার পাশে এসে দাঁড়াল ।

–কি ভাই । আমাকে ডাকছিলে ?

হাতের ইশারায় মানিককে একটা গাছের আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল হাবসী খোজা। তারপর একটা বোরকা বের করে বলল-এটা পরে নাও। তারপর চল আমার সঙ্গে।

হতভম্ব মানিক কিছুই বুঝতে পারল না ; কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে একবার হাবসীর দিকে একেবার বোরকার দিকে তাকাল, বলল- আমি যে এসবের কিছুই বুঝতে পারছি না। এই বোরকা আমাকে কেন পরতে হবে ? আর যাবইবা কোথায় ?

হাবসী গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল-তোমাকে কিছুই বুঝতে হবে না। চটপট বোরকাটা পরে নিয়ে চলে এস আমার সঙ্গে। আর একটিও সওয়াল করবে না। করলে বিপদ।

নিরুপায় মানিক বোরকা পরে দ্বিধান্বিত মনে হাবসীকে অনুসরণ করল।

এক সময় ইটের জালির নক্সা তোলা দেওয়ালের দু'ধারের মধ্যবর্তী গলিপথ পার হয়ে বিরাট চত্বরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল দু'জন। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য নারী কণ্ঠের মিলিত হাসির কালোচ্ছ্বাস যেন দিশেহারা করে দিল।

হাবসী মানিকের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল-সাবধান। মুখ দিয়ে একটি শব্দও বের করবে না। কেউ যেন বুঝতে না পারে তুমি পুরুষ। এখানে শাহজাহীর মহলে মিনাবাজার হচ্ছে। আমীর ওমরাহর বেগম আর খানদানী রইস-ঘরের মেয়েরা এসেছে। তুমি কে টের পেলে আর উপায় থাকবে না ।

হাবসী খোজা দূরে সরে যেতে মানিক অসংখ্য খুবসুরত মহিলাদের দুর্মূল মহার্ঘ শৌখিন বস্তু কেনা-বেচার হৈ-হুল্লোড়ে ভারী অসহায় বোধ করতে লাগল ।

হঠাৎ তার পাশে বাতাসে সুরভি ঢেলে একটি নারী মূর্তি ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। অস্ফুটে বলল-ভয় পেয়ো না। আমি গুলরুখ। এসো আমার সঙ্গে। শাহজাদী তোমায় ডেকেছেন ।

মানিকের যেন বিস্মিত হবার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছিল। নিঃশব্দে সন্তর্পণে নিজেকে ভীড় থেকে বাঁচিয়ে গুলরুখকে অনুসরণ করল। অনেক প্যাচাল অলি গলি আর শ্বেত মর্মর নির্মিত পিচ্ছিল উজ্জ্বল চত্বর পেরিয়ে একটি কক্ষের সামনে দাঁড়াল দু'জন। দরজার সামনে দু'জন প্রহরী উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে দাঁড়িয়েছিল। গুলরুখের পেছনে ভেতরে ঢুকল মানিক। পুরু রক্তলাল নক্সা তোলা গালিচা থেকে সে দৃষ্টি তুলতে পারল না ।

গুলরুখ ফিসফিস করে বলল-শাহজাদীকে কুর্নিশ কর বেওকুফ।

দ্রুত মাথা নত করে কুর্নিশ করে অবনত হয়ে রইর। অজান্তেই নিজের কণ্ঠ থেকে নির্গত হতে শুনল-বান্দা হাজির জনাব। আদেশ ফরমান ।

খিলখিল করে হেসে উঠল গুলরুখ।

সঙ্গে সঙ্গে এক অপরূপ বীণানিন্দিত কণ্ঠধ্বনি শুনতে পেল মানিক-চুপ বেশরম। কেন ওকে ঘাবড়ে দিচ্ছিস। তুমি বোরকার নেকাব সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও মানিক । এখানে তোমার আর কোন ভয় নেই ।

মানিক সোজা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তার দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে রইল জরিচুমকীর কারুকার্য খচিত অপূর্ব দু'টি নাগরায় বন্দী সুকোমল পদপ্রান্তে ।

শাহজাদী জাহান আরা অল্প শব্দ তুলে হাসলেন। তারপর তার হাতে ধরা ফারসী কাব্যগ্রন্থটি পাশের শ্বেতপাথরের ত্রিপয়ার ওপর রেখে বললেন-মানিক তোমার সব খবরই আমি গুলরুখের কাছে শুনেছি। তুমি কি গুলরুখকে চাও?

মানিক এই মুহূর্তে এমন প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না ।

গুলরুখ কলোচ্ছ্বাস তুলল- জনাব বান্দীর গোস্তাখী মাফ করবেন। ও বড় লাজুক। মুখ ফুটে সব কথা বলতে পারে না। আমি ওর হয়ে বলছি আমরা দু'জনেই দু'জনকে চাই ।

শাহজাদী আবার হাসলেন-বেশ। গুলরুখকে আমি তোমার হাতে তুলে দিতে রাজি আছি। কিন্তু এক শর্তে। গুলরুখকে নিয়ে তোমার বংগাল মুলুকে যেতে

হবে। সেখানে সুবাদার শাহজাদা সুজার কাছে আমার পক্ষ থেকে একটা গোপনীয় খবর পৌছে দিতে হবে। কিন্তু সাবধান ! চারিদিকে আওরঙ্গজেবের চররা ঘুরছে। খুব সাবধানতার সঙ্গে এবং গোপনে কাজ করতে হবে তোমাকে। আর এতে যদি রাজী না থাক তবে এই মেয়ে মহলের মিনাবাজারে ঢোকার অভিযোগে এখনি তোমাকে কতল করা হবে ।

মানিকের আপাদমস্তক শিরশিরে অনুভূতি প্রবাহিত হল। মুখে কথা জোগাল না।

জবাব দিল গুলরুখ। বলল-আপনার হুকুম তামিল করার জন্য ও প্রস্তুত হয়ে আছে শাহজাদী ।

শাহজাদী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দৃঢ় উচ্চারণ করলেন-মুনাফেকীর শাস্তি কি তা ওকে বুঝিয়ে দিও গুলরুখ। আচ্ছা এবার ওকে অন্দরের বাইরে পৌছে দিয়ে এসো। সময় মত আমি সব ব্যবস্থা করে জানাব ।

খোজা প্রহরীর সঙ্গে শাহজাদীকে কুর্নিশ করতে করতে পিছিয়ে বেরিয়ে এল মানিক। গুলরুখও এল সঙ্গে। নিরাপদে বাইরে এসে বোরকা খুলে ফেলল মানিক। গুলরুখ তখনও তার সঙ্গে ।

মানিক তার দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত প্রশ্ন করল-এসব কি গুলরুখ ! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না !

কালো রেশমী ওড়নায় মুখের অর্ধাংশ ঢাকা গুলরুখের। ওড়নার বাইরে টানা দু'টি চোখে অনুনয় ফুটিয়ে গুলরুখ বলল- তুমি আর কিছু বোলো না, মানিক। সামান্য একটু কাজের বিনিময়ে আমি তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারব। আবার স্বাধীন জীবন হবে আমার। আমি যে তোমাকে না পেলে বাঁচব না। জওহর খেয়ে আত্মহত্যা করব।

মানিক এক মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল। তারপর বলল-আমাকে নিয়ে আরেকজনও যে অনেক আশা করেছিল। কিন্তু সে তো কিছুই পায় নি ।

গুলরুখের দুই চোখ দপ করে জ্বলে উঠল। চাপা স্বরে বলল-শোন মানিক হারেমের আওরত হয়ে আমি অনেক নিষ্ঠুরতা দেখেছি। তার চেয়েও বেশী নিষ্ঠুরতা সয়েছি। তাই নিষ্ঠুর হয়ে গেছি আমিও। মানিক আজো আমায় তুমি চেন নি ।

গুলরুখ আর দাঁড়াল না। ক্ষীপ্রগতিতে অন্দরমহলের দেয়ালের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল ।

মসজিদের মিনারের সুউচ্চ চূড়া থেকে মুয়াজ্জিনের সুললিত আজানের ধ্বনি ফজরের শিশিরসিক্ত বাতাস ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিগন্তরে। মানিকের দরজায় করাঘাতের শব্দ উঠল । উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বসে মানিক প্রশ্ন করল-কে ?

বাইরে চাপা কণ্ঠে কথার আওয়াজ শোনা গেল-দরজা খোল জরুরী দরকার আছে ।

মানিক কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইল। বাইরে আবার অসহিষ্ণু করাঘাত শোনা গেল। এবারে উঠে দরজা খুলল মানিক। কালো কাপড়ে ঢাকা দুটি মূর্তি ঢুকে পড়ল তার ঘরে । একজন কঠিন আদেশের সুরে বলল-বাইরে এসো কথা আছে ।

আরেকজন বলল-বাইরে দরকার নেই এখানেই বলে দাও। সময় খুব কম ।

প্রথম কণ্ঠস্বরের মালিক দীর্ঘকায় ব্যক্তি। গম্ভীর কণ্ঠে বলল-বাইরে ঘোড়া অপেক্ষা করছে। আর এক মুহূর্ত দেরী না করে বেরিয়ে পড়। বংগাল মুলুকে যেতে হবে তোমাকে । শাহজাদী জাহান আরার হুকুম ।

মানিক ভীতকণ্ঠে বলল-কিন্তু আমাকে কি করতে হবে সেখানে গিয়ে কিছুই তো জানতে পারলাম না ।

দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল—সে সব তোমার এখন জানার দরকার নেই। ঘোড়ায় বসে অপেক্ষা করছে গুলরুখ। সেও তোমার সঙ্গে যাবে। তার কাছ থেকে সবই জানতে পারবে। চলে এসো আর দেরী কোরো না ।

যন্ত্রচালিতের মত বেরিয়ে এল মানিক। দেখল তার কুটিরের সামনেই দু'টি ঘোড়া দাঁড়িয়ে পা ঠুকছে ।

মানিক একবার অসহায়ভাবে অপরিচিত সঙ্গী দু'জনের দিকে তাকাল-কিন্তু ভাই আমি যে ঘোড়ায় চড়তে জানি না ।

মানিকের কথায় একজন চাপা কণ্ঠে হাসল, বলল- বেওকুফ বংগাল । তুমি তো হে আওরাতের চেয়েও নাজুক। তবে যে শুনেছি বংগালরা লড়াকু জাত ।

দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি তার সঙ্গীকে থামিয়ে দিল

—রাখো রাখো এখন এতো ফজুল তামাশার সময় নেই। এদিকে সুবেহ সাদেক হয়ে এল। তুমি চলে এসো বংগাল । আমি সব ঠিকঠাক করে দিচ্ছি।

আগ্রার জনহীন পথে তখনও কুয়াশার ঝালর। আকাশে একটি দু'টি তারা তখনও চিকচিক করছে। পথের ওপর টগবগ শব্দ তুলে দু'টি ঘোড়া নগর-তোরণ পার হয়ে গেল। একটি ঘোড়ার পিঠে ওড়নায় মুখ ঢাকা গুলরুখ শক্তহাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। তার পেছনে বসেছে মানিক। আর একজন অশ্বারোহী তাদের পেছনের ঘোড়ায় চলেছে।

নগরের পথ ছাড়িয়ে যেতে কিছুটা ভোরের কুয়াশা কেটে প্রস্ফুটিত হল দিন। এক সময় সূর্য উঠল। আগ্রা শহর তখন অনেক পিছে। গ্রামের পর গ্রাম ছোট ছোট শহর পিছে পড়ে থাকে। অশ্বখুরে ধূলি ওড়ে। বেলা বাড়ে। চৌকিতে চৌকিতে ঘোড়া থামাতে হয়। গুলরুখের অশ্বারোহী সঙ্গী নেমে চৌকিদারের সঙ্গে কি সব কথাবার্তা বলে । তারপরই ছাড়পত্র মিলে যায়।

আবার যাত্রা। মাঝে মাঝে সরাইখানায় বিশ্রাম নিয়ে খাওয়া দাওয়ার পর আবার চলার শুরু। দিনের শেষে মকাই বজরা আর গমের ক্ষেতের পিছনে অসরল আঁকাবাঁকা রেখার টিলার আড়ালে সূর্য অস্ত যায়। তখন পথের ধারের জনপদের কোন আস্তানায় রাত কাটে। ভোর না হতেই ঘোড়সওয়ার রক্ষী ডেকে তোলে। আর দেরী নয়। সূর্য উঠবার আগে যাত্রা শুরু করতে হবে ।

পথে গুলরুখের কাছে ভাঙা ভাঙা খবর পায় মানিক। দারা, মুরাদ আর আওরঙ্গজেব যুদ্ধের জন্য অস্ত্র শানাচ্ছে। শুজা যেন এগিয়ে আসে যুদ্ধে। আওরঙ্গজেবকে দমাতেই হবে। এর জন্য জরুরী শলা-পরামর্শ দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন শাহজাদী জাহান-আরা। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। পথক্লান্ত অশ্বারোহীদের উদ্বিগ্ন যাত্রা যেন আর শেষ হয় না ।

তবু একদিন মধ্যাহ্নের বেলা অতিক্রান্ত হবার পর যাত্রীদের দৃষ্টপটে জেগে উঠল সজল শ্যামল সমতল এক ভূমি ।

গাছে গাছে অসংখ্য পাখীর কলরব, সবুজ ধানক্ষেতের বুক চিরে বয়ে যাওয়া আঁকাবাঁকা জল টলমল নদী আর খাল রূপালী আভায় চিকমিক করছে।

নদীতে ভেসে চলেছে অসংখ্য নৌকা। জেলেরা মাছ ধরছে। বিলে নেমেছে

বুনোহাঁসের ঝাঁক। বিলের ধারে ফুটে আছে লাল পদ্ম ।

মানিক দীর্ঘ পথক্লান্তি ভুলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে গুলরুখকে বলল-দেখো গুল, চেয়ে দেখো । এই আমার বংগাল। আমার পুণ্যভূমি ।

গুলরুখও মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখল-এমন খুবসুরত, এমন চোখ জুড়ান সবুজ তো আর কোথাও দেখি নি। সত্যিই সুন্দর ।

অশ্বারোহী সঙ্গী বলল-এবার তো নৌকায় উঠতে হবে। এখানে নদীর ঘাটের ধারের চৌকিতে ঘোড়া দুটো রেখে যেতে হবে। আর একটা দিন এখানে বিশ্রামও করে নেওয়া যাবে ।

নদীর ঘাটের কাছের চৌকিতে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল তিনজন ।

দুপুর পারহয়ে বিকেল নামতেই আকাশ ঘন নীল মেঘে আচ্ছন্ন হল । গাছপালা ঝোপঝাড় নিথর। আকাশের রং ক্রমশ ঘন নীল থেকে মসীবর্ণ ধারণ করল। গুরু গুরু গর্জনে মেঘ ডেকে উঠল। চোখ ধাঁধান আলো বিকিরণ করে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিত হয়ে। ভয়ে বিবর্ণ হল গুলরুখের মুখ। ব্যাকুল হয়ে মানিককে প্রশ্ন করল-কি সর্বনাশ। ভারী তুফান হবে না কি ।

মানিক নির্বিঘ্ন হাসল-ও কিছু নয়। এ রকম বড় ঝাপটা আমাদের দেশে হয়েই থাকে ।

শুকনো পাতা খড় কুটো ধূলি উড়িয়ে প্রচণ্ড জোরে বাতাস বইতে শুরু করল। সেই সঙ্গে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল ।

চৌকির মুসাফিরখানার বেড়া খুঁটি দুলে উঠল। এমন সময় ভীত চেহারা নিয়ে গুলরুখের ঘোড়সওয়ার রক্ষী ছুটে এল। বলল-এ দিকে যে মহা বিপদ। আমরা লক্ষ্য করিনি। অনেক আগে থেকেই আওরঙ্গজেবের চর ছদ্মবেশে আমাদের অনুসরণ করে আসছে। ওদিকের ঘরটায় এসে কিছুক্ষণ আগে ওরা আশ্রয় নিয়েছে। ওদিক দিয়ে হেঁটে আসবার সময় আমি ওদের কথাবার্তা শুনেছি। ওরা বেশ দলে ভারী।

আরো কয়েকজন সঙ্গে আছে। তারাও এসে পড়ল বলে। আমাদের এখুনি পালাতে হবে। অন্য কোন পথ কি তোমার জানা নেই বংগাল ?

মানিক উদ্বিগ্ন সংশয়ে বলল-কিন্তু এই ঝড় তুফানের মধ্যে কেমন করে বের

হবে ? তার ওপর সন্ধ্যা হয়ে আসছে ।

এবারে কথা বলল গুলরুখ-ঝড় তুফান যাই-হোক দুশমনের হাতে পড়ার চাইতে বাঘের পেটে যাওয়াও ভালো। আর দেরী নয় এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড় মানিক। এখান থেকে পালাতেই হবে ।

মানিক উঠল—চল দেখি গ্রামের দিকে আশ্রয় পাওয়া যায় কি না ।

প্রবল বৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল তিনজন। বড় সড়ক পারহয়ে বাঁশ ঝাড় সুপারী বন আর বেত ঝোপের ভেতর দিয়ে হেঁটে ক্ষেতের ওপর নামল, তখনই কোথা থেকে একটা তীর ছুটে এসে বিধল মানিকের সঙ্গীর পিঠে ।

তীর বিদ্ধ অবস্থায় মাটিতে গড়িয়ে পড়ল সে। তার বুক পিঠ রক্তে ভিজে উঠল। সেই অবস্থাতেই সে বলল-তোমরা পালাও দুশমন পিছু নিয়েছে-আমার জন্য ভেব না ।

মানিক দু'হাত দিয়ে তার সঙ্গীকে জড়িয়ে ধরল- তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে আমরা কেমন করে পালাব !

গুলরুখ পেছন থেকে মানিকের হাত ধরে সজোরে আকর্ষণ করল। মানিক ফিরে তাকিয়ে দেখল আশ্চর্য দৃঢ়তা আর কঠিন অভিব্যক্তিতে গুলরুখ যেন অন্য কোন অচেনা গুলরুখে রূপান্তরিত হয়েছে। চাপা কণ্ঠে গুররুখ বলল- ওকে ছেড়ে দাও, এক সঙ্গে তিনজন মরবার কোন অর্থ হয় না। চল আর একটুও দেরী নয়। কোন নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বের করতেই হবে।

মানিক অদ্ভুত বিতৃষ্ণা অনুভব করল গুলরুখের প্রতি। শুধু বলল-তুমি এত নিষ্ঠুর ।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকে নীলাভ আলোয় ধাঁধিয়ে দিল চতুর্দিক। সেই বিজলী ঝলসালো গুলরুখের চোখে মুখে—হ্যাঁ নিষ্ঠুর। প্রয়োজন হলে আরও নিষ্ঠুর হতে পারি ।

দশ

সুবা-ই-বংগালের আকাশ জুড়ে হাহাকার। প্রচণ্ড খরা আর অনাবৃষ্টিতে ধানের চারা শুকিয়ে লাল হয়ে গেছে। মাটি শুকিয়ে পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠেছে,

লাঙলের ফলা বসে না। কৃষাণেরা মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। তাঁতীর তাঁত বন্ধ। কুমোরের চাকা ঘোরে না, বাজার মন্দা। বংগালের সোনালী মসনদে বসে যুদ্ধবাজ সুবাদারদের দেশের হাল হকিকত পুরো নজর দেবার সময় কোথায়। তারা দিল্লীর আদেশে শহর নগর বন্দর গড়ে, রাজপথ, মসজিদ, কাটরা তৈরী করে নগরের শোভা বাড়ায় । আর বিরাট সেনাবাহিনীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করতে মনোযোগী তারা । এক দিকে জলদস্যুর উৎপাত। চট্টগ্রাম আরাকানে ঘন ঘন যুদ্ধ। আরাকানী শক্তির মোকাবেলা করতে ব্যতিব্যস্ত সিপাহসালাদের সর্বদা গোলাবারুদের শব্দে ডুবে থাকতে হয় । গ্রামীণ বাংলার হাহাকার তাদের কানে পৌঁছবার অবকাশ পায় না ।

ওদিকে দিল্লীর গৃহ-বিবাদের অন্তে আওরঙ্গজেব হাতে তুলে নিয়েছেন শাসনভার। তাঁর পক্ষের সিপাহসালার মীর জুমলার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত সুজা পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন আরাকানে ।

বাংলার সুবাদার মীর জুমলা তো যুদ্ধ নিয়েই ব্যস্ত। আসামের রাজাকে দমাতে বিরাট বাহিনী নিয়ে মীর জুমলা এগিয়ে গেছে অহোম রাজাকে মোঘল শক্তির পদানত করতে। তারই বা সময় কোথায় দুর্ভিক্ষপীড়িত বংগালের সাধারণ মানুষের দুঃখের দিকে তাকিয়ে দেখবার। বাংলার নদী চিরন্তন ধারায় বয়ে যায়। তার দু'ধারে দীর্ঘকালীন দুর্ভিক্ষে অর্ধভুক্ত মানুষেরা হাহাকার করে ।

সন্ধ্যা আসন্ন। শস্যহীন ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে অবসন্ন ক্লান্ত শরীরে হেঁটে চলেছে মানিক। এখন সে আর সৌম্যকান্তি যুবক নয়। শীর্ষ বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত এক ক্ষুধার্ত মানুষ। দূরে মাঠের শেষে বাঁশ ঝাড়, নারকেল সুপারীর ঘন বনের ওপর শেষ বিকেলের রোদ ম্লান হয়ে এসেছে। মানিক যেন আর হাঁটতে পারছিল না। কোন রকমে ধুঁকে ধুঁকে চলেছে। সহসা পথের এক মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে মানিকের সারা শরীর শিহরিত হল। একটি শীর্ণ বালকের দেহ পড়ে আছে মাঠের ধারে। দু'টি কুকুর কামড়াকামড়ি করে তার পা থেকে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। অভুক্ত অর্ধমৃত বালকটি করুণ যন্ত্রণার্ত দৃষ্টিতে ভয়াবহ আতংক। মানিক এক মুহূর্ত দাঁড়াল। মানবিক সহানুভূতিবৃত্তির বশে একটা মাটির ঢেলা তুলল কুকুর দু'টিকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে। পরক্ষণেই এক রূঢ় বাস্তব চেতনাবোধ তাকে যেন স্থবির করে দিল। ভাবল কি লাভ এই বালককে বাঁচিয়ে। একে বাঁচিয়ে তুলবার মত অন্নের সংস্থান সে কোথা থেকে করবে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় পাগোল হয়ে ঘুরছে অসংখ্য লোক । মরছেও অজস্র। নদীর

ঘাটে, মাঠে ভাঙা কুড়ের মধ্যে আনাচে কানাচে কত শিশু বালক, স্ত্রী, পুরুষ, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, যুবক না খেয়ে মরে পড়ে আছে। তাদেরকে বাঁচাবার কি শক্তি আছে মানিকের হাতে !

তাঁর ঘরেই তো দুই শিশু আর তার স্ত্রী গুলরুখ বানু আজ ক'দিন আজ অর্ধ উপবাসে দিন কাটাচ্ছে । শাক পাতা সিদ্ধ করে খেয়ে আর চলছে না ।

কুকুরের আহার্যে পরিণত জীবন্ত মানব শিশুটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মাটির চাকাটা ফেলে দিয়ে দ্রুত গ্রামের দিকে পা বাড়াল মানিক। ঘরে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা নেমে এল। বিষণ্ণ সন্ধ্যায় ঘরের উঠোনে পা দিয়ে মানিকের বুকটা ধক করে উঠল। কুঁড়ের দরজা খোলা। ভেতরটা অন্ধকার। একটা খাটাশ লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অনেক কষ্টে জোগাড় করে আনা চালের পোঁটলাটা ধপ করে পড়ে গেল হাত থেকে ।

মানিক ভীত কণ্ঠে ডেকে উঠল-গুল....গুলরুখ......গুলরুখ বানু ।

...কোন উত্তর এল না। ঘরের পাশের নিম গাছ থেকে কর্কশ শব্দে একটা প্যাচা ডেকে উঠল। মানিক অভুক্ত দুর্বল শরীর নিয়ে ঘরে ঢুকল। সেখানে কেউ নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনের চারপাশে বাগানের দিকে ঘুরে ঘুরে চীৎকার করে ডাকতে লাগল মানিক-গুল........গুলরুখ তুমি কোথায় ? আমি চাল নিয়ে এসেছি।

কোন সাড়া এল না। অভাবগ্রস্ত সারা গ্রামটায় রাত নয় যেন মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এসেছে। দূর থেকে মাঝে মাঝে করুণ আর্তধ্বনি শোনা যাচ্ছে কোন কোন বাড়ী থেকে ‘আল্লারে দুটো ভাত......আর যে পারি না ।'

অনেক্ষণ খোঁজাখুজি করে বিষণ্ন চিন্তিত মন নিয়ে ঘরের দাওয়ায় বসে পড়ল মানিক। ব্যাকুল হয়ে চিন্তা করতে লাগল তার স্ত্রী পুত্রের কথা। কিন্তু অবসন্ন দেহে সে আর বেশিক্ষণ চিন্তা করতে পারল না। দাওয়ার ওপর গুটিয়ে শুয়ে পড়ল । রাত বাড়ল। প্রহরে প্রহরে শিয়াল ডেকে উঠল। ঝোপঝাড়ে ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়াতে লাগল জোনাকীর দল। অন্ধকারে চোখ রেখে চিন্তা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল মানিক। ভোরে সূর্যের আলো এসে চোখে পড়তে ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসল মানিক। উঠে বসেই দেখল উঠোনের মাঝখানে উদ্ভ্রান্ত অস্বাভাবিক চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে গুলরুখ। তারও বয়স বেড়েছে কিন্তু এত দুঃখ দারিদ্র্য অনাহারে তার দেহের লাবণ্য এখনও

কিছুটা বিদ্যমান ।

মানিক ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল-কোথায় ছিলে সারারাত কাল গুল্ ? আমার বাচ্চারা কোথায় ?

গুলরুখ নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল । উত্তর দিল না ।

মানিক উঠে এসে গুলরুখের দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল— কথা বলছ না কেন? কি হয়েছে....বল.....বল গুলরুখ আমার বাচ্চারা কোথায় ?

গুলরুখের নিস্পন্দ ঠোঁট এবারে নড়ে উঠল। অদ্ভুত স্বরে বলল-ওরা নেই ।

-নেই ? কি বলছ আবোল তাবোল। বল ওরা কোথায় ? আমি যে ওদের ভাত খাওয়াবো বলে মহাজনের কাছ থেকে চাল ধার করে এনেছি ।

-ভাত খাওয়াবে ? বিদ্রূপে গুলরুখের দুঠোঁট বেঁকে গেল।—কয় নৌকা ধান এনেছ ? বাচ্চারা আমার ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আধমরা হয়ে পড়ে আছে আজ ক'দিন। ওদের কান্নায় আমি পাগোল হয়ে গেছি। তারপর তারপর......বাচ্চা দুটো আমার গলা দিয়ে আর শব্দও বের করতে পারছিল না। এ দৃশ্য সহ্য করা অসম্ভব তাই...

-তাই...কি ? কি করেছ বল ?

-বলছি। বলব বলেই ফিরে এসেছি। না হলে আর ফিরতাম না। গলায় কলসী বেঁধে কাল দুটোকে একসঙ্গে গাঙে ডুবিয়ে দিয়েছি......।

–কি ? প্রবল শক্তিতে চীৎকার করে উঠল মানিক। শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে প্রচণ্ড এক চড় মারল গুলরুখের গালে।

—ডাইনী। নিজ হাতে নিজের ছেলেদের মেরেছিস.......উঃ অসহ্য। পাগোলের মত কিল চড় মারতে লাগল গুলরুখকে ।

চীৎকার করতে লাগল—ডাইনী। তুই কেন ফিরে এলি ! তুই কেন গলায় কলসী বেঁধে মরলি না। তোর মত মেয়ে মানুষরা সব এক। নিজের প্রাণের মায়া তোদের বড় বেশি। সেই যে একজন ‘মগো ছোঁয়া' ছিল সেও একদিন নিজের প্রাণটা সম্বল করে জায়গীরদারের হারেমে উঠেছিল। তোকে বিশ্বাস করেছিলাম ....কিন্তু তুইও......সেই একই......। শাহ্ সুজার হারেমে

আয়েসের বাঁদী হবার সুযোগ পাস নি বলে সারা জীবন আমায় উঠতে বসতে কথা শুনিয়ে এসেছিস.....উঃ কি, কালসাপ এই মেয়েমানুষের জাত ।

পাষাণের মত দাঁড়িয়ে মার খেল গুলরুখ। মুখের ভঙ্গী তার নির্বিকার । মারতে মারতে শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ল মানিক ।

এবারে মুখ খুলল গুলরুখ। দুচোখে তার অগ্নি বর্ষিত হল -বেঈমান পুরুষ। আমার রূপ-যৌবন নিয়ে আমি অনায়াসে কোন জায়গীরদার ফৌজদার রইসের হারেমে গিয়ে উঠতে পারতাম। কিন্তু যাইনি কেবল তোমার মত বেঈমান পুরুষের ধোঁকায় পড়ে। বাদশাহজাদীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমার হাত ধরে মাটির কুঁড়েতে উঠেছিলাম ; কিন্তু কিসের আশায় ? শুধু একটু শান্তির জন্য। কিন্তু তুমি বল....বল... কোন মা পারে নিজের সন্তানের তিল তিল করে না খেয়ে মরা দেখতে।

কান্নায় এবার অবরুদ্ধ হল গুলরুখের কণ্ঠ ।

পরক্ষণেই সামলে নিল সে ।কান্না ফুরিয়ে গেল, কণ্ঠস্বর ঝলসে উঠল।

-কেন দেখতে পাচ্ছ না। কত স্ত্রী স্বামী-সন্তান ফেলে পেটের ক্ষুধায় বজরায় উঠছে। কত মা-বাপ তার ছেলে মেয়ে বিক্রী করছে হাটে। কুকুর বেড়ালের মত মরছে না খেয়ে....তুমি কি দেখতে পাও না ? তুমি কি অন্ধ ? বেঈমান, কাপুরুষ ।

কণ্ঠস্বর আরো চড়ল গুলরুখের। চোখের দৃষ্ট বদলাল। ভয়ংকর চেহারা নিয়ে সে এগিয়ে এল মানিকের দিকে..... ।

উদ্ভ্রান্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করল-একদিন পেটের জ্বালা মিটাতে আমার চাচা আমাকে বিক্রী করেছিল দালালের কাছে......আমি ভুলি নি। আজো ভুলি নি। সেই জন্য তো আমি এখন কাউকে বিশ্বাস করি না। জানি অভাবের কাছে সব মিথ্যে । তাই তো নিজের প্রাণের চেয়ে আপন ছেলেদের নিজ হাতে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছি। পাছে তুমিও ওদের বিক্রী করে দাও। আর আর..... তোমাকেও আমি ছাড়ব না। তুমি......তুমি......আমাকেও তো বেচে দিতে পার। তোমাকেও ছাড়ব না । সেইজন্যই ফিরে এসেছি।

ক্ষীপ্ত বাঘিনীর মত মানিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গুলরুখ। দুই হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে তার গলা টিপে ধরল। গোঙাতে গোঙাতে হাত পা ছুঁড়ে

নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল মানিক। কিন্তু কিছুতেই পারল না। শক্ত সাঁড়াশীর মত গুলরুখের দুই হাত চেপে বসল মানিকের কণ্ঠে। চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ক্রমে নিস্পন্দ নিঃসাড় হয়ে গেল মানিক ।

তার অসাড় প্রাণহীন বুকের ওপর থেকে এক সময় উঠে দাঁড়াল গুলরুখ। সকালের বাতাসে ভয়াবহ শিহরণ তুলে উন্মাদ হাসি হেসে উঠল। আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগল....আর....আর আমার বাচ্চাদের কেউ ক্ষুধার কাছে বিক্রী করতে পারবে না......আর.....পারবে না......বিড়বিড় করতে করতে কেঁদে উঠল গুলরুখ। আবার উন্মাদ হাসি হাসতে লাগল। কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। অনাহার দুর্বল শরীর এক সময় মাটির ওপর পড়ে গেল। আর উঠল না ।

বংগালের ঘরে ঘরে অনাহারে মানুষ মরছে, হত্যা করছে, পাগোল হয়ে যাচ্ছে। তখন খাদ্য আর যুদ্ধের রসদ নিয়ে পায় পায় তাল মিলিয়ে যুদ্ধ করতে এগিয়ে চলেছে মোঘল সেনাবাহিনী ।

আর চিরকালের নীরব সাক্ষী পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র বয়ে চলেছে তার ধীর গতিতে কালের ইতিহাস বুকে নিয়ে ।

নবম অধ্যায়

এক

যুদ্ধ আর রণডংকায় রাজছত্রের নিচে রাজদণ্ডের হস্ত বদল হয় বার বার। সময়ের চক্রবাঁকে ইতিহাসের গতি ভঙ্গে পরিবর্তিত হয় শাসক-গোষ্ঠী। তুর্কী পাঠান মোঘলের জয়োদ্ধত পদধ্বনি বিলীন হয়ে যায় কালের গর্ভে। খণ্ড-বিখণ্ড হয় বিশাল সাম্রাজ্য সীমা। আবার স্বাধীনতায় মাথা চাড়া দেয় বংগাল, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদার মুর্শিদকুলী খানের পরবর্তী শাসক সরফরাজ খান। স্বাধীন নবাবী শাসনে জাঁকিয়ে বসেন বংগাল, বিহার, উড়িষ্যার রাজ্যসীমার মসনদে।

এত যুদ্ধ, এত রক্তক্ষয়, এত শোষণ তবু কামধেনু বাংলার ঝলক যে কমে না। এই ঝলকের আকর্ষণে এসেছে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী অবশেষে ইংরেজ। সুদূর ইংল্যান্ডের অধিবাসী বণিকেরা বংগালে বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য দাবি নিয়েই সন্তুষ্ট হল না। এ স্বর্ণহংসীকে কুক্ষিগত করার লোভ সম্বরণ করা যে বড় কঠিন ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দূরদর্শী বিচক্ষণ এক কর্মচারী জব চার্নব সুতানুটিতে এক পত্তন গড়ে তুলল। ওদিকে হুগলী, পাটনা, কাসিম বাজারে তো ইংরেজ বাণিজ্যকুটি আগেই তৈরী হয়েছে। এবারে আরো পাকাপোক্ত হয়ে বসতে হবে যে।

সুতানুটি গোবিন্দপুর কলকাতা তাদের ঘেরাও এলাকায় নির্মিত হল ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। মোঘল সাম্রাজ্যের খণ্ড বিখণ্ড ভাঙ্গনের ফাটল বেয়ে এদেশে রোপিত হল এক বিষবৃক্ষের চারা । সে বিষবৃক্ষ ইংরেজ শক্তি ।

সেই বিষবৃক্ষের চারা উৎপাটিত করতে গিয়েও হস্ত সংকুচিত করলেন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব আলীবর্দি খান। কারণ আবহমান কাল ধরে উৎপীড়িত বাংলার বাতাসে এখনও যে করুণ কান্নার সুর বাজে—

"ছেলে ঘুমাল

পাড়া জুড়াল

বর্গী এল দেশে।"

বর্গী। সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে অশ্বখুরে ধূলির মেঘ উড়িয়ে হিংস্র লোলুপ বাজের মত ছুটে আসে মারাঠা বর্গীরা। মারাঠা ব্রাহ্মণ ভাস্কর পণ্ডিতের দুর্ধর্ষ নির্মম অশ্বারোহী অনুচরেরা বার বার ছুটে আসে বংগালের উত্তর-পশ্চিম সীমানায়। তাদের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা আর পৈশাচিকতার কথা মনে করে এখনও শিহরিত হয় বংগালের মানুষ । শিহরিত হয় বৃদ্ধ অছিমদ্দি শেখ।

হুঁকাতে কয়েকটা টান দিয়ে দূরে মাঠের বাবলাগাছের দিকে তাকিয়ে বলে- আমরা তো সেই মুর্শিদাবাদেরই লোক। আমার দাদা তো ওই বর্গীদের ভয়ে ছেলে বউয়ের হাত ধরে দেশছাড়া হয়েছিল, তারপর এই যশোরে এসে ঘর গড়েছিল। আমাদের ছিল রেশমের চাষ.....বুঝলি হারু ?...হুঁঃ, যেই সেই কথা নয় । যা তো চট করে হুঁকোর কলকের টিকেতে একটু আগুন ধরিয়ে নিয়ে আয় ।

হারু অর্থাৎ পনেরো বছরের হারাধন ছুটে গিয়ে কলকের ছাই ফেলে আগুন ধরিয়ে নিয়ে আসে। তারপর দাওয়ার খুঁটি ঠেস দিয়ে বসে বলল-তারপর দাদাজান সেই বর্গীরা এসে কি করল বল না ?

হুঁকোয় কয়েকটা সুখটান দিয়ে বুড়ো অছিমদ্দি বলল-ও বর্গী ? তারা তো মানুষ নয় রে, শয়তান। পিশাচ। প্রত্যেক বছর ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হত মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বর্ধমান এলাকায়। আর যা কাণ্ডকারখানাটা জুড়ে দিত তা মুখে বলা যায় না । এই দ্যাখ না আমার গায়ে কেমন কাঁটা দিচ্ছে।

হারু সভয়ে তাকিয়ে বলল-খুব বুঝি মারধর করত ? কুঠিতে নিয়ে আটকে রাখত বোধ হয় ।

অছিমদ্দি গম্ভীর কণ্ঠে বলল-হুঁঃ, আটকে রাখা মানে ! মীর হাবীবের নাম জানিস? জানবি কোথা থেকে তোরা তো দু'দিনের ছেলেপুলে ।

–কেন সে নওয়াবের দেওয়ান ছিল বুঝি ?

-দুর ব্যাটার বুরবাক ! সে ছিল আর এক মীরজাফর। ওই মারাঠা বর্গী সর্দারভাস্কর পণ্ডিতকে তো এই দেশে মীর হাবীবই ডেকে এনেছিল। বুঝলি হারু, একবার হল কি, নওয়াব আলীবর্দি তখন মুর্শিদাবাদে নেই। আর সেবার বর্ষা শুরু হয়েছে সাংঘাতিক। বর্গী ডাকাতরা তো কিছু দূর এগিয়ে এসে পিছু হটতে শুরু করল বর্ষার দাপট সহ্য করতে না পেরে। ওই ব্যাটা মীর হাবীব....

ওই ডেকে আনল বর্গীদের ।

হারু অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করল-ডাকাতকে কি কেউ শখ করে ডেকে আনে ! এ আবার কেমন কথা !

বৃদ্ধ গাঁ-বুড়ো অছিমদ্দির চোখ মুখে বিচিত্র ভাবের আভা ফুটে উঠল ।

মুখ থেকে হুঁকাটা নামিয়ে বলল-তবে আর বলছি কি রে হাবারাম । এ সব হল উজীর নাজীর রাজা মন্ত্রীর দাবার ঘুঁটির চাল। কোথাকার চালচুলো ছাড়া বাউণ্ডুলে মীর হাবীব এসে জুটেছিল নবাবের দরবারে। চালাকি বুদ্ধি খাটিয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার মত দরবারের কেউকেটা হয়ে বসল। কিন্তু মানুষের লোভের কি সীমা আছে, মনে মনে শখ চাপল নবাবী কব্জা করবার। সেই কুবুদ্ধির বশেই চুপি চুপি যোগ দিল গিয়ে বর্গীদের সাথে ।

-কেন ?

কেন কি রে। ভাবল এ এক সুযোগ। দুর্দান্ত ডাকাত বর্গীরা হাতে থাকলে তাদের তাঁবেদারী করে দেওয়ান হয়ে বসবে। তারপর সেই মুনাফেক বর্ষার মধ্যেই পথঘাট বাতলে বর্গীদের ডেকে আনল মুর্শিদাবাদে ।

বর্ষার রাত। লোকে ঘরে আগল দিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়েছে, এমন সময় ঘোড়ার খুরের দাপটে মুর্শিদাবাদ কেঁপে উঠল। হা রে রে করে বর্গীরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল । ওঃ, তারপর সে কি লুঠতরাজ। জগৎ শেঠের নাম শুনেছিস ? বিরাট ধনী ছিল। একমাত্র তার বাড়ী লুঠ করেই পাওয়া গেল তিন লক্ষ টাকা আর আশরফী....আর তারপর আগুনের পর আগুন ধরিয়ে চলল শহরে। দেখতে দেখতে গোটা শহরের অর্ধেক ছাই হয়ে গেল ।

গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে ছারখার করে দিতে লাগল। যে পথে বর্গীরা ফিরে গেল সে পথের দু'ধারে আর মানুষ জনের বসতি বলতে কিছুই রইল না। কাক পক্ষীও উড়তে ভুলে গেল ভয়ে।

হারু সভয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল.....বর্গীরা কি মানুষ নয় গো দাদাজান ?

অছিমদ্দি হুঁকোটা বেড়ায় ঠেস দিয়ে বলল,... আর মানুষ ! সেগুলো কি মানুষ রে ! হায়ান ! কেবল পয়সা ছাড়া আর কিছু চিনত না। দয়া মায়া বলে শরীরে

কিছুই ছিল না। আহা গাঁয়ের নিরীহ মানুষগুলোকে ধরে কি মারটাই মারত... শুধু মেরেই কি ক্ষান্ত দিত ! জ্যান্ত মানুষের পা কেটে, কারো বা নাক কেটে, কারো জিভ ছিঁড়ে চোখ উপড়ে ফেলে দিত। আর মাটিতে শুইয়ে গলার ওপর পা চেপে বলত, 'রূপেয়া দোও, রূপেয়া দোও।'

মেয়ে মানুষের ওপর কি অত্যাচারটা যে করত গো। আহ্ আল্লার আরস কেঁপে উঠত মনে হয়। কি হিন্দু-মুসলমান, কি গরীব-বড়লোক, ব্রাহ্মণ-শূদ্র কারো স্ত্রী- কন্যার ইজ্জত মানত না। আহ্ । অছিমদ্দি চুপ করল ।

আকাশে সাদা সাদা মেঘ জমছিল। মেঘের পটভূমিকায় দল বেঁধে শকুন আর চিল উড়ছে। মাঝে মাঝে কুটোর মত হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টির সীমানা থেকে। আকাশের মেঘগুলো জমাট বেঁধে উঠছিল।

সেদিকে তাকিয়ে অছিমদ্দি বলল-বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে না রে হারু ?

হারু তাকাল । মাথা নেড়ে বলল-তাই তো মনে হচ্ছে।

এমন সময় একটি কিষাণ যুবক এসে উঠল দাওয়ায়। মাথার টোকা খুলে রেখে হারাধনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল ।

তারপর বলল-এই যে জুটেছিস এসে। গল্পের গন্ধ পেলেই হল । বলি হতভাগা, বাপ-মা খেয়ে বসেছিস তো ছোটবেলায়। তিনকুলে কেউ নেই। তা কাজ কাম কিছু শিখে পেট চালাবার ব্যবস্থাটাকরবি না, কেবল গল্প শুনে দিন কাটলেই চলবে। আর চাচাজান, তুমি আদর দিয়ে ওর ভবিষ্যৎটা ফরসা করবে এই বলে ছাড়ছি।

অছিমদ্দি যুবকের দিকে অর্ধনিমিলীত চোখে তাকিয়ে ম্লান হাসল ।

–তুই একে গল্প কেন বলছিস সাইদু। এ তো গল্প নয়, এ যে বড় কঠিন সত্য। আহা এখনও ওই মেঘের ডাকে, ওই বাতাসের শব্দে এই নদীর ঢেউয়ে আমি যে সারা বাংলার কান্না শুনতে পাই । আহা বড় দুঃখিনী আমার এই দেশ ।

সাইদু হাতের কাস্তে নিড়ানী বেড়ায় গুঁজে রেখে এসে বসল অছিমদ্দির সামনে। হাত-পা ঝেড়ে বলল-এই তো মন খারাপ করলে। আমরাই বা এখন কি সুখে আছি, এই সাত গাঁয়ের মধ্যে ক'টা লোক তুমি খুঁজে পাবে যাদের পিঠে ওই কুঠিয়াল নীলকর সাহেবদের চাবুকের দাগ না আছে। এই তো আজ ক্ষেতে

কাজ করছি, কুঠির নীলকর সাহেব রেনী আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা এসে চারিদিকে দেখে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করে গেল। কালকে কি শুনতে হয় কে জানে। তাই ভাবছি। এমন বেঈমান ঐ কুঠিয়ালদের পাইকগুলো কি বলব চাচা ! বলি নেমকহারামরা তোর কি এ দেশের মানুষ না ?

অছিমদ্দি ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ।

তারপর হারাধনের দিকে তাকিয়ে বলল-যা তো হারু আর এক ছিলুম তামাক সেজে আন দেখি !

হারু উঠে গেল । একটু পরই সে তামাক সেজে নিয়ে এল।

অছিমদ্দি হুঁকোটা হাতে তুলে নিয়ে উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল-সেটাই তো বিপদ। ঘরের ইঁদুর বেড়া কাটলে কিছু কি আর থাকে? মারাঠা বর্গীরা এ দেশের রেশমের চাষ ধ্বংস করে দিয়ে গেল। তাদের যেমন ডেকে এনেছিল মীর হাবিব, তেমনি লোভে অন্ধ মীরজাফর গদীতে বসাল বিদেশী বণিক ইংরেজদের। ওই যে ইংরেজরা কলকাতার শহর বসাল। ওতেই তো হল আরও কাল। এদিকে আলীবর্দি খাঁ যখন বর্গী তাড়াতে ব্যস্ত সে সুযোগ ইংরেজরা বেশ পাকাপোক্ত হয়ে বসল। এমনই পাকা হয়ে বসল যে আলীবর্দি খাঁর নাতি সিরাজদ্দৌলা যখন নবাব হলেন তখন কোম্পানীর সাহেবরা তাঁকে পাত্তাই দিলেন না। ক্লাইভ সাহেব তো পারলে তাঁকে নবাব বলে মানেনই না।

এতক্ষণে কথা বলল সাইদু-চাচাজান ! যুদ্ধ তো হয়েছিল নবাবের সঙ্গে ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে। আমাদের তাতে কি এসে যায় বল। বেল পাকলে কাকের কি? আমরা যেই চাষা তো চাষাই !

অছিমদ্দি হুঁকোটা নামিয়ে রাখল। কণ্ঠস্বর ক্ষুব্ধ হল তার দ্যাখ সাইদু যা বুঝিস না তা নিয়ে কথা কইতে আসিস না।

সাইদু একটু হাসল । কিছু বলল না মুখে। অছিমদ্দি আপন মনেই যেন বলতে থাকল—কোথায় সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারের ওই লালমুখো ইংরেজগুলো। ওদের কি এদেশের ওপর এক ফোঁটা মায়া আছে ? নবাব সিরাজ হাজার হোক সে তো এদেশেরই মানুষ ছিলরে !

আর দেশকে সে ভালোও বাসত। শোন তবে বলি ক্লাইভের সঙ্গে যখন

নবাবের যুদ্ধ বাধল লক্ষাবাগের যুদ্ধে তো ইংরেজরা হেরে হল ভূত। ওই যে বললাম ঘরের ইঁদুর বেড়া কাটলে বিপদ। মীরজাফর খান-সে হল কনের মাসী বরের পিসী । নীচে নীচে ষড়যন্ত্র করল ইংরেজদের সাথে। সে খবর নবাব জানল না। মীর জাফরকে ডেকে সিরাজ মাথার তাজ খুলে ফেলে দিল জাফর খানের সামনে। বলল-জাফর খান, আমার এই তাজ এ কেবল নবাবের একার নয়। এ হল বাংলা-বিহার- উড়িষ্যার স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা রক্ষা করতে আপনি এগিয়ে আসুন। আচ্ছা তোরাই বল সাইদু, দেশকে ভালো না বাসলে কেউ এমন বলতে পারে ?

হারু পেছন থেকে বলে উঠল-তা দাদাজান, জাফর খান কি জবাব দিল নবাবকে ?

-কি আর। বেঈমান মুনাফেক মীরজাফর কোরান শরীফ ছুঁয়ে কথা দিল সিরাজকে যে সে যথাসাধ্য নবাবের পক্ষে থাকবে। ওদিকে মনে তখন তার শয়তানীর খেলা। ইংরেজের সঙ্গে যুক্তি করে নবাবের সঙ্গে করল বেঈমানী। ইংরেজরা লোভ দেখাল, সিরাজকে সরিয়ে দাও। তোমায় আমরা নবাব করব। আর, সেই লোভে পড়েই মীর জাফর....

অছিমদ্দির গল্পের মাঝখানে আর একজন প্রৌঢ় কৃষক এসে উঠল দাওয়ায়। আসরে বসে পড়ে বলল-এই যে অছিম চাচা আবার বুঝি গল্পের ঝুড়ি খুলে বসেছ ! এদিকে খবর জান ?

উচ্চকিত হল সাইদু-কি খবর চাচা । কোন খারাপ খবর নয় তো !

প্রৌঢ় মওলা বকস একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল-আর বাবা ! আমাদের কি আর ভালো খবর থাকতে পারে। এ পোড়া কপালে তো কেবল বদনসিবী লেখা । আজ রেনী সাহেবের পাইক এসেছিল আমার বাড়ী।

অছিমদ্দি, হারু, সাইদ এক সঙ্গে সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকাল মওলার দিকে। মওলা উদাস শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ মেঘ জমে ওঠা আকাশের দিকে । তারপর বলল-সাহেবের কুঠিতে আমার তলব হয়েছে।

হারু হঠাৎ বলে উঠল-সাহেবের কুঠিতে ! কি মজা তোমার মওলা চাচা । শুনেছি রেনী সাহেবের কুঠিতে পোষা হরিণ চরে বেড়ায়। কুঠির বাগানে চিড়িয়াখানায় কাকাতুয়া, তিতর ময়ূররা, উড়ে উড়ে ঘোরে....আর কুঠির সামনে

কেমন বড় বড় চৌবাচ্চায় নীল জ্বাল দেয় ।

এবার ধমক দিল সাইদু—তুই থাম তো ভেঁপো ছোঁড়া। বড় সাধের নীলকুঠি না ! যা না একবার, লালমুখো ওই রেনী সাহেব তোকে ধরে নীল জ্বাল দেবার কড়াইতে ছেড়ে দেবে খন ।

হারু চুপ করে গেল। সাইদু চিন্তিত উদ্বিগ্নতায় প্রশ্ন করল-ব্যাপারখানা কি বল তো মওলা চাচা !

—ব্যাপার তো একটাই। আউশের জমির ফসল তুলে ফেলে নীলের চাষ লাগাতে হবে। কথা না শুনলে কি হয় তা তো জানিসই ।

এতক্ষণে নিভে যাওয়া কল্কিটা হুঁকো থেকে নামিয়ে অছিমদ্দি কথা বলল- আহা...হা কোম্পানীর যুগটা বুঝি আমাদের সবাইকে অমন নীলের মত নিংড়ে ছোবড়া বানিয়ে ছাড়বে ।

আকাশে গুম গুম করে মেঘ ডেকে উঠল, উঠে দাঁড়াল মওলা বকস যাই ঝড় পানি হবে মনে হচ্ছে। বাড়ী থেকে বেরিয়েছি সেই কখন ।

আড্ডা ভাঙ্গবার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ কালো করে সেজে ওঠা মেঘ ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি হয়ে নামল । বিকেলে নামা বাদল ক্রমাগত ঝরতে ঝরতে অকাল সন্ধ্যা নামাল । সন্ধ্যার পর বৃষ্টি ঝরার বিরাম নেই। সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে অছিমদ্দির দহলিজ ঘরের ভেতর এক কোণায় মাদুরের ওপর কাঁথা পেড়ে শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে হারু। এ দুনিয়ায় তার আপন বলতে কেউ নেই । মা- বাবার কথা তার মনেও পড়ে না। কবে এক মহামারীতে পুরো পরিবারটা তাদের শেষ হয়ে গেছে। তিন বছর বয়স থেকে সে অছিমদ্দির বাড়ীতেই মানুষ হচ্ছে। অছিমদ্দিও স্নেহ করে তাকে, বলে, ‘আহা তিনকুলে কেউ নেই, দুনিয়ার এতিম । কোথায় কার কাছে যাবে। থাক আমার সংসারে খুদকুঁড়ো যা হোক দুটো খেয়ে বড় হয়ে উঠুক।'

ঘরের আর একদিকে বাঁশের মাচার উপর বিছানা পেতে শুয়েছিল অছিমদ্দি শেখ। সেদিকে লক্ষ্য করে হারু বলল-দাদাজান, তুমি ইংরেজ আর নবাবের লড়াই দেখেছ ?

অন্ধকারে হাসল অছিমদ্দি-দুর পাগোল, আমি কোথা থেকে দেখব ? সে তো ক'যুগ আগের কথা ?

হারু আবার বলল-তা দাদাজান, তুমি নিশ্চয়ই মুর্শিদাবাদের হীরাঝিল মতিঝিল দেখেছ ?

-তাও দেখি নি রে ।

-তবে সুতানটি গোবিন্দপুর কলকাতার ইংরেজী পত্তন দেখেছ নিশ্চয়ই !

অছিমদ্দি কাসল। তারপর বলল-ছোঃ, ও বেনের জাতের তৈরী শহর আমি দেখতে চাই না । জানিস ওই শহরটা তৈরী করেছিল যে সাহেব, তার নাম ছিল জব চার্নব। আস্ত চামার ছিল লোকটা। লোকে এখনও বলে জব চার্নবের খাবার ঘরের পাশের কুঠুরীতে দেশী লোকদের ধরে এনে কয়েদ করে রাখা হত। লোকগুলোকে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলা হত। সেই সব হাত-পা বাঁধা চাবুক খাওয়া লোকগুলোর গোঙানী শুনতে শুনতে চার্নক সাহেব খানা খেত। লোকের কাতরানী আর গোঙানী না শুনলে সাহেবের না কি খানা খাওয়াই জমত না ।

বেড়ার গায়ে বৃষ্টির ঝাপটা লাগছে। চালের শনের প্রান্ত বেয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে বৃষ্টির পানি। বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে হারাধনের দুচোখের ঘুমের রেশ নেমে আসছিল। আধঘুম আধাতন্দ্রার মধ্যে হারাধনের মনে হল সে যেন স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্যে দেখতে পাচ্ছে মাঠ ঘাট নদী প্রান্তর পেরিয়ে ছুটে আসছে দস্যু বর্গী ঘোড় সওয়াররা, গ্রাম গঞ্জ জ্বলছে। রেশমের বাগানে গুটি পোকা আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাচ্ছে। লোকজন দল বেঁধে ভাগীরথীর তীর ছেড়ে প্রাণ ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। ছেঁড়া মেঘের মত টুকরো টুকরো স্বপ্ন ভেসে আসে। হারু দেখতে পাচ্ছে নবাব মাথার উষ্ণীষ মীরজাফরের পায়ের সামনে ফেলে দিয়ে দীপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে ।

....তারপর....হারাধন এ কি দেখছে ! অছিম চাচার কাছে শোনা গল্প যেন সত্যি হয়ে উঠেছে। উষ্ণষবিহীন বন্দী নবাব। কোমরে তার সাধারণ বন্দীর মত শিকল বাঁধা। হাতে পায় কড়া। মুর্শিদাবাদের নবাবী রাজসভায় হাজার হাজার দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ স্বদেশ প্রেমিক যুদ্ধবন্দী। সহস্র নীরব দর্শক তাদের প্রিয় নবাবের অবস্থার নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছে। হারুর মনে হল সেও যেন আছে জনতার ভীড়ে। অশ্রু সজল নয়নে তাকিয়ে আবেগ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে সহসা চীৎকার করে উঠেছে......বেঈমান বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর। কাপুরুষ ইংরেজ নিপাত হয়ে যাও। ছেড়ে দাও আমাদের নবাবকে । ছেড়ে

দাও, ছেড়ে দাও । আমরা আর নীলের চাষ করব না।.....দাদনে খাটব না-।

অছিমদ্দি শেখ ধড়মড় করে উঠে বসল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল-ও হারু হারু...... কি হয়েছে রে ! কি বিড় বিড় করছিস ঘুমের মধ্যে ! পাশ ফিরে শো ।

হারুর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ কচলে দেখল কোথায় নবাব ? কোথায় মুর্শিদাবাদ....সে তো কুঁড়েতে তার ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় শুয়ে। হারু বলল- কিছু না দাদাজান ! খোয়াব দেখছিলাম বোধ হয় ।

দুই

সকালের কাঁচা রোদ এসে ছড়িয়ে পড়েছে ফারলং সাহেবের কুঠি বাড়ীর আঙ্গিনায়। সযত্নবর্ধিত ফুলের কেয়ারীতে উড়ে বসেছে প্রজাপতির ঝাঁক। সমান করে ছাঁটা মখমল সবুজ ঘাসের ওপর গত রাতের বৃষ্টির বিন্দু টলমল করছে। লম্বা ঝুলের গাউন দু'হাতে ধরে সোনালী চুলে ঢেউ তুলে নেমে এল বারবারা। তার চোখের নীল তারায় যেন কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার শেষ নেই। মাত্র ক'দিন হল সে বিলেত থেকে জাহাজে চড়ে বাবার সঙ্গে কলকাতায় এসে নেমেছে। কলকাতায় বাবার এক বন্ধুর বাড়ী দিন কয়েক কাটিয়ে এই চাঁদপুরে এসে পৌঁছেছে। কলকাতায় নেমেই গঙ্গার ধারে নেংটির মত কাপড় পরা লোকগুলোকে দেখে শিহরিত হয়েছিল বারবারা।

টেমস নদীর পারের সোনালী চুলের সুন্দরী নাক কুঁচকে বলেছিল-ও গড। হরিবল। এমন বিশ্রী বিদঘুটে কালো মানুষ হয়। এদের মধ্যে থাক কি করে বাবা ?

ফারলং হেসে মেয়েকে বলেছিল-লোকগুলোকে এমন কালো দেখছিস। কিন্তু দেশটা যে সোনার। এই সোনার লোভেই তো জব চার্নক এই শহরে ইংরেজ পত্তনি বসিয়েছিল। দু'পয়সার কোম্পানীর ক্লাইভ ইংরেজ রাজত্বের ভিত গেড়েছিল।

বারবারা মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিয়েছিল-ও নো নো। অসম্ভব। এই বিশ্রী নোংরা কালো লোকের দেশে আমি থাকতে পারব না। পরের জাহাজেই আমায় হোমে পাঠিয়ে দাও। মাম্মী এত করে নিষেধ করল যে সাপ-বাঘের দেশে গিয়ে কাজ নেই ! তোর বাপ সেখানে জমিদারী পেয়েছে একাই থাকুক। আমাদের গিয়ে কাজ নেই ! তা মাম্মীর কথা শুনলাম না। আমার তো এখুনি হোমে ফিরে

যেতে ইচ্ছে করছে। বারবারা প্রায় কেঁদে ফেলেছিল আর কি।

মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়েছিল ফারলং সাহেব-মাই সুইট গার্ল, এত অল্পতে ঘাবড়ে যেতে হয় না। আর এ দেশের সব মানুষ তো কালো নয়। ব্রাউন রং এমনকি হোয়াইট রংও এদের মধ্যে দেখা যায় ।

বারবারা গাল ফুলিয়েছিল-এই স্যাভেস প্যাগানের দেশে আমার একটুও মন টিকবে না ।

ফারলং সাহেব বারবারার মন খুশী করবার জন্য মেয়েকে নিয়ে শহর ঘুরে বেড়াল । সাহেবের তৈরী থিয়েটারে একদিন নাটক দেখিয়ে আনল ।

তবুও বারবারার মন খুঁত খুঁত করে-এটা আবার একটা শহর, এ তো পাড়া গাঁই বলতে হয় । শহরের সীমানা পার হলেই যত এঁদো ডোবা আর উলুখড়ের বন। আর তেমনি ভয়ংকর মশা রাতে। উঃ হরিবল। হরিবল।

কিন্তু পালকী চেপে এই চাঁদপুরে তার বাবার কুঠিতে আসতে আসতে বারবারার চোখের সামনে যেন এক নতুন জগতের দ্বারা খুলে গেল। পালকীতে বসেই বারবারা বলে-বাঃ, কি বিউটিফুল কান্ট্রি-সাইট।

এত নানা রকমের পাখী আর পাখীর ডাক বারবারা তার সারা জীবনে শোনে নি। সবুজ মাঠ ধানক্ষেত....আঁকাবাঁকা নদী আর খাল। সবুজ গাছপালায় ঘেরা শ্যামলিমার পটভূমিকায় ছোট ছাট গ্রাম। জল টলমল দীঘিতে সাদা লাল শাপলা আর পদ্মের দল পাপড়ি মেলে হাওয়ায় দুলছে।

তবে বারবারার জন্য আরো বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তার বাবার নীলকুঠি সংলগ্ন প্রাসাদোপম বাসভবনে। লন্ডনে তাদের ছোট কাঠের দোতলা বাড়ীতে বসে এসব সে কল্পনাও করতে পারেনি ।

নীলকুঠির পাশেই বিরাট এলাকা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। মস্তবড় ফটক। ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেই একধারে প্রকাণ্ড আস্তাবল। সারি সারি ঘোড়া বাঁধা। আস্তাবলের সাথেই ঘোড়ার গাড়ী রাখবার জায়গা। তারপর পালকীখানা। তিন চারটে নানা আকৃতি সুদৃশ্য কারুকার্য করা পালকী সব সময়েই সেখানে আছে। তারপরেই কাহার সহিস, চাকরবাকরদের থাকবার সারি সারি ঘর। আরেক দিকে বাবুর্চিখানা ।

তার ওপর বাগানের একদিকে জাফরী বেড়া আর বাঁশের রেলিং ঘেরা চিড়িয়াখানা। কত রং বেরংয়ের কত জাতের পাখী এখানে। আরেকধারে পোষা হরিণের দল চরে বেড়াচ্ছে। সবচেয়ে বিস্মিত হল বারবারা তার বাবার বিরাট পোষা হাতীটা দেখে । খুশীতে বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বারবারা।

ফারলং মেয়ের কাঁধে হাত রেখে প্রশ্ন করেছিল-কি, কেমন লাগছে এবার ? বারবারা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল-উঃ, হাউ নাইস ! ইউ আর নাথিং বাট এ কিং ।

ফারলং হেসেছিল-সো ইউ আর এ প্রিন্সেস। প্রিন্সেস অব চাঁদপুর নীলকুঠি ।

রাজকন্যাই বটে। পালকী থেকে নামবার পর তার বাবার কুঠির কর্মচারীরা যে ভাবে সারি ধরে এসে জড়ো হয়ে মুনিব-কন্যাকে অভিবাদন জানাতে লাগল আর পরিচয় দিতে লাগল দেওয়ান, আমীন, তহশীলদার, তাগিদগীর......তাতে বারবারা সেই মুহূর্তে নিজেকে অত্যন্ত সম্মানীয়া বলে মনে করতে দ্বিধাবোধ করল না। এবং গর্বও বোধ করল।

বারবারার বেশ মনে আছে মায়ের সঙ্গে থাকতে মাকে কিচেনের কাজে তাকে যথেষ্ট হেলপ করতে হত। কিন্তু নীলকুঠিয়াল জমিদারের মেয়ের কি কোন কাজ করা এমন কি কুটোটি ভেঙে দু'খান করাও শোভা পায় !

ভোরে ঘুম ভেঙে চোখ মেলে হালকা মসলিনের মশারির ভেতর দিয়েবাইরে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশীয় আয়া এসে হাজির। খাটের সামনে স্যান্ডেল এগিয়ে দিয়ে বিনয়ে অবনত হয়ে জানাল ম্যাডাম সাহেবের জন্য গরম জল, দাঁতের মাজন তৈরী। হুকুম হলেই আনে ।

বিছানা থেকে মুখ বাড়িয়ে আয়ার আনা গরম জল-সাবানে মুখ ধোওয়া ও দাঁত পরিষ্কার করে নীচে নামতেই আরেক আয়া ট্রেতে কাপড় জুতো প্রসাধনী নিয়ে উপস্থিত। রাতের কাপড় ছেড়ে নতুন সাজ পোশাক করতে হবে। আয়নার সামনে বসতেই এল নাপতেনী ।

-সালাম ম্যাম সাহেব বাবা। আমি এসেছি।

নাপতেনী গরম জলে লেবু মিশিয়ে বারবার পা ধুইয়ে দিল। তারপর নখ কেটে পায়ে মালিশ করল আধঘণ্টা। এই রকম পায়ের পরিচর্যার না কি পায়ের

সৌন্দর্য বাড়ে। এরপর এল খোঁপা বাঁধুনী আয়া। বারবারা সোনালী চুল রুপোর চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চমকদার মেম-খোঁপা বেঁধে দিল ।

সোনালী কাজ করা জুতো পরে, ছড়ানো ঘের ওয়ালা লম্বা দামী গাউন পরে, চমকদার খোঁপা নিয়ে সাজসজ্জায় সুশোভিত হয়ে ডাইনিং হলে এল বারবারা। বিরাট গোল টেবিলের একধারে বসেছিল ফারলং।

বারবারাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে বলল-এই যে বারবারা। সকালের সাজ সজ্জার পাট শেষ হল ?

বারবারা হাসল। সুখীকণ্ঠে বলল-বাপরে, এ যে বিরাট ব্যাপার। ঘুম ভাঙার পর থেকে ক'জন মেইডের দেখা পেলাম। এরা সবাই বুঝি তোমার এখানে বাঁধা চাকুরে ?

–এই দেখেই ঘাবড়ে গেলি। আরো কত যে কর্মচারী আছে আমার। আর ফারলং সাহেবের নামে সব থরহরি কম্পমান। থাক ওসব, এবার খাওয়া শুরু করা যাক ।

ফারলং সাহেবের বাবুর্চিখানার তন্দুরের তৈরী পাউরুটি, ঘরে তোলা মাখন, আলু ভাজা, পায়েশ, হলুদ রঙের বড় বড় কলা, ডিম সিদ্ধ, প্লেটের ওপর কেটে রাখা লালচে রঙের পাকা পেঁপে, আরও নাম না জানা ফলমূলের বাহুল্যে তাকিয়ে বারবারা কপালে চোখ তুলল- ও গড কত খাবার ! আমরা মাত্র দু'জনে এত খাব ।

ফারলং সাহেব গলায় ন্যাপকিন জড়িয়ে মেয়েকে বসতে বলল। তারপর টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা খানসামাকে উদ্দেশ্য করে বলল-বাইরে গোমস্তাকে অপেক্ষা করতে বল । আর নীলের দাদনের যেসব চাষীদের তাগিদগীর নিয়ে এসেছে ওদের যেন যেতে না দেওয়া হয় ।

ন্যাপকিন তুলে নিয়ে কাঁটা চামচ ধরতে ধরতে প্রশ্ন করল বারবারা-নীলের দাদনের চাষী কারা বাবা ? ওই যে যারা ইন্ডিগো প্ল্যান্টে কাজ করে ? আমি কিন্তু নীলের চাষ দেখব বাবা ।

খানসানা চলে যেতে ফারলং মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ উৎক্ষিপ্ত করল-দেখো বারবারা মাইডিয়ার, তুমি ছেলেমানুষ, সব কিছু জানোও না। তবু আমার মনে হয় তোমাকে কিছু বলা দরকার। এই সব নেটিভ চাকর বাকরের সামনে তুমি

ওরকম আনাড়ীর মত কথা বোলো না। তুমি ভুলে যেও না এরা আমাদের রাজার জাত বলে সমীহ করে। সুতরাং এদের সঙ্গে সব সময় ডমিনেটিং ওয়েতে কথা বলবে।

বারবারা নীরবে রুটিতে মাখন লাগাতে লাগল ।

এখন এই বৃষ্টি ধোওয়া ঝকঝকে সকালটায় বারবারার অনেক কিছু মনে হল। ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বারবারা দেখল চিড়িয়াখানার সাদা ছিটে দেওয়া একটা হরিণ কি সুন্দর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। ওদিকে বৃষ্টি ভেজা নারকেল গাছের চিরল পাতায় সোনালী রোদ পড়ে কি চমৎকার লাগছে দেখতে । বারবারার ভালো লাগল। ভারী ভালো লাগল এই সুন্দর সকালটা ।

হঠাৎ তার রেনীর কথা মনে পড়ল। বাবায় নীলকুঠির ছোট সাহেব মিঃ রেনী। এখানে আসার পরই রেনীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। রেনীর বাংলো এখান থেকে কিছুটা দূরে। বাবা বলেন রেনী খুব প্র্যাকটিক্যাল আর খাটুয়ে ছেলে। বারবারার কিন্তু অন্যরকম মনে হয়। রেনীতে বাংলোতে এক দিন তাদেরকে ডিনারে ডেকেছিল সে।

বারবারা তার আরেক গুণের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এসেছে। রেনী একজন আর্টিস্ট। চমৎকার ছবি আঁকে। বারবারার সবচেয়ে ভালো লেগেছে রেনীর বাঁশী বাজান। এদেশের বাঁশের বাঁশীতে রেনী কি সুন্দর সুর জাগিয়ে তোলে। আর বারবারাকে নিয়ে যা চমৎকার নেচেছিল সেদিন। বারবারা বৃষ্টি ভেজা নারকেল পাতার দিকে চোখ রেখে আপন মনে বলল-ওঃ, রেনী মাই ডিয়ার। তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে ।

আনমনে বাগানের ঘাস মাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে বারবারা একেবারে ফটকের কাছে এসে পড়েছিল। পেছন পেছন রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এল আয়া।

চোখ কপালে তুলে বলল-এই সাত সকালে খালি পায়ে কোথায় চলেছেন ম্যাডাম সাহেব বাবা ? বড় সাহবে দেখলে যে রাগ করবেন। এই নিন জুতো। ছাতাও নিয়ে এসেছি। আয়া বারবারার পায়ের কাছে বসে পড়ে জুতো পরিয়ে দিল। তারপর ছাতা খুলে মাথার ওপর ধরে পিছে পিছে হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করল-কোনদিকে যাবেন ?

বারবারা হেসে ফেলল। বলল- আচ্ছা আয়া তুমি ছাতা ধরে আমার পেছন পেছন কত দূর যাবে। তুমি যে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তার চাইতে তুমি কুঠিতে যাও । আমি একা একাই ঘুরব।

আয়া সভয়ে জিভ কাটল-এটা একটা কথা হল। আমি আপনার খাস আয়া । সব সময় আপনার সঙ্গে থাকবার হুকুম আমার। আপনি একা একা ছাতা ছাড়া বেড়াতে যাবেন.....এ কথা শুনলে যে সাহেব রাগ করবেন।

বারবারা থমকে দাঁড়াল-বেশ তাহলে চল । আমি রেনী সাহেবের কুঠিতে যাব।

আয়া যেন শিহরিত হল-উঃ, সে তো অনেকটা পথ। আপনার পায় যে ফোস্কা পড়ে যাবে। আপনি একটু সবুর করুন, আমি বেহারাদের পালকী বের করতে বলি ।

বারবারার মন থেকে সকালের স্নিগ্ধতা ঝরে প্রখরতা ফুটল। ভারী বিরক্ত বোধ করল সে। ফারলং সাহেবের মেয়ের কি নিজের ইচ্ছে মত একটু হাঁটবার স্বাধীনতাও নেই ! না হয় বাবা একজন বিখ্যাত নীল ব্যবসায়ী তাই বলে কতগুলো ফস্ প্রেজুডিসের কি অর্থ থাকতে পারে। বারবারার রাগ হল। ইচ্ছে হল ছাতাটা এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে দূরের ওই চষা মাটির ক্ষেত, ওই মাঠ প্রান্তরে নিজের খেয়াল খুশী মত ঘুরে বেড়ায়। ইতিমধ্যে বেহারার পালকী নিয়ে উপস্থিত হল। তিক্ত বিতৃষ্ণা মনে চেপে বারবারা পালকীতে উঠে বসল।

তিন

অছিমউদ্দিন দা দিয়ে বাঁশ চেঁছে ঝুড়ি তৈরী করছিল উঠোনে বসে। হারু ছুটতে ছুটতে এল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল-দাদাজান আজ নীলকুঠিতে গিয়েছিলাম গো ।

অছিমদ্দিন চোখ না তুলেই প্রশ্ন করল-কি হল তাই ।

হারু বসে পড়ল অছিমদ্দিনের সামনে । রুদ্ধশ্বাসটা হালকা করে বলল— মোল্লাপাড়ার করিম মোল্লা নীল গাছের আঁটি গরুর গাড়ী বোঝাই করে যাচ্ছিল। পথের ধারে কাদায় গাড়ীর চাকা আটকে গেল। আমায় দেখ বললে ‘গাড়ীটা ঠেলে দে তো হারু।' আমিও কম চালাক নই। আমি শুধু শুধু গাড়ী ঠেলতে যাব কেন ? বললাম-গাড়ী ঠেলে তুলছি চাচা, আমায় কিন্তু নীলকুঠিতে নিয়ে

যেতে হবে। বুঝলে দাদাজান। গাড়ী ঠেলে তুলে আমিও চেপে বসলাম নীলের গাড়ীতে। অনেকগুলো গাড়ী যাচ্ছিল কি না । তাই কেউ কিছু আর বললে না।

অছিমদ্দিন মাথা নাড়ল-ও পাড়ার ওরা সব দাদনের নীল চাষী কি না। লং সাহেবের কাছে একজন দশ বছর পনেরো বছরের দাদনের চুক্তি নিয়েছে। এখন মর। ক্ষেতে একটা ধানের চারা লাগাতে পারে না। গোলায় এক ফোঁটা ধান ওঠে না। ওদিকে চুক্তি মত নীলের চাষ করে চলেছে। সাহেব তো একটা পয়সাও আর দিচ্ছে না ।

হারু একটু ভেবে বলল-তা সদরে গিয়ে কাছারীতে নালিশ করলেই পারে। শুধু শুধু ঠকবে কেন ।

অছিমদ্দি হাতের দাটা কয়েকবার ঠুকে হারুর দিকে তাকাল-হাবারাম কি তোকে বলে সাইদু সাধে। ঘটে যদি এক ফোঁটা বুদ্ধি থেকে থাকে। বলি নালিশ করবে কার কাছে। ওই কুঠিয়ালরা আর বিচারকরনেওয়ালার তো একই জাতের একই দেশের লোক। ক'টা চাষী ঠকল তা নিয়ে তাদের থোড়াই মাথা ব্যথা ।

চাষীদের নালিশ তাই হামেশাই নাকচ হয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের এই দেশী জমিদারগুলো একেবারে পাঁজির পা ঝাড়া নেমকহারাম। ইংরেজ কুঠিয়ালদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাবুয়ানা করে। রায়ত পেটায়, লোকের ভিটে উচ্ছেদ করে, নীলের চাষ লাগায়, মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করে জাতে উঠতে ব্যস্ত। দেশের লোকের হয়ে দু'কথা বলবার সাহস তাদের নেই। এই দ্যাখ কি বলতে বলতে কোথায় কি বলতে শুরু করলাম। তা নীল কুঠিতে গিয়ে কি দেখলি ।

-ওঃ, এলাহি কাণ্ডকারখানা। গাড়ী গাড়ী নীল এসে খামারে জমা হচ্ছে। আর কি বড় বড় সব চৌবাচ্চা। তার মধ্যে নীল গাছের আঁটি ধরে ধরে জাক দিয়ে পচান হচ্ছে। আবার ওদিকে খামারের কাছারী ঘরের গোমস্তা কি চেঁচামেচি করে একদল চাষাকে বকছে, বলছে—ব্যাটারা পয়সা চাইতে এসেছে, এঃ, সাহস কত। নীলের যোগান দিতে পারছিস না। দাদন নিয়েছিস। তারপর পয়সা চাইতে এসেছিস। দেব ব্যাটাদের সাহেবের কয়েদখানায় ভরে। বউ-ঝিদের ধরে চালান করে দেব বাগান বাড়ীতে। তারপর তোদের ভিটে উচ্ছেদ করে লাঙল বসিয়ে নীল চাষের আবাদ করাব। উঃ, বজ্জাত হাড়ে হারামজাদারা, দাদন নেবার সময় মনে ছিল না। বলতে বলতে সহসা চুপ করে গেল

হারাধন। তার চোখের সামনে কাছারী ঘরের সেই দৃশ্যটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল ।

মোটাসোটা নধরকান্তি গোমস্তা একদল নিরুপায় চাষীর ওপর তর্জনে গর্জনে অস্থির ।

একজন চাষী গোমস্তার পা জড়িয়ে ধরল-বাবু গরীবের বাপ-মা আপনি। যখন দাদন নিয়েছিলাম তখন অন্য ফসলের চাষের কথা তো জানা ছিল না। তখন পয়সা কড়িও কিছু সাহেবরা দিয়েছে, এখন তো কিছুই পাই না। তার ওপর না খেয়ে ছেলে-মেয়ে নিয়ে যে আর পারি না। ধানের চাষ করতে পারি না। পয়সা কড়ি কিছু না পেলে কি খাইয়ে পরিবার বাঁচাব। দয়া করুন বাবু।

গোমস্তার মুখ মহা বিরক্তির কুঞ্চিত হল। বিশ্রী চীৎকার করে উঠল-যা যা ব্যাটা, আর নাকি কান্না কাঁদতে হবে না। একটা পয়সাও পাবি না। ঝি-বউকে খাওয়াতে না পারিস কুঠিবাড়ীতে পৌঁছে দে। সাহেবদের মন খুশী করতে পারলে খেয়ে পরে সুখেই থাকবে ।

চাষীদের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের একজন চাষী ফুঁসে উঠল-মুখ সামলে কথা বোল বাবু। আমাদের পরিবারে ইজ্জত তুলে কথা বললে ভালো হবে না কিন্তু ।

—বটে। বটে। গোমস্তা রেগে লাল হল – উঃ, বিষ নেই তায় কুলোপন্না চক্কর। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে একজন পাইককে গোমস্তা হুকুম দিল-এ ব্যাটাকে সাজা ঘরে নিয়ে যা, দু'শ চাবুক মেরে তবে ছাড়বি। সাহস কত চাষার ব্যাটার। মুখে মুখে বাহেজ করতে আসে ।

পাইক এসে লাঠি মারতে মারতে লোকটাকে নিয়ে গেল। একটা নীলের গাড়ীর আড়াল থেকে হারু দেখছিল। ভয়ে সে যেন কাঠ হয়ে গেল। গোমস্তা ফিরে তাকাল জড়সড় হয়ে বসে থাকা চাষীদের দিকে ।

একজনকে উদ্দেশ্য করে বলল-এই রহিম বিশ্বাস। শোন তোর সঙ্গে একটা কথা আছে। তোর বউ বুঝি খুব সুন্দরী। শুনেছি একেবারে ডানাকাটা পরী। সেদিন বুঝি ঘাট থেকে কলসী নিয়ে বাড়ী ফিরছিল। এদিকে আমাদের ছোট কুঠিয়াল রেনী সাহবে ঘোড়ায় চড়ে ওই পথ দিয়েই আসছিল। দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে নজরে আটকে গেছে। সাহেব তো হন্যে হয়ে গেছে। ওই মেয়ে তাকে এনে দিতেই হবে।

হিঃ হিঃ করে বিশ্রী শব্দ তুলে হাসল গোমস্তা। সেই সঙ্গে কাছারীর অন্য কর্মচারীরাও হাসিতে যোগ দিল । মাথা নীচু করে রইল রহিম বিশ্বাস ।

কুঠির কর্মচারীদের মধ্য থেকে কে একজন বলল-কি রে, অমন দম মেরে গেলি কেন ?

রহিম নির্বিকার ভাবে মুখ তুলল। কিন্তু তার চোখ দু'টি জ্বলতে লাগল আগুনের মত। তবু আশ্চর্য দৃঢ়তায় বলল-আমার এখানে আর বলবার কি আছে। আমাদের নালিশ সেই ওপরওয়ালা একজনের কাছেই পৌঁছচ্ছে। সব কিছুরই বিচার একদিন হবে।

রহিমকে যে বিদ্রূপ করেছিল সে গোমস্তার দিকে ফিরে বসল-দেখুন বাবু স্পর্ধা কত ব্যাটার । এটাকেও সাজা ঘরে পাঠান ।

হঠাৎ রব উঠল ‘বড় সাহেব আসছেন’। ‘বড় সাহেব আসছেন' ।

সকলেই তটস্থ হয়ে উঠল, সাদা তেজীয়ান ঘোড়ার খুরে টগবগ শব্দ তুলে ফারলং সাহেব এসে উপস্থিত হল কাছারীর সামনে। সহিস ছুটে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরল। সাহেব লাফিয়ে নামল ঘোড়ার পিঠ থেকে। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে কাছারীতে উঠতে উঠতে বলল-কি গোমস্তা বাবু খবর টবর কি ?

হারু অবাক হয়ে দেখল একটু আগের প্রচণ্ড রাগী গোমস্তা চেহারা একেবারে পালটে গেছে।

হাতজোড় করে বিনয়ে গদগদ হয়ে বলল-খবর মোটামুটি হুজুর। এই যে তাগিদগীর দাদনের চাষীদের ধরে এনেছে। দাদন নিয়েছে ব্যাটারা, এখন বলছে নীলের চাষ আর করতে পারব না।

ফারলং সাহেবের মুখ রাগে রক্তবর্ণ ধারণ করল। হাতের চাবুকটা ঘুরিয়ে এলোপাথাড়ি চাষীদের ওপর চলিয়ে ভয়ংকর কণ্ঠে বরল-নীলের চাষ করবে না ! ছোট জাতরা পেয়েছে কি ! আমার নামও ফারলং সাহেব। চাষীদের দিয়ে নীল চাষ কি করে করতে হয় তা আমার জানা আছে। সব ব্যাটাকে সাজা ঘরে আটকে না খাইয়ে রাখ। আঙ্গুলের মাথা লোহায় থেলে দাও। দুবেলা চাবুক মারো। আর ওদের ঘরদোর আগুন ধরিয়ে দিয়ে সেখানে আমার রায়তী মজুরদের দিয়ে চাষ লাগাও ।

হারু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। ছুটে পালিয়ে এসেছে।

এখন হারু সবই একে একে খুলে বলল অছিমদ্দিনের কাছে। নিশ্চুপ রইল অছিমদ্দি। হারু তার কৈশোর অতিক্রান্ত অভিজ্ঞতায় অন্তত এইটুকু বুঝল যে, নীলকুঠিয়ালরা মানুষের ওপর যে জুলুম চালাচ্ছে তাতে সহযোগিতা করছে এদেশেরই কিছু পরপদলেহী লোভী সুযোগ সন্ধানী ।

তার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলতে লাগল। এক সময় জ্বালা ধরা কণ্ঠে বলল-জানো দাদাজান, আমার ইচ্ছে করে ওই দেশী লোকগুলো, যারা ভাড়া খেটে কুঠিয়ালদের সাথী হয় তাদের ঘর দোরও আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই।

অছিমদ্দি গম্ভীর হয়েই রইল। এক সময় গভীর আক্ষেপে বলল-দেখ হারু একটা হাতের পাঁচটা আঙ্গুল যখন এক সঙ্গে কোন জিনিস ধরে তো সে হাত অনেক কিছুই করতে পারে। আর পাঁচটা আঙ্গুলের তিনটে আঙ্গুল যদি এক কাজে এগোয় দুটো আঙ্গুল না এগোয় তাহলে কোন কাজই হয় না। শোন, মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ এরা নবাবের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করেছিল। আর নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য লড়াই করছে তখন দলে দলে পয়সাওয়ালা লোক জানমাল নিয়ে ছুটেছে কলকাতার দিকে। কলকাতা বড় দেওয়াল ঘেরা শক্ত শহর। সেখানে গিয়ে একবার উঠতে পারলে আর কোন চিন্তা নেই। এদিকে লড়াই হচ্ছে হোক না। দেশ নবাবের শাসনেই থাকুক আর কোম্পানীর ইংরেজ সাহেব ক্লাইভ আর ওয়াটসন সাহেবের কব্জায় আসুক। তাতে কার কি এসে যাচ্ছে। আমরা বাবা, নিজেদের সোনা-দানা মোহর নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে পারলেই হল। আচ্ছা বল হারু, এই লোকগুলোকে তুই কি বলবি। নেমকহারাম। একেবারে নেমকহারাম। আর এই নেমকহারামরাই এখন জমিদারী ভোগ করছে। কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে নায়েব তহশীলদার হয়ে বসেছে। মাঝখান থেকে মরছি আমরা, এই গরীব চাষ করে খাওয়া লোকগুলো। আমাদের দুঃখে বনের পশু পাখী কাঁদে কিন্তু ওই মানুষ নামের লোকগুলোর কিছু হয় না। ওদের কি মানুষ বলবি ?

অছিমদ্দির কথা শেষ করে হারুর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে ।

হারুর মুখে কিসের এক অচেনা অভিব্যক্তি দপ দপ করেছে। ঠোঁটের কোণে অনমনীয় দৃঢ়তা। এ যেন সেই হাবাগোবা হারু নয়, অন্য কেউ। অছিমদ্দি হারুর কাঁধে ধাক্কা দিয়ে প্রশ্ন করল-কি হল রে হারু । কি হয়েছে ? অমন

করে আছিস কেন ?

হারু অদ্ভুত দৃঢ়তায় ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল-এ আমরা মানব না ।

–কি মানবি না !

- দাদন নেব না। নীলের চাষ করব না। একটা ক্ষেতেও আর নীলের বীজ পড়বে না। সবগুলো হাত যদি নীল চাষ বন্ধ করে দেয় তবে কি করে নীলের ব্যবসা করে পয়সা লুটবে ওই কোম্পানীর নীল কুঠিয়ালরা। আমরা নীল চাষ করব না। করব না ।

বৃদ্ধ অছিমদ্দির দুচোখ আবেগে অশ্রু সজল হয়ে উঠল। দু'হাতে হারুকে বুকে জড়িয়ে ধরে ধরা গলায় বলল-হারু সোনা আমার। তুই আজ যে কথা শোনালি এমন কথাতো কেউ কোনদিন বলে নি । কেউ ভাবে নি ।

চার

পালকী চড়ে রেনী সাহেবের বাংলোতে আসতে বারবারার কিন্তু খারাপ লাগেনি। বরং পালকীর দোলা অনুভব করতে করতে পালকীর খুলে রাখা দরজার ফাঁক দিয়ে দু'ধারের শোভা সে মন দিয়ে উপভোগ করছিল। পথের দু'দিকে লোকজন লং সাহেবের মেয়ের পালকী দেখে সভয়ে পথ ছেড়ে সরে যাচ্ছিল আর দু'হাত তুলে অভিবাদন জানাচ্ছিল।

রেনীর বাড়ীতে পৌছে বারবার কিন্তু রেনীকে পায় নি। কি কাজে বেরিয়ে গেছে সে।

প্রথমে একটু অভিমান হল বারবারার। রেনীই কিন্তু বলেছিল তাকে আসতে। আরও বলেছিল আজ সে বারবারাকে সামনে রেখে তার একটা ছবি এঁকে দেবে । অথচ আর্টিস্টের নিজেরই পাত্তা নেই। পরক্ষণেই আপন মনে মিষ্টি হাসল বারবারা । যা ভুলো মন রেনীর। আর্টিস্ট মানুষরা নাকি এমনিই হয়ে থাকে। কিন্তু বাবা যে বলেন রেনী জাঁদরেল নীলকুঠিয়াল। তার নামে পুরো তল্লাট থরথর করে কাঁপে ।

কি যেন বাবার মন্তব্যের সঙ্গে নিজের চোখে দেখা রেনীর চরিত্রের সামঞ্জস্যই খুঁজে পায় না বারবারা। রেনী ভাবুক। রেনী বাঁশী বাজায়। ছবি আঁকে। আর কি সুন্দর কথা বলতে পারে। এমন সুন্দর পুরুষ বারবারা তার এই বসন্তের

ছোঁয়া লাগা জীবনে ক'টা দেখেছে ! সত্যি কথা বলতে কি রেনীই তার জীবনের প্রথম পুরুষ। রেনীই বারবারার দুচোখে ভালো লাগার অঞ্জন পরিয়েছে। হৃদয় প্লাবিত করে এনেছে প্রেম। বারবার মনে পড়ল ক'দিন আগে তাদের বাড়ীতে একটা পার্টি হয়েছিল। কলকাতা থেকে সস্ত্রীক বাবার ক'জন বন্ধু বান্ধব এসেছিলেন। এর মধ্যে একজন ছিলেন কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টরসদের হোমরা চোমরা কর্তা মিঃ হগিনস্ এবং তাঁর স্ত্রী অ্যাঞ্জেলা হগিন্স ।

বাবা সেদিন সত্যিই চমৎকার পার্টির আয়োজন করেছিলেন। বাবুর্চিরা সারা দিন ধরে নানা পদের নানা স্বাদের রান্না করেছিল। অনেক উঁচু জাতের ড্রিংকসও জোগাড় করা হয়েছিল। তাদের কুঠির বড় হল ঘরটায় যখন অনেকগুলো রঙিন কাঁচের ঝাড়বাতি জ্বলে উঠেছে তখন বিলেত থেকে নিয়ে আসা অরগ্যানের সামনে বসেছে সুন্দর সাজে সাজা বারবারা। তার সুন্দর আঙুলে তোলা সুরে তাল মিলিয়ে সবাই জোড়া নৃত্যের ঝলক তুলেছে। নাচে গানে গল্পে বিভোর অতিথিরা কেউই জানতে পারে নি যে বাইরে তখন রূপোর থালার মত একটা চাঁদ সুন্দর স্নিগ্ধ আলোর ধারা ছড়াচ্ছে পৃথিবীর বুকে। অরগ্যান বাজাতে বাজাতে বারবারা কিন্তু ঠিকই খেয়াল করে সম্মানীয় অতিথি মিসেস অ্যাঞ্জেলা হগিন্স রেনীর সঙ্গে নাচছে। ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে নীচু কণ্ঠে আলাপ করছে। মাঝে মাঝে দু'জনই হাসছে। অকারণে রাগ হচ্ছিল বারবারার । বাজনায় বুঝি তাল কাটছিল।

এক সময় লক্ষ্য করল রেনী এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। প্রথমে অভিমানে মুখ ঘুরিয়েছিল বারবারা। রেনী সন্তর্পণে বারবারার কাঁধে একটা হাত রেখে অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বলেছিল – একটু বাইরে বারান্দায় যাবে বারবারা ? দেখবে কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে আকাশে, এসো.....।

রেনীর কণ্ঠস্বর আর দৃষ্টিতে ছিল বুঝি সম্মোহনের যাদু। সবাই গল্পে ব্যস্ত । দু'জন বেরিয়ে এল বারান্দায়। কাঠের রেলিং দেওয়া টানা বারান্দায় চাঁদের আলো তির্যক ভঙ্গীতে এসে পড়েছে।

বারান্দায় এক কোণে খুব ঘনিষ্ঠভাবে এসে দাঁড়িয়েছিল দু'জন। রেনী একটা হাত বাড়িয়ে বারবারাকে বেষ্টন করে টেনেছিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে গিয়েছিল বারবারা। এক হাত দিয়ে বারবারার কোমর জড়িয়ে ধরে আরেক হাতে বারবারার সোনালী চুল নিয়ে খেলা করেছিল রেনী। রেনীর বুকে মাথা রেখে সুখে আনন্দে বিভোর হয়েছিল বারবারা। এক সময় বারবারার

চিবুক তুলে ধরে তাকে অজস্র চুমুতে বিবশ করে দিয়েছিল রেনী। নীচু কণ্ঠে ডেকেছিল— বারবারা।

— উঃ।

—দ্যাখো এই দূরের চাঁদটা। তুমি বুঝি ওই চাঁদের চেয়েও সুন্দর। তোমাকে আমি ভালোবাসি বিশ্বাস কর তো বারবারা ?

- করি। করব।

বারাবারা রেনীর বুক থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিয়েছিল ।

আরেক পশলা আদরে বারবারাকে ভরিয়ে দিয়ে রেনী বলেছিল – জানো এখন আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে। কবিতা আবৃত্তি করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

বারবারা ফিসফিস করে উঠেছিল- ডারলিং রেনী। ইউ আর সো সুইট। তোমাকে না পেলে আমি বোধ হয় এখানে থাকতে পারতাম না। আর এখন তো তোমাকে একদিন না দেখে থাকতে পারি না ।

- তাহলে চল আগামী মাসেই এনগেজমেন্টটা সেরে ফেলি। তোমাকে যে আমি ভীষণভাবে চাই বারবারা ।

বারবারা উত্তরে মিষ্টি করে হেসেছিল ।

রেনীর বাংলোর বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে রেনীর অনেক আদর, অনেক আবদারের স্মৃতি মনে পড়ে হেসে ফেলল বারবারা।

সারাটাদিন একাই রেনীর বাংলোকে ভাবী স্বামীগৃহ মনে করে চাকর খানসামাদের সঙ্গে নিয়ে নিজের অভিরুচিমত ঘর-দোর গোছগাছ করল। এখানকার ফার্নিচার ওখানে সরিয়ে দেয়ালের ছবির স্থান পরিবর্তন করে সারা বাড়ীটাকেই সুন্দর করে তুলল। ঘর বাড়ীর সংস্কারের পর বারবারা কিচেনে ঢুকল। বাবুর্চিদের নিষেধ সত্ত্বেও নিজ হাতে কয়েকটা বিশেষ ‘ডিশ’ তৈরী করল রেনীর জন্য। বারবারার কিন্তু জানা হয়ে গেছে রেনী কি কি খেতে পছন্দ করে। রান্না-বাড়া সেরে, স্নানঘরে গিয়ে স্নান করে ঝরঝরে হয়ে বাইরে এল বারবারা। রেনী তখনও ফেরে নি। একটু যেন ক্ষুণ্ণ হল বারবারা। পরক্ষণেই নিজের মনকে বোঝাল। রেনী কাজের মানুষ। কাজকর্ম ফেলে বাড়ী এসে বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তা'ছাড়া রেনী তো জানেও না যে

আজ সকালে উঠেই বারবারা এখানে ছুটে আসবে। বারবারা একবার ভাবল খানসামাকে দিয়ে রেনীকে খবর পাঠালে কেমন হয়। না থাক, বরং রেনী ফিরে অপ্রত্যাশিতভাবে বারবারাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। অনেক যত্নে খাবার টেবিল সাজাল বারবারা। বাইরে দুপুরের রোদ স্তিমিত হয়ে আসছে। ব্যস্ত হল সে। কখন ফিরবে রেনী ! এদিকে যে লাঞ্চের সময় পার হয়ে গেল। রেনীর ঘরের আরাম কেদারাটায় বসে জানালা দিয়ে বাইরের ধূলি ধূসরিত পথটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল বারবারা ।

হঠাৎ কেমন একটা অস্বস্তিকর শব্দ আর গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল বারবারার। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। ঘরে চাকর লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে গেছে। বারবারা দু'হাতে চোখ রগড়ে উঠে দাঁড়াল। ইস এতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে। ওদিকে বাবা হয় তো চিন্তায় অস্থির হয়ে পালকী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে রেনীর বাংলোর উদ্দেশে। কিন্তু সারাটা বাড়ী এমন নিঝুম কেন ? রেনী কি এখনও ফেরে নি ? কিন্তু বারবারার যেন মনে হচ্ছে কিসের একটা শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙেছে। উঠে দাঁড়িয়ে এক'পা এগিয়েই থমকে হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হল বারবারাকে ।

পাশের ঘর থেকে একটা নারীকণ্ঠের আতচীৎকার আর ধস্তাধস্তির শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে একটি পুরুষ কণ্ঠের অসংযত কথার শব্দও ভেসে আসছে। হতভম্ব হয়ে গেল বারবারা। সেই সঙ্গে ভয় পেল প্রচণ্ড। এসব কি ভৌতিক কাণ্ড হচ্ছে ! একটু পরে আবার চীৎকার, আর কান্না জড়িত অনুনয় ।

বারবারা এবার আর স্থির থাকতে পারল না। ছুটে গিয়ে পাশের ঘরের দরজায় দু'হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে শুরু করল দরজা খোল । দরজা খোল। ক্যান ইউ হিয়ার মি ? প্লীজ প্লীজ ওপেন দ্য ডোর ।

দরজা কিন্তু খুলল না। ভেতরে নারী কণ্ঠের গুমরানো কান্নার শব্দ বরবারাকে ভয়ে আতংকে অস্থির করে তুলল।

দরজার ওপর ক্রমাগত মাথা ঠুকতে ঠুকতে বারবারা কেঁদে ফেল- ওঃ প্লীজ, ওপেন দ্যা ডোর ।

তারপর ফুপিয়ে কেঁদে উঠল – ওঃ রেনী ডিয়ার, হোয়ার আর ইউ ? আই অ্যাম ডাইং ইন দিস হনটেড রুম ।

এবারে দরজা খুলে গেল। সামনে তাকিয়েই চোখ বন্ধ করে ফেলল বারবারা। তার মনে হল সারা জীবনের জন্য এ দরজা বন্ধ থাকলেই বোধ হয় ভালো হত । এই বন্ধ দরজা খুলে গিয়ে বুঝি বারবারার জীবনের সব আনন্দ আর বিশ্বাসের দরজা বন্ধ হয়ে গেল ।

ঘরের মধ্যে এক বিবস্ত্র যুবতী নারী ভীত অসহায়তায় বিছানায় পড়ে। আর আর বিছানার পাশে তার বাবা ফারলং আর রেনী। রেনীর এক হাতে চাবুক আর একটা হাত তখনও সেই যুবতীটিকে ধরে আছে। টেবিলে ড্রিংকসের বোতল আর গ্লাস ।

বারবারার মনে হল তার পায়ের নীচের মাটি সরে যাচ্ছে, দু'হাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠল সে - ও গড। এ তুমি আমাকে কি দেখালে ।

পাঁচ

নীলের দাদন নেবনা। নীলের চাষ করব না। সম্মিলিত কণ্ঠের শপথ উচ্চারিত হয়েছে তাদের কণ্ঠে, যারা এতদিন বুটের লাথি, চাবুক আর সাজা ঘরের শাস্তি ছাড়া কিছুই পায়নি। অবলা পশুর মত যারা কেবল মুখ বুজে অত্যাচার সয়েছে, আজ তারা যেন কোন মন্ত্রবলে প্রবল শক্তিতে জেগে উঠেছে।

অছিমদ্দি শেখের ছেলে সাইদুকে ক'দিন আগে নীলকুঠিতে ডেকে পাঠান হয়েছিল। ফারলং সাহেবের হুকুম হয়েছে ‘তার জমিতে নীলের চাষ করতে হবে'। হুকুম অমান্যকারীর শাস্তির কথাও শোনান হয়েছিল ।

সাইদু কিন্তু শোনে নি। বলেছে আমীনকে – ভাই, নীলের দাদন আমি নেব না। দু'টো ধান-পান যা হচ্ছে তাতে আমাদের সংসার চলেছে। ওই জমিতে যদি ধান না বুনে নীল গাছ বুনি তবে কি ভাতের বদলে নীল খেয়ে পেট ভরবে?

আমীন মুখ খিচিয়ে উঠেছে – যা ব্যাটা গো মূর্খ চাষা। নীলের চাষ করলে যে কাঁচা টাকা পাবি ।

সাইদু অবজ্ঞায় জবাব দিয়েছে- ওঃ, কাঁচা টাকা দিয়ে তো নীলকর সাহেবরা চাষার বাড়ীতে দালান তুলে দিয়েছে। আমি পারব না নীলের চাষ করতে।

সাইদুর পাশে দাঁড়ান করিম শেখের ছোট ভাইটা বারুদের মত জ্বলে উঠেছে – আমীন সাহেব, তোমরা না এদেশের মানুষ। তোমরা তো সমুদ্দুর পেরিয়ে

ওই ইংরেজদের মত মজা লুটতে আস নি। জানো রেনী সাহেবের বাংলোতে তোমাদের পাইক বরকন্দাজরা আমার বোনকে ধরে নিয়ে তুলে দিয়েছে। আমার ভাইকে সাজাঘরে আটকে তিল তিল করে যন্ত্রণা দিয়ে মারছে। তোমাদের মা-বোনের কি ইজ্জত নেই ? তোমার ভাইকে যদি সাজাঘরে তাকে থামিয়ে দিয়ে আমীন চেঁচিয়ে উঠল- চোপ বেয়াদব। কার সঙ্গে কথা বলছিস জানিস ! চাকে তোর পিঠের ছাল তুলে দেব।

হারু কোথা থেকে লাফিয়ে এসে পড়ল- তুমি চুপ করো পরের নেমক খাওয়া গোলাম । এই শুনে রাখ, নীলের চাষ আজ থেকে আর কেউ করবে না। সাত গাঁয়ের মধ্যে নীলকুঠি থাকতে দেব না আমরা। এ গাঁ, এ জমি আমাদের।

আমীন রেগে উঠে হারুর পিঠে একটা ছড়ির বাড়ি মারল। ক্ষুব্ধ বাঘের বিক্রমে আমীনের ওপর লাফিয়ে পড়ল হারু। দেখতে দেখতে বিরাট জনতার ভীড় জমে গেল। পাইক বরকন্দাজ আর জমি মাপার সাহায্যকারী লোকজন বে-গতিক দেখে সরে পড়ল। সকলে মিলে আমীনকে ধরে নিয়ে বন্দী করল অছিমদ্দি শেখের ধানের গোলার মধ্যে।

দাবানলের মত খবর ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। চাষীরা বিদ্রোহ করেছে। তারা আর নীলের দাদন নেবে না। নীল চাষ করবে না। উপায়হীন পশুর মত পড়ে তারা আর মার খাবে না ।

খবর ছড়িয়ে পড়ল নান্দায়ালী, শিবরামপুর, শুরসুনা, শালনগরে। দক্ষিণ বাংলার প্রান্তে প্রান্তে। বিদ্রোহের নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে এল তরুণ হারাধন। গ্রামে গ্রামে দল গড়ে উঠল। গোপন আড্ডায় চলতে লাগল শলা পরামর্শ, কি করে নীলকর কুঠিয়ালদের ধ্বংস করা যায়। লাঠি খেলা, সড়কী ছোড়া, রাম দা ঘুরান স কসরতেই পারদর্শিতা দেখাল হারাধন ।

রাতে বাঁশ ঝাড়ের ডালপালার ভেতর দিয়ে হঠাৎ কখন এক ফালি চাঁদ ভেসে ওঠে । ঝোপে-ঝাড়ে জ্বলে জোনাকীর দল।

বৃদ্ধ অছিমদ্দি শেখ খামার বাড়ীতে বসে বসে হুঁকো টানছিল। খড়ের পালানের পেছন থেকে হারুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল -

“মোল্লা খায় কলা

কাজী খায় রান

শেখের গলায় দড়ি দিয়ে

হড়হড়িয়ে টান” ।

অছিমদ্দি হেসে ফেলল - ওরে হতচ্ছাড়া বাড়ী ফিরেই আমার সঙ্গে লাগতে এসেছিস।

হারু হাসতে হাসতে এসে বসে পড়ল অছিমদ্দির সামনে। বলল – দাদাজান, তোমার সঙ্গে আবার কখন লাগলাম। আমি তো মোল্লা – আর কাজীদের ব্যাখান করছি। এই মোল্লা হল নীলকর ইংরেজ সাহেবরা। কাজী হল যত দেশী জমিদার আর ইংরেজদের মায়না করা পোষা কর্মচারীরা। আর শেখ হলাম গিয়ে আমরা। যাদের পেটে দু'মুঠো অন্ন জোটে না। অথচ কলুর বলদের মত যারা কেবল খেটেই মরি ।

অছিমদ্দি কপারে মৃদু করাঘাত করল— সবই এই নসীবের দোষ রে।

হারু উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসল। উদ্দীপ্ত হল তার কণ্ঠ- কেন কেবল নসীবের দোষ দেবে দাদাজান ! নসীব কি বদলান যায় না ? একশ' বার যায়। আমিও দেখিয়ে ছাড়ব নসীব বদলান যায় কিনা। আগুনে পুড়িয়ে মারব ওই নীলকর সাহেব, তাদের সাঙ্গপাঙ্গ আর ইংরেজের পা-চাটা জমিদার বাবুদের। আমরা যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছি। কি রকম লড়াইটা হয় একবার দেখে নিও ।

কথা বলতে বলতে কেমন উন্মনা হয়ে গেল হারাধন। সে শুনেছে কুঠিয়াল সাহেবরাও নাকি জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। শোনা যাচ্ছে কলকাতা থেকে গোরা সৈন্য বন্দুক-কামান নিয়ে আসবে ।

আনুক। নিজের মনে সাহস ফিরিয়ে আনল হারু। হাজার হাজার চাষীর মনের আর কব্জির জোরটা বড় কম নয় ।

সহসা অচেনা কার কণ্ঠস্বরে হারু ধাতস্থ হল। বাবড়ী চুলওয়ালা হাতে পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে দু'জন পাইক গোছের লোক এসে দাঁড়াল ।

একজন রাশভারি কণ্ঠে প্রশ্ন করল – এটা অছিমদ্দি শেখের বাড়ী নয় ? অছিমদ্দি মাথা নেড়ে জবাব দিল - হ্যাঁ, আমিই অছিমদ্দি শেখ। তোমরা ? কোথা থেকে আসছ.... মানে তা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না ।

লাঠিধারী গোঁফে তা দিয়ে বুকের পেশী ফুলিয়ে সগর্বে উত্তর দিল - আমরা

মোল্লাহাটির জমিদার বাবুর কাছ থেকে আসছি। হারাধন বলে কে যেন আছে তার সঙ্গে বাবু দেখা করতে চান। কর্তা তাই আমাদের পাঠালেন।

হারু এগিয়ে এল।

ধীর দৃঢ় কণ্ঠে বলল - মোল্লাহাটির জমিদার বাবু আমার মত একটা ছোট লোকের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বরকন্দাজ পাঠিয়েছে এতো বড় অবাক কাণ্ড! তা ব্যাপারখানা কি খুলে বলই না ভাই ?

একজন বরকন্দাজ হারাধনের আপাদমস্তক দৃষ্টি বুলিয়ে বলে ফেলল - এই এক ফোঁটা ছোকরাই তা হলে সেই জাত সাপের বাচ্চা ! সাত গাঁয়ের চাষীদের ক্ষেপিয়ে তুলছ তবে তুমিই ?

হারু চটে উঠল – পরের গোলাম আর এর চাইতে বেশী কি বলবে । তর্কবিতর্কটা জমাট বেঁধে উঠছিল। অছিমদ্দি তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল ব্যাপারটা কি ! বরকন্দাজ দু'জনের বিবৃতি থেকে জানা গেল নীলকর সাহেব আর চাষীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন মোল্লাহাটির জমিদার বাবু। তাই তিনি চাষীদের নেতা হারাধনের সঙ্গে কথা বলতে চান ।

হারু নমনীয়তা দেখাল না ।

ঝাঁজের সঙ্গে জানিয়ে দিল- যত পরগনার যত জমিদার সব মিলেও যদি এসে বলে নীলকর কুঠিয়ালদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে তবুও কোন লাভ হবে না। চাষীরা নীলের চাষ আর কোনদিন করবে না ।

মোল্লাহাটির জমিদার বাবুর পাইকরা ফিরে গেল ।

ছয়

বারবারা সেই যে গোঁ ধরে খিল এঁটে বসেছে কেউ তাকে ঘর থেকে বের করতে পারছে না। ফারলং সাহেব বহু অনুনয় বিনয় করে মেয়ের মন টলাতে পারল না । বারবারার এক কথা, এখানে সে একদিনও থাকবে না। তাকে হোমে পাঠিয়ে দেয়া হোক। কলকাতা থেকে যদি শুধু মাল বোঝাই হয়েও কোন জাহাজ ইংল্যান্ডে যায় তবে তাতে চড়েই সে হোমে ফিরে যাবে। ফারলং অনেক বুঝিয়েও বারবারাকে বোঝাতে পারল না। মেয়ে সিদ্ধান্তে অটল । চারদিকে যেন অন্ধকার দেখল ফারলং। এদিকে চাষীরা যেমন ক্ষেপে উঠেছে

তাতে কখন যে কি হয় বলা বিপদ। এ দুঃসময়ে বারবারাকে নিয়ে কলকাতায় রওয়ানা হওয়াটাও সমীচীন হবে না। উঃ, কি কুক্ষণে সেদিন রেনীর আমন্ত্রণে তার বাড়ীতে ফুর্তি করতে গিয়েছিল।

রেনীও এল বারবারাকে বুঝাতে। বারবারার ঘরের বন্ধ দরজায় করাঘাত করে কোমল কণ্ঠে ডাকল-বারবারা। বারবারা মাই ডিয়ার। মাই ডার্লিং। দরজা খোল তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার ।

ঘরের ভেতর বারবারা নিশ্চুপ। রেনী ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগল ।

-বারবারা দরজা খোল। ক'দিন থেকে তোমাকে না দেখে আমি পাগোল হয়ে গেছি।

ভেতর থেকে বারবারার শীতল কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছে–তোমার মত লোকেরা পাগোল হয় না মিঃ রেনী। তুমি যাও তোমার বাংলাতে সেখানে অনেক 'ফান' আছে ।

তবু রেনী দরজায় আঘাত করল—আমায় ক্ষমা কর বারবারা ।

-আমার কাছে কেন ক্ষমা চাইতে এসেছ মিঃ রেনী। ক্ষমা তাদের কাছে চাও যাদের ঘরের মেয়েদের ধরে তোমার কুঠিতে নিয়ে এস। যাদের রক্তে তোমাদের হাতের চাবুক লাল হয়ে থাকে। ক্ষমা চাও তাদের কাছে যাদেরকে তোমরা ঘৃণ্য পশুর চেয়েও অধম মনে কর, অথচ তাদেরই রক্ত জল করা পরিশ্রমে লর্ডের মত আয়েসে জীবন কাটাও। আমার কাছে নয় ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর মিঃ রেনী

সর্ব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। বারবারা প্রায় অনশন করে বন্ধ ঘরে পড়ে রইল। অদ্ভুত তার দাবি। তাকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিতে হবে তা না হলে এদেশের মানুষের ওপর এই অমানুষিক অত্যাচার করা চলবে না। নীলের চাষ বন্ধ করে দিতে হবে।

ফারলং মাথায় হাত দিয়ে পড়ল। এমন অদ্ভুত কথা কেউ কোনদিন শুনেছে যে জাঁদরেল নীলকর সাহেবের মেয়ের প্রস্তাব হল কি না নীলের চাষ বন্ধ করে দিতে হবে ! পাগোল আর কি ! সারাটা পৃথিবীর বাজারে বাংলার নীল বিক্রী করে একচেটিয়া মুনাফা লাভ করে নীল ব্যবসায়ীরা রাজার হালে দিন কাটাচ্ছে। দু'হাত দিয়ে লুটে আনছে কাঁচা সোনা। হুঁঃ, বললেই হল নীলের

চাষ বন্ধ করে দাও। এরপর মেয়েকে বিলেতে না পাঠিয়ে আর কি করতে পারে ফারলং।

একদিন বারবারা ভারাক্রান্ত মুখে পালকীতে চড়ে বসল। তারপর জাহাজে উঠে হাত নেড়ে বিদায় নিল। কিন্তু যাবার আগে পর্যন্ত রেনীর নাম একবার মুখ দিয়ে উচ্চারণও করল না বারবারা ।

বারবারাকে পাঠিয়ে দিয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ফারলং। কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার কারণ খুঁজে পেল না অবশ্য। চাষীরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে নীলকরদের বিরুদ্ধে। দেশীয় জমিদার আর নিজেদের পাইক বরকন্দাজ দিয়ে ক্ষেপে উঠা চাষীদের দমানোর কথা চিন্তা করা এখন প্রায় অসম্ভব। ফারলং ভাবল এবার কলকাতায় গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলা প্রয়োজন ।

কলকাতায় এসে ফারলং এক বিরাট মানসিক আঘাতে নির্বাক হয়ে গেল । ম্যাজিস্ট্রেট ও কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের সদস্যদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা। বিলেতের এক বিখ্যাত জার্নালে নীলকরদের প্রতি খোলা চিঠি, এই কলামে বারবারা ফালংয়ের বিবৃতি ছাপা হয়েছে। বাংলাদেশে মোট কত নীল উৎপন্ন হয়, কত একর জমিতে রায়তী প্রথায় এবং কত একর জমিতে দাদনে নীলের চাষ করা হয় তার সঠিক হিসেব দেয়া হয়েছে। এতে নীলকরদের প্রচুর অর্থ লাভের বিষয়ও নির্দেশ করা হয়েছে। এই বিবৃতিতে লেখা হয়েছে "ইন্ডিয়া তথা বাংলাদেশে যে প্রথায় নীলের চাষ চলেছে তা যেমনি অমানুষিক তেমনি মর্মন্তুদ । নীলকর ইংরেজ কুঠিয়ালদের অত্যাচারে শত শত সোনার সংসার ছারখার হয়ে যাচ্ছে। চাষীদের ভিটেমাটি উচ্ছেদ করে সেখানে নীলের চাষ করা হচ্ছে। চাষীদের স্ত্রী-কন্যাদের বলপূর্বক কুঠিতে ধরে এনে তাদের ইজ্জত হানি করা হচ্ছে। এই অমানুষিক কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে ইংরেজ জাতির কলংক স্বরূপ।"

ফারলং অভিভূত চক্ষে তাকিয়ে দেখল তারই কন্যা বারবারা ফারলং একদিন তার পিতা ও প্রেমাস্পদকে যে অপকর্ম করতে দেখেছিল তার বিবরণ তুলে দিয়েছে। রাগে, দুঃখে, অপমানে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হল। উঃ, কি দুর্বুদ্ধির বশেই না শখ করে মেয়েকে ইন্ডিয়াতে বেড়াতে নিয়ে এসেছিল। ওদিকে নীলকুঠিকে ঘিরে যে অসন্তোষ বিদ্বেষ জমাট বেঁধে উঠেছে। কখন যে সেই বিষাগ্নি দপ করে আগুনের মত জ্বলে উঠবে কে জানে। এখন একা কি করবে ফারলং ।

সাত

দুপুরের সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে প্রান্তরে। মাঠের মাঝ দিয়ে জমিদার কমলাকান্তদেবের পাল্কী চলেছে। জমিদারের পালকী চলেছে বেহারাদের পালকী টানা সুরে দুলে দুলে। আশপাশের লোকজন সভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াচ্ছে। গাঁয়ের লোক নীলকরদের পরেই ভয় পায় জমিদারকে। ইংরেজদের সঙ্গে জোট বেঁধে নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার করতে দেশী জমিদারও কম যায় না ।

পালকীএসে দুলতে দুলতে থামল রেনী সাহেবের বাংলোর দেওড়ীতে। পালকী থেকে জমিদার বাবু নামলেন। মুহূর্তে চতুর্দিক রব হয়ে গেল মোল্লাহাটির জমিদার আর তার নায়েব এসেছে রেনী সাহেবের কুঠিতে। খবরটা আর চাপা থাকল না।তবু রেনী সাহেব কোন কিছুই আমল দিল না। যদিও বারবারার চলে যাওয়াতে মনটা তার একটু দমে গিয়েছিল। বারবারা তার চরিত্রের শিল্পীসুলভ দিকটা দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল অথচ বারবারার তো বোঝা উচিত ছিল, রেনী একজন স্বাধীন ক্ষমতাশালী পুরুষ। উদ্দমতা তার কিছু তো থাকবেই। অনেকটা স্তেপে চরে বেড়ান অবাধ্য অশ্বের মত ।

মেয়েরা যে কেন এত অবুঝ আর সেন্টিমেন্টাল হয় তার হদিশ খুঁজে না পেয়ে বিরক্ত হয়ে বারবারার চিন্তা ছেড়ে দিয়েছে রেনী। জীবনটা অন্তত এখানে এসে একটা চমৎকার স্পোর্ট হয়ে যায়। জীবনকে ভোগ করাতেই খেলার আনন্দ। আপাতত নীল চাষীদের কি করে সমুচিত শিক্ষা দেয়া যায় সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত রেনী। এদিকে তো ফারলং সাহেব মিটমাট বোঝাপড়া করে ব্যাপারটা থামিয়ে দেবার তালে আছে। রেনীর কিন্তু সে ব্যাপারে একটুও সায় নেই। তার ইচ্ছে হাতী নামিয়ে এই সব ব্ল্যাক ট্রাবল ক্রিয়েটারদের বিচূর্ণ করে দেয়। চাবুক মেরে ওদের পিঠের ছাল তুলে আনে। ওদের গ্রামে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেইজন্যই রেনী তার বিশেষ বন্ধু মোল্লাহাটির জমিদারের শরণাপন্ন হয়েছে। বন্ধ ঘরে দু'জনে অনেকক্ষণ সলাপরার্শ হল । অবশেষে হৃষ্ট চিত্তে দু'জনে পানাহারে বসল ।

জমিদারবাবু আর নায়েব গোঁফে তা দিয়ে মুচকি হাসল। এইবার ব্যাটা চাষাদের এক হাত দেখে নেয়া যাবে ।

রেনী সাহেব খেতে খেতে বলে উঠল-উঃ, অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে। এদের

একেবারে গুঁড়ো করেনা দিলে চলবে না ।

সুরাপানে রক্তিম চোখ তুলে জমিদারবাবু বলল-গুঁড়ো মানে ছাতু করে দিতে হবে। হুঃ ব্যাটা ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি ।

নায়েব মাথা দুলাল-বলেছেন বটে কর্তা। ছুচো হয়ে হাতীর পায় ল্যাং মারতে আসা। একেবারে কিনা রাজার জাতের সঙ্গে লড়তে আসা ।

রেনী তার পানপাত্র ভরে নিয়ে উষ্ণ কণ্ঠে বলল-আপনারা সেই বদ ছোড়াটার কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন ?

নায়েব মাথা নেড়ে বলে উঠল-হ্যাঁ হুজুর। পাইক পাঠান হয়েছিল। সেটা একেবারে বিচ্ছু সাহেব। কিছুতেই তাকে বাগে আনা গেল না।

রেনী উত্তেজিত হয়ে টেবিলে ঘুষি মারল-ওঃ, স্টপ ইট। একটা ভাতে মরা হাড় জিরজিরে প্যাগান। তাকে এত ভয়। জমিদারের দিকে ফিরল কুঠিয়াল জাঁদরেল নীলকর সাহেব।

রক্তাক্ত চোখ মেলে বলল-মিঃ ফারলং ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলবে না। শুনুন তার আগেই পাইকবরকন্দাজ নামিয়ে ওই চাঁইগুলোকে ধরে এনে সাজাঘরে ভরে ওগুলোকে জীবন্ত কবর দিতে হবে ।

জমিদার বাবুরও নেশা জোরাল হয়ে জোরাল হয়ে উঠল সমান তেজে বলল-সেও আলবত। আর দেরী করা যাবে না। আজ রাতেই আমাদের লাঠিয়ালদের নামিয়ে দিতে হবে ।

রাতে প্রচণ্ড কোলাহল আর ভয়ার্ত চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল অছিমদ্দির। ঘুম ভেঙে হতভম্ব হয়ে দেখল পুরো পাড়াটায় আগুন ধরে গেছে। কোন রকমে ঘরের বাইরে এসে চীৎকার করে ডাকতে লাগল অছিমদ্দি-সাইদু, হারু.... তোরা সব কোথায় ? এমন সর্বনাশা আগুন লাগল কেমন করে....।

অছিমদ্দির কথা শেষ হল না। কুঠিয়ালদের পাইকের লাঠি এসে পড়ল তার মাথায়। মাটিতে পড়ে গেল অছিমদ্দি । জ্ঞান লুপ্ত হতে হতে অছিমদ্দির কানে এল পাইকদের নিষ্ঠুর হর্ষধ্বনি। কে একজন বলল-এই বুড়োটাকে মেরে কি লাভ। আসল কেউটের বাচ্চাটা তো পালিয়েছে। মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা অছিমদ্দির কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু তখনি বাঁশের লাঠির আঘাত এসে

পড়ল তার মাথায়। অছিমদ্দি জ্ঞান হারাল। শুধু পাড়া নয়। সারাটা গ্রাম দাউ দাউ করে জ্বলল । সে আগুন যেন হাজার মানুষের মনের ক্ষোভেও আগুন জ্বেলে দিল। প্রচণ্ড জোয়ারের উত্তাল গর্জনের মত গর্জে উঠল মানুষ। নিজের কুঠিতে বসে অস্থির রেনী। কেন যে ফারলং গোরাসৈন্য নিয়ে ফিরে আসার আগেই প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল সে। এখন এই বিপুলজনতার ক্ষোভ থেকে কেমন করে রেহাই পাবে সে । জমিদার বাবু বেগতিক দেখে পালিয়েছে। কুঠির পাইক বরকন্দাজরাও ফেরারী।

এখন পুরো কুঠিটাকে ঘিরে রেখেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। কি করবে রেনী এখন। ভয়ে ভাবনায় পাগোলের মত নিজের ঘরটার মধ্যে পায়চারী করতে লাগল ।

আট

মধুমতী নদী দিয়ে স্টীমারে চড়ে ফিরছিল ফারলং। সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট লারমুর সাহেব। স্বচক্ষে নীল চাষীদের অবস্থা দেখতে চলেছেন তিনি। তারপর তাঁর রিপোর্ট থেকে সরকার সিদ্ধান্তে পৌছবেন। ফারলং অবশ্য অনেক বলেছে যে বিলেতের জর্নালে ছাপা রিপোর্টে যথেষ্ট অতিশয়োক্তি রয়ে গেছে। বরং নীল চাষীরাই এখন ক্ষেপে গিয়ে বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছে।

জাহাজের ডেকে বসে ফারলং আর লারমুর সাহেব গল্প করছিলেন। জাহাজ মোল্লাহাটির কাছাকাছি এসে গেছে। আর মিনিট দশেকের মধ্যেই তারা ঘাটে নামতে পারবে। লারমুর সাহেব হৃষ্টচিত্তে চোখে একটা দুরবীন লাগিয়ে ঘাটের দিকে দেখছিলেন ।

ফারলং বলল-পালকীতে না এসে স্টীমারে এসে ভালোই হল। জার্নিটা বেশ এনজয় করা গেল ।

লারমুর সাহেবের দুরবীনের মধ্যে তখন এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য ফুটে উঠেছে। হাজার হাজার জনতা জাহাজ ঘাটে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে কি যেন বলছে ।

চোখ থেকে দুরবীন নামিয়ে লারমুর সাহেব বললেন-কি ব্যাপার বলুন তো মিঃ ফারলং। জাহাজ ঘাটায় এত লোক কেন । এরা কি সবাই আপনাদের পাইক না কি ?

লারমুরের হাত থেকে দুরবীন নিয়ে ফারলং তীরের দিকে তাকাল । মুহূর্তে

তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। বিভ্রান্ত কণ্ঠে বলল-আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম মিঃ মুর। এখন দেখুন কি ভয়াবহ অবস্থা কে জানে। রেনীটার যা মাথা গরম । স্টীমারের গতি ক্রমশঃ কমে আসছিল ।

সারেং এসে সালাম দিয়ে সামনে দাঁড়াল-হুজুর, জাহাজ কি ঘাটে লাগাব ? অবস্থা তো বিশেষ ভালো মনে হচ্ছে না। হাজার হাজার মানুষ লাঠি সড়কী নিয়ে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। নাগালের সীমানায় পেলেই বোধহয় ঝাঁপিয়ে পড়বে। কি যে অবস্থা হয় কে জানে।

-হোয়াট ?

এক সঙ্গে দুই সাহেব চমকাল। লারমুর গরম হয়ে আদেশ দিলেন-ভেড়াও জাহাজ । দেখি নেটিভগুলো কত বেড়েছে।

সারেং চলে গেল। লারমুর সাহেব রাগে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলেন । দমদম ব্যারাক থেকে কিছু গোরাসেনা নিয়ে এলে এই ঔদ্ধত্যের উচিত জবাব দেওয়া যেত। কিন্তু অবস্থার যে এত অবনতি ঘটেছে তা তিনি ফারলং-এর বিবৃতি থেকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি।

জাহাজে ঘণ্টি বেজে উঠল। নদীর পানিতে আলোড়ন তুলে জাহাজ ঘাটের নিকটবর্তী হল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত চাষীরা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'নীলকর সাহেব দফা হও'। 'লারমুর ফিরে যাও'।

বিভিন্ন ধ্বনি সমুদ্র গর্জনের মত আছড়ে পড়ল। সারেং ছুটে এল-হুজুর অবস্থা বড় খারাপ। সব লোক যেন ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে আছে। জাহাজ কূলে ভিড়লে কি যে ঘটে যাবে কেজানে ।

লারমুর ভয়ে আতংকে নির্বাক হয়ে গেল । জাঁদরেল নীল কুঠিয়াল ফারলং ভেতরে যথেষ্ট বিচলিত হলেও মুখে প্রকাশ করল না কিছু। শুধু বলল-কেন কি ব্যাপার ?

সারেং ভীত কণ্ঠেই জবাব দিল-কি যেন একজন খালাসী বলছিল চাঁদপুরের কুঠিয়াল রেনী সাহেব আর মোল্লাহাটির জমিদার বাবুর লাঠিয়ালদের সঙ্গে নীল চাষীদের বিরাট ফৌজদারী হয়ে গেছে। দুই পক্ষেরই অনেক লোক মরেছে। চাষীরা ক্ষেপে গিয়ে রেনী সাহেবকে কুঠিতে আটক করে কুঠিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

–বটে, এতখানি সাহস ! আর দেরী নয়। এখুনি শায়েস্তা করতে হবে । লারমুর নীচু কণ্ঠে ফারলংকে উদ্দেশ্য করে বলল-এত উত্তেজিত হবেন না মিঃ লং। আপাতত জাহাজের গতি পরিবর্তন করে আমাদের ফিরে যেতে হবে কলকাতায়। তারপর এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে ।

-কিন্তু সে যে অনেক সময়ের ব্যাপার ।

-তাই বলে এই বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ দিয়ে লাভ নেই ।

এত বিপদের মধ্যেও একটু বিচক্ষণ হাসলেন মিঃ লারমুর। বললেন-মিঃ লং একটা বিড়ালকে আবদ্ধ ঘরে ক্রমাগত মারতে থাকলে সেও একসময় লাফিয়ে উঠে প্রহারকারীর টুটিতে মরণকামড় হানে ।

লারমুরের বক্তৃতা এই মুহূর্তে একটুও ভালো লাগল না ফারলংয়ের। সে যেন দেখতে লাগল হাজার একর জুড়ে নীল চাষের ক্ষেতে আগুন জ্বলছে।

ক্ষীপ্ত হয়ে উঠল ফারলং। উত্তেজিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। তীরে তখন অসংখ্য জনতার বিক্ষোভ ।

সারেং বলল-সাহেব, আপনারা কেবিনের ভেতরে চলে যান। লোক যেমন ক্ষেপে উঠেছে, তাতে তারা সাঁতরে এসে জাহাজে উঠবে ।

ফারলং তবু ভেতরে গেল না। তার নিজস্ব বন্দুকটা কেবিন থেকে নিয়ে এসে তীর লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে লাগল ।

লারমুর ছুটে এলেন-মিঃ লং আপনি কি পাগোল হয়ে গেছেন। এই বিশাল জনতার মধ্যে একটা বন্দুক দিয়ে গুলী ছোঁড়া মানে চাপা আগুন আরও দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দেওয়া ।

ফারলং তবুও থামে না। স্বেদাক্ত মুখে লারমুরের দিকে ফিরে বলল-গুলী ছুঁড়ব না কেন ? ওরা আমার কুঠি জ্বালিয়েছে। নীলের ক্ষেতে আগুন দিয়েছে। রেনীকে বদ্ধঘরে পুড়িয়ে মেরেছে। ইংরেজ জাত কি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে এর প্রতিশোধ নিতে পারবে না ?

লারমুর একরকম জোর করেই ফারলংকে কেবিনে টেনে এনে দরজা আটকে দিলেন ।

সারেং জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। তীরের ক্ষীপ্ত জনতার কোলাহল ক্রমশঃ দূরে পড়ে রইল । জাহাজ ফিরে চলল ।

লারমুর সাহেব এক সময় বললেন-মিঃ ফারলং, ইংরেজ জাত বুদ্ধির স্থিরতার জন্যই এদেশে বাণিজ্য করতে এসে রাজদণ্ড হাতে পেয়েছে। তারা গাছের মাথা কেটে প্রবলেম সল্ভ করে না। তারা জানে বিপজ্জনক ঘটনাকে সমূলে উৎখাত করতে হয়। ফিরে চলুন কলকাতায়। এ অবস্থার মূল উৎপাটনের ব্যবস্থা করে যদি না ফিরি তো আমার নাম লারমুর নয় ।

সারা এলাকা জুড়ে উত্তেজনা। নীলকর সাহেবদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাষীরা এখন আর নীলের চাষ করবে না। ক্ষেত জুড়ে বাতাসে ঢেউ খেলবে আউশ আমন, বোরো ধানের সবুজ সতেজ চারা। কুঠিয়াল সাহেবদের চাবুক আর নয়....

কিন্তু কি হল ।

একদিন রক্তম গোধূলিবেলায় সম্মিলিত ঘোড়ার খুরের শব্দে গ্রামের পর গ্রাম কেঁপে উঠল ।

এবার আর মারাঠা বর্গী নয়। ঘোড়ার খুরে ত্রাসের ঝড় তুলে এগিয়ে এল ইংরেজ গোরা সৈন্য । গর্জে উঠল কামান বন্দুক ।

ছত্রভঙ্গ নীল চাষীরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার আগেই কামানের গোলা এসে পড়তে লাগল ।

সাইদু নেই। অছিমদ্দি নেই। তারা আগেই কুঠিয়ালদের পাইকের হাতে প্রাণ হারিয়েছে।

তবু ছত্রভঙ্গ দিশেহারা চাষীদের এই আচমকা আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবার নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে এল হারাধন। দু'দিন দু'রাত প্রতিরোধ টিকিয়ে রাখল নীল চাষীরা । প্রতিজ্ঞায় অটল হারাধন। এদেশের মাটি থেকে শুধু নীলের চারা নয় ইংরেজের অস্তিত্বকে মূলচ্ছেদ করবার প্রতিজ্ঞা তার ।

কিন্তু ইংরেজের গোলা বন্দুকের সামনে নিরস্ত্র প্রতিরোধ টিকিয়ে রাখা বড় কঠিন। সেদিন আকাশে মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। হারু অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে গ্রামের দিকে চলেছিল। গ্রাম থেকে আরও লোকজন ও ঢাল

সড়কী জোগাড় করতে হবে। আবছা অন্ধকারে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে হারু বলল ‘হয় মওত নয় তো লড়াই।' ভিনদেশী ইংরেজের গোলামী আর নয়। কোম্পানীর শাসনের যাঁতাকলে সারাটা দেশ নিষ্পেষিত হচ্ছে। এ অত্যাচারের অবসান চাই। মানুষের অধিকার নিয়ে বাঁচতে হবে।

চলতে চলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল হারু। বন্দুকের গুলী এসে বিধল তার বুকে। আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল সে। রক্তাপ্লুত বুক চেপে মাটি আঁকড়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু পারল না। আবার ঢলে পড়ে গেল। তার কানে এল মোল্লাহাটির জমিদারের নায়েবের কণ্ঠ-ক'দিন থেকেই তাকে তাকে আছেন হুজুর ।আজকে একেবারে বাগে মোক্ষম মার মেরেছেন হুজুর। এইবার সাহেবরা নির্ঘাত আপনাকে মাথায় তুলে রাখবে.....তাছাড়া ....।

বাকি মন্তব্য হারুর শ্রুতগোচর হল না। তার মুখ দিয়ে অস্পষ্ট জড়িত ধ্বনি নির্গত হল-তোমরা....মীর হাবীব....মীর জাফর....জগৎ শেঠ....উমি চাদ.... চিরদিন দেশের লোকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এলে.....তোমাদের মাফ নেই ।

আর কথা বলতে পারল না হারু। তার চোখের সামনে ঘোলাটে চাঁদনীর আকাশ ঝাপসা হয়ে এল। সে যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখতে পেল রেশমের গুটি জ্বলছে। জ্বলছে আউশ আমনের ক্ষেত। আর সারা দেশ জুড়ে সাপের ফণার মত গজিয়ে উঠছে নীলের চারা। অসংখ্য হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে সোচ্চার হয়েছে এর বিরুদ্ধে। নীলের বিষাক্ত লোভ বিষধর সাপের মত সেই মুষ্টিগুলোকে একে একে ছোবল দিয়ে নিষ্প্রাণ করে দিচ্ছে।

হারু শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে যন্ত্রণাক্ত কণ্ঠে বলে উঠল-না। তখনই তার নিষ্প্রাণ অচেতন দেহটা স্থির হয়ে গেল। মুষ্টিবদ্ধ প্রতিরোধের হাত গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

দশম অধ্যায়

এক

আকাশে তপ্ত সীসে গলা রোদের ঝলকানি। সাবের সাহেব অত্যন্ত ব্যস্ত, অনেকটা উদ্ভ্রান্ত হয়ে বাড়ী ঢুকলেন। আনোয়ার আসন্ন পরীক্ষার নোট তৈরী করছিল। বাবাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। বাবার ঘর্মাক্ত উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল-কি হয়েছে বাবা ?

সাবের সাহেব বসে পড়লেন। ছেলের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললেন-কি পড়ছিস ওটা ?

আনোয়ার উত্তর দিল-ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির নোট করছি।

সাবের সাহেব অনেকটা স্বগতোক্তির মত করে বললেন-ইতিহাস ! ইংরেজের লেখা বিকৃত ইতিহাস ?

আনোয়ার হেসে ফেলল-তুমি তো এতদিন ধরে কলেজে এই ইতিহাসই পড়িয়ে আসছ !

-হ্যাঁ পড়াই বলেই তো অক্ষমতার যন্ত্রণায় কষ্ট পাই। ভালো কথা জহরলাল নেহরু পূর্ব বঙ্গ ঘুরে আসবার পর যে বক্তৃতাটা দিয়েছেন শুনেছিস ?

-না।

—উনি বলেছেন পূর্ব বঙ্গ ভারতবর্ষের অংশ নয়। এর গাছ-পালা, নদী-নালা, এর প্রকৃতি সুস্পষ্ট প্রমাণ করে দেয় যে এর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা দেশ ।

আনোয়ার দীপ্ত মুখে বলল—কথাটা কিন্তু আমার সত্যি মনে হয়। এই যে ছুটির সময় আমরা সবাই মিলে যখন দেশে যাই তখন মনে হয় অন্য এক নদীর দেশে চলে এসেছি।

সাবের সাহেব মাথা নাড়লেন-তা তো বটে। দেশ স্বাধীন হতে চলেছে। দু'শো বছর পর ইতিহাসের গতিভঙ্গে ইংরেজের রাজদণ্ড খসে পড়ল । কিন্তু-

আনোয়ার-কিন্তু কি বাবা ?

সাবের সাহেব মৃদু হাসলেন-না বলছিলাম সশস্ত্র বিপ্লব, সত্যাগ্রহ, কংগ্রেস মুসলিম লীগের যৌথ সংগামের ফল হয়ে স্বরাজ আসছে দু'টি দেশের জন্ম নিয়ে-পাকিস্তান আর ভারত ।

* * * *

বাজার থেকে ফিরে সাবের সাহেব খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ডাকলেন-বউ মা !

আনোয়ারের বউ জমিলা বেরিয়ে এল-ডাকছেন বাবা ?

—হ্যাঁ তোমার ক্ষুদে ডাকাতটি কই ? সেটিকে যে বড় দেখছি না ?

জমিলা বলল-ইসলাম চাচার বাড়ী বেড়াতে গেছে। আপনি কি এখন চা খাবেন?

সাবের সাহেব মাথা নাড়লেন-না থাক, ওই মোড়াটা নিয়ে বসো। একটু গল্প করি। জমিলা মোড়া এনে বসল। সাবের সাহেব কাগজ সরিয়ে চশমাটা খুলে বললেন-সেবার কলকাতায় জাপানীরা বোমা ফেলল। তোমার শাশুড়ীর সে কি কান্নাকাটি, কেবল বলত কবে শেষ হবে যুদ্ধ ! দেখো সেই যুদ্ধও শেষ হল, দেশ ভাগাভাগি হয়ে গেল, আমি ঢাকায় চলে এলাম অথচ কিছুই তার দেখা হল না। যুদ্ধের বছরই দেশে এসে ম্যালেরিয়ায় ধরে....।

সাবের সাহেব চুপ করে গেলেন ।

একটু পরেই আনোয়ার বাড়ী ফিরল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক আনোয়ার আহমেদ চোখের চশমা খুলে বাবার পাশে এসে দাঁড়াল-জানো বাবা জিন্নাহ সাহেব ঢাকায় আসছেন ।

-না কি !

—হ্যাঁ, পূর্ব পাকিস্তানে এই তো তাঁর প্রথম....ছেলেকে থামিয়ে দিলেন সাবের সাহেব-পূর্ব পাকিস্তান কেন যে বলিস। এ দেশ বাংলাদেশ। আদি যুগ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে নাম চলে এসেছে, যে নামের জন্য আমরা নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দিই, সে কি রাজনীতির একটা চালে বদলে যাবে ! আনোয়ার মৃদু হাসল । বলল-তোমার যে কি অদ্ভুত কথা ।

– কেন ? অদ্ভুত করা কেন হবে। আনোয়ার মৃদু হাসল। বলল- যাই কাপড়টা

পালটে আসি ।

আনোয়ার চলে গেল। জমিলা উঠে গেল রান্না ঘরে ।

সাবের সাহেব ভাবলেন-সত্যি কি তিনি অদ্ভুত কথা বলেন ! তাঁর মত করে করে ভাববার কি একজনও নেই ? বিক্রমপুরে তাঁর যে আদি নিবাস রয়েছে সেখানে তো আনোয়ার অনেকবার গেছে। তাঁর ইতিহাস পড়ান ছেলে আনোয়ার! সেও কি স্বীকার করবে না যে এই নদী নালা বিল ঘেরা দেশ অনেক.....অনেক পুরোন । একদিন যার নাম ছিল বংগাল ।

কিন্তু সাবের সাহেব, তিনি কেমন করে অস্বীকার করবেন ইতিহাসকে !

দুই

আনোয়ারের ছেলে মিন্টু একটা লাঠির মাথায় চাঁদ-তারা আঁকা কাগজের সবুজ সাদা নিশান হাতে লাফাতে লাফাতে বাড়ী ঢুকল। সাবের সাহেব তার ঘরে বসে একটা বই পড়ছিলেন। মিন্টুর কচি কণ্ঠের চীৎকার তাঁর কানে এসে লাগল 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' ।

'আল্লাহ হু আকবর।'

সাবের সাহেব গলা উঁচিয়ে ডাকলেন—কই—কই, আমার দাদুভাই কোথায় ? ছোট্ট মিন্টু শ্লোগান থামিয়ে চেঁচিয়ে জবাব দিল—

-এই তো এদিকে ।

-এখনে এসো দাদুভাই । তোমার নিশানটা একটু দেখি ।

মিন্টু কাছে এলে সাবের সাহেব তাকে প্রশ্ন করলেন—ওটা কিসের নিশান ভাই? মিন্টু গর্বিত জবাব দিল-পাকিস্তানী ফ্ল্যাগ । তুমি বুঝি জান না দাদু ?

-না ভাই আমি কিছুই জানি না। আচ্ছা তোমার নামটা বলে ফেল দেখি চট করে।

-আজাদ হোসেন ।

-এই তো চমৎকার। তা তোমার নামের অর্থটা কি বলতে পারবে ?

-বারে তুমিই তো শিখিয়ে দিয়েছ যে আজাদ মানে স্বাধীন। আচ্ছা স্বাধীন কাকে বলে দাদু ?

ঘরে ঢুকলেন সাবের সাহেবের বন্ধু এককালের সহকর্মী শেরওয়ানী জিন্নাহ টুপি পরা ইসলাম সাহেব ।

–এই যে, নাতির সঙ্গে খুব জমিয়েছ দেখছি ।

সাবের সাহেব হাসলেন। বললেন-বসো ।

ইসলাম সাহেব বেতের চেয়ার টেনে বসলেন-তারপর খবর টবর কি শুনলে?

—শুনলাম জিন্নাহ সাহেব ঢাকায় আসছেন। ইসলাম সাহেব মাথায় টুপি খুলে সামনের টেবিলে রেখে বললেন-একটা ভালো খবর শুনছি। জিন্নাহ সাহেবের না কি ইচ্ছে রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে। এটা একটা কাজের মত কাজ বটে ।

সাবের সাহেব ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন-কি বলতে চাও তুমি ? আমি তো মনে করি এটা হলে মহা অন্যায় করা হবে।

—অন্যায় কেন হতে যাবে ? তোমার ওই একগুঁয়ে মতটা আর ছাড়লে না দেখছি। আরে বাংলা হল হিন্দুর ভাষা, আমার পূর্বপুরুষের ভাষা তো আরবী ফারসী তুর্কী ।

-সারাটা জীবন ছাত্রদের ফারসী বয়াত পড়িয়ে পড়িয়ে কোনদিকে চোখ তুলে তাকাবার অবসর পেলে না, গণতন্ত্রের দেশ যদি এটা হয় তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের যে ভাষা সে ভাষাই তো রাষ্ট্র ভাষা হওয়া উচিত, তাছাড়া তুমি আমাকে বল যে পাকিস্তানের কোন অঞ্চলের লোকের মাতৃভাষা উর্দু ! এদিকে বাংলা, ওদিকে পশ্তু, পাঞ্জাবী, বালুচি, সিন্ধি—উদুটা দেখলে কোথায় ? আর কি যে তোমাদের খানদানী গর্ব যে আমাদের পূর্ব পুরুষের ভাষা ছিল আরবী ফারসী। আরে এইজন্যই তো বাঙালীদের কোন ইতিহাস নেই । বাঙালী হিন্দু পণ্ডিতরা চিরকাল নাক উঁচু করে বলে এল 'বাংলা ম্লেচ্ছ ভাষা। আমাদের পূর্ব পুরুষের ভাষা সংস্কৃত।' আর তোমরা বলছ আমাদের ভাষা আরবী ফারসী......

ইসলাম সাহেব বাধা দিলেন- আহ, রাখো তোমার বস্তা পচা বক্তৃতা। বল বাঙালী জাতি বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও ?

মিন্টু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। ইসলাম তাকে কোলের কাছে টেনে এনে বললেন—

বল তো দাদাভাই তুমি বাঙালী না পাকিস্তানী ?

মিন্টু চট্পট উত্তর দিল-পাকিস্তানী ! আমরা যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলি । ইসলাম সাহেব সাবের সাহেবের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসলেন। সাবের সাহেবও হেসে ফেললেন।

সন্ধ্যার দিকে একটু বেড়াতে বের হচ্ছিলেন সাবের সাহেব। বেরোবার মুখে আনোয়ারের সঙ্গে দেখা। দু'জন ছাত্র সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরছিল সে। সাবের সাহেবকে দেখে থামল ।

-বাইরে চললে বাবা ?

—হ্যাঁ, যাই একটু হেঁটে আসি ।

সাবের সাহেব আর দাঁড়ালেন না। হাঁটতে হাঁটতে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে ইউনিভার্সিটির ছায়াঘন রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললেন। রাস্তা পার হয়ে মাঠের পুকুর পাড়ে ঘাটে এসে বসলেন। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। ধোঁয়াটে কুয়াশা মাথা আকাশে দু'একটা তারা ফুটেছে। দূরে হাইকোর্ট আর কার্জন হলের আলো দেখা যাচ্ছে। মনের মধ্যে কেমন নিরুপায় এক জ্বালার অস্তিত্ব অনুভব করলেন সাবের সাহেব। মনে হচ্ছে এমন একটা অন্যায় হতে যাচ্ছে যার প্রতিবাদ প্রয়োজন। কিন্তু এই বার্ধক্যের দুর্বলতায় সেই প্রতিবাদের উপায় খুঁজে পেলেন না সাবের সাহেব। একটু পরেই ছটফট করে উঠে পড়লেন। মিন্টু নিশ্চয়ই এতক্ষণ ভাত খেয়ে তার দাদুর কাছে গল্প শুনবার বায়না নিয়ে অপেক্ষা করছে।

ঘোলা ঘোলা কুয়াশার মাঝখান দিয়ে চাঁদের আলো ফুটেছে। ঝাকড়া মাথা পেয়ারা তলায় ছড়ান ছিটোন জ্যোৎস্না। বাড়ী ঢুকেই সাবের সাহবে ডাকলেন-দাদুভাই কই ?

খাবার ঘর থেকে মিন্টুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল-আসছি দাদু। ভাত খেয়েই আসছি।

আনোয়ারের পড়ার ঘরে আলো জ্বলছিল। কথাবার্তার শব্দও শোনা যাচ্ছে। সাবের সাহেব আর ওদিকে গেলেন না। পায়ের জুতো খুলে চটি পরে একটা বই খুলে বসলেন। একটু পরেই মিন্টু এল। দরজার আড়াল থেকে বলল-দাদু!

সাবের সাহেব বই বন্ধ করলেন। কৃত্রিম ব্যাকুলতায় বললেন-কই আমার দাদুকে তো খুঁজে পাচ্ছি না ।

মিন্টু ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাবের সাহেবের কোলে-এই তো আমি । মিন্টুকে কোলে তুলে সাবের সাহেব বললেন-আজ কিসের গল্প শোনা হবে ? মিন্টু একটু চুপ করে থেকে বলল-জানো দাদু আজ আব্বু আমাকে বকেছে । -তাই না কি, মহা অন্যায় করেছে। তা কি জন্য বকল শুনি ?

—ওই যে পড়ার ঘরে আব্বুর ছাত্রদের সঙ্গে আব্বু কি সব গল্প করছিল। বলছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা হতেই হবে। আমি বললাম রাষ্ট্রভাষা বাংলা কাকে বলে আব্বু ? অমনি আব্বু আমাকে ধমকে বলল-বাজে বোকো না মিন্টু। ও ঘরে যাও। আচ্ছা দাদু তুমি তো বড়, তোমার সঙ্গে আমি কত গল্প করি ।

সাবের সাহেব জবাব দিলেন না। ভেতরে ভীষণ আলোড়ন অনুভব করছিলেন তিনি। তাহলে সত্যি প্রতিবাদ উঠতে পারে ! উঠবে !

মিন্টু উসখুস করল-কি হল দাদু ! গল্প বলছ না কেন ?

মিন্টুর মাথায় হাত বুলিয়ে সাবের সাহেব বললেন-বলছি। বলছি। এত ব্যস্ত হলে কি চলে ! শোন, অনেকদিন আগে এই বাংলাদেশে কুয়াশামাখা চাঁদনীর মত আবছা হালকা এক রকম কাপড় তৈরী হত, বুনত এদেশের তাঁতীরা। এত হালকা হত সে কাপড় যে একটা ছোট আংটির মধ্য দিয়ে পুরো কাপড়টা চলে আসত। সে কাপড়ের নাম ছিল মসলিন। আর কদর কত সে কাপড়ের। দেশ বিদেশের বড় বড় ব্যবসায়ীরা সোনার দরে সে সব কিনে নিত। রাজা বাদশাহদের বেগমেরা তো মসলিন বলতে অজ্ঞান ছিল। এমন কাপড় আর পৃথিবীর কোথাও তৈরী হত না। তারপর একদিন কি হল জানো !

-কি হল ?

-এদেশে ব্যবসা করতে সাত সমুদ্দুর তের নদী পাড়ি দিয়ে এল ইংরেজ বণিকেরা। শেষে নানা চালাকি করে একদিন তারা হয়ে বসল এ দেশের রাজা। এ দেশের সোনা দানা লুটে তারা হয়ে উঠল বড়লোক। এবার তারা নিজের দেশের তৈরী কাপড় বিক্রী করবার জন্য তাঁতীদের হুকুম দিল “তোমরা আর মসলিন বুনতে পারবে না। যে মসলিন বুনবে তাকে দেওয়া হবে কঠিন শাস্তি।" তবুও তাঁতীরা লুকিয়ে মসলিন বুনত। খবর পেয়ে ইংরেজের লোক

এসে মসলিন তৈরীর তাঁতীদের সব হাতের বুড়ো আঙুল কেটে দিল। যাতে তারা আর কোনদিন মসলিন বুনতে না পারে ।

মিন্টু বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সাবের সাহেবের দিকে তাকাল-এত দুষ্টু ছিল ইংরেজরা !

আনোয়ার এসে দাঁড়াল-বাবা ।

সাবের সাহেব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন-কি রে ? ছাত্ররা চলে গেল ?

—হ্যাঁ বাবা ।

একটু চুপ করে থেকে আনোয়ার বলল-মিন্টু তুমি ওঘরে মায়ের কাছে চলে যাও । আমি এবার তোমার দাদুর সঙ্গে গল্প করি ।

মিন্টু চলে গেল । আনোয়ার এসে বসল সাবের সাহেবের পাশে।

-এদিকে যে খবর অন্যরকম বাবা !

-কি রকম ।

—ইউনিভার্সিটির ছেলেদের মধ্যে রীতিমত উত্তেজনা, এরা উর্দুর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য তৈরী হচ্ছে। বোধ হয় একটা কিছু ঘটবে।

সাবের সাহেব চমকে উঠলেন-কি ব্যাপার আনু ?

—জিন্নাহ্ সাহেবের প্রস্তাবে তো তিনি আসার পর থেকেই প্রতিবাদ চলল। এদিকে হলের ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা। এরা কিছুতেই উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা মানতে রাজী নয়। সাবের সাহেব ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন-এমনিই হয়। এরকমই চিরকাল হয়ে আসছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি হাত হলেও প্রতিবাদে উত্তোলিত হয়। সেই একটি মুঠির সঙ্গে যখন অসংখ্য মুঠি উত্তোলিত হয় তখন অন্যায়কে নতি স্বীকার করতেই হয়।

তিন

মাঘ শেষ হয়ে ফাল্গুন না পড়তেই ঢাকার ছায়াঘন রাস্তার দু'পাশের গাছগুলোর মাথায় উজ্জ্বল বর্ণের ফুলের কলি চোখ মেলে তাকাল । রোদে তীব্রতার ঝাঁঝ এল । সাবের সাহেব বিকেল বেলা বেড়িয়ে ফিরছিলেন। বিকেলের নিস্তেজ

আলো অসহায়ভাবে তখনও আকাশের বুক আঁকড়ে আছে। জন-বিরল পীচের রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছিলেন সাবের সাহেব। রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ তুলে একটা পালকী গাড়ী তাঁর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এক পলক থামলেন সাবের সাহেব, গাড়ী থেকে টিনের চোঙা মুখে একটি অল্প-বয়স্ক ছেলে চীৎকার করে বলছে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। জুলুম জবরদস্তি মানব না। রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই ।"

গাড়ীটা ধীরে ধীরে দূরে চলে গেল। সাবের সাহেব হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন আবেগ অনুভব করলেন। দূরের কাঁটামেহেদী ঘেরা সবুজ মাঠ, ঘোড়দৌড়ের ময়দান শেষ বিকেলের ফিকে রঙের আকাশ সব কিছু তাঁর কাছে হঠাৎ বড় নতুন আর প্রাণবন্ত মনে হয়। সাবের সাহেব বাড়ী না ফিরে তাঁর বন্ধু ইসলাম সাহেবের বাসার দিকে চললেন।

ইসলাম সাহেব বাগানে পায়চারী করছিলেন। সাবের সাহেবকে দেখে খুশী হয়ে বললেন-এসো এসো ।

দু'জনে বারান্দায় উঠে বেতের চেয়ারে বসলেন। ইসলাম সাহেব বললেন-তারপর খবর-টবর কি বল !

সাবের সাহেব উদ্দীপ্ত হলেন—খবর তো খুব গরম। শুনেছ নাকি দেশে তো রীতিমত আন্দোলন শুরু হতে চলেছে উর্দুর বিরুদ্ধে ।

ইসলাম সাহেবের কপালে ঢেউয়ের মত কয়েকটি কুঞ্চনের রেখা দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল । বিরক্ত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন-হুঁ। আমার ছোট ছেলে সারোয়ার কি সব আবোল তাবোল লেখা কাগজ নিয়ে এসেছে। ওরা নাকি এ মাসের একুশ তারিখে ধর্মঘট ডাকছে। সাবের সাহেব চমৎকৃত হলেন সারোয়ার ! সেও তাহলে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চায় !

-আর বল কেন। এসব হুজুগে ছেলে ছোকরা নিয়ে আর পারা গেল না। আরে বাবা তোরা কি বুঝবি পাকিস্তানের মর্ম ! কত লড়াই ফাসাদ করেইনা দেশটা কায়েম করা হয়েছে। এই নতুন দেশ। এখন হল গড়ার সময়। এখনি এ সব আন্দোলন টান্দোলন করা ! এসব কি দেশের জন্য ভালো হবে ?

সাবের সাহেব কি একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন ।

ইসলাম সাহেব আবার বললেন-আর তোরা যে বাংলা বাংলা করে নাচছিস !

চালুনী দিয়ে ছাঁকলে ক'টা নির্ভেজাল বাংলা শব্দ টিকে থাকে। সব তো ফারসী, আরবী, ইংরেজী, পর্তুগীজ শব্দে ভরা ।

এবার হেসে ফেললেন সাবের সাহেব- তাহলে স্বীকার করছ যে এ দেশে যুগে যুগে বহু জাতি বহু ভাষা নিয়ে এসেছে। জাতি আর ভাষা হচ্ছে নদীর স্রোতের মত। বহমান এই ধারার মধ্যে কত অসংখ্য স্রোত এসে মিলিত হয়। তার ফলে নদী হয় পরিপূর্ণ আর আকারও হয় বিস্তৃত। এমনি করেই জন্ম হয় নতুন ভাষার। নতুন জাতীয়তাবাদের।

ইসলাম সাহেব রেগে গেলেন-আঃ সাবের, তুমি চিরদিনই ইমোশ্যনাল রয়ে গেলে । সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করতে শেখো।

সাবের সাহেব রাগ করলেন না-আমিও সে কথাই বলছি যে সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করতেই হবে ।

ইসলাম হাসলেন—ওসব তর্ক বিতর্ক থাক । চল এক হাত দাবাখেলা যাক । সাবের সাহেব একটু ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন-বেশ চল ।

ফাল্গুনের লাল ধূলি ওড়া বাতাসে, কৃষ্ণচূড়া রক্তিম শাখায় প্রতিবাদের কম্পনের ঝড় তুলে ঢাকার পথে মিছিল নামল। একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভূলুণ্ঠিত হল অনেক দৃপ্ত পদক্ষেপের আঘাতে। যানবাহনহীন রাজপথ শ্লোগানে ব্যানারে দাবিতে উত্তাল । তারপর গোলাগুলী। সেই গুলীর শব্দই যেন প্রথম জানিয়ে দিল পশ্চিম আর পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্ক, শাসক-শাসিতের সম্পর্ক।

সাবের সাহেব মনে মনে বার বার উচ্চারণ করলেন ‘আমরা কি স্বাধীন।'

সন্ধ্যার পর উত্তেজিত আনোয়ার এসে দাঁড়াল সাবের সাহেবের ঘরের সামনে।
- বাবা ! খবর শুনেছ ?

- শুনেছি ।

–ওরা মিছিলের ওপর গুলী চালিয়েছে। ইউনিভারসিটির হলে ঢুকেও গুলী করেছে।

– মারা গেছে কেউ ?

- হ্যাঁ। কয়েকজন ছাত্র মারা গেছে। আর আহত হয়েছে বহু। ব্যাপক

ধরপাকড়ও করেছে।

জমিলা ঘরে এল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল - বাবা, ইসলাম চাচাজান খবর পাঠিয়েছেন, সারোয়ারের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ।

আনোয়ারের মুখেও উদ্বেগ ফুটল – সেও তো মিছিলে ছিল ।

বাইরে দরজার কড়া নড়ে উঠল। আনোয়ার দ্রুত উঠোন পেরিয়ে দরজার - সামনে গেল । প্রশ্ন করল – কে ?

বাইরে থেকে উত্তর এল না ।

এবার সাবের সাহেব এগিয়ে গেলেন – কে ? কথা বলছ না কেন ?

অপরিচিত কণ্ঠ শোনা গেল - দরজাটা খুলুন। আমরা সারোয়ারকে নিয়ে এসেছি।

সাবের সাহেব দ্রুত হাতে দরজা খুলে দিলেন। দু'তিন জন অপরিচিত যুবক সারোয়ারকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে এল। ওদের কথা থেকেই সাবের সাহেব জানতে পারলেন সারোয়ারের ডান হাতে গুলী লেগেছে। মিছিলের সামনে ‘রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' লেখা ব্যানার হাতে শ্লোগান দিচ্ছিল সারোয়ার। পুলিশের গুলী এসে বিধল তার সেই হাতটাতেই। সারোয়ারের হাতের রক্তে লাল হয়ে গেল সেই গর্বিত দাবির লেখা ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ।

সারোয়ারকে সাবের সাহেবের ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। আলো জ্বলা ঘরে সারোয়ারের হাতে তাকিয়ে জমিলা অস্ফুট চীৎকার করে উঠল কি সাংঘাতিক, রক্তে হাত ভিজে উঠেছে যে ।

আনোয়ার এতক্ষণে বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে বলল ওকে এখুনি হাসপাতালে নেওয়া দরকার। তোমরা কেউ একজন আমার সঙ্গে চল। রেল লাইনের ওপার থেকে ডাক্তার ডেকে আনব। জমিলা ভয় পেল, অসহায়তা ফুটল তার কণ্ঠে ।

– সে কি, এই গোলমালের মধ্যে তুমি কেন যাবে বাইরে ! কোথায় কোন বিপদ ঘটে ।

জমিলা ! ছিঃ।

সাবের সাহেবের কণ্ঠনিঃসৃত ভর্ৎসনাপূণ দু'টি শব্দ শুধু যেন জমিলাকে নয় ঘরশুদ্ধ সবাইকে স্তব্ধ করে দিল। সাবের সাহেব আলনার ওপর থেকে আলোয়ান তুলে নিয়ে দরজার কোনায় হেলান দেওয়া ছড়িটা তুলে নিয়ে ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন তোমরা থাক । আমি ডাক্তার ডেকে আনি ।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার নিয়ে ফিরলেন সাবের সাহেব। ডাক্তার এসে সারোয়ারকে দেখে চিন্তিত হয়ে জানালেন এ রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা দরকার । ব্লাড দিতে হবে। স্যালাইন দিতে হবে। প্রচুর রক্তক্ষয় হয়েছে।

শেষপর্যন্ত সারোয়ারকে হাসপাতালেই নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে আনোয়ার গেল। ইসলাম সাহেবকে খবর পাঠান হয়েছিল তারা সবাই এলেন। সাবের সাহেব কিন্তু জেদ ধরলেন রাতে হাসপাতালে সারোয়ারের কাছে তিনি থাকবেন। সবাই আপত্তি করল। কেবল ইসলাম সাহেব বললেন – তোমরা নিষেধ কোরো না। সাবেরকে ওর নীতির স্বপক্ষে কিছু করতে দাও ।

চার

সারোয়ার ভালো হয়ে বাড়ী ফিরল ক'দিন পরেই। ততদিনে ভাষা আন্দোলনের শহীদ সালাম, বরকত, রফিকের নাম সবাই শ্রদ্ধা-উত্তেজনা মিশ্রিত চিত্তে আলোচনা করছে। সারোয়ার অসুস্থ থাকা অবস্থায় ইসলাম সাহেবের মত পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি একদিন সাবের সাহেবের কাছে বলেই ফেললেন আমি আবার নতুন করে ভাবছি সাবের। আমার মনে হয় তুমি যা বল তাই বোধহয় সত্যি। এদেশের মানুষ চিরকাল অন্যায়ের শিকার ।

সাবের সাহেব ভুল সংশোধন করে দেন এ দেশের মানুষ চিরকাল স্বাধীনচেতা। বলেই সাবের সাহেব অন্যমনস্ক হয়ে যান। ভাবতে থাকেন সত্যিই কি আমরা স্বাধীনচেতা ? নয়ই বা কেন ? ওই তো ইসলামের ছেলে সারোয়ার। বাবার আদর্শকে কি সে নিজের আদর্শ বলে ভাবতে পেরেছে ? আজকের অন্যায় তো ইসলামও অস্বীকার করতে পারছে না। তবে এরও হয় তো ব্যতিক্রম আছে। সাবের সাহেবের পুত্রবধূর মা-বাবা যেন সেই ব্যতিক্রমের জীবন্ত উদাহরণ হয়েই একদিন ঢাকায় এলেন ।

বৈশাখের মাঝামাঝি ট্যাক্সী এসে থামল সাবের সাহেবের বাড়ির দরজায় । সাবের সাহেবের বেয়াই অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির কর্মচারী। বিভাগোত্তর কালে দিল্লী

শিমলা করে কাটিয়েছেন। এখন রাওয়ালপিণ্ডি করাচী করছেন ।

অনেকদিন পর কুটুম্বদের পেয়ে সত্যি খুশী হলেন সাবের সাহেব। নিজে বাজারে গিয়ে মাছ, মাংস সব্জি কিনে আনতে লাগলেন । একদিন বাজার থেকে ফিরে রান্নাঘরে বারান্দায় সওদা নামিয়ে নিজের ঘরে এসে পাঞ্জাবী খুলছিলেন সাবের সাহেব। কয়েকটি কথা এসে তাঁর কানে বিঁধল ।

জমিলার কলেজের পড়া ছোট ভাই তর্ক জুড়েছে বোনের সঙ্গে।

স্টেট ল্যাঙ্গয়েজ উর্দুই ঠিক। বাংলা ভাষার আছে কি যে ওটা রাষ্ট্রভাষা হবে ? জমিলা চাপা কণ্ঠে ধমক দিল – চুপ, চুপ। বাবা শুনতে পাবেন। এসব কথা তুই আর ভুলেও বলবি না ইনাম ।

- বা রে। তোমার শ্বশুর শুনল তো আমার কি। আপা, তুমিও আশ্চর্য রকম ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছ তোমার এই পাঞ্জাবী পরা শ্বশুর আর ভ্যাবলা মাস্টার স্বামীর পাল্লায় পড়ে।

সাবের সাহেব নীরবে ঘামে ভেজা পাঞ্জাবীটা খুলে আলনায় রাখলেন। ওদিকে তখন তর্ক চলছে। টেবিলের ওপর থেকে সকালের খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে খুলে বসলেন তিনি। কিন্তু বার বার কতগুলা অপ্রীতিকর কথা এসে তাঁর শ্রুতিতটে আঘাত করতে লাগল ।

এবার জমিলার মা ছেলের পক্ষ নিয়েছে।

- ঠিকই তো। ইনাম অন্যায় কিছু বলেনি। মাস্টারের বউ কথাটা শুনতে ভালো। কিন্তু ওর কি ওজন আছে। আনোয়ার তো কম্পিটিটিভ পরীক্ষাটাও দিল না । আনোয়ারকে বল এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে করাচীতে চলে আসুক ।

জমিলা অখুশী কণ্ঠে বলল আমার শ্বশুর বুড়ো মানুষ তাঁকে একা ফেলে কোথায় যাব মা ! তুমি ওসব কথা যেন আবার তোমাদের জামাইর সামনে বোলো না। শুনলে দুঃখ পাবে ।

থাক বাবা। আমরা কিছুই বলছি না। বিয়ে তো তুই নিজেই করেছিলি । যাক গিয়ে। তবে ছেলেটাকে যেন আবার অমন ক্যালাস বানাসনে। ভালো ইংরেজী ইস্কুলে ভর্তি করে দিবি। ছেলেবেলা থেকেই স্মার্ট হবে। না হয় আর একটু

বড় হলে করাচীতে আমার কাছে নিয়ে যাব। জমিলার উত্তর আর শোনা গেল না। সাবের সাহেব অস্বস্তি মেশান কেমন আত্মগ্লানি বোধ করতে লাগলেন। কি যেন তিনি কি জমিলা আনোয়ারের জীবনাদর্শকে স্বাধীন ভাবে চলতে দেবার পথে একটা বাধা হয়ে আছেন কি না। শত চেষ্টায় তিনি আর খবরের কাগজে মন বসাতে পারলেন না । ধীরে ধীরে উঠে আবার আলনা থেকে পাঞ্জাবী তুলে নিলেন। একবার ইসলামের বাড়ীর দিকে যাওয়া যাক ।

দুপুরে সবাই এক সঙ্গে খেতে বসে আবার কথা উঠল। আনোয়ারের শ্বশুর আশরাফ সাহেব উঁচু কণ্ঠে বললেন আপনারা যাই বলুন, এই বাংলাদেশে বসে দৃষ্টিভঙ্গী বড় সীমিত হয়ে যায় ।

বাঙালী জীবনে সত্যিই অ্যামবিশন বলে কিছু নেই। আর আমরা মাতৃভাষা করে করে গলা ফাটাচ্ছি সত্যিকারের দেশপ্রেম কি আমাদের আছে ? সে তুলনায় একজন পাঞ্জাবী কি পাঠান.........

সাবের সাহেব মুখ তুললেন বেয়াই সাহেব ! কথাটা কি আপনি ঠিক বললেন? মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আমাদের ছেলেরা প্রাণ দিল। এত বড় দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কোথায় আছে ? পাঠানদের কথা বলছেন শুনেছি তারা এখনও পাকিস্তানকেই স্বীকার করছে না। আর পাঞ্জাবীরা, আপনি জানেন নিশ্চয়ই সিপাই বিদ্রোহের সময় একমাত্র পাঞ্জাব প্রদেশের লোকেরাই ইংরেজদের পক্ষ নিয়েছিল। ওরা তো ভাড়াটে সৈনিকের জাত ।

আশরাফ সাহেব বোধ হয় অসন্তুষ্ট হলেন। একটু ক্ষুণ্ণ সুরে বললেন পুরোন কথা বাদ দিন সাহেব। ইতিহাসের ঘটনা তো স্ট্যাগনেন্ট ব্যাপার। এখন হচ্ছে ডায়নামিকসের যুগ। পুরোন মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকাটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনারা সারা জীবন বইয়ের পাতায় মুখ ডুবিয়ে ছাত্র পড়িয়ে কাটিয়ে দিলেন। বর্তমানের সত্যটাকে উপলব্ধি করবার প্রয়োজন অনুভব করলেন না। অতীতের আবর্জনা বর্তমানের গতিশীলতার ওপর একটা বার্ডন ছাড়া আর কিছুই নয় ।

সাবের সাহেব আর কিছুই বললেন না। ওধারে আনোয়ার কোন রকমে মাথা গুঁজে খেয়ে উঠে গেল ।

অসহায় বোধ করল জমিলা। মিন্টু টেবিলের ওপর দু'চামচ ডাল ফেলে দিয়েছিল। জমিলা তার পিঠে চড় বসিয়ে ধমক দিল – অসভ্য ছেলে কোথাকার!

কেবল দুষ্টুমী ।

রাতে ঘুমোতে এসে আনোয়ার জমিলাকে বলল - মহা ফ্যাসাদ হল দেখছি। আমার বাবা আর তোমার বাবা এ যে দেখছি উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। তার ওপর বাবা যা সেন্টিমেন্টাল, কখন যে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যায় ।

জমিলা সংক্ষেপে উত্তর দিল – পৃথিবীর সব মানুষের মত যে এক রকম হবে এমন কোন কথা নেই ।

আনোয়ার হেসে ফেলল এই তো চটে গেলে, আমি কি আর তাই বলছি। তবে ইনামকে বলে দিও ও যেন যেখানে সেখানে আবোল তাবোল তর্ক জুড়ে না বসে। এখন পাবলিক সেন্টিমেন্ট অন্যরকম।

জমিলা জবাব না দিয়ে নীরবে মশারি গুঁজতে লাগল ।

আনোয়ার একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বলল – জানো আজ বিকেলে ইসলাম চাচার সামনে তোমার আব্বা যখন ইনাম বুলবুল ওদের সঙ্গে উর্দু বলছিলেন আমার তখন সত্যি বড় লজ্জা করছিল । আমরা বাঙালীরা বড় অনুকরণপ্রিয় ।

জমিলা স্তব্ধ হল। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল স্বামীর দিকে। তারপর অত্যন্ত দৃঢ় এবং শান্ত কণ্ঠে বলল আদর্শবাদী বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বোধ হয় অতিথিকে অসম্মান দেখানো এবং পরছিদ্রান্বেষণ করা ।

আনোয়ার সিগারেট অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিল – জমিলা, কি আবোল তাবোল বলছ তুমি ।

হ্যাঁ ঠিকই বলছি। এত বছর পরে বাবা-মা তোমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছেন অথচ তাঁদের তোমরা সহ্য করতে পারছ না। এত সীমাবদ্ধ দৃষ্টি তোমাদের । তোমরাই আবার বৃহত্তর স্বার্থের মহৎ কথা বল ।

আনোয়ারের কণ্ঠ অতিমাত্রায় শীতল হল – বোধহয় বাড়াবাড়ি করে ফেলছ।

-হয় তো করছি। তবে এ কথা ভুলে যাও কি করে যে আমি তাদেরই মেয়ে। মা-বাবার অমতে তোমাকে বিয়ে করেছি বলে তাঁদের আমি পর হয়ে যাই নি। আর বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেছি আমি। অথচ এ সংসারে এসে তোমাদের সুখে রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। বুড়ো শ্বশুরকে নিজের

বাবার মত সেবা করছি। আদর্শ মাস্টারের বউ হয়ে আছি।

আনোয়ারের সারা শরীরে যেন তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত হল । নিজের অজ্ঞাতসারে উঠে, দাঁড়াল জমিলার সামনে-জমিলা তুমিও তাহলে আমাকে মাস্টার বলে হেয় করছ তোমার মা-বাবার মত ?

জমিলার কণ্ঠস্বর অবিচলিত-মাস্টারকে মাস্টার বললে যদি হেয় করা হয় তাহলে বুঝব তুমিও ওই সিনিক হীনম্মন্যতায় ভুগছ। দৃষ্টিটাকে আরও একটু বড় করতে শেখো ।

আনোয়ার বোধহয় যোগ্য প্রত্যুত্তর খুঁজে পেল না। এমনিতেই শান্ত নিরিবিলি স্বাভাবের সে। কিছুক্ষণ হাতের দু'আঙ্গুলে মাথা টিপে ধরে বসে থাকল। তারপর এক সময় মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল স্ত্রীর দিকে-ভুল বোধহয় আমিই বুঝেছি । সবারই একটা নিজস্ব মতামত আছে।

জমিলা কোন কথা না বলে বালিশ টেনে শুয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ না ফিরিয়ে বলল-ভাবছি মিন্টুকে মার সঙ্গে করাচীতে পাঠিয়ে দেব। কিছুদিন বেড়িয়ে আসুক। - শুধু মিন্টু কেন তুমিও যাও। এখানকার এই নিরানন্দ একঘেয়েমী তোমার কেটে যাবে। আনোয়ার আর দাঁড়াল না। সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল। এক অক্ষম নিরুপায় জ্বালায় তার মনটা জ্বলতে লাগল। সেই সঙ্গে জমিলার ওপর দুরন্ত অভিমানে বুকটা তার ভারী হয়ে এল। বারান্দার একধারে বেতের চেয়ারটায় নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল আনোয়ার। হাতের সিগারেট পুড়তে লাগল। বৈশাখী তারাজ্বলা আকাশের নীচে রাত বাড়তে থাকল। এক সময় নিজের পাশে কার উপস্থিতি উপলব্ধি করে সচকিত হল আনোয়ার। সাবের সাহেব এসে দাঁড়িয়েছেন। আনোয়ার উঠে দাঁড়াল-বাবা ! এখনও ঘুমোওনি যে তুমি।

সাবের সাহেব একটা হাত রাখলেন আনোয়ারের পিঠে – কি হয়েছে রে আনু? তুই এত রাতে বাইরে বসে যে !

আনোয়ার জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে রইল। সাবের সাহেব ছেলের অসহায় ভঙ্গী দেখে কিছু একটা অনুমান করলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন-আনু তোকে একটা কথা বলব ভাবছি ।

- কি বাবা ?

- তুই কিছুদিন ছুটি নিয়ে বউমা আর মিন্টুকে নিয়ে করাচীতে তোর শ্বশুরের ওখান থেকে বেড়িয়ে আয় ।

— কিন্তু তা কি করে সম্ভব। তোমার দেখাশোনা ... তা ছাড়া তুমি একা একা! সাবের সাহেব হাসলেন আমার জন্য চিন্তা করিস না। তাছাড়া এ পৃথিবীতে আমরা সবাই একা। অনেক রাত হয়েছে ঘুমিয়ে পড় এবার। বেশী রাত জাগলে শরীর খারাপ করবে।

আনোয়ার উঠে ঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবল বাবা কি করে সব বুঝতে পারেন।

জমিলার মা-বাবার সঙ্গে সাবের সাহেব জোর জবরদস্তি করে আনোয়ার, জমিলা ওদের যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। ওরা যাবার আগে সাবের সাহেবও তাঁর বইপত্র টুকটাক জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেললেন। তারপর খাবার সময় সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন- আমারও তো দিন ফুরিয়ে এল। কখন ডাক আসে। তার আগে যাই দেশের বাড়ীতে বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে আসি ।

পাঁচ

ছোট্ট লঞ্চটা চরপড়া পদ্মার আঁকাবাঁকা স্রোত উড়িয়ে খালের মুখে ঢুকেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিল আনোয়ার। পাশে বসে তার পশ্চিম জার্মানী থেকে পাস করা ছেলে আজাদ হোসেন একটা ইংরেজী ম্যাগাজিনে চোখ বুলাচ্ছে । আনোয়ার ছেলের দিকে এক পলক তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। জানালা দিয়ে এলমেলা ভেজা বাতাসের ঝাপটা আসছে। মাথাটা একটু সরিয়ে আনোয়ার বলল- দেখছিস মিন্টু নদীর অবস্থা। বিশ্বাসই হয় না এ নদী সেই পদ্মা ।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল একটা নদী একটা সভ্যতার আদি ইতিহাস। সেই নদী যদি মরে যায় ! বিদেশী বিশেষজ্ঞরা ড্রেজিং করবার হিসেবপত্র তো দিয়ে গেল। কিন্তু কি হল। বছর বছর বন্যায় মানুষের দুর্দশার আর সীমা নেই ।

মিন্টু চোখ তুলল – ওদিকে তো তারবেলা মংলা ড্যাম তৈরী হল এর চার ডবল টাকা খরচ করে। মরুভূমিকে সুজলা সুফলা করে তোলা হল। আর অবহেলিত দেশটা কেবল গরীবই হচ্ছে। আচ্ছা বাবা এতসব অন্যায় অবিচার আমরা সহ্য

করি কি করে ?

আনোয়ার একটু ম্লান হাসল - যেমন করে যুগে যুগে আমরা সহ্য করে এসেছি।

লঞ্চের গতি শ্লথ হল। সামনেই লঞ্চঘাটা। তাদের নামবার সময় হয়ে গেছে। মিন্টুর দিকে তাকিয়ে আনোয়ার বলল জিনিসপত্রগুলো গোছগাছ করে নাও। এবার আমাদের নামতে হবে।

একটু পরেই লঞ্চ খালের পাড়ে ভিড়ল। তক্তা ফেলা সিঁড়ির ওপর দিয়ে বাবার সঙ্গে ঘাটে নেমে এল মিন্টু। ঘাটেই নৌকা ছিল । আনোয়ারের বাবা সাবের সাহেবের পুরোন লোক মাঝি রমজান আলী কাঁধের গামছা নেড়ে এক মুখ হাসল- এই যে ভাইজান এদিকে আহেন। সুটকেস ব্যাগ দ্যান আমার হাতে।

নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে, সুটকেস আর ব্যাগ লুফে নিল রমজান আলী। নৌকাটা তক্তার সিঁড়ির লাগালাগি করে বলল - এহান দিয়াই নাইমা আহেন ভাইজান । সামনে বড় প্যাক ।

আনোয়ার মিন্টুর হাতের সহায়তায় নৌকায় নেমে বলল কি খবর রমজান ভাই, ভালো তো তোমরা। নৌকার পাটাতনের ওপর সুজনী বিছিয়ে রমজান খুশীর হাসি হাসল ভালোই ভাইজান। ভালো না হইলে এই বুড়া বয়সে আপনোগো দেখনের কপাল হইত নি ? যাক, ছোটমিয়া সাব শুনছি বিলাত থেইকা বহুত ল্যাখাপড়ি শিখা আইছে। আহাঃ, আইজ মিয়াসাব বাইচ্যা থাকলে কত খুশী না হইত । রাইত দিন তো ছোট মিয়ার প্যাচালই পাড়ত ।

নৌকার রশি খুলে লগি হাতে তুলে নিল রমজান। ওদিকের গলুয়ে তার ছেলে বারেক বসেছিল। বারেককে উদ্দেশ করে বলল- এই ছ্যাড়া হাঁ কইরা রইলি ক্যান ? বৈঠাডা ধর।

নৌকায় বসে মিন্টুর ভারী ভালো লাগছিল । সেই কবে নানা-নানির সঙ্গে করাচী চলে যাবার আগে একবার দেশে এসেছিল দাদুর কাছে। দাদুকে এখানে সবাই বলত বড়মিয়া আর তাকে বলত কুট্টি মিয়া। সব মনে আছে তার। দাদুর সঙ্গে এই গ্রামে যে কত ঘুরে বেড়িয়েছে। দাদু প্রায়ই বলতেন – দেশকে ভালো বাসতে হয়। দেশের সঙ্গে সে বেঈমানী করে সে কুকুরেরও অধম ।

মিন্টুর মনে পড়ে এখন হাসি পেল দাদুকে সে প্রশ্ন করছিল – দাদু অধম বুঝি

কুকুরদের চেয়ে ছোট ? আচ্ছা অধমের লেজ নেই ?

- এবার দেশে ধান পান কেমন হয়েছে রমজান ভাই ?

বাবার প্রশ্নে মিন্টু বর্তমানের আবেষ্টনীতে ফিরে এল। নৌকা খালের বাঁক ছাড়িয়েছে। লগি ছেড়ে রমজান আলী বৈঠা ধরেছে।

- ধান তো হইছিল ভালোই। অহন বইন্যায় ভাইসা না গেলে হয়। হর বছর বানে তো মাইরা রাইখা যায়। নইলে কি আর এত আকাল, আমাগো কি আর ভাইজান কন ! প্যাটে দু'গা ভাত আর পিন্দনের কাপড় হইলেই হয়। তাও তো জোটে না ।

বেলা শেষ। খালের দু'পাড়ের ঝোপঝাড়ে আঁধার নেমেছে। শুধু মান্দার আর হিজল গাছের উঁচু ডালপালায় শেষ বেলার আলোর দু'এক টুকরো সুতো ছেঁড়া বেওয়ারিশ ঘুরির মত আটকে আছে। মিন্টু সেই আলোর দিকে তাকিয়ে নৌকার দোলা অনুভব করতে করতে কেমন উদাস হয়ে গেল। আলোকোজ্জ্বল ধাবমান অগ্রগতির শহর করাচীতে কেটেছে তার শৈশব। যৌবনের প্রারম্ভ কেটেছে ইয়োরোপের উন্নত এক দেশে। কিন্তু এমন সহজ এমন ন্যূনতম দাবির মানুষ সে কি কোথায়ও দেখেছে ? শুধু পেটে দু'টো ভাত আর পরার কাপড়। কত সামান্য আশা । সভ্যতার অগ্রগতির কোন্ বিন্দুতে বাস করছে তার দেশের শতকরা নব্বুই জন মানুষ ! সন্ধ্যা ঘন না হতেই নৌকা নদীর ঘাটে লাগল। রমজান আলী কামলা নিয়ে আগেই বাড়ীঘর পরিষ্কার করে কিছুটা বাসোপযোগী করে তুলেছিল। রমজান নৌকা ঘাটে লাগিয়ে ছেলেকে বলল – বারাইকা, তুই দৌড় পাইড়া ও বাড়ীর চাচীজানরে খবর দে। ভাইজানরা আইয়া গ্যাছে ।

বারেক মালপত্র মাথায় তুলে চলে গেল। একটু পরেই একটা হ্যারিকেনের আলো দুলতে দুলতে এল। আনোয়ারের শরিকী চাচাত ভাইর ছেলে মঞ্জুর আলো নিয়ে এসেছে।

আনোয়ার আর মিন্টু মাটিতে নামল। বহুদিন পরে দেশে আসা হল। এবার মিন্টু ঢাকায় ফিরেই জেদ ধরল গ্রামের বাড়ীতে আসবে। জমিলা অবশ্য অনেক নিষেধ করেছিল। দেশে এমন পরিস্থিতি চলছে। কখন কি যে হয় বলা যায় না । এ সময় কোথাও যাওয়া আসা না করাই ভালো। আনোয়ারও একটু ভেবেছিল। পরে জমিলাকে বলেছিল তুমিও না হয় চল। জমিলা রাজী হয়নি।

ইসকাটনে তার নতুন বাড়ী তৈরী সবে সমাপ্ত হয়েছে ।

এখন অনেক কাজ তার। আর বেড়ানর এটা কি একটা সময়। শেষ পর্যন্ত জমিলাকে রেখে আসতে হয়েছে।

বাড়ীর বারান্দায় তক্তপোষের উপর বসতে পাড়া-প্রতিবেশী শরিকী আত্মীয় স্বজনরা ভীড় করে এল। এতদিন পরে বড় মিয়া সাহেবের ছেলে আর নাতি দেশে এসেছে। বলতে গেলে এরা তো এক রকম দেশ ছাড়া। সেই যে বড় মিয়া সাহেব মরবার পর তার ছেলে আর ছেলের বউ একবার এসে গিয়েছিল তারপর থেকে আর খবরবার্তা নেই। জমিজমা বারোজনে লুটে খাচ্ছে। মঞ্জুর জাঁকিয়ে বসে বলল-চাচাজান দেশে যখন এলেন জমিজমার মামলাটা মিটিয়ে যান। আইন মত একটা ভাগাভাগি হয়ে যাক। আনোয়ার কিছু বলবার আগেই রমজান আলী একটু বিরক্ত হয়ে বলল-আহ্ রাহেন দেহি জমি জিরাতের মামলা। রাইত দিন তো জমির চিন্তায় আপনের দিশা ঠিক থাহে না। ভাইজান এতদিন পরে আইলেন। বইয়া একটু দম ফালাইবার দেন । তারপর কাইল থেইকা জমির প্যাচাল উঠাইয়েন ।

মঞ্জুর উষ্ণ হল। কিন্তু মনের ভাব চেপে গেল। সত্যি বলতে কি মনে মনে সে একটু বিচলিত হয়েছে। এতদিন নিশ্চিন্ত মনে সাবের সাহেবের জমির ফসল সেই গোলায় তুলেছিল। যাক ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে নিয়ে তারপর রণক্ষেত্রে নামা যাবে। ভীড়ের মধ্যে ডুরে শাড়ী পরা ঘোমটা দেওয়া বছর ষোলো সতেরোর একটি মেয়ে এসে আনোয়ারকে সালাম করল। তারপর কুণ্ঠিত লজ্জাজড়িত সুরে বলল-চাচাজান, আপনাদের হাতমুখ ধোবার পানি দিয়েছি। মা বলেছেন আপনাদের নাশতা এখানে নিয়ে আসব না আমাদের ওঘরে গিয়ে খাবেন ।

আনোয়ার একটু দ্বিধান্বিত হল-তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না মা। কে বল দেখি তুমি ?

মেয়েটি লজ্জায় অধোবদন হল। মঞ্জুর পরিচয় করিয়ে দিল-ওকে চিললেন না! ও যে মানিক চাচার মেয়ে রমি ।

এবারে মনে পড়ল। মানিক ভাই তার বাবার মামাতো ভাইয়ের ছেলে। তার মেয়ে রমিজা। অনেক দিন আগে এসে ওকে ছোটটি দেখে গিয়েছিল আনোয়ার। মানিক ভাইয়ের কথা মনে পড়ে বড় দুঃখও হল। সাবের সাহেব

জীবনের শেষ ক'টা দিন দেশেই কাটালেন। কিছুতেই ঢাকায় ফিরে গেলেন না। তাঁর দেখাশোনা মানিক ভাই আর তার বউই করেছে। বাবার বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিল মানিক ভাই আনোয়ার তা জানে। সাবের সাহেব মারা যাবার পরের বছরই মানিক ভাই মারা গেল। আনোয়ার অবশ্য শুনেছিল মানিক ভাই মারা যাবার পর বিধবা ভাবী ছোট মেয়েটিকে নিয়ে বিশেষ অভাবে আছে। মঞ্জুরকে তো চিঠি লিখেও দিয়েছিল যে ওদের ভরণপোষণ বাবদ যা খরচ লাগে তা দেবার জন্য।

রমিজা খুব সংকুচিত কণ্ঠে বলল-চাচাজান পানি কি এখানে নিয়ে আসব ? আনোয়ারের সম্বিত ফিরল। তাড়াতাড়ি বলল-নারে পাগলী। তোকে অত কষ্ট করতে হবে না। ভাবী সাহেবা বুঝি পাকঘরে ? যা আমি আসছি।

উঠোনের একধারে জলচৌকির ওপর সাবান গামছা আর বালতিতে পানি দেওয়া ছিল। আনোয়ার হাত মুখ ধুয়ে উঠে যেতে মিন্টু এল। রমিজা বিরাট একটা ঘোমটা টেনে ঘটী করে মিন্টুর হাতে পানি ঢেলে দিচ্ছিল। মিন্টু হাতে সাবানের ফেনা তুলতে তুলতে সকৌতুকে রমিজার দীর্ঘ ঘোমটার দিকে তাকাল-তোমার নাম বুঝি রমি ? সুন্দর নাম। কিন্তু আমাকে দেখে অত বিরাট ঘোমটা টেনেছ কেন বল দেখি । আমি বাঘ না ভালোক ?

রমিজা আরো জড়সড় হয়ে গেল। তার হাত কেঁপে ঘটী থেকে খানিকটা পানি ছলকে পড়ে মিন্টুর শার্টের হাতা ভিজে গেল। যেন ভারী মজা পেল মিন্টু। সশব্দে হেসে উঠল সে। অপ্রস্তুত রমিজার মাথার ঘোমটা খসে গেল। ভীত কণ্ঠে বলল-ভাইজান ! আমি দেখি নি। হঠাৎ হাত ফসকে....মা শুনলে রাগ করবে। হ্যারিকেনের লালচে আলোয় রুক্ষ চুলের আটসাট খোপা বাঁধা গ্রাম্য সরল মুখের তরুণীটির অভিব্যক্তি মিন্টুর হঠাৎ ভারী ভালো লাগল। উঠোনের ওধারে আম কাঁঠাল জামরুল গাছের ওপরে ফাল্গুনের বাতাসের ঝিরঝির শব্দ উঠেছে। কোথায় যেন কোকিল ডাকছে।

-ভাইজান রাগ করেছেন ?

রমির কথায় মিন্টু হাসল-রাগ করব কেন ! ইচ্ছে করে তো তুমি পানি ফেলে দাও নি ।

রমিজার মা কেরোসিনের কুপী হাতে নিয়ে এলেন-কই বাবা ! হল তোমার হাত মুখ ধোওয়া ? ওদিকে যে তোমার বাবা বসে আছেন !

মিন্টু তাড়াতাড়ি বলল-আসছি চাচী। আমি একটু শার্টটা বদলে আসি । হাত ধুতে গিয়ে শার্টটা ভিজিয়ে ফেলছি।

রমিজার মা সস্নেহে হাসলেন-তোমরা হলে সাহেব মানুষ বাবা। কলের পানি ব্যবহার করা অভ্যাস। এখানে এই তোলা পানি....মিন্টু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল-কি সর্বনাশ ! এমন কালো গায়ের রং আপনি বলছেন সাহেব ! সত্যিকারের সাহেবরা শুনলে এক্ষুণি হাইকোর্টে মানহানির মামলা করতে ছুটবে।

মিন্টুর কথার ভঙ্গীতে অপরিচয়ের আড়ষ্টতার ব্যবধান কাটিয়ে রমিজা খিল খিল করে হেসে উঠল। রমির সুগঠিত দাঁতের সারির উজ্জ্বল হাসিতে তাকিয়ে আবার ভালো লাগল মিন্টুর।

খেতে বসে আনোয়ার খেয়াল করল মানিক ভাইর বিধবা বউর শাড়ীটা বড় জীর্ণ বিবর্ণ। রমির পরনের ডুরে শাড়ীর আঁচলের কাছে অনেকটা ছেঁড়া। মনে মনে অপরাধী বোধ করল আনোয়ার। কুণ্ঠিত সুরে বলল-ভাবী ! অনেকদিন তোমাদের খোঁজ খবর নিতে পারিনি। মঞ্জুর কি তোমাদের....।

রমির মা থামিয়ে দিলেন-ওসব কথা এখন থাক ভাই। এতদিন পরে ভাপা পিঠে খাচ্ছ ভালো লাগছে তো ? এককালে তুমি আমার তৈরী পিঠে ভারী পছন্দ করতে। এখন তো বয়স হয়েছে। আগের মত পারিও না। আর পিঠে তৈরী করবার রসদই বা কই...পোড়া কপালে দুটো ডাল ভাত...এই দেখো কি বলতে কি বলছি। যা তো রমি তোর চাচা আর ভাইজানের জন্য গরম আর দু'খানা পিঠে নিয়ে আয়।

রমিজা চলে যেতে বললেন-মেয়েটাকাল সারা রাত জেগে চালের গুঁড়ি করেছে। তোমরা আসবে ! ওর যে কি উৎসাহ। সাবের চাচাজানের কাছে ও কেবল তোমাদের গল্পই শুনত। চাচাজান বলতেন ওকে লেখাপড়া শেখাবেন। আর সে কপাল কি আর আমাদের। পোড়াকপালীটা তো গলার কাঁটা হয়ে আছে। বাপমরা মেয়ে। নেই এক কানি জমি। ভদ্রঘরের মেয়ে, যার তার হাতে তো আর তুলে দিতে.......

রমিজার মার কথা অসমাপ্ত রইল। ফুল তোলা টিনের বাসনে ধোঁয়া-ওঠা পিঠে নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেল রমিজা। অপরাধীর মত মাথা নীচু করল। আনোয়ার কোমল কণ্ঠে ডাকল-আয় রমি। আয় মা।

তারপর রমিজার মার দিকে তাকিয়ে বলল-ভাবী। এবার আমি ওকে সঙ্গে করে ঢাকায় নিয়ে যাব ।

গল্প করতে করতে খাওয়া শেষ হল। খাবার পর উঠোনে পাটি পেতে বসল সবাই। গাছপালার মাথার ওপরে গোল থালার মত চাঁদ উঠেছে।

মঞ্জুর বলল-চাচাজান। কাল দুপুরে আমার ওখানে খাবেন। শ্রীনগর বাজার থেকে সওদা করে এনেছি আপনারা আসবেন শুনে। আপনাদের বউ চিড়ে কুটেছে। মুড়ি ভেজেছে ।

আনোয়ার হাসল-খাব। খাব। সবার ঘরেই খাব। ওদিকে ঢাকার যা অবস্থা সবাই মিলে হয় তো দেশে চলে আসব ।

মঞ্জুর উদ্বিগ্ন হল-সত্যি চাচাজান ঢাকার অবস্থা তাহলে ভালো না ! আওয়ামী লীগ তাহলে সত্যি পাওয়ারে আসবে ?

পেছন থেকে কে যেন বলল-মঞ্জুর ভাইয়ের তো চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না। উনি তো আবার বি.ডি. মেম্বার ছিলেন। তার ওপর জামাতে ইসলামীকে ভোট দিয়েছেন।

মঞ্জুর ধমকে উঠল-থাম তো ফাজিল ছোকরা ।

মিন্টু উঠে দাঁড়াল-বাবা ! আমার ক্লান্ত লাগছে। আমি ঘুমুতে চললাম । রমিজার মা বলল-সে কি রাতে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়বে বাবা ?

মিন্টু হাত উল্টাল-ওরে বাবা। সন্ধ্যাবেলা যা খাইয়েছেন তাতে আরও দু'বেলা না খেয়ে থাকলেও চলবে।

মিন্টু আর দাঁড়াল না। বারেক মিন্টুকে শোবার ঘরে পৌছে দিয়ে গেল ।

পুরোন পড়ে থাকা দালান। তবু ধোয়া-মোছায় কিছুটা বাসযোগ্য হয়েছে। টেবিলের ওপর একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। হ্যারিকেনের আলোয় দেওয়ালে টাঙান সাবের সাহেবের যৌবনের পারিবারিক ছবিটার দিকে তাকিয়ে মিন্টু উন্মনা হয়ে গেল। ছোটবেলার দাদুর সান্নিধ্যের দিনগুলো যেন বিস্মৃতির কুয়াশা সরিয়ে মনে ছায়া ফেলতে লাগল। সহসা কার মৃদু পায়ের শব্দে মিন্টু ফিরে তাকাল। মাথায় ঘোমটা টেনে রমি এসে দাঁড়িয়েছে।

মিন্টুকে তাকাতে দেখে চোখ নামিয়ে বলল-মা এক গ্লাস দুধ পাঠিয়ে দিলেন। বললেন রাতে খালি পেটে থাকতে নেই ।

মিন্টুর মনের একটু আগের অনুভূতির রেশ তখনও কাটে নি। অন্যমনস্ক ভাবে বলল-টেবিলে রেখে যাও। পরে খাবো ।

রমিজা গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে কাঁসার প্লেট দিয়ে ঢেকে দিল। একটু ইতস্তত করে বলল-মাথার কাছের জানালাটা কি খুলে দিয়ে যাব ?

রমিজার কথায় মিন্টু দৃষ্টি নামিয়ে আনল। আগের দিনের সাবেকী পালংকে পরিপাটি বিছানা পাতা। ধোওয়া মশারি ফেলা। নিভাঁজ শুভ্র বিছানায় তাকিয়ে ভালো লাগল তার। খুশী মনেই বলল-ঠিক আছে। খুলে দাও জানালা ।

রমিজা এগিয়ে এসে খাটের শিয়রের কাছের জানালার পাল্লা দুটো খুলে দিল সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক নীলচে জ্যোৎস্না এসে লুটিয়ে পড়ল ঘরে। এক ঝাপটা ফুরফুরে হাওয়া এক রাশ ফুলের সুরভি নিয়ে এসে সারা ঘর সৌরভে ভরিয়ে দিল ।

মিন্টু উচ্ছ্বসিত হল-ভারী মিষ্টি ফুলের সুগন্ধ তো ! কি ফুল ?

জানালার একটা শিকে হাত রেখে লাজুক নম্র হাসল রমি-হাস্নাহেনা। গাছটা আমিই লাগিয়েছিলাম ।

বলে ফেলেই লজ্জা পেল। জানালা দিয়ে আসা জ্যোৎস্নার তির্যক রেখা রমির মুখের অর্ধেক অংশে আলো ফেলেছে। আলো-আঁধার মাখা মেখে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ওর সরল ভঙ্গীটা যেন মিন্টুর মনে ফুলের সুরভিত স্নিগ্ধতা বয়ে আনল ।

মিন্টু হঠাৎ বলে ফেলল-তুমি ভারী মিষ্টি মেয়ে রাম ।

রমিজা কিছুটা বিস্মিত দুর্বোধ্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল মিন্টুর দিকে। মিন্টুর কপালের ওপর একগোছা চুল উড়ে এসে পড়েছে। চশমার কাচের ভেতর চোখের দৃষ্টিটা কেমন ঝিকমিক করছে, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসিটায় ভারী কোমলতা। রমি ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিল ।

তারপর একসময় তার স্বভাববশত ছেঁড়া শাড়ীর আঁচলটা মাথায় তুলে দিয়ে ছুটে পালাল ।

রমিজার মার উঠোনের মাচায় লাউয়ের ডগা পড়ন্ত বেলার রোদে মনোরম সবুজ। কোথা থেকে যেন শিমুলের ঝরা পাতা উড়ে এসে পড়েছে নিকোন উঠোনে । দাওয়ার মোড়ায় বসে চা খাচ্ছিল আনোয়ার। রমিজার মা ডালায় করে খৈ নিয়ে এসে সামনে বসল। বলল কালকেই চলে যাচ্ছ, ভাই। মনটা কেমন করছে। কিছুই তো খাওয়াতে পারলাম না। কলমী শাক দিয়ে ইলিশ মাছের পাতুরী খেতে আগে তুমি কি পছন্দই না করতে। বউও ভালোবাসত। কিছু চিড়ে মুড়ি আর নারকেলে লাড়ু দিলাম । বউকে বোলো গরীব ভাবী তো আর কিছুই দিতে পারল না । আনোয়ার সৌম্য হাসল ভাবী, তুমি যে কি বল। আজকালকার দিনে তোমাদের মত আন্তরিকতা পাওয়া বড় কঠিন। এ ক'দিনে তুমি যে যত্ন আর স্নেহ করেছ....।

রমিজা ঢেঁকি ঘরের পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে আনোয়ারকে দেখে থমকে গেল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে রমিজার মাও বাক্যহারা হলেন। রমির সারাটা কাপড় সপসপে ভেজা। হাঁটু পর্যন্ত কাদায় মাখামাখি। বিস্ময়ে বিরক্তিতে মুখিয়ে উঠলেন তিনি – এত বড় ধিংগী মেয়ে এই অবেহলায় কোথা থেকে কাদা পানি মেখে পেত্নী হয়ে এলি। তোকে নিয়ে আমার আমার আর জ্বালার শেষ নেই। ছিঃ ছিঃ। লোকে দেখলে কি বলবে। একটু যদি আক্কেল থাকে মেয়ের।

রমিজা নত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। ইতিমধ্যে আরেক আসামী এসে উপস্থিত। ভেজা জামা কাপড় নিয়ে মিন্টু এসে দাঁড়াল রমিজার পাশে। তারও হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট কাদায় কালো । চুল দিলে টপ টপ করে পানি ঝরছে ।

আনোয়ার শংকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল – কি ব্যাপার মিন্টু ?

মিন্টু কপালের ওপর থেকে ভেজা চুল সরিয়ে দিয়ে অপ্রতিভ হাসল নৌকা চড়তে গিয়ে পা পিছলে পানিতে পড়ে গিয়েছিলাম। রমি পানিতে ঝাঁপিতে পড়ে আমাকে টেনে তুলেছে।

রমিজার মা সভয়ে এগিয়ে এলেন কি সাংঘাতিক কাণ্ড। দু'দিনের জন্য বেড়াতে এসে একটা সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল আর কি। আল্লাহ্ নেগাহবান তাই কিছু হয়নি। যাও বাবা তুমি তাড়াতাড়ি ভেজা কাপড় ছেড়ে ফেল। শেষে কোন অসুখ বিসুখ না বেধে যায় ।

আনোয়ার এতক্ষনে নিঃশ্বাস ফেলে হাত থেকে চায়ের গ্লাসা নামিলে রেখে

বলল- এমন অঘটন একটু আধটু ঘটেই থাকে ।

শরীরের কাদা ধুয়ে ঘরে এসে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে মিন্টু ভাবল সত্যি একটা অঘটনই বটে। এমন তো ঘটবার কথা ছিল না। সে তো কত দেশ ঘুরেছে । কত মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের এই নিভৃত গ্রামটিতে ওই ডাগর সরল চোখের মেয়েটিকে দেখবার পর থেকে তার মনোজগতে এমন একটা অভাবনীয় অঘটন ঘটে গেল কেমন করে ! আজ বিকেলে রমিকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিলের ধরে চলে গিয়েছিল। রমি অবশ্য ভয় পাচ্ছিল। কি যেন কেউ যদি দেখে ফেলে। সারা গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে যাবে। বিশেষ করে মঞ্জুর ভাইয়ের চোখে পড়লে তো কথাই নেই। আনোয়ার চাচারা ঢাকায় ফিরে গেলে পরদিনই শরিকের মুরুব্বীদের ডেকে মজলিশ বসাবে। বিচার দেবে। একে তো তাদের মা-মেয়েকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না মঞ্জুর ভাই। ভয়ে রীতিমত শরীর কাঁপছিল রমিজার। আবার মিন্টুর সঙ্গে বেড়ানর লোভটাও সম্বরণ করতে পারছিল না। এত বলে বিদ্বান ! কত দেশ বিদেশ ঘুরেছে। অথচ তার চোখে-মুখে শিশুর সারল্য আর কৌতূহল। এমন সব কথা বলবে তাঁর প্রশ্ন করবে যা শুনলে এ গাঁয়ের একটা পাঁচ বছরের ছেলেও মিন্টুর অজ্ঞতায় হেসে উঠবে।

বিলের ধারে ঘাসের ডাঙায় এসে বড় বড় নল খাগড়া আর বইন্যা গাছের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা সাপ দেখে চীৎকার করে উঠেছিল মিন্টু। সঙ্গে সঙ্গে হেসে লুটিয়ে পড়েছিল রমিজা। কি বীরপুরুষ রে ! সামান্য একটা জলঢোড়া দেখে ভয়ে অস্থির।

রমির হাসিতে চটে উঠেছিল মিন্টু।

- হাসছিল যে বড় রমি ! সাপ দেখে হাসবার কি আছে !

আরো হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল - ও তো জলঢোড়া ! ও সাপ দেখে আবার কেউ ভয় পায় না কি ! এই আপনার সাহস !

হাসতে গিয়ে রমির মাথার ঘোমটা খসে গিয়ে এল খোপা ভেঙে একরাশ চুল ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পিঠে। মিন্টুর মুখের ভাষা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল মুগ্ধতা। রমির কিন্তু মিন্টুর ভাবান্তরে খেয়াল মাত্র নেই। বইন্যা গাছের পাতায় পাতায় তার হাসির ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ তার কেমন দুষ্টমীর ঝোক চাপল। হাসি থামিয়ে অস্ফুট চীৎকার করে উঠল রমিজা

– মিন্টুভাই সরে যান। সরে যান। সাপ । ওটা জলঢোড়া নয় কেউটে।

লাফিয়ে উঠল মিন্টু। আর আচমকা তাল সামলাতে না পেরে নরম মাটিতে পা পিছলে পড়ল কলমীলতার দাম আর শাপলা লতায় ভরা পানির মধ্যে। এমন দুর্বিপাক রমিজার চিন্তার বাইরে ছিল। ঘটনার আকস্মিতায় এক পলক হতভম্ব হয়ে রইল রমি। পরক্ষণেই কোমরে কাপড় জড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মিন্টুকে ডাঙায় টেনে তুলল। ওপরে যখন উঠল তখন দু'জনেই কাদা পানিতে ভিজে একাকার। রমিজা অনুভব করল মিন্টুর দুটি বলিষ্ট হাত থেকে নির্ভর নয়, আবেষ্টন করে আছে। রমিজা যেন অনাস্বাদিত এক পুলকে অবশ হয়ে যাচ্ছে।

নলখাগড়ার ওদিকে এক ঝাঁক বুনো হাঁসের পাখার ঝাপটায় চমকে উঠল রমিজা। সঙ্গে সঙ্গে সম্বিত ফিরল তার। মিন্টুর বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দু'হাতে বইন্যার ডাল পালা ঠেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। ছি ছি ! ওই বিলের কালো পানিতে ডুবে মরল না কনে সে। কি লজ্জা !

মিন্টুর কাপড় ছাড়া হতে হাতে চায়ের গ্লাস নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রমিজা। আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল আপনার চা। মিন্টু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল । তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল ঘরে আয় রমি ।

রমিজার ঘোমটার দৈর্ঘ্য কমল। দ্বিধান্বিত সংশয়ের দৃষ্টি তুলে কোন রকমে তাকাল মিন্টুর দিকে । মিন্টু হাসল ভয় নেই। এখানে জলঢোড়াও নেই। কেউটেও নেই ।

রমিজা ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল। বিকেলের চপলতা আর তার মধ্যে নেই। তরুণী মহিলার গাম্ভীর্যে সে যেন সংযত। মিন্টু এসে তার কাছে দাঁড়াল ।

— আচ্ছা ! তখন মিছিমিছি আমায় কেন ভয় দেখালি। অবশ্য তাতে আমার লোকসান হয় নি ।

রমিজা চকিতে একবার চোখ তুলে নীরবে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। মুগ্ধ চোখে রমিকে দেখল কয়েক পলক মিন্টু। দু'জনই চুপ। একসময় মিন্টু রমির চিবুকটা এক হাতে তুলে ধরল। গভীর কণ্ঠে ডাকল—রমি ।

কেঁপে উঠল রমিজা। কথা বলতে পারল না ।

মিন্টু আবার ডাকল – রমি ! আমার চোখে দিকে তাকা। ভয় করছে তোর ? এতক্ষণে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল রমিজা

মিন্টুর বুকে সাগরের ঢেউয়ের মত আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। মনে হল বিলের শ্বেতপদ্মের মত নিষ্পাপ এই মেয়েটিকে মনের ভাব প্রকাশের মত কোন ভাষা তার জানা নেই। শুধু অস্ফুটে বলল – তুই এত সুন্দর ! এত ভালো ! এত আশ্চর্য রমি ! তোকে আমার ভীষণ ... ভীষণ ভালো লাগে ।

অনেক কাছ থেকে মিন্টুর সুন্দর চোখের দৃষ্টিতে দৃষ্টি রাখল রমিজা। জড়িত কম্পিত কণ্ঠে বলল – আমি মুখ্য। গরীবের মেয়ে। আমাকে তুমি এসব কি বলছ ।

মূর্খ ! রমি এত ইনোসেন্ট নিষ্পাপ মুখ যে আমি জীবনে দেখি নি। রমি তোকে যদি আমি বিয়ে করি ।

যেন ভয়ংকর অসম্ভব কোন কথা শুনেছে এমনি ভাবে চমকে উঠল রমিজা। মিন্টুর হাত থেকে নিজের মুখটা সন্তর্পণে সরিয়ে নিল। তার চোখ দু'টো পানিতে ভরে উঠল। যদিও তার বুক অসহ্য দুর্বোধ্য এক আনন্দে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল ।

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে রমিজা বলল – আমি যাই । মা খুঁজবে ।

মিন্টু দু'হাত দিয়ে ঘরের দরজা আগলে ধরল - আমার কথার জবাব দিয়ে গেলি না রমি ?

রমিজা অসহায়ভাবে একবার মিন্টুর দিতে তাকাল । তাকিয়ে বুঝল ওই মানুষটা এই ক'দিন তার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে গেছে। আবার চোখ নামিয়ে নিল রমিজা। ছোট্ট করে বলল তাহলে কাল চলে যেও না। তুমি চলে গেলে আমার খুব কষ্ট হবে ।

- মিন্টুর চোখের দৃষ্টি হাসিতে উজ্জ্বল হল – ঠিক আছে যাব না ।

রমিজা আশ্চর্য সুন্দর এক দৃষ্টি মেলে রইল মিন্টুর চোখে। রমির চোখের আলোর ভাষা মিন্টুর বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিতে ফাল্গুনের উন্মাদনা এনে দিল । দীর্ঘ সুন্দর দু'টি আঙুল রমিজার রঙের আভাষ ফোটা গালে ছুঁইয়ে মিন্টু বলল তোমাকে আমি - ভালোবাসি রমি ।

ছয়

ঢাকায় উত্তেজনা উত্তাল ভরা উনিশ শ' একাত্তুরের মার্চ। আনোয়ার খবর কাগজ পড়তে পড়তে উৎকর্ণ হল। নীলক্ষেতের ছায়াচ্ছন্ন নিরিবিলি পথ আবার শ্লোগানের গর্জনে থরথর। জমিলা বারান্দা থেকে সরে এল। বলল এ মাসটা যেন মিছিলের মাস। এদিকে তোমরা আবার অসহযোগ করে ঘরে বসে রইলে। কি যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।

আনোয়ার খবর কাগজ ভাঁজ করে রাখল ।- একটা কিছু হবে। এদিকে দেখ না পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধির দল এসে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সঙ্গে বদ্ধ ঘরে আলোচনা করছে কিন্তু কাগজের খবর তো বলছে অন্যরকম ।

—কি লিখছে কাগজে ? কাগজ আজ পড়ি নি ।

আনোয়ার চিন্তিতভাবে বলল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ এসেছে চট্টগ্রামে। সেখানে কি গোলমাল হয়েছে। এদিকে শান্তির ফয়সালা ওদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি । কি যে ঘটতে যাচ্ছে কিছুই বুঝছি না ।

রাস্তা দিয়ে আবার মিছিল যাচ্ছে। জমিলা উঠে জানালায় দাঁড়াল। উত্তাল মিছিলের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল জমিলা। ইসকাটনে তার নতুন বাড়ীর কাজ শেষ। ইচ্ছে ছিল মিন্টু ফিরে এলেই মিলাদ দিয়ে উঠে যাবে। এ মাসের শেষে মিন্টুর করাচীতে ফিরে যাবার কথা। ওর ছুটি সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। আজ মার্চের পঁচিশ তারিখ। মিন্টু হয় তো দু'একদিনের মধ্যে এসে যাবে।

আনোয়ার ঘর থেকে ডাকল – জমিলা, আমাকে একটা নোভালোজিন ট্যাবলেট থাকলে দাও তো । কেমন জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে।

জমিলা নোভালোজিন আনতে গেল ।

সন্ধ্যায় আনোয়ারের জ্বরটা একটু বাড়ল। জমিলার মনটা সব মিলিয়ে বিষণ্ন লাগছিল। কোন রকমে খেয়ে ঘরে এল জমিলা। আনোয়ার শুয়েছিল। জমিলা আনোয়ারের কপালে হাত দিয়ে চিন্তিত হল জ্বর মনে হয় বাড়ছে। আমি ডাক্তার সাহেবের কাছে একটা ফোন করি না হয়। আনোয়ার মৃদু আপত্তি

করল - থাক না । রাত করে আর ঝামেলা বাড়িয়ে কাজ নেই। সকালে উঠে দেখা যাবে ।

জমিলা শুনল না। ড্রইংরুমে টেলিফোন করতে গেল। টেলিফোন বার কয়েক ডায়াল করে মহা বিরক্ত হল জমিলা। কাণ্ড দেখ। টেলিফোনটাও ডেড হয়ে আছে। আনোয়ারকে না জানিয়ে জমিলা পাশের ফ্লাটে মিসেস আলমের টেলিফোনে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে গেল। মিসেস আলম অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বললেন কি কাণ্ড দেখুন। আমার টেলিফোনও ডেড হয়ে বসে আছে। ছোকরাটাকে দিয়ে খবর নিলাম পুরো বিল্ডিংয়ের সবার বাড়ীর টেলিফোনই ডেড। কি যে ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদের সাহেব বললেন শহরের অবস্থাও নাকি ভালো না। শহরে নাকি আর্মি বের হচ্ছে। ওদিকে ছেলেরা পাড়ায় পাড়ায় ড্রাম ভাঙ্গা টিন ইট পাটকেল আর গাছ ফেলে ব্যারিকেড দিচ্ছে ।

চিন্তিত মন নিয়ে ফ্লাটে ফিরে এল জমিলা। স্বামীকে কিছু বলল না। কম্বল দিয়ে আনোয়ারকে ভালো করে ঢেকে দিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল । অজানা আশংকায় অনেকক্ষণ জেগে থেকে ঘুমিয়ে পড়ল।

অস্বস্তি নিয়েই হঠাৎ ঘুম ভাঙল । চারিদিকে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ । আতংকগ্রস্ত জমিলা উঠে বসল। আনোয়ারকে ঠেলে তুলল ওগো শুনছ। এসব কিসের শব্দ হচ্ছে !

আনোয়ার উঠল । জানালার সার্সির সামনে গিয়ে আবার ফিরে এল । রাস্তা দিয়ে বিরাট বিরাট মিলিটারীর ভ্যান চলছে। আকাশটা ট্রেসারের নীল আলোর ফুলকিতে ভয়াবহ ।

দরজায় ঠক ঠক শব্দ হল। বাইরে থেকে আলম সাহেবের কণ্ঠ শোনা গেল দরজাটা খুলুন ।

ত্রস্তহাতে বাইরের দরজা খুলে দিল আনোয়ার। ভীত উদ্ভ্রান্ত চেহারা নিয়ে ভিতরে এলে আলম সাহেব সর্বনাশ হয়েছে। পালান পালান। আর উপায় নেই।

বাইরে ট্যাঙ্কের চাকার ধাতব শব্দের সঙ্গে চলেছে গোলাগুলীর অবিশ্রাম শব্দ। আনোয়ার দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকাল – কি ব্যাপার ! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না ।

কি আর বুঝতে চান। পাক আর্মি সারা শহরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ইকবাল হলে সব শেষ। প্রফেসরদের কোয়ার্টারেও ঢুকেছে। আর সময় .....

আলম সাহেবের কথা শেষ হল না। সিঁড়ি দিয়ে জোড়া জোড়া ভারী বুটের শব্দ ওপরে ওঠে এল। দরজার ওপর অমানুষিক শক্তির হিংস্রতায় আঘাত পড়তে লাগল - দওয়াজা খোল দোও। দরওয়াজা খোল ।

কয়েক মুহূর্ত বজ্রাহত স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল তিন জন। ছোকরা চাকরটা ঘুম ভেঙে বোবা চোখে বারান্দার এক ধারে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল । সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড পদাঘাতে দরজার পাল্লা ভেঙে ছিটকে পড়ল । মুহূর্তের মধ্যে স্টেনগানধারী একদল পাকিস্তানী সৈন্য ঘিরে ফেলল তিন জনকে ।

আনোয়ার বোধ হয় নিজের অজানিতেই প্রশ্ন করল – আপনারা কি চান ?

- দলের মধ্যে একজন মধ্যবয়সী পাঞ্জাব প্রদেশীয় মেজর ছিল। কঠিন নিরুত্তাপ মুখে পৈশাচিক হাসি ফুটিয়ে সে বলল বাঙালীকা খুন। তোম লোক তো বহুত লিখা পড়া আদমী হ্যায়। তোম সব বাঙালীকা দেমাগ গরম কিয়া। শুন, মাস্টার সাহাব। ইস মাসরেকী পাস্তিানমে এক ভি লিখা পড়রা আদমী হামলোক নেহি রাখেঙ্গে। ইধার স্রেফ মজদুর আওর ক্ষেতি কা কামকরণেওয়ালা আদমী রহেগা। সব তালিমওয়ালা বাঙ্গালীকা বাচ্চে কো মার ডালেঙ্গে। আওর সব বাঙ্গালী আওরাতকো রাণ্ডী (দেহ উপজীবিনী) বানেয়েঙ্গে। কেয়া সোচা কমজাত কাফের লোগ ?

আনোয়ারের এই মুহূর্তে ভয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মাথা তুলল সে কে কাফের?

আলম সাহেব সাদা কাগজের মত মুখে বিড়বিড় করলেন।

- আপলোক ভি মুসলমান। হাম সব ভি মুসলমান ।

আনোয়ার আবার কথা বলল চব্বিশ বছর আগে তোমরা মুসলমান আমরা মুসলমান এই সমঝোতাতেই পাকিস্তান হয়েছিল। তোমরা বেঈমান মুনাফেক।

মেজর ধমকে উঠল – চোপ রও ।

তারপর হুকুম দিল – খতম কর দোও সব কো ।

সঙ্গে সঙ্গেই এক ঝাঁক গুলী এসে বিঁধল আলম সাহেব, জমিলা ও আনোয়ারের বুকে। ছোকরা চাকরটাকেও টেনে এনে গুলী করা হল। তারপর বীর দর্পে পবিত্র কোরান শপথকারী দেশরক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সৈনিকেরা একের পর এক বাড়ীতে ঢুকে নির্দোষ মানুষের রক্তের বন্যা বইয়ে চলল ।

মানুষের রক্তের ওপর প্রভাত-সূর্যের লাল রং ছড়িয়ে সকাল হল। ঢাকা নগরী তখন রক্ত, মৃতদেহ আর বন্দুকধারী জালেমের ট্যাংক, মেসিনগান, স্টেনগানের ভয়াবহতায় এক আতংকের নগরী।

গ্রামে বসেই খবর পেল মিন্টু ।

সাতাশে মার্চ সকালে ট্রানজিসটর রেডিও খুলে শুনল প্রতিবাদের কণ্ঠ । যেন কণ্ঠ নয় বিদ্রোহে প্রদীপ্ত আশায় ভাস্বর এক বাণী। অন্ধকার অমনিশায় আলোর দিশা।

'আমি মেজর জিয়া শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।'

একে একে সব খবর এল। আনোয়ার জমিলা কেউ বেঁচে নেই। খবর এল ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, রাজারবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের। পাকিস্তানী সৈনিকেরা মেশিনগান আর ট্যাংক নামিয়ে নিরস্ত্র মানুষ মারছে ।

চট্টগ্রামে ওদিকে ই, পি, আর পুলিশ রাজেন্দ্রপুর থেকে ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একদল, কুমিল্লা থেকে আর এক দল বাঙালী সেনিক বিদ্রোহ করে সরে গেছে। প্রচণ্ড অবরোধ চলছে।

মিন্টু যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। মা-বাবা আত্মীয়-বন্ধু অনেকেই নেই। দিনরাত ট্রাজিসটর রেডিও খুলে ছটফট করছে সে উপায়হীন আক্রোশে। দলে দলে লোক পালিয়ে আসছে গ্রামে । এই সঙ্গে আসছে পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বর পৈশাচিক অত্যাচারের আতঙ্কভরা কাহিনী। পুরুষদের গুলী করে মারছে। মেয়েদের ইজ্জত হানি করে অমানুষিকভাবে হত্যা করছে। শিশুদের বেয়নেটের মাথায় গেঁয়ে টুকরো করছে।

পৃথিবীর দৃষ্টিতে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানকে ।

কি করবে ! কি করবে মিন্টু। সারা শরীরের রক্ত তার উত্তেজনায় জ্বলছে।

ঘরের মধ্যে পাগোলের মত পায়চারী করছিল সে। রমিজা এসে দাঁড়াল দরজার সামনে- মিন্টু ভাই ! মা বলছিল তুমি আজও কি কিছু খাবে না ?

মিন্টুর যেন ঘোর ভাঙল। প্রচণ্ড জোরে ধমকে উঠল - খাব ! সরে যা। সরে যা আমার সামনে থেকে। জানিস আমার সারা বুক আর মাথায় আগুন জ্বলছে। ইচ্ছে ইচ্ছে ... ইচ্ছে হচ্ছে .... উঃ ।

দু'হাতে মাথা চেপে খাটের এক প্রান্তে বসে বসল মিন্টু। রমিজা সরে গেল না। ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল মিন্টুর পাশে। সংকোচে একটা হাত রাখল তার পিঠে। তারপর অদ্ভুত চাপা দৃঢ় কণ্ঠে বলল – এর শোধ নিতে পারি না আমরা?

মিন্টু চমকে চোখ তুলে তাকাল রমিজার চোখে । গ্রাম্য শান্ত মেয়ের সরল চোখে যেন মশালের আগুন, প্রেরণার হাতিয়ারের আহ্বান। মিন্টু উঠে দাঁড়াল। দু'হাত দিয়ে রমিজা কাঁধ আঁকড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে যেন নিজের সত্তার দৃঢ়তাকে অনুভব করল । তার সারা মনে এক অদ্ভুত উদ্দীপনার জোয়ার উছলে উঠল। রমিজার আগুন ভরা চোখে চোখ রেখে বলল – পারি। হাজার বার পারি। পারতেই হবে। আমার মা- বাবার নিরুপায় মৃত্যুর, অসংখ্য নির্দোষের রক্তপাতের, অজস্র মা বোনের ইজ্জত হানির অপমান আর নিষ্পাপ শিশুর হত্যার বদলা আমাকেই নিতে হবে।

রমিজা মিন্টুর হাত দু'টির ওপর নির্ভয়ে অসম্ভব আশ্বাসের উষ্ণতায় নিজের হাত দু'টি রাখল। বলল - যাও তবে, যুদ্ধে যাও।

সাত

পাঞ্জাবী জেনারেল টেবিলে সেলুট দিয়ে পাঠান কর্নেল ফিরে এল মেসে। জেনারেল সাহেবের আজ মেজাজ খুব খারাপ। ওদিকে ইয়াহিয়া সাহেব তো মদে চুর হয়ে বলছেন শোন দুনিয়ার লোকেরা, পূর্ব পাকিস্তানে সব ঠিক আছে। এটা একটা ঘরোয়া ব্যাপার। মনে মনে বলছে খুব বোকা বানিয়েছি সবাইকে। আর শায়েস্তা করেছি কমজাত বাঙালীকে। এদিকে কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও খবর বেরিয়ে গেছে। সারা পৃথিবীর পত্র-পত্রিকার খবর বেরিয়েছে ‘জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ', মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার খবর বেরিয়েছে ফলাও করে ।

জেনারেল সাহেবের মাথা গরম। সামরিক সৌজন্য ভুলে টেবিলে ঘুষি মেরে বলছেন আমরাও দেখে নেব ।

মুখ লাল করে অধস্তনদের হুমুম দিয়েছেন – দফা কর ইয়ে খবর কো। আওর দাবাও বাঙালীকো । এবার শুধু অস্ত্রে নয়। ছলে বলে কৌশলে এগোও। বিহারী গুণ্ডা লেলিয়ে দাও। পয়সার লোভ দেখিয়ে রাজাকার বানাও ।

কর্নেল মেসে ফিরে ইউনিফরম খুলতে খুলতে পাঠান মেজরকে বলল – ইংরাজী পত্রিকায় লিখেছে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের অস্ত্রহীন নিরীহ বাঙালীদের ওপর বর্বর অত্যাচার হিটলারের নাজী সৈন্যদের নৃসংশতাকেও হার মানিয়েছে। মধ্য যুগের চেংগিস খান হালাকু খানের রক্তপিপাসু তরবারীর ইতিহাসকে ম্লান করেছে ।

পাঠান মেজর মনোযোগ দিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনছিল রেডিওতে। কর্নেল বসে পড়ে বলল ইয়ার। পঁচিশে মার্চ রাত্রেই পূর্ব পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে। ভুল আমরাই করেছি। একটা নিরীহ বেড়ালকে ঘরে আটকে তুমি যদি ক্রমাগত মারতে থাক এক সময় নিরুপায় হয়ে সে তোমার টুটিতে মরণ কামড় হানবে।

মেজর রেডিও বন্ধ করে সন্ত্রস্ত হয়ে বলল চুপ চুপ। কেউ শুনলে কোর্ট মার্শাল হয়ে যাবে। আসলে আমারও এসব ভালো লাগে না। এই যে শ'য়ে শ'য়ে মেয়ে ধরে এনে ক্যান্টনমেন্টে রেখে পাশবিক অত্যাচার করা হচ্ছে... বলুন আমাদের কি মা-বোন নেই ? তাছাড়া প্রত্যেকদিন নির্দোষ লোক ধরে ক্যান্টনমেন্টে যে অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়ে মারা হচ্ছে এ আমার সহ্য হয় না। মনে হয় চাকরী ছেড়ে চলে যাই । এ কাজ করবার জন্যই কি আর্মির কমিশন র‌্যাংকে এসেছিলাম ।

কর্নেল ম্লান হাসল — চুপ হো যাও দোস্ত। যে হারে মুক্তি বাহিনীর ছেলেরা আমাদের মারছে তাতে দু'দিনেই জেনারেল সাহেবের চান্দি ঘুরে যাবে।

-যাই বলেন স্যার। বাঙালীদের আমরা খুব আন্ডার এস্টিমেট করেছিলাম। বাঙালী নওযোয়ানদের ছাতিতে যে এত সাহস, কব্জিতে এত জোর এ কিন্তু আগে বুঝিনি ।

আরে ভুলে যাও কেন সিকসটি ফাইভের ওয়ারে বাঙালীরা যুদ্ধ না করলে

লাহোর শহর বাচত ! খেম কারান আর রান অব কাচে বেপরোয়া হয়ে লড়াই করেছিল তো বাঙালীরা। মনে রেখো এত কাল বাঙালীদের যে যতই দাবিয়ে রাখুক বাঙালীরা আসলে লড়াকু জাত ।

তা বটে। তা না হলে এত ট্যাংক কামান মেশিনগান স্যাভার জেট নিয়েও লুঙ্গি পড়া পচা পান্তা খাওয়া বলতে গেলে আধ পেটা খাওয়া ছেলেগুলোর কাছে এমন মার খায় সুশিক্ষিত যুদ্ধপটু বেস্ট সেনাবাহিনীর দল ।

কর্নেল আবার হাসল — তাতে কি। তারা তো গ্রাম শহর জ্বালাচ্ছে। লুট করছে। মৌজে আছে ।

বারান্দায় পায়ের শব্দ হতেই দু'জনেই চুপ করে গেল ।

মিন্টু চলে যাবার পর মঞ্জুরের লম্ফ ঝম্প চলল ক'দিন। তারপর হয়ে বসল সে রাজাকার রিক্রুটমেন্টের কমান্ডার ।

তার বাড়ীতে মিলিটারী আসে এ কি কম কথা। সে তো ইচ্ছে করলেই গাঁয়ের সে কাউকে মুক্তিবাহিনীর বলে ধরিয়ে দিয়ে পারে। কত হোমরা চোমরা লোকের সাথে তার খাতির। মৌলবী ফরিদ আহমদের সঙ্গে দেখা করে এসেছে সে ঢাকায় গিয়ে। বাড়ী ফিরেই রমিজার মাকে বলছে – চাচী শোন, এই যে বড় বড় লোকের সঙ্গে দেখা হল। গিছলাম একদিন ক্যান্টমেন্টে সেখানে পাঞ্জাবী সাহেবরা যা ইজ্জত করল ...... দেখো ইচ্ছে করলেই মিন্টুর নাম বলে দিতে পারতাম। তা আর বললাম না। হাজার হোক চাচাত ভাই তো। তবে তোমরা কিন্তু সাবধান। ওর ছায়া যেন বাড়ীর আশেপাশে না পড়ে। তোমার মেয়ের সঙ্গে তো আবার খুব মাখামাখি ছিল।

রমিজার মা মাথা নত করে রইলেন ।

মঞ্জুর একটু আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হেসে আবার বলল- চাচা তো মরেছে। মিন্টুটাও আর ফিরে আসবে না। ওটাও মরবে ।

রমিজার মা শিউরে উঠলেন। অজানিতে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল – ষাট বালাই । অমন কথা বোলো না। সে যে সোনার টুকরো ছেলে ।

মঞ্জুরের চোখের দৃষ্টি ক্রূর হল। মুখ বিকৃত করে বলল – ষাট বালাই ! উঃ, খুব যে দরদ। তা তোমার মেয়েটিকে নিয়ে অমন ফূর্তি করে কেটে পড়ল কেন?

শোন চাচী, তোমাকে সাফ কথা বলে দিই। সাবের চাচার সম্পত্তি ভোগ করার মালিক এখন আমি একা। তোমরা মায়ে ঝিয়ে-আমার বাড়ীতে কাজ কাম করবে। আর দু'টি খাবে। আর এও শুনে রাখ মিন্টুর ছায়া পর্যন্ত পেলে আমি ছাড়ব না। সম্পত্তি তাকে ভোগ করতে হবে না। তার আগেই গুলি খাওয়াব। যদি কখনও শুনি তোমরা তার খোঁজ খবর নিচ্ছ তোমার মেয়েকে নিজের হাতে চুলের মুঠি ধরে পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন সাহেবের ক্যাম্পে তুলে বেশ্যা বানিয়ে দিয়ে আসব। রমিজার মা অস্ফুট চীৎকার করতে গিয়ে থেমে গেলেন। শুধু বললেন- বাবা মঞ্জুর, ও তোমার বোন ।

মঞ্জুর ধমকে উঠল – থাক । থাক। ওসব ছিচকাঁদুনী শোনাতে এসো না।

মঞ্জুর চলে যেতে আতঙ্কগ্রস্ত রমিজার মা ঘরে এসে দেখলেন রমিজা ঘরের বেড়া আঁকড়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েকে কি বলবেন ভেবে পেলেন না তিনি। রমিজা মায়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। তার সারা মুখে বিচ্ছুরিত হতে লাগল ঘৃণা। মাটিতে থুথু ছিটাল সে প্রচণ্ড বিতৃষ্ণায়। তারপর বলল ওই লোভী কুকুরের বাড়ী তুমি যেতে পার মা আমি যাব না। মীরজাফর। বেঈমান। মুনাফেক।

রমিজার মা ভীত হয়ে মেয়ের মুখে চেপে ধরলেন – চুপ। চুপ। মঞ্জুরের কানে গেল আর উপায় নেই । শুনলি তো ও কি বলে গেল ।

রমিজা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল মায়ের দিকে - শুনেছি। আমি ওকে আঁশবটি দিয়ে কাটব।

ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন রমিজার মা। মেয়ের এমন মূর্তি তিনি কোন দিন দেখেন নি। তবু ভয়ে ভয়ে রমিজার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন – থাম রমি । থাম । অবস্থা বুঝে চলতে হয়। দেখছিস তো চার দিকের অবস্থা। বাজারের হাইস্কুলে মিলিটারী ক্যাম্প করেছে। সেখানে রোজই নানা গাঁ থেকে সোমত্ত বউ-ঝিদের ধরে আনছে। সেদিন ওপাড়ার আসমত বলছিল রাত হলে সেখান থেকে যা কান্নাকাটি চীৎকার ভেসে আসে শুনলেও শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়। আমরা এ গাঁয়ে এখনও ইজ্জত নিয়ে টিকে আছি মঞ্জুরের জন্যই। ওর বাড়ীর লোক বলেই এখনও শরীরে আঁচড় পড়ে নি ।

রমিজা বেড়া থেকে হাত নামিয়ে মায়ের দিকে ফিরল মা ! এমন বেঁচে থাকার আনন্দে আমার ফাঁসি দিতে ইচ্ছে হয়। আমি ফাঁসি লটকেই মরব।

রমিজার মা আর পারলেন না। মাটিতে বসে পড়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে ফেললেন - আহ্ আল্লাহ । কত যে তোমায় ডাকছি। আমাদের মা-ঝিকে তুমি তুলে নাও। না হয় গজব দাও জালেমদের ওপর। এত অত্যাচারেও তোমার আরশ কি কেঁপে ওঠে না !

রমিজা এসে ধীরে ধীরে মায়ের মাথায় হাত রাখল – ওঠ মা। যখন সময় হবে তখন আল্লার গজব আসবে ।

অগ্রহায়ণের শীতের রাতের কুয়াশাচ্ছন্নতার হালকা চাঁদের আলো মিহি ওড়নার মত ঝুলে আছে। ঘরে তক্তপোষের ওপর কাঁথা জড়িয়ে শুয়েছিল রমিজা। ঘুম নেই তার চোখে। ঘুম নেই অনেক মাস থেকে। ঘুমে নেই আশংকায় । ঘুম নেই প্রত্যাশায়। যদি .. যদি সে কোন রাতে আসে। গাঁয়ে মিলিটারী আস্তানা গাড়বার পর থেকেই অনেকদিন যখন তার মা নিরুপায় হয়ে তাকে গালাগাল করছেন ‘তুই আমার গলার কাঁটা। আল্লাহ তোকে তুলে নিক।' তখন রমিজার মাঝে মাঝে সত্যি দুঃসাহসী ইচ্ছা হয়েছে। ঘরের আড়াল সঙ্গে শাড়ী লটকে ফাঁসি দিয়ে মরতে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি কেবল একটি গোপন আকাঙ্ক্ষিত বাসনার প্রেরণার। মিন্টু বলেছিল যুদ্ধের ট্রেনিং নেবার পর যেখানেই তাকে দেওয়া হোক না এ গাঁয়ে সে একদিন আসবেই। এসে রমিজাদের নিয়ে যাবে নিরাপদ আশ্রয়ে। যদি সে আসে ! রাতে মাঝে মাঝে অভিমানে কাঁথায় মুখ চেপে কাঁদে রমিজা। কবে সে আর আসবে ! আর কত আশাতে বুক বেঁধে থাকবে মিন্টুর রমিজা ! তার আগে সত্যি যদি কোন অঘটন ঘটে যায়। ঘটা তো অসম্ভব কিছুই নয়। যখন তখনই তো কোন ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আবার মধ্যে মধ্যে ভয় করে রমিজার । সে অক্ষত অবস্থায় সুস্থ শরীরে আছে তো ! কি যেন যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি... । না না। সেকথা ভাবতেও পারে না রমিজা। যে তার জীবনে স্বপ্নের দুয়ার খুলে দিয়েছে, যাকে রমিজাই যুদ্ধে পাঠিয়েছে সে ফিরে আসবে না ? এ কখনও হয় ! প্রাণপণে আল্লাকে ডাকে রমিজা। আল্লাহ্, সে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক তাকে তুমি সুস্থ অক্ষত রেখো ।

বেড়ার ছিদ্র দিয়ে আসা আবছা আলোর আভাসে নির্ঘুম চোখে তাকিয়ে থাকে রমিজা। সহসা কেমন একটা শব্দে তার বুকের ভেতর দপ্ করে উঠল। সারা শরীর কাঁপতে লাগল। উৎকর্ণ হয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উঠে বসল রমিজা। কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ খুব সন্তর্পণে ঘরের পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছে। কি এক

দুর্বার সাহসের বশে মাথার কাছে রাখা ধারাল দা'টা তুলে নিল রমিজা। দা'টা সে রোজ মাথার কাছে নিয়ে শোয়। মনে মনে তার দৃঢ় সংকল্প কোন লালসাসিক্ত নৃশংস বিদেশী হায়নার হাতে পড়ার আগেই এই দা দিয়ে নিজের গলায় কোপ বসাবে। দা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে উঠে বেড়ার ছিদ্রে চোখ রাখল রমিজা। একজন পুরুষ দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে। আর সেই মূর্তিটাকে এক আবছা আলো আঁধারে চিনতে একটুও ভুল হল না রমিজার। বুকের উত্তেজনার ঢেউয়ে কেঁপে উঠল সারা শরীর। দরজায় সন্তর্পণে টোকা পড়ল। পলকে নিজেকে সংযত করে সাবধানী হাতে দরজা খুলে দিল রমিজা। মিন্টু ঘরে এল। মিন্টুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রমিজা। কান্নার আবেগে দুচোখ ভেসে গেল। একটি কথাও বলতে পারল না সে। মিন্টুও কথা বলল না । দু'হাতে রমিজাকে বুকে জড়িয়ে অজস্র আদরে তার ভেজা চোখ মুখ ভরিয়ে দিল। কয়েকটি বিস্মৃত মুহূর্ত। তারপর দু'হাত সরিয়ে নিল মিন্টু। মিন্টুর চোখে মুখে চুলে হাত বুলিয়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগল রমিজা। একটু পরেই সচেতন হল রমিজা। দ্রুত হাতে ঘরের দরজা বন্ধ করে সন্ত্রস্ত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল পালাও মিন্টু ভাই। পালাও—ওই মঞ্জুর শয়তান টের পেলে আর উপায় নেই। ও যে মিলিটারীর দালাল।

মিন্টু আত্মপ্রত্যয়ে অল্প একটু হাসল সবই জানি। ওই মিলিটারীর ক্যাম্প ওড়াবার জন্যই আমরা এসেছি। আমাদের আরো মুক্তিযোদ্ধ আছে আশেপাশে। রাতের আঁধারে এসেছিলাম তোকে এক পলক দেখার জন্য। রমি। যাই এবার।

রমিজা চকিত হল - যাবে। আর দেখা হবে না ?

-হবে ওদের দিন শেষ হয়ে গেছে। আজ কালকের মধ্যে এয়ার অ্যাটক শুরু হবে। যুদ্ধ বেধে যাচ্ছে। চলিরে রমি। আর শোন ! যদি পারিস দ ুটো দিন অন্য কোথাও পালিয়ে থাক ।

রমিজা অসহায়ভাবে বলল – কোথায় পালাব ! সব জায়গায়ই তো বিপদ । পর মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে বলল ঠিক আছে। সে ব্যবস্থাই একটা হবে। তুমি এবার যাও। মঞ্জুর ভাই-এর মা একটু পরেই উঠে পুকুর ঘাটে যাবে। যদি দেখে ফেলে ।

মিন্টু আবার হাসল - আমার পিঠে এটা কি দেখেছিস ? দেশের শত্রু যদি

আপনজনও হয় তাকে আমরা ছাড়ি না। আচ্ছা যাই ।

মিন্টু আর দাঁড়াল না। সাবধানে দরজা খুলে ঘরের পেছনে চলে গেল । সেখানে আরো দু'জন অপেক্ষা করছিল। বেড়ার ছিদ্র দিয়ে তাকিয়ে রমিজা দেখল ওরা সবাই ছায়ার মত সুপুরী বাগানের আবছায়ায় মিলিয়ে গেল ।

ভোর রাতে প্রচণ্ড গোলাগুলীর শব্দের ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন রমিজার মা। উঠে পড়ল মঞ্জুরের বাড়ীর সবাই। পাড়ার সব লোক জাগল। নিজেদের ঘরে হতভম্বের মত বসে রইল সকলে। রমিজার মা একবার বিবর্ণ মুখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন মুক্তিবাহিনীরা কি এসে গেল না কি রে ?

অদ্ভুত উত্তেজনায় মুখ তুলল রমিজা – জানি না ।

সকালের আলো ফোটার পরও যুদ্ধ চলল। সারাগায়ে তখন রব ছড়িয়ে গেছে মুক্তিবাহিনী এসেছে। ঘরে ঘরে তখন এক নীরব খুশীর উত্তেজনা। বেলা বাড়বার পর গোলাগুলী থামল। সারা দিন ঘর থেকে বের হল না রমিজা। বিকেলে শুকনো মুখে মঞ্জুর এল রমিজাদের ঘরে। বলল – চাচী ! মুক্তিবাহিনী এসেছে গ্রামে। আর ওদিকে শ্রীনগর থেকে দুই লঞ্চ বোঝাই মিলিটারী আসছে। তোমরা না হয় এক কাজ কর। একা ঘরে না থেকে আমাদের বাড়ী এসে থাক। আর শোন রমি, মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা যদি আসে আমরা কিন্তু বলব যে আমার ভাই আছে মুক্তিবাহিনীতে ।

রমিজা কিছুই বলে না। মঞ্জুর চলে যাবার পর মুখ খুলল – ওই অমানুষের বাড়ী আমি কখনই যাব না ।

রমিজার মা বিরক্ত হলেন - তোর সাহসের বড় বাড়াবাড়ি। মঞ্জুর তো ভালো কথাই বলল। রাত ভরে এত যুদ্ধ হয়ে গেল। শ্রীনগর থেকে আরো মিলিটারী আসছে। এতো কম ভয়ের কথা নয় ।

সন্ধ্যার আগে আবার আতংক ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে। কয়েক লঞ্চ বোঝাই পাক সৈন্য অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসেছে। ঘাটে নেমেই তাড়া বাড়ী বাড়ী সার্চ শুরু করেছে মুক্তিবাহনীর খোঁজে। সন্ধ্যার পর ভারী বুটের শব্দে রমিজাদের উঠোন কেঁপে উঠল। বুটের লাথিতে পুরোন কাঠের দরজা ভেঙে পড়ল। কয়েক জন পাঞ্জাবী সেনা রমিজাদের ঘরে ঢুকে পড়ল। মঞ্জুর অবশ্য এসেছিল সঙ্গে। কিন্তু তার মুখে কথা ফুটছিল না। বাঁশাপাতার মত কাঁপছিল সে। একজন সেনা

এগিয়ে এসে রমিজার মার চুল ধরে টেনে তুলল – বাতা মুকতি কিধায় হ্যায় !

দুর্বল শরীরে রমিজার মা মুখ থুবড়ে পড়লেন মাটিতে। তাঁর পিঠের ওপর বুট চেপে ধরে সৈনিকটি চীৎকার করে উঠল – জলদি বাতা দে বুড্টি মুক্তি কিধার হ্যায় ?

রমিজা কাঠের আলমারীটার পাশে লুকিয়েছিল। হঠাৎ তার মাথায় আগুন ধরে গেল। বেড়ায় গোঁজা দা হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল সে - খুন করে ফেলব জালেম । ছাড় আমার মাকে।

রমিজার আগুন ভরা চোখ, হাতে ধারাল দা কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব করে দিল সবাইকে। সৈনিকটি পরিপূর্ণ চোখে তাকাল রমিজার দিকে। তারপর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রমিজার দা ধরা হাতখানি চেপে ধরে বলল বাঃ। বহুত তেজী সা খুবসুরত আওরত হ্যায় ।

এক লাথি মেরে রমিজার মাকে ছুড়ে ফেলল উঠোনে। দলের সকলের দিক তাকিয়ে বলল - আ যাও ভাই লোগ। মুক্তি তো জরুর মিলে গা। ইস লাড়কী সে তো মজাক লে লোও।

মঞ্জুর ভূতগ্রস্তের মত ঠোঁট বিড়বিড় করতে লাগল ।

আধঘণ্টার মধ্যেই আবার প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের শব্দ। মুক্তিবাহিনীর গোলা এসে পড়তে লাগল পাকিস্তানী সেনাদের লঞ্চগুলোর ওপর। ধোঁয়া বারুদ আগুন আর শব্দে আকাশ যেন থর থর করে কেঁপে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

রমিজা অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল দু'দিন। তার মা আর নেই। পাকিস্তানী সৈন্যরা বেরিয়ে যাবার সময় তার কুকড়ে যাওয়া অচৈত্য দেহের উপর কয়েক রাউণ্ড গুলী খরচ করে গিয়েছিল যেন খেলার ছলে ।

পাশের বাড়ীর আসমতের মা রমিজাকে তুলে নিয়ে গেল ।

খালের পার দিয়ে আসমতের সাত বছরের ছেলেটা স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা একটা পতাকা হাতে লাফাতে রাফাতে কচি কণ্ঠে চীৎকার তুলে বাতাসে শিহরণ জাগাল – ‘জয় বাংলা' ‘জয় বাংলা' ।

নতুন নাগরিকের শিশু কণ্ঠের খুশীর অনুরণ যেন ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে গঞ্জে শহরে নগরে। মিন্টু এসে দাঁড়াল আসমতের ঘরের দরজায়। ঘরের মধ্যে মাথা

গুঁজে বিড়বিড় করছিল রমিজা। অসহ্য বেদনার্থ দৃষ্টি নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল সে। বুকের বেদনার অনুভূতিটা ঢেউ জাগা পুকুরের পানির মত কাঁপতে কাঁপতে স্তিমিত হয়ে গেল। মিন্টু এগিয়ে এসে দু'হাতে রমিজাকে বুকে টেনে নিল। চুলে ঠোঁটে চোখে পাগোলের মত ঠোঁটের স্পর্শ দিতে দিতে বলল রমি। আমার রমি !

ঘোলা নিষ্প্রভ চোখে তাকাল রমিজা। অর্থহীন নির্বাক দৃষ্টি। দু'জনেই তাকিয়ে রইল। মিন্টুর চোখ বলল – চেয়ে দেখো রমি। আমি তো মা-বাবা সবাইকে হারিয়েছি। তুমিও হারিয়েছ। তবু আমরা দু'জনেই আছি। আমরা থাকব ।

রমিজার চোখে ক্রমে ভাষা ফিরে এল। কম্পিত হাতে সে মিন্টুর চুল কপাল চোখ স্পর্শ করল । এবারে কথা বলল মিন্টু – চল রমি ! আমরা বাইরে যাই। সেই যে বিলের ধারে যেখানে এক দিন তুই আর আমি কাদা মাটি মেখে একাকার হয়েছিলাম ।

মিন্টুর হাত ধরে ঘরের বাইরে নামল রমিজা। বিলের কালো পানিতে শেষ বেলার বৌদ্রের সোনালী ঝলক। দূরে ধীর গতিতে বয়ে চলেছে শীতের শান্ত নদী পদ্মা। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চুপ করে রইল দু'জন। মিন্টু অপলকে দেখছিল রমিজার মুখ। শীর্ণ বিক্ষোভ ক্লান্ত বেদনার্থ মুখখানা শেষ সূর্যের রক্তিমাভায় অপরূপ। বেদনার মত। আনন্দের মত। মিন্টু ফিসফিস করল - তুমি আমার এই দেশের মত। অনেক দুঃখ সহা আনন্দময়ী। অনেক বিদেশী দস্যুর নির্যাতন সয়ে যে বেঁচে থাকে ।

রমিজা চোখ তুলল। আর সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলল - তোমার সব কথা বুঝতে পারি না ।

মিন্টু হাসল – আচ্ছা অত বুঝে কাজ নেই। তাকিয়ে দেখ দূরে ওই নদী পদ্মা। কত হাজার বছরের ইতিহাসের সাক্ষী। জানিস রমি ! দাদু ভারী অদ্ভুত একটা গল্প বলতেন। বং আর এলা নামে দুই আড়াই হাজার বছর আগে দু'টি তরুণ-তরুণী সব হারিয়ে এই পাখী ডাকা নীল জল টলটল শাপলা ফোটা বিলের ধারে, এই নদীর পাড়ে আল বেঁধে ঘর গড়েছিল। সেই বং আল আজ হাজার হাজার বছরের বঞ্চনা লাঞ্ছনা আর আর যন্ত্রণার আবর্তনের মধ্য দিয়ে অনেক রক্তের বিনিময়ে হল বাংলাদেশ ।

রমিজা তাকিয়ে রইল নদীর দিকে। হাওয়ায় ওর খোলা চুল উড়তে থাকল।

মিন্টুর রমিজা একটা হাত ধরল আমরা তেমনি সব হারিয়ে নতুন গড়ার আকর্ষণে সেই নদীর ধারে বিলের পারে এসে দাঁড়িয়েছি। চল রমি নীচের ভেজা ওই মাটির বুকে এই মুক্তদেশে মুক্ত আকাশের নীচে দু'জোড়া পায়ের ছাপ এঁকে দিই ।

রমি কথা বলল না। শুধু হাসল। হাত ধরাধরি করে ভেজা মাটিতে দুজোড়া পায়ের ছাপ এঁকে ওরা দাঁড়াল পানির ধারে ।

গোধূলির সোনালী আভা যেন গৌবের আবির ছড়িয়ে দিল দু'টি মানব-মানবীর ওপর, যেমন দিয়েছিল হাজার হাজার বছর আগে ।